মুসলমানমঙ্গল

জাকির তালুকদার

আ
আমারবই.কম
দুনিয়ার পাঠক এক হও!

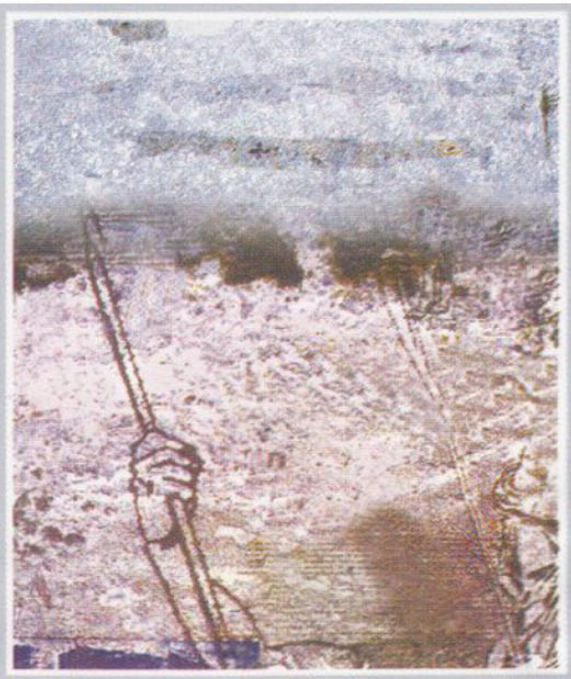

'আমি প্রতিটি অন্ধকার গুহা হাতড়েছি, আমি প্রতিটি সমস্যার ওপর অভিঘাত করেছি, আমি প্রতিটি অতল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমি প্রতিটি দলের ধর্মমত পরীক্ষা করেছি। এ সবই আমি করেছি যেন আমি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, এবং নির্ভুল সুন্নাহ ও বিদআতের মধ্যে তারতম্য করতে পারি। যখনই আমি কোনো বাতেনিকে দেখি, তখনই আমি তার মতবাদ পড়তে চাই। যখনই আমি কোনো জাহেরিকে দেখি তখন তার বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলি জানতে চাই। যদি তিনি দার্শনিক হন তবে আমি তার দর্শনের অন্তঃসারগুলি জানতে চাই। যদি তিনি মুতাকাল্লিম হন তাহলে আমি তার ধর্মতত্ত্বের যুক্তি পরীক্ষায় ব্যাপৃত হই। যদি তিনি সুফি হন আমি তার সুফিতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাকুল হই। যদি তিনি সংসারবিরাগী হন আমি তাহলে তার বৈরাগ্যের আচার-ব্যবহারের ভিত্তি অনুসন্ধান করি। যদি তিনি যিন্দিক হন তাহলে আমি তার এই ধরনের মত গ্রহণের সাহসিকতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেক গভীরে তাকাই।'

প্রচ্ছদ চিত্রণ। মাহবুব কামরান

জাকির তালুকদার, কারো কারো মতে, হয়ে উঠতে যাচ্ছেন, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের সবচেয়ে অগ্রগামী চিন্তার কথাসাহিত্যিক। সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজ ও মননকে ইসলামের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে লিখিত হয়েছে 'মুসলমানমঙ্গল'। আমরা বিনীত অহংকারের সঙ্গে বলতে চাই এই ধরনের উপন্যাস বাংলাভাষায় এটাই প্রথম।

সংবেদী পাঠক,

উভয়েই, আপনি এবং আমি, রক্তাক্ত হই প্রতিনিয়ত আমাদের মুসলমান এবং বাঙালি এই দুই পরিচয় নিয়ে। রক্তাক্ত হই দুই দিক থেকেই। বাহিরের দিকে আছে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের মানুষ। তারা কিছু ভিক্ষে, সাহায্য ও ঋণচক্রজালের সাথে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা ছিটিয়ে চলে আমাদের মুখে। আর ভেতরের দিকে রয়েছে আমাদের পাহাড়সমান জাতীয় অজ্ঞতা, পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে মানুষের অনীহা, ধর্মের নামে প্রতারিত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা, সারাজীবন ভুল নেতৃত্ব নির্বাচন, আত্মসম্মানবোধের অভাব, বহির্বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণাহীনতা এবং সর্বোপরি নিজেকে চিনতে চেষ্টা না করার বেদনাদায়ক অথর্বতা। আমাদের আছে গৌরবের ইতিহাস, কিন্তু অসম্মানের বর্তমান, আর অনিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ। এই উপাখ্যান তাই এক অর্থে রক্তাক্ত বেদনারও উপাখ্যান। কষ্ট ভাগ করে নিলে তা নাকি উপশমের সমান। এই প্রত্যাশা নিয়েই আপনি আর আমি মুখোমুখি।

চলুন তাহলে শুরু করা যাক!

মুসলমানমঙ্গল

জাকির তালুকদার

বিরচিত

মুসলমানমঙ্গল

আমার পীর-কেবলা
দাদিমা উম্মে ছাবিরন নেছা

আত্মসমালোচনাপর্ব

দূর থেকে মনে হচ্ছিল ডোয়ারের মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে কয়েকটা শুয়োর। কিন্তু এই গাঁয়ে শুয়োর আসবে কোত্থেকে! যারা শুয়োর পালত, সেই আদিবাসী বুনোরা অনেক আগেই চলে গেছে এই তল্লাট ছেড়ে। শহরের মতো এখানে কোনো সুইপার কলোনিও নেই যে দুই-একটা হারাম মাংসের প্রাণীর দেখা মিলবে। তাই সিদ্ধান্ত পাল্টে ভাবতে হয়, শুয়োর নয়, ওগুলো ঠিক মোষই হবে। কিন্তু মোষ ডোয়ারে গড়াগড়ি দেবে কেন! তারা তো গরমে সহনীয়তার অকুলান হলে নেমে যায় পুকুরে-মেঠেলে-খালে। পানি থাকলে পানিতে, না থাকলে পাঁকে পেট ঠেকিয়ে ধুঁকতে থাকে। অবশ্য তাদের ধুঁকতে থাকা বোঝা যায় না। তাদের পুরো শারীরিক ভাষায় থাকে এক বিপুল নির্বিকার ঔদাসীন্য। তারা তখন কারও হুকুমই গ্রাহ্য করে না। এমনকি মালিককেও পাত্তা দেয় না। চোত-বোশেখ মাসে সে নিজেই মায়ের সাথে মোষের গাড়িতে নানাবাড়ি যাওয়ার পথে বিড়ম্বনায় পড়েছে একাধিকবার। মাথার ওপরে রোদ চড়ে গেলে, আর পথের পাশে কোনো পাঁক-পানির খানাখন্দ দেখতে পেলে চালকের নির্দেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে জোড়া-মোষ গাড়ির জোয়াল কাঁধে নিয়েই মাটির সড়ক ছেড়ে হুড়হুড় করে নেমে গেছে শীতলতার স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায়। যতক্ষণ নিজের খুশি গা ডুবিয়ে বসে থেকেছে উবু হয়ে। শকটচালকের পান্টি পিঠে আছড়াতে আছড়াতে ছেতড়ে গেলেও তারা ওঠে না। সেসব অভিজ্ঞতা নিজের অনেকই হয়েছে। কিন্তু মোষের ডোয়ারের মাটিতে গড়াগড়ির ব্যাপারটি মিলছে না কিছুতেই। ডোয়ারে পাঁক কোথায় যে মোষ সেখানে শুয়ে থাকবে! আর বাড়ির মানুষই বা ডোয়ারে মোষকে শুয়ে থাকতে দেবে কেন!

চলনবিল এখন শুকানোর পথে। যে ক'টা খাল এঁকেবেঁকে এখনও কিছুটা পানি বয়ে নিয়ে চলতে পারছে সেগুলি আসলে আর নৌপথ নেই। কাজেই চলনবিলে এখন যেখানেই যাও, ভরসা আদি পদযুগল। সেই হাঁটার রাস্তাকেও তো রাস্তা বলে মনে করা মুশকিল। মূলত আলপথ। তার মাটি আগের বর্ষায় সরে সরে গেছে বলে উইয়ে খাওয়া কাঠের বাটামের মতো মাটির আল। তার সাথে শামুক-

ঝিনুকের মিশেল। খচ করে কখন যে পা পড়বে শামুকের ধারালো গায়ে আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়বে স্নায়ুতন্ত্রে, তা আগে থেকে ঠাওর করার কোনো উপায় নেই। সাবধানে চলতে গেলে চলতে হবে পুরোপুরি মাটির দিকে তাকিয়ে। তা কী সবসময় সম্ভব! যদিও চারদিকে তাকিয়ে কৌতূহল জাগতে পারে দর্শনযোগ্য এমন কোনো দৃশ্য নেই। এখন আমন কাটার মৌসুম চলছে। ক্যাটকেটে গা-পুড়ানো রোদের নিচে ফ্যাকাশে-হলদে রঙের নীবারগুচ্ছ। উত্তরের খিয়ার অঞ্চল থেকে ধানকাটার মুনিষরা এসেছে দলে দলে। ভিয়েতনাম-আফগানিস্তানের পথে পথে পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইনের মতো শামুক-ঝিনুকের দলা পায়ে পিষতে পিষতে ত্যানাঢাকা পশ্চাদ্দেশ উঁচু করে মুখগুলোকে প্রায় মাটির সাথে গুঁজে দিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কাস্তে চালিয়ে ধান কাটছে ওরা। প্রাচ্যরোদের নিচে ঘামতে ঘামতে ওদের কাঠ-কাঠ ত্বকগুলো এমনই কালো হয়ে গেছে যে শরীরগুলোকে আর মানুষের শরীর বলে মনেই হয় না। বরং যে কারও মনে হবে কচু-ঝোপের গোড়ায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে শুয়োরের দল।

তখনই বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে হয়, ডোয়ারের মাটিতে গড়াগড়ি করা শরীরগুলো আসলে মানুষেরই দেহ। কাছে গিয়ে দেখা গেল, শেষের ধারণাটাই সঠিক। কিন্তু মানুষগুলো এভাবে পানি ছিটিয়ে ডোয়ারে কাদা বানিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে কেন?

দুলাভাই বলে– গরম দেখো না! ভোর বেলা ধান কাটা শুরু করিছে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদ। শরীলে এখন আগুন ধরে গেছে রোদে পুড়ে পুড়ে। তাই মাঝে মাঝে ধানকাটার কাম ছেড়ে এসে এইভাবে কাদার মদ্যে গড়াগড়ি দিয়া চামড়ার জ্বালা জুড়ায়। জ্বালা কমলে আবার কামে চলে যায়।

দৃশ্য এবং দৃশ্যের পেছনের কারণটা জোর ধাক্কা দিয়েছে ইউসুফকে। ধাক্কাটা তার মনকে তখন প্রায় অসাড় করে দিয়েছে। এইভাবে কাজ করে মানুষ! এইভাবে গরম থেকে নিজেকে সাময়িক উপশম দেয়, তারপরে আবার নেমে যায় সেই গরমের মধ্যে! এইভাবে বেঁচে থাকে মানুষ! কী পরিমাণ কষ্ট ওরা পায় ভাবতে গিয়ে নিজেকে হাবিয়া দোজখের আগুনের মধ্যে কল্পনা করে ইউসুফ। কোনোমতে বলতে পারে– এত কষ্ট করেও ওরা এই কাজ করে চলে দিনের পর দিন!

দুলাভাইকে নির্বিকার দেখায়– কী করবি বলো! কারও-না-কারও তো ধানকাটার কাম করাই লাগবি। আর এইসব লোক এই কাম না করলে খাবে কী? তাছাড়া অগের এইভাবে থাকার অভ্যাস আছে। চলো ভিতরে চলো। তোমার আর এই রোদের মদ্যে বেশিসময় থাকার দরকার নাই। টাউনের মানুষ। সর্দি-গর্মি লাগতে পারে। ভিতরে চলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনও পা নাড়াতে বেশ কষ্টই হচ্ছে ইউসুফের। ডোয়ারের কাদায় গড়াগড়ি দেওয়া চারটি মানবদেহ থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এখানেও তো রোদ বেশ চড়া। ডোয়ারে থাকার মধ্যে আছে একটামাত্র কদবেলগাছ। তার মাথা এতটা ঝাঁকড়া নয় যে পর্যাপ্ত ছায়া পাবে মাটিতে গড়াগড়ি করা মানুষগুলো। বিমূঢ়ের মতো দেহ চারটির দিকে তাকিয়ে থাকে ইউসুফ। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুলাভাই বোধহয় ভাবে যে ইউসুফ কথা বলতে চায় মুনিষদের সাথে। তার সবসময়ের অনুচ্চ কণ্ঠ একটু উঁচু হয়– ও ব্যাঙ্গা মিয়া, এইডা আমার বড় কুটুম। তোমাগের মালকিনের ছোটভাই। টাউনে থাকে।

কঙ্কাল-কাঠামোতে কাদালেপা একজন মানুষ গড়াগড়ি থামিয়ে একটু উঠে বসার চেষ্টা করে। তাকায় ইউসুফের দিকে। যখন হাসে, দেখা যায় তার দাঁতেও কাদার ছিটে লেগে আছে। সে হাত তুলে কপালে– সালেমালেকুম!

ততক্ষণে বুবু বের হয়ে এসেছে খলপার বেড়া ঠেলে। রোদ-ঘাম মাখা চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক– ইউসুফ! আয় ভাই ভিতরে আয়!

উঠোনের উত্তর পাশে নতুন দালান উঠেছে। দালান মানে পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনির ওপরে দোচালা টিন। চলনবিলে এই ধরনের ঘরও খুব সাম্প্রতিক কালের সংযোজন। তাকে সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছিল দুলাভাই। কিন্তু দুলাভাইকে অনুসরণ না করে ইউসুফ সোজা উঠোন পেরিয়ে উঠল বুবুর পুরনো বড় ঘরের বারান্দায়। আবলুস রঙের শালকাঠের মোটা দরজা ঠেলে মাটির কোঠাঘরের ভিতরে ঢুকতেই আবছা অন্ধকারের সাথে মায়ের আঁচলের বাতাসের মতো আরামদায়ক ঠাণ্ডার স্পর্শ পায় শরীর। হাতের ব্যাগটা মেঝেতে কোথায় ফেলল সেদিকে লক্ষ্য না করেই বুবুর অর্ধেক ঘরজুড়ে পেতে রাখা পুরনো আমলের খাটে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল ইউসুফ। প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে প্রসন্ন হাসি মিশিয়ে ভাইয়ের এই এলিয়ে পড়া দেখল বুবু। যা গরম! এর মধ্যে আবার কয়েক মাইল হেঁটে আসতে হয়েছে ভাইকে। বুবু পাখা হাতে নিলে ইউসুফ নিজেই তার কাছ থেকে কেড়ে নিল পাখা। হাত ঘুরিয়ে দেখল সে বেশ ভালোভাবেই নিজের শরীরে তালপাখার বাতাস বইয়ে দিতে পারছে। তার পুরনো অভ্যাস এতদিনেও অনভ্যাসে পরিণত হয়নি দেখে বুবুর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটু খুশি হলো ইউসুফ। বুবু বলল– একটু গা ঠাণ্ডা করে তারপর হাতমুখ ধো। আমি ডাব কাটতে বলতিছি।

দুলাভাই বাইরে থেকে বলে– এই রোজা-রমজানের দিনে দুপর বেলাত কীসের ডাব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউসুফ কিছু বলার আগে বুবুই উত্তর দেয়– ভাই আমার কত দূর থেকে আসল। মোল্লাসায়েব কি জানে না যে মুসাফিরের জন্যে রোজা ভাঙা জায়েজ?

দুলাভাই মেনে নেয় কথাটা– এই রোদের গরম আর কী গরম! পরকালে দোজখের আগুন যে কী ভয়ঙ্কর সেইডা বুঝলে কেউ আর রোজা-নামাজ কামাই করত না। তা আজকের জন্যে নাহয় মুসাফিরের ওজর মানা গেল। ভোর পহরে কিন্তু সেহেরি খাওয়া লাগবি! আগামীকাল থেকে রোজা ছাড়ান নাই!

বুবু আপাতত ধামাচাপা দিতে চায় এই প্রসঙ্গ– কালকার কথা কাল দেখা যাবি। এখন আপনে ডোয়ারের একজন কামলাক কন ডাব কাটতে।

কিন্তু ডাব খাওয়ার আগেই বাইরে বেরিয়ে পড়তে হলো ইউসুফকে। দুলাভাইকে ডাকতে এসেছে উত্তেজিত কয়েকজন এলাকাবাসী। কী কারণ? মকু এই পবিত্র রমজান মাসেও তার খাবারের দোকান খুলে রেখেছে।

খাবারের দোকান জিনিসটাই চলনবিলে নতুন। যেহেতু নিয়মিত বাজার বলতে কোনো জিনিস আগে ছিল না। ছিল সপ্তাহের হাটবার। কোনোদিন বিলদহরে, কোনোদিন বিয়াসি, কোনোদিন খাজুরাতে, কোনোদিন কাউয়াটিকরিতে। সেখানে খাবারের দোকান বলতে ছিল জিলিপি-গজার দোকান। খাবার কিনে খেতে হবে এমন ধারণা অকল্পনীয় ছিল পুরো তল্লাটে। কারণ এই অঞ্চলে যে পা রাখত, সে কারও-না-কারও কুটুম। গাঁয়ের কোনো বাড়ির কুটুম দোকানে ভাত খাচ্ছে, এর চেয়ে বড় অগৌরবের আর কী থাকতে পারে! এছাড়া ছিল নৌকা নিয়ে হাটে ধান নিয়ে যাওয়া। সেই হাটেও ভাত-রুটি পাওয়া যেত না। যার নৌকা নিয়ে যাওয়া, খাওয়ার অক্ত হলে সেখানেই রান্না-বাড়া করে খেয়ে নেওয়া। তাই নৌকাতে হাঁড়ি-পাতিলের সাথে আলোক-চুলা থাকতই। খড়ি-লাকড়ির তো অভাব নেই। যে কোনো যায়গায় নাও ভিড়িয়ে কয়েকটা গাছের শুকনো ডাল-পালা টুকে নেওয়া। আর এখন নিয়মিত খাবারের দোকান বসে চলনবিলে!

চলনবিল কী আর সেই চলনবিল আছে! –দুলাভাইয়ের কণ্ঠে একটু যেন প্রচ্ছন্ন গর্বও। অনেক দূর-দূরের মানুষ আসে। আসে ধানের বেপারি, মাছের বেপারি, এনজিও-র মানুষ, আরও কতজনা। এখন তাই কয়হাত পর পর চা-বিস্কুটের দোকান। খাজুরা বাজার, বিলদহর বাজারে পারমানেন্ট ভাতের হোটেল।

চলে সেগুলো? মানে রেগুলার ভাত কিনে খাওয়ার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় খদ্দের আসে বাইরে থেকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে মানে! মানুষের কী কামাই আছে আসার! বাহিরের মানুষ আসতে আসতে বলে যে চলনবিলের মাটি খুঁচে কাদা বানায় দেয়!

আলাপটা এর বেশি এগুতে পারে না। রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যগ্র মানুষগুলি দুলাভাইকে তাড়া লাগায়– মকুর বেপারডা...

হ্যাঁ। চলো যাই।

তাদের সাথে সাথে ইউসুফকে বেরুতে দেখে বুবু পথরোধ করে– তোর আবার এই রোদের মদ্যে যাওয়া লাগবি ক্যান?

দেখে আসি বুবু। আমার বেশি কষ্ট হবে না।

কী দেখবে ইউসুফ? ভাতের হোটেল না কি রোজার দিনে ভাতের হোটেল খুলে রাখার অপরাধে মকুকে কী করা হয় হবে সেটা?

মকুর দোকানের সামনে অর্ধচন্দ্র সারি বানিয়ে দাঁড়ালো জনা তিরিশেক মানুষ। একটাই চেয়ার পাতা। দুলাভাই সেখানে বসার অপেক্ষাও করল না। কাছে পৌঁছেই বলল মকুকে– পয়লা রোজার দিনই তো তোমাক বলা হইছিল যে দিনের বেলা খাওয়ার হোটেল খুলা রাখা যাবি না।

মকু চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

কী বলা হইছিল না?

মকু উত্তর দিল– হইছিল।

তা-ও তুমি দোকান খুলছ!

চিরাচরিত অনুচ্চ কণ্ঠেই কথা বলছে দুলাভাই। তার রাগও বোঝা যায় না, বিরক্তিও বোঝা যায় না। কোনো শুনানির ধার না ধেরে, আর বাড়তি কোনো প্রশ্ন না করে সরাসরি সিদ্ধান্ত দিল দুলাভাই– অর দোকানের বেড়া-টাটি খুলে ফেলো, চুলা ভাঙো। আর মকু তুমি ঐ ভাতের হাঁড়ি মাথাত নিয়া আজ ইফতারির আজান পর্যন্ত এই বাজারের মাঝখানে দাঁড়ায় থাকবে। রোজার মাসে আর যদি দোকান খুলার সাহস দেখাও, তাহলে তোমাক এই গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হবি।

সবগুলি কথাই হলো নিচু স্বরে। কিন্তু সবাই শুনতে পেয়েছে কারণ সেখানে ছিল নিঃশব্দ রুদ্ধশ্বাস। দুলাভাই ইউসুফের দিকে তাকিয়ে একবার বলল– চলো। তারপর সে আসছে কি না, তা না দেখেই পেছন ফিরে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। ক্ষমতার এমন নিরঙ্কুশ প্রয়োগ কোনোদিন চাক্ষুষ করেনি ইউসুফ। কোনো মানুষ একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না। সে মকুর দিকে তাকাল। মকুর মুখেও কোনো অনুযোগ-অভিযোগের চিহ্ন নেই। মনের মধ্যে থাকলেও তা বাইরে প্রকাশের সাহস নেই। সঙ্গের লোকজন কাজে লেগে গেছে দুলাভাইয়ের উচ্চারিত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দেশ অনুসারে। ফোঁশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দুলাভাইয়ের পাশে চলে এলো ইউসুফ। হাঁটতে থাকল পাশাপাশি। পনেরো মিনিটের বেশি একটানা চলার মধ্যেও দু'জনের কারও মুখেই কোনো কথা নেই। শেষে নীরবতা ভাঙল ইউসুফই– এই ভাবে কাজ করাটা কি ঠিক হলো দুলাভাই?

দুলাভাই তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল– কী ব্যাপারে?

এই যে মকুর দোকানের ব্যাপারটা।

কী হলো? কী সমস্যা দেখলে তুমি?

না, মানে, আপনিই তো বললেন এলাকায় এখন দূর দূর থেকে ব্যাপারিরা আসে। তারা তাহলে খাবে কোথায়?

মুসলমান হলে কেউ একবেলার খাওয়া নিয়া উদগ্রীব হয় না। অন্তত রোজার দিনে।

মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষও তো আসে। তারা কী করবে?

তারা নিজেরাই কোনো-না-কোনো ব্যবস্থা করে নিবে।

আর মকু?

কী হলো মকুর!

তার সংসার চলবে কী করে? ওর কি এটা ছাড়া আলাদা কোনো আয়ের পথ আছে?

তা বোধহয় নাই। অর তো কোনো জমিজমা নাই।

তাহলে সে তার পরিবার নিয়ে চলবে কীভাবে এই এক মাস?

আল্লার পথে থাকলে এগুলান কোনো সমস্যা না। আল্লা ঠিক চালায় নিবেন।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। আপনারা কি সমাজ থেকে মকুর জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করবেন?

এবার একটু বিরক্ত দেখায় দুলাভাইকে– তা করা লাগবি ক্যান? মকু নিজেই অন্য পথ খুঁজে নিবি। কামলা-কিষাণের কাম করবি, নাহয় অন্য কোনো ব্যবসা করবি।

কিন্তু তার সংসারের রুজি এইভাবে বন্ধ করে দেওয়াটা কি ঠিক হলো?

দুলাভাই এবার একটু হাসে– কেউ কারও রুজি বন্ধ করতে পারে না। আমার সেদিক দেখার দরকার নাই। ঐগুলান চিন্তা করার সময় নাই। সমাজের মাথা হিসাবে আমার কাম হলো শরা-শরিয়ত, ধর্ম-কর্ম, আর সমাজের নিয়ম-কানুন ঠিকভাবে চলতিছে কি না তা দেখা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করতিছি। আর তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না গাঁ-গেরামের নিয়ম-নীতি। কোনো জায়গাত একবার ঢিলা দিলে পরে আর সমাজকে ঠিক জায়গায় ফিরত আনা মুশকিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মকু আর তার পরিবার?

দুলাভাই পরম নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে– সেইডা আল্লার দেখার কথা, আল্লা দেখবেন। তুমি-আমি সেই চিন্তা করার কে? সেই কাম করতে গেলে খোদার উপর খোদকারী করা হয়। সেইডা ঠিক না।

মকু যদি আবারও দোকান খোলে? যদি আপনাদের নিষেধ না শোনে তাহলে কী করবেন?

একটু হাসে দুলাভাই। যেন খুব ছেলেমানুষী একটা প্রশ্ন শুনছে। বলে– অবশ্যই শুনবি। না শুনে তো মকুর উপায় নাই।

কেন উপায় নাই কেন?

না মানলে যে একঘরে হওয়া লাগবি। এত সাহস তার নাই। একঘরে হওয়ার আজাব বড় কঠিন।

এ আবার কী কথা! এই যুগেও কাউকে একঘরে করা হয় নাকি?

এই যুগ সেই যুগ বলে কোনো কথা নাই। হাদিসের নিয়ম শরিয়তের নিয়ম সব যুগেই এক।

একটু অবাক হয় ইউসুফ– শরিয়তেও একঘরে করার বিধান আছে!

তার দিকে তাকিয়ে অনুকম্পার হাসি হাসে দুলাভাই। বলে– তোমরা টাউনের মানুষ, পড় তো খালি ইংরেজি বই। আল্লার কালাম-কেতাবও একটু পড়া দরকার বুঝলে!

শরিয়তের কোথায় আছে মানুষকে একঘরে করার কথা?

হাদিসে আছে। হাদিস মানেই শরিয়ত। পড়তে চাও?

চাই।

আলহামদুলিল্লাহ! দ্বীনের জ্ঞান যদি অর্জন করতে চাও, তবে আল্লা নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করে দিবেন।

দুই

তারাবিহ-এশা-বেতের নামাজের পরেই সবার খেয়ে নেওয়া। তারপরেই ঘুম। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে নয়টা বাজার আগেই চারপাশ নিঃসাড় হয়ে যায়।

বুবু জানে ইউসুফের এখন ঘুম আসবে না। তার ইচ্ছা ছিল ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করার। কিন্তু ইউসুফ জোর করে বুবুকে ঘুমাতে পাঠিয়েছে। সেহরির আগে উঠে চুলো জ্বালাতে হয় বুবুর। তারপর সারাদিন কাজ। কামলা-কিষাণের খাওয়ার যোগার করতে হয় তিনবার, বাড়ির ছোটদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনবেলা, ঘরের এই কাজ সেই কাজ, তার সঙ্গে নিজের নামাজ-রোজা। তাকে এখন ঘুমাতে না দেওয়ার মানে তার ওপর অত্যাচার করা। বুবু বিছানা-মশারি করে, হ্যারিকেনে তেল ভরে দিয়ে, টেবিলে পানির জগ-গ্লাসের পাশাপাশি বিস্কুট-মুড়ি-মোয়া রেখে গেছে। জানে ইউসুফের ঘুমাতে দেরি হবে। আর ঘুমাতে দেরি হলে খিধে পায়।

আর দুলাভাই দিয়ে গেছে হাদিসের কেতাব। বলে গেছে, রাতে যদি ঘুম না আসে তাহলে এই বই পড়তে। রাতে ধর্মীয় বই পড়া আর সারা রাত জেগে এবাদত করার ছওয়াব নাকি সমান।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় বই পড়তে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধাই হয়। কিন্তু পড়ার নেশা একবার জেগে উঠলে বা পড়ার মধ্যে মজা পেয়ে গেলে তখন আর এই স্বল্প আলোর অসুবিধাকে বেশি বড় বলে মনে হয় না। একপাতা দুইপাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একসময় বইয়ের বিষয়বস্তু নিজের মধ্যে টেনে নেয় ইউসুফকে।

বাইরে তখন রাত বাড়ার সাথে সাথে একটু একটু করে কমে আসছে গরমের গুমোট। সারাদিন পরে এই প্রথম মনে হয় একটু একটু বাতাসও বোধহয় আছে। গোয়াল থেকে গরুর লেজের ঝাপটায় মাছি তাড়ানোর শব্দ পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। ছোট কোনো কোনো বাচ্চা মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে। ঘুমজড়িত গলায় বাচ্চাকে শান্ত করে মা। এই অঞ্চলে শেয়াল বোধহয় তেমন আর অবশিষ্ট নেই। শেয়ালের ডাক তেমন শোনা যায় না। তবে রাতচর পাখি আছে অনেক রকম। সম্ভবত ডোয়ারের কদবেলগাছে একটা কুঁদপাখি বসে আছে। কিছুক্ষণ পর পর সে ডাকতে শুরু করছে। ডেকে চলছে অনেকক্ষণ ধরে। কুঁদ্ কুঁদ্ শব্দটি নির্জন নিঃশব্দ রাতের মধ্যে একধরনের শিরশিরানি বইয়ে দেয়। বুবুর পাতলা ঘুম। কুঁদপাখি ডাকতে শুরু করলেই বুবুর গলা শোনা যায়– উঠ্ উঠ্ আল্লার নাম নে! আল্লার নাম নে! ইউসুফের মনে পড়ে, খাঁ খাঁ দুপুরে উঠোনে কাকের কা কা রব উঠলে মা-ও এইভাবে বারণ জানাত কাকগুলিকে– উঠ্ উঠ্ আল্লার নাম নে! দুপুরে কাকের ডাক আর রাতে কুঁদপাখির ডাক– দু'টোই নাকি অশুভ আভাস! এই দেশে পুরো জাতির জন্য সারাজীবন ধরে এই অশুভ আভাসই তো দিয়ে আসছে তারা। তাহলে জাতির সামনে শুভ বলে কোনো কিছু কি ছিল না? এখনও নেই?

দুলাভাইয়ের রেখে যাওয়া কেতাব খুলে বসে ইউসুফ। বইটার নাম দেখে সন্দেহ হয় এখানে কোনো যুক্তির প্রসঙ্গ আদৌ থাকবে কি না। কিন্তু যুক্তি না থাকলেও ফ্যান্টাসি নিশ্চয়ই থাকবে। আর থাকবে হাদিসের নামে কল্পকথার ছড়াছড়ি। তবে এসব পড়তে মজাই লাগে। মানুষের আদিম সারল্য এখনও বহমান দেখতে পেলে যেমন মজা লাগে, সেই রকম মজা এইসব শাস্তর-বইতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্র থেকে শাস্তর শব্দটি এলেও এই অঞ্চলে শাস্তর বলতে গাল-গল্পকেই বোঝানো হয়। কিন্তু মুশকিল হয় তাদের নিয়েই যারা এইসব শাস্তরকে সত্য হিসাবে ধরে নিয়ে তার মাধ্যমে যখন নিজের জীবন চালাতে চায় এবং অন্যের জীবনে হস্তক্ষেপ করে।

ঘটনাটি কা'ব ইবনে মালেকের। তিনি নিজের মুখে বলেছেন তার পুত্র আবদুল্লাহকে। তাবুকের যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য তাকে সহ আরও তিনজনকে একঘরে করা হয়েছিল। তার নিজের কথা বলা হয়েছে কেতাবে–

'নবী এবং মুসলমানরা কুরাইশদের ব্যবসা-কাফেলার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তাবুকে যাচ্ছিলেন। আমি সেই সময় তাদের সাথে যাইনি। না যাওয়ার কারণ হচ্ছে, তখন আমি যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিলাম, এবং মালে-গণিমতের অংশ আমার প্রয়োজন ছিল না। এই রকম অভিযানে বের হওয়ার সময় নবীজী আসল গন্তব্যের কথা গোপন রাখতেন। এবার যখন তিনি অভিযানে বের হলেন, তখন ছিল খুব গরমের সময়। সফর ছিল অনেক লম্বা। রাস্তায় পানি ও খাদ্যের অভাবে কষ্ট পেতে হবে এটা নিশ্চিত ছিল। এছাড়া এবার কুরাইশদের কাফেলায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি। যেহেতু বিপদের ঝুঁকি এবার বেশি, তাই নবীজী আগেই অভিযানের কথা সবাইকে জানিয়ে দিলেন যাতে সবাই অভিযানের জন্য ঠিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, সকল সক্ষম মুসলমানকে এই অভিযানে তাঁর সাথে যেতে হবে। যখন মুসলমানরা অভিযানে বের হলো তখন গাছের খেজুর পেকে এসেছিল, ফসল তোলার সময় উপস্থিত। সে সময় কে কে জেহাদে যোগ দিচ্ছে তাদের নাম লিখে রাখার জন্য কোনো রেজিস্ট্রার রাখা হতো না। আমিসহ অন্যরা ভাবত যে একমাত্র ওহির মারফত জানিয়ে না দিলে রাসুলুল্লাহ টের পাবেন না যে কে জেহাদে যোগ দিয়েছে আর কে যোগ দেয়নি। যাহোক, মুসলমানরা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। আমিও তাদের সাথে প্রস্তুতি নেবার জন্য সকালবেলা যেতাম বটে, কিন্তু কোনো কিছু না করেই ফিরে আসতাম। এইভাবে যখন রাসুলুল্লাহ অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন, তখন আমি রয়ে গেলাম মদিনাতেই।

তাবুকে পৌঁছানো পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ আমার কথা স্মরণ করেননি। সেখানে পৌঁছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'কা'ব ইবনে মালেকের কী খবর?' বনি সালেমার একজন লোক উত্তর দিলেন– 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, তাকে তার চাদর ও শরীরের দুই পার্শ্বদেশ দর্শন আটকে রেখেছে।' অর্থাৎ সে পোশাক-পরিচ্ছদ, শরীর গঠন ও সৌন্দর্যচর্চায় লিপ্ত থাকার জন্য জেহাদে যোগ দেয়নি।

রাসুলুল্লাহর ফিরে আসার খবর শুনে আমি মনে মনে কৈফিয়ত হিসাবে বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করতে শুরু করলাম। কিন্তু একসময় মনে হলো যে জেহাদে যোগ না

AMARBOI.COM

দিয়ে এমনিতেই একটা অন্যায় করেছি, এখন মিথ্যা বলে আরেকটা অন্যায় করব না। রাসুলুল্লাহ মদিনায় ফিরে এলেন। তিনি যে কোনো সফর থেকে ফিরে প্রথমেই মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। তিনি নামাজ শেষ করে মসজিদে বসলেন। তখন যারা জেহাদে যোগ দেয়নি, তারা তাদের না যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে বিভিন্ন ওজর পেশ করতে শুরু করল। এমন লোকের সংখ্যা ছিল আশি জনেরও বেশি। রাসুলুল্লাহ তাদের কৈফিয়ত মেনে নিলেন এবং তাদের গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আমি যখন তাঁর সামনে গেলাম, তিনি ক্রোধমিশ্রিত হাসি দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কেন পেছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন কিনেছিলে না?'

আমি বললাম– 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোনো দুনিয়াদার লোকের কাছে বসতাম, তাহলে কোনো ওজর দ্বারা তার অসন্তোষ থেকে বাঁচবার পথ দেখতে পেতাম। যুক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতা আমার রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি জানি, যদিও আজ আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলি তাতে হয়তো আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, কিন্তু আল্লাহ আপনাকে শীঘ্রই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর সত্য কথা বলায় আপনি এখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও পরবর্তীতে আমি আল্লাহর কাছে শুভ ফলের আশা রাখি। আল্লাহর শপথ! এই জেহাদের সময় আমি যতখানি অর্থশালী এবং শক্তিশালী ছিলাম, আগে কোনো সময় এতটা ছিলাম না।' রাসুলুল্লাহ বললেন– 'সে সত্য কথাই বলেছে। আচ্ছা উঠে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো ফয়সালা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।'

আমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার পরে বনি সালেমার কয়েকজন লোক বলল– 'আল্লাহর শপথ, ইতোপূর্বে তুমি কোনো অন্যায় করেছ বলে আমরা জানি না। তোমার গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে রাসুলুল্লাহর দোয়াই তো যথেষ্ট হয়ে যেত।' ওরা আমাকে এত তিরস্কার করতে শুরু করল যে এক পর্যায়ে আমার রাসুলুল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার ইচ্ছা পুনরায় জেগে উঠল। তখন আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম যে আমার মতো এমন ব্যাপার আর কারও ক্ষেত্রে ঘটেছে কি? তারা উত্তর দিল যে আরও দুইজনের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। তুমি যা বলেছ, ওরাও সেই রকম কথা বলেছে। তারা হচ্ছে মুরায়া ইবনে রাবীয়া আমেরী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকেফী। এই দুইজন মানুষই ছিলেন সৎ এবং আদর্শ পুরুষ। তাঁরা দু'জনেই বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের কথা শোনার পরে আমি পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল রইলাম।

রাসুলুল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে আমাদের এই তিনজনের সাথে কেউ বাক্যালাপ করতে পারবে না। কাজেই সব লোক আমাদের থেকে দূরে সরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে শুরু করল। এমনকি আমার জন্য দুনিয়া একেবারে অপরিচিত হয়ে গেল। পরিচিত দেশ আমাদের জন্য অপরিচিত হয়ে গেল। আমার অন্য দুই সঙ্গী ঘরের মধ্যে বসে বসে কাঁদতেন, কারণ তাঁরা ছিলেন বয়স্ক। কিন্তু আমি যেহেতু জোয়ান ছিলাম, তাই আমি বাইরে যেতাম, মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তাম, বাজারে যেতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কোনো কথা বলত না। নামাজের পরে আমি রাসুলুল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম, তাঁকে সালাম দিতাম, আর তাঁর ঠোঁটের দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকতাম, দেখতে চাইতাম তাঁর ঠোঁট নড়ে কি না। নামাজের সময় আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়াতাম, খেয়াল করতাম তিনি আমার দিকে তাকান কি না। আমি যখন নামাজে মশগুল হতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। কিন্তু নামাজ শেষে আমি তাঁর দিকে তাকানো-মাত্রই তিনি দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতেন। আমি আর যেন সহ্য করতে পারছিলাম না। একদিন মরিয়া হয়ে আমি আবু কাতাদা-র বাগানের দেয়াল টপকে তাঁর সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। অথচ তিনি ছিলেন আমার নিজের চাচাতো ভাই এবং আমার প্রিয়তম বন্ধু। আমি তাঁকে বললাম– 'আবু কাতাদা, আল্লাহর শপথ, আপনি কি জানেন না যে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি?' তিনি চুপ করে রইলেন। আমি আবার তাঁকে শপথ দিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ করে রইলেন। আমি তাঁকে আবার শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।' একথায় আমার দু'চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো। আমি আবার দেওয়াল টপকে ফিরে এলাম।

একদিন আমি মদিনার বাজারে ঘুরছিলাম। সিরিয়া থেকে আসা একজন কৃষক আমার সাথে দেখা করে আমার হাতে ঘাসসান বাদশাহ-র একখানা চিঠি দিল। চিঠিতে লেখা ছিল– আমরা জানতে পারলাম তোমার সাথী রাসুলুল্লাহ তোমার প্রতি জুলুম করছেন। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার স্থানে বাস করার জন্য সৃষ্টি করেননি। তুমি আমাদের সঙ্গে মিলে যাও। আমরা তোমাকে সাহায্য করব।

আমি নিজেকে বললাম যে এটাও আমার আর একটা পরীক্ষা। তারপর কুচি কুচি করে চিঠিটা ছিঁড়ে চুলার আগুনে ফেলে দিলাম।

এভাবে চল্লিশ দিন পার হয়ে গেল। কোনো ওহি নাজিল হলো না। হঠাৎ একদিন রাসুলুল্লাহর একজন বার্তাবাহক এসে জানিয়ে গেল যে রাসুল আমাকে আমার স্ত্রীদের কাছ থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম, একথার অর্থ কি এই যে আমাকে আমার বিবিদের তালাক দিতে হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদদাতা উত্তর দিল যে, তালাক দিতে হবে না। আমাকে শুধু স্ত্রী-র সঙ্গে মিলিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার মতো অন্য দুইজনকেও একই আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম– 'তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও। আল্লাহ কোনো ফয়সালা না করা পর্যন্ত সেখানেই থাকবে।'

হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসুলুল্লাহর কাছে এসে আরজ করল– 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, হিলাল ইবনে উমাইয়া খুবই বৃদ্ধ মানুষ। তার কোনো খাদেম নাই। আমি তার খেদমত করলে আপনি কি খুব অসন্তুষ্ট হবেন?'

রাসুল উত্তর দিলেন– 'না, তবে তুমি তার সাথে সহবাস করতে পারবে না।'

হিলালের স্ত্রী বললেন– 'আল্লাহর শপথ, এই ব্যাপারে তার কোনো শক্তিই নাই। তার সাথে যা কিছু ঘটছে, তাই নিয়ে সে সব সময় ভয়ে কাঁপছে।'

কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে আমি যেন রাসুলুল্লাহর কাছে গিয়ে আমার স্ত্রীর খেদমত গ্রহণের অনুমতি চাই। কারণ তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে এই ধরনের অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম যে আমি এ ব্যাপারে হুজুরের কাছে কোনো অনুমতি চাইতে যাব না।

এভাবে আরও দশ দিন কেটে গেল।

একান্নতম দিনে আমি ফজরের নামাজের পরে বাড়ির ছাদে বিষণ্ন মনে বসে ছিলাম। তখন আমার অবস্থা সেই রকম যেমনটি কোরআনে বলা হয়েছে– "আমার মন ছোট হয়ে গেছে এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে।"

এমন সময় সালআ পাহাড়ের উপর থেকে আমি একজন লোককে চিৎকার করতে শুনলাম। তিনি বলছেন– 'হে কা'ব তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো!'

আমি একথা শুনে সেজদায় পড়ে গেলাম। এবং বুঝতে পারলাম যে মুক্তি এসেছে। আল্লাহ যে আমাদের তওবা কবুল করেছেন, ফজরের নামাজের পরে রাসুলুল্লাহ এই খবর সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই সুখবরটি দিতে আমার বাড়িতে এলো। কেউ কেউ অন্য দুইজনকে খবর দিতে ছুটল। আসলাম গোত্রের হামযা ইবনে উমার আল আসলামী আমার কাছে প্রথম খবরটি নিয়ে এসেছিল। আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে পরনের কাপড় দু'খানা খুলে তাকে দিয়ে দিলাম। আমার কাছে আর কোনো কাপড় ছিল না। আমি আরেক জনের কাছ থেকে ধার নিয়ে কাপড় পড়ে ছুটে গেলাম রাসুলুল্লাহর কাছে। তাঁর সামনে গিয়ে যখন সালাম দিলাম, তাঁর চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম– 'হে রাসুল, আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে কি আল্লাহর তরফ থেকে নাকি তাঁর রাসুলের তরফ থেকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহানবী বললেন– 'আল্লাহর তরফ থেকে।'

আমি বললাম– 'হে আল্লাহর রাসুল, তওবা কবুল হওয়ার আনন্দে আমি সকল মাল-সামান দান করে দিতে চাই।'

রাসুলুল্লাহ বললেন– 'কিছু মাল রেখে দাও। সেটাই তোমার জন্য ভালো হবে।'

ঘটনাটা পুরোপুরি পড়া শেষ করে মনে মনে হাসল ইউসুফ। এখন এক শ্রেণীর ইসলামি আলেম দেখা যাচ্ছে যারা কোনো হাদিসকেই কোরআনের সঙ্গে না মিলিয়ে সত্যি বলে মেনে নিতে রাজি নন। তাছাড়া সবকিছু বিবেচনা করতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে। এই ঘটনাটির প্রাসঙ্গিকতা এখন যে অনেক বদলে গেছে, একথা দুলাভাইদের মতো মানুষদের বোঝাবে কে! আল্লা-নবীর কালাম হিসাবে যা-ই তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে, তাকেই অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয় হিসাবে মেনে নিতে তারা রাজি। ধর্মের তিনটি দিক রয়েছে, বলেছিলেন সন্ত লেখক তলস্তয়। একটা হচ্ছে প্রাণবস্তু। এখানে পৃথিবীর সব ধর্ম এক। সেখানে বলা হয়েছে মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, অন্যকে শোষণ করা অন্যায়, ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া উচিত– এইসব চিরন্তন মূল্যবোধ। দ্বিতীয় হচ্ছে ধর্মের দার্শনিক দিক। এখানে এসে ভেদ শুরু হয়েছে। ইসলাম বলছে আল্লাহ এক এবং হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর রাসুল; খ্রিস্টান বলছে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কিন্তু তার পুত্র যীশু মানবজাতির মুক্তিদাতা; হিন্দু বলছে ঈশ্বর এক কিন্তু তার জাগতিক প্রকাশ তেত্রিশ কোটি রূপ ধরে। আর সবার বাইরের দিকে আছে ধর্মের প্রথা। এইখানে এসে মানুষে মানুষে ধর্মে ধর্মে একেবারে জলঅচল ফারাক। মুসলমান দাড়ি রাখে– হিন্দু টিকি রাখে, মুসলমান নামাজ পড়ে– হিন্দু কীর্তন গায়, মুসলমান রোজা রাখে– হিন্দু তখন আহ্নিক করে, ইসলাম গান-বাজনাকে নিরৎসাহিত করে– হিন্দুর ঢোল-কাঁসর ছাড়া পূজাই হয় না। সাধারণ মানুষ প্রথাকেই ধর্ম মানে, পুরুত-মোল্লা-পাদ্রি-রাব্বিরা ধর্মের রীতি-প্রথা নিয়ে বাহাসে লিপ্ত হয়, এক ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে আরেক ধর্মের মানুষকে লেলিয়ে দেয়। চিরকালই ধর্মের মর্মবস্তু বোঝার ক্ষমতা থাকে অল্প সংখ্যক মানুষের। তখন ইবনে রুশদের কথা মনে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ও বিখ্যাত দার্শনিক-চিন্তাবিদ বলে পুরো দুনিয়া যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই ইবনে রুশদ বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মানুষকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন। সবার নিচে সহজবুদ্ধির মানুষ। তাদের জন্য নাকি ধর্মের সকল আপ্তবাক্য বেদবাক্যের মতো বিনা প্রশ্নে মেনে চলাই যথেষ্ট। এর ওপরে আছে তার্কিক মানুষের দল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সবকিছু মাঝারি মানের যুক্তির মাধ্যমে বুঝতে চায়। আর সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে সেইসব মানুষ যারা নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করতে রাজি নন। চট করে মনে প্রশ্ন জাগে, এটাও কি হিন্দুদের ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মতো এক ধরনের বর্ণবাদ নয়? আবার এটাও তো সত্যি যে সব মানুষের মেধা বা প্রজ্ঞা বস্তুগত কারণেই সমান নয়। তাহলে বৈষম্য কি প্রাকৃতিক রীতি? এই প্রাকৃতিক বৈষম্যের আরেক নামই কি বৈচিত্র্য?

আর প্রায় বিনা নোটিশে, হুড়মুড় করে আরেকটা প্রশ্ন ঢুকে পড়ে নিজের মধ্যে। নিজেকে নিজে অনবরত জিজ্ঞেস করতে থাকে ইউসুফ– তুমি কি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করো? তুমি কি আল্লাহকে বিশ্বাস করো?

পাশ কাটাতে চায় ইউসুফ। কিন্তু অন্যকে পাশ কাটানো যত সহজ নিজেকে পাশ কাটানো তত সহজ তো নয়ই, বরং এককথায় অসম্ভব।

করি! অবশেষে স্বীকার করে ইউসুফ– কিন্তু আমার আল্লাহর স্বরূপ যে ঠিক কী তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

AMARBOI.COM

তিন

বুবুর বোধহয় তেমন ইচ্ছা নেই ইউসুফকে রোজা রাখানোর। কতদিন পরে ভাইটা এসেছে, থাকবে মাত্র অল্প কয়েকটা দিন, তাকে দু'টো ভালো-মন্দ জিনিস না খাওয়ালে শান্তি পাওয়া যায়! আবার কাউকে রোজা রাখতে মানা করাটাও কবিরা গুনাহ। এমনিতেই দুলাভাইয়ের ধারণা যে ইউসুফ কিছুটা নাস্তিক। তাকে যদি ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে না আনা যায়, তাহলে তার পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ভাই! ইউসুফরে! ভাই!

নরম গলার ডাক, আর কপালে-চুলে তার চাইতেও কোমল হাতের স্পর্শ ঘুম ভাঙায় ইউসুফের। চোখ খুলে দেখতে পাওয়া অনভ্যস্ত ম্লান আলো, খুব অল্প চেনা একটা বিছানা এবং ঘর, অল্প একটু ঘুমের পরেই চোখখোলাজনিত মধুর অলসতার পাশাপাশি বুবুর স্নেহময় উপস্থিতির স্পর্শ, তার হাত ও শাড়িতে লেগে থাকা সদ্য রান্নাজনিত মশলার গন্ধ– সব মিলিয়ে যে পরিবেশ, তাতে কথা বলার চাইতে চুপ করে থাকতেই ভালো লাগছিল ইউসুফের। বুবু তাকে অল্প ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করল– সেহরি? রোজা থাকবু ভাই?

কী করব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউসুফের পাল্টা প্রশ্ন শুনে একটু হাসল বুবু– তুই কী করবু তুই-ই জানিস! ঐদিকে তোর ইমাম গাযযালী...

বুবুর মুখে এই নাম শুনেই হেসে ফেলল ইউসুফ। আগের বার এসে দুলাভাইকে এই নাম দিয়ে গেছে ইউসুফই। দুলাভাইয়ের কাছে কোনো ব্যাখ্যার দরকার নাই। তার কথা হলো শরিয়তে যা বলা হয়েছে তা করে যেতে হবে। তার বলার ভঙ্গির মধ্যে একেবারে ইমাম গাযযালীর দৃঢ়তা– কেবল আচার-অনুষ্ঠান এবং নামাজ-কালামই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান যোগাতে পারে। কোনো যুক্তি বা ব্যাখ্যার দরকার নাই।

চলো– উঠে পড়ল ইউসুফ। ইমাম গাযযালীকে আর অপেক্ষা করানোর দরকার নাই।

কলতলার দিকে এগুতেই বুবু বলল– আন্ধারে ঐদিক যাওয়ার দরকার নাই। বারান্দার বালতি থেকেই কুলি করে চলে আয়। চোখে পানি দিস না।

চোখে পানি দিলে ঘুম কেটে যায়। তাহলে সেহরির পরে আবার ঘুমাতে দেরি হবে। মা-ও বলে এমন কথা। দাদিকেও বলতে শুনেছে ইউসুফ। কথাটা কতখানি সত্যি কেউই বোধহয় পরীক্ষা করে দেখেনি। কিন্তু মেনে চলছে বংশ পরম্পরায়।

দুলাভাই তখন কিষাণদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডেকে চলেছে একভাবে– এই লেকু এই ব্যাঙ্গা উঠ্! সেহরি খাওয়া লাগবি উঠ্!

বুবু নিচু কণ্ঠে গজ গজ করে– রোজ রোজ এই এক নাটক। অরা যে রোজা থাকবি না, এই কথা তাঁই ভালোই জানে। তা-ও রোজ রোজ ডাকতে যায়।

দুলাভাই ফিরে এসে দস্তরখানে বসতে বসতে বলে– হারামজাদাগুলান রোজা করতেই চায় না।

কীভাবে ওরা রোজা করবে দুলাভাই! ভোর থেকে সারাদিন যে হাড়ভাঙ্গা খাটনি ওদের খাটতে হয় এই গরমের মধ্যে, রোজা করলে ওরা তো ডিহাইড্রেশনে মারা পড়বে।

রোজা করলে কেউ মরে না। মরুভূমির গরম এই জায়গার চাইতে অনেক বেশি। সেইখানে মানুষ যদি রোজা রাখতে পারে, রোজা রাখার পরেও সব কাম করতে পারে, এই জাগাত পারবি না ক্যান! আসল কথা হচ্ছে ইমান।

ওদের জায়গায় আপনি থাকলে দেখা যেত এই ইমান কোথায় যায়। কড়া কথাটা ঠোঁটে এসে গিয়েছিল। গিলে ফেলল ইউসুফ।

বুবু বলে– অরা যে রোজা থাকে না তা তো আপনে জানেনই। খালি খালি ডাক দিয়া বেচারাগুলানের ঘুম নষ্ট করেন ক্যান!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুলাভাই একটু অবাক হয়ে তাকায় বুবুর দিকে– কও কী তুমি! অরা যদি রোজা না-ও করে তবু আমার ডাকার দরকার আছে। নামাজের জন্য ডাকা রোজার জন্য ডাকা হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত। এই দায়িত্ব পালন না করলে আমি গুনাগার হবো।

খাওয়া শুরু করার আগে দুলাভাই পরিবারের সব সদস্য উঠেছে কি না পরখ করে দেখে।

মজিদ কই?

তার কথা ওঠায় বুবুর বড় ছেলের বউ, মানে ইউসুফের ভাগ্নে-বউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। বুবুর মুখেও হাসি লুকানোর হাসি। দুলাভাই একটু গজগজ করে ওঠে– হারামজাদা রোজার দিনেও...

বুবু এবার ধমকের সুরে বলে– থামেন তো আপনে!

মজিদ ঠিক এবাড়ির সদস্য নয়। ছোট কামলা ছিল। পাশেই বাড়ি। অল্প বয়সে তার বাপ মরার পরে পাখা গজিয়েছিল। জমানো পয়সা উড়িয়ে দিতে দিতে এক পর্যায়ে যেটুকু জমি ছিল সেটুকুও দুলাভাইয়ের কাছে বিক্রি করেছে। এখন দুলাভাইয়ের জমিতেই জন খাটে। বাঁকা মানুষ। তার ও তার বুড়ি মায়ের খাবার দেওয়া হয় এই বাড়ি থেকেই।

সেহরি খেতে বসে মজিদকে নিয়ে এই রকম আলোচনা একটু রহস্যময় মনে হয় ইউসুফের। কিন্তু বুবুকে তার এই বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী মনে না হওয়ায় নিজেও কোনো প্রশ্ন করে না সে।

তাদের খাওয়া শেষে বারান্দায় হাত ধোয়ার সময় দেখা যায় খলপার ঝাঁপ ঠেলে খুব মৃদু পায়ে বাড়িতে ঢুকছে মজিদ। তাকে দেখে খেঁকিয়ে ওঠে দুলাভাই– হারামজাদা সেহরির সময় পার হয়া যায়, খেয়াল থাকে না!

মজিদ নিঃশব্দে দাওয়ায় উঠতে গেলে দুলাভাই আবার ধমক লাগায়– যা হারামজাদা, আগে গোসল দিয়া আয়!

গোসল দিয়াই আইছি। মৃদু কণ্ঠে বলে মজিদ।

বুবু ভেতর থেকে ডাক দেয়– তাড়াতাড়ি আয় মজিদ, সেহরির সময় পার হয়া যাচ্ছে। যে কোনো সময় মোরগ বাঁক দিয়া উঠতে পারে।

কুলকুচার ফাঁকে ফাঁকে তখনও দুলাভাইয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে বিরক্তির শব্দ– রোজার মাসেও মানুষের সংযম নাই, ইমান-আমান বলতে কিছু নাই, খোদার উপর ভয় নাই, সেই জন্যেই তো এই রকম অবস্থা...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

মুসলমানদের অবস্থা ঠিক কেমন? গত সাতশো বছর ধরে কেমন আছে সারা পৃথিবীর মুসলমান?

দেড়শো কোটিরও বেশি মুসলমান এখন পৃথিবীতে। মুসলমানের চাইতে সংখ্যায় বেশি কেবল বৌদ্ধ আর খ্রিস্টানরা। দেশভেদে উনিশ-বিশ থাকতে পারে, কিন্তু যদি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে ধরা যায়, তাহলে পৃথিবীতে সবচেয়ে অনুন্নত জাতি হচ্ছে মুসলমান। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া একমাত্র মুসলমান হলেন পাকিস্তানের আবদুস সালাম। তাঁর দেশ পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা বানিয়েছে। কিন্তু সে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ দৈনিক মাত্র আট সেন্টের সমান উপার্জন করতে পারে, যা দিয়ে তাদের পরিবারের জন্য শুকনো রুটির ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না। তিনি নবীর একটি হাদিস বলেছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে– 'দারিদ্র্য কুফ্‌র নিয়ে আসতে পারে।' আবদুস সালাম ভয় পান, বিশ্বের মুসলমানদের এক বিরাট অংশ যে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে, তা তাদের মধ্যে কুফরি নিয়ে আসতে পারে। আবদুস সালাম মনে করেন, মুসলমানরা গরীব কারণ তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই। আবার তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন নেই সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে তারা গরীব। এই চক্র চলছেই। কোথাও সাতশো বছর ধরে, কোথাও চারশো বছর ধরে, কোথাও তিনশো বছর ধরে।

আবদুস সালাম জানেন যে মুসলমানদের এই দুর্দশা চিরকাল ছিল না। বরং বিজ্ঞানে মুসলমানদের ছিল গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। জর্জ সাটন তাঁর পাঁচ খণ্ডের বিশাল বিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রন্থে বিজ্ঞানের সফলতার বৃত্তান্তকে কয়েকটি যুগে ভাগ করেছেন। প্রতি পঞ্চাশ বছরে এক যুগ। আর প্রত্যেক যুগের রয়েছে একজন করে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, যাঁর একক অবদান ঐ যুগের অন্য সকলের চাইতে বেশি। যীশুখ্রিস্টের জন্মের আগের ৪৫০ থেকে ৪০০ বছরের যুগটিকে জর্জ সাটন বলেছেন প্লেটোর যুগ। তারপর এসেছে একে একে এরিস্টটল, ইউক্লিড, আর্কিমিডিসের যুগ। ৬০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ, এই একশো বছর ছিল সুয়ান সেং এবং ইচিং-এর চৈনিক শতাব্দী। তারপরে ৭৫০ সাল থেকে ১১০০ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ৩৫০ বৎসর পুরোটাই ইসলামি পরম্পরা। তখন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে একের পর এক চিহ্নিত হয়েছেন জাবির, খাওয়ারিজমি, রাজী, মাসুদী, ওয়াফা, আল বিরুনি এবং ইবনে সিনা, ইবনে আল হাইথাম এবং ওমর খৈয়াম। সবাই ইসলামি সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত মানুষ। কেউ আরব, কেউ তুর্কী, কেউ পারসী, কেউ আফগান। তারপরেই, অর্থাৎ ১১০০ সালের পরেই কেবল উল্লেখিত হয়েছে কোনো খ্রিস্টান বা ইহুদি ইংরেজের নাম। ক্রিমোনার জেরার্ড এবং রজার বেকন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পরেও ২৫০ বৎসরে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হয়েছে ইবনে রুশদ, নাসিরউদ্দিন তুসী এবং ইবনে নাফিসের নাম। কিন্তু তারপরে? আবদুস সালাম খুঁজে পাননি সেই কারণটিকে, যে কারণে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ত্যাগ করল। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে কোরআনে আইন সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা ২৫০টি। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা ৭৫০টি। সেই কারণেই আল কিন্দি বলেছিলেন– যেখান থেকেই আসুক না কেন, সত্য স্বীকার করা আমাদের উচিত এবং তার উৎস যাই হোক তাকে আমাদের আত্মীকরণ করা উচিত। কেননা যিনি সত্যাভিলাষী তার কাছে সত্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই; তা কখনও তাকে সস্তা করে না অথবা ক্ষুদ্র করে না। অথচ, আবদুস সালামের মতো সব মানুষই বেদনার সাথে দেখতে পান যে, মুসলমানরা এই চিন্তা থেকে সরে এসেছে। ধরা দিয়েছে ফতোয়ামোল্লাদের খপ্পরে। এখন মুসলমানরা আলেম বলতে বোঝায় তাদের যারা শুধুমাত্র কোরআন না বুঝে মুখস্ত করে, হাদিস বলে আর ফতোয়া দেয়, যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞই শুধু নয় বরং তারা বিজ্ঞানকে খুবই অপছন্দ করে। সেই কারণে মানুষ যাকে আধুনিক যুগ বলছে, সেই যুগে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো মুসলমানের বিশেষ কোনো অবদান নেই। কে আর এত অতীতের খোঁজ রাখতে যায়? কে আর মানুষকে শুধুমাত্র তার সুদূর অতীতের জন্য সম্মান করে থাকে? সেই কারণেই একজন নোবেলবিজয়ী ইংরেজ-বিজ্ঞানী আবদুস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ঐ সমস্ত জাতিগুলিকে রক্ষা করা, সাহায্য করা, এবং বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য– সেই সব দেশ যারা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে বিন্দুমাত্র কিছু সৃষ্টি করেনি বা দেয়নি?' এই কথা শোনার পর থেকে কোনো হাসপাতালে ঢুকলেও আবদুস সালাম লজ্জা পেতেন এই ভেবে যে আজকের পৃথিবীর প্রায় কোনো ধরনের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ আবিষ্কারে কোনো মুসলিম দেশের বা কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীর কোনো অবদান নেই। এখনকার অবস্থা আরও খারাপ। কারণ এখন আবদুস সালামের মতো লজ্জিত হওয়ার জন্য যতটুকু আত্মসম্মান দরকার, ততটুকু আত্মসম্মানবোধ দেড়শো কোটি মুসলমানের মধ্যে সম্ভবত একজনেরও অবশিষ্ট নেই।

যে ইহুদি-নাসারা-হিন্দু-বৌদ্ধদের সারাদিন কাফের বলে ফতোয়া বিলিয়ে বেড়ায় মুসলমানরা, তারা ভিক্ষা না দিলে কোনো মুসলমানের পেটের ভাত জোটে না, অসুখের চিকিৎসা জোটে না। কোনো মুসলিম দেশে সাইক্লোন হলে, সুনামি হলে, বন্যা হলে তারা ভাতের জন্য, ত্রাণের জন্য, ওষুধের জন্য, বস্ত্রের জন্য, মাথা গোঁজার আশ্রয়ের জন্য আল্লার দরবারে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়, কিন্তু তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য আল্লাহ আকাশ থেকে মান্নাও পাঠায় না, সালওয়াও পাঠায় না। তখন তাদের হাত পাততে হয় আমেরিকার ইহুদি-নাসারার দলের কাছে। যতগুলি মুসলিম দেশ আছে, এক ইরান বাদে, সবগুলিতেই আমেরিকার পুতুল সরকার। তাদের দেশের মানুষ কী চায় তা তাদের কাছে বিবেচ্য নয়; বিবেচ্য হচ্ছে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত কী হুকুম করে। ইসলামি উম্মাহর নামে নাকি-কান্নায় কোনো ঘাটতি নেই কোথাও। কিন্তু আমেরিকা যখন ইরাক আক্রমণ করে, কিংবা আফগানিস্তান দখল করে নেয়, তখন মুখে হলেও প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারে না কোনো মুসলিম দেশের সরকার। এই বাংলাদেশে 'আমরা হবো তালেবান– বাংলা হবে আফগান' শ্লোগান দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে ভোট নিলেও জামায়াতে ইসলামি বা ইসলামি ঐক্যজোট আফগানিস্তানে মার্কিন বিমান হামলার প্রতিবাদে ঢাকার রাস্তায় একটা মিছিল পর্যন্ত করার সাহস পায়নি। ইরাকে বা আফগানিস্তানে আমেরিকার নির্লজ্জ হামলার প্রতিবাদে এই দেশে যতটুকু প্রতিবাদ হয়েছে তা করেছে বামপন্থীরা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যখন সারা পৃথিবীতে জরিপ করে দুর্নীতির বার্ষিক প্রতিবেদন দেয়, দেখা যায় দুর্নীতিতে ওপরের দিকে থাকে মুসলিম দেশগুলির নাম। অন্য ধর্মের মানুষ দাঁত বের করে হাসে– তাহলে ব্যাপারটি হচ্ছে গিয়ে মুসলমান মানেই দুর্নীতিবাজ।

ইউনিসেফ রিপোর্ট দেয়– পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শিশুমৃত্যুহার মুসলিম দেশগুলিতে। মাতৃমৃত্যুহার বেশি মুসলিম দেশগুলিতে। শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি বেশি মুসলিম দেশগুলিতে। শিশুশ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মুসলিম দেশগুলিতে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট দেয়– সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে মুসলিম দেশগুলিতে। সবচেয়ে বেশি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে মুসলিম দেশগুলিতে।

এই হচ্ছে বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের অবস্থা। গত কয়েক শত বছর ধরে এইভাবে চলে আসছে। মুসলমানদের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে বা কী? বাহিরের অপশক্তি নিশ্চয়ই আছে। প্রতিকূলতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু শুধু বাহিরের দোহাই দিয়ে এত শত বছর ধরে একটি ধর্মের সব মানুষের পিছিয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

বিষণ্ন মনে মাথা ঝাঁকায় ইউসুফ– আসল ক্ষয়িষ্ণুতা লুকিয়ে আছে নিজেদের ভেতরেও। আসলে ঘূণ ধরেছে মুসলিম সমাজের একেবারে ভেতরের কোনো অচেনা অন্ধকার কোণে। একেবারে ভিত্তির কোনো অংশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগকে পাশ্চাত্যের মানুষরা বলে অন্ধকার যুগ। কারণ সেই সময় গির্জা দাঁড়িয়েছিল বিজ্ঞান এবং মুক্তচিন্তার বিরুদ্ধে। তখন বিশ্বসৃষ্টি এবং অধিবিদ্যা নিয়ে চিন্তা করার অধিকার একমাত্র পাদ্রিদেরই ছিল। তাদের চিন্তার বিষয় ছিল– পৃথিবী কি একটি অনড় জায়গাতে অবস্থিত? এর বাইরে কি কিছু আছে? একটির বেশি কি পৃথিবী আছে? গ্রহ এবং তারাগুলি কি একটি ভৌত বর্তুলের চারিদিকে ঘোরে? ঈশ্বর কি আদিম জঙ্গমকে সরাসরি এবং সক্রিয়ভাবে চালান একটি কার্যকরী কারণ হিসাবে অথবা শুধু অন্তিম এবং চূড়ান্ত কারণ হিসাবে? বিশ্ব চরাচর কি একজন চালান নাকি কয়েকজনে চালান? বর্তুলগুলি কি মেধা দিয়ে চলে নাকি বস্তুর অন্ত র্নিহিত কোনো নীতির মাধ্যমে চলে? মহাকাশস্থিত পরিচালকগণ কি শ্রান্তি অথবা ক্লান্তি অনুভব করেন? সব বর্তুল কি একই প্রকৃতির? পৃথিবীর সঙ্গে সেগুলির কি একটি সাধারণ কেন্দ্রবিন্দু আছে? অথবা কেন্দ্র বহির্ভূত অধিবৃত্তের চাকতির অনুমান করা কি প্রয়োজন? মহাকাশ বস্তুটির প্রকৃতি কি? সেটি কি পৃথিবীর বস্তুর মতোই যার একটি অভ্যন্তরীণ বস্তুভিত্তিক আকার আছে এবং যার উষ্ণ, শীতল, শুকনো হওয়ার মতো অন্তর্নিহিত গুণ আছে?

বলাই বাহুল্য সব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজা হতো বাইবেল বা ধর্মপুস্তকে। সেই কারণেই গ্যালিলিও-র ওপর নির্যাতন, কারণ তার আবিষ্কার বাইবেলের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। ৩৫০ বৎসর পরে গির্জা তার সেই অবিচারের জন্য ভুল স্বীকার করেছে। আর মুসলমানরা পড়েছে এখন সেই জায়গাতে। খ্রিস্টানদের গির্জার মতো মুসলমানদের সবকিছু এখন মোল্লাদের হাতে। সেদিন থেকেই কি শুরু হয়েছে মুসলমানদের অন্ধকার যুগ?

এক সময়ের বিখ্যাত তার্কিক এবং বিজ্ঞানপন্থী হিসাবে পরিচিতি অর্জনকারী ইমাম গাযযালী পর্যন্ত ভেসে গেলেন এই অজ্ঞানতার জোয়ারে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তিনি জ্ঞান বলতে শুধু ধর্মীয় তথা ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞানকেই বোঝাতে শুরু করলেন। এত শত বৎসর ধরে মুসলমানরা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যেসব অমূল্য সম্পদ দান করে যাচ্ছিলেন, সেগুলিকে ইমাম গাযযালী আদৌ জ্ঞান বলে স্বীকার করতেই রাজি নন আর। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের বাইরে আর মাত্র তিনটি শাস্ত্র চর্চার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরবি ব্যাকরণ, গণিত এবং চিকিৎসাশাস্ত্র। অনুমতি দিলেও এই তিনটি তাঁর বিবেচনায় ছিল নিকৃষ্ট জ্ঞান। তবে প্রয়োজনীয়।

বাগদাদে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে ইবনে সিনা এবং ইমাম গাযযালীর বাহাসের কথা শুনেছিল সে হাসান মাহমুদের কাছ থেকে। 'হাত কীভাবে নড়ে?' এই প্রশ্নের উপর বাহাস। ইবনে সিনা সেই সময়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে বললেন যে, মানুষের মস্তিষ্ক থেকে অসংখ্য স্নায়ু শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ যখন তার হাত নাড়াতে চায় তখন মস্তিষ্ক থেকে সেই নির্দেশ স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে হাতে গিয়ে পৌঁছায়। তখন হাতের পেশিগুলির প্রয়োজনীয় সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে। ফলে হাত নাড়ানো সম্ভব হয়। এবার ইমাম গাযযালীর পালা। তিনি সোজাসুজি বললেন, মস্তিষ্ক বা স্নায়ু বা মাংসপেশি নিয়ে চিন্তা বা আলোচনার কোনো দরকারই নেই। আল্লাহ হাতকে নড়তে হুকুম দেন, হাত তাই নড়ে।

তখনকার পতনমুখি মুসলিম বিশ্ব ইমাম গাযযালীর ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলে মেনে নিয়েছিল এবং জানিয়েছিল যে বিজ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই মুসলমানদের। সেটাই কি মুসলমানদের পতনের শুরুর একটি রূপক বিন্দু? সৈয়দ আমীর আলী দুঃখ করে বলেছিলেন– যদি মুসলমানদের মধ্যে ইমাম আশআরী এবং ইমাম গাযযালীর আবির্ভাব না হতো, তাহলে মুসলমানদের এই দূরবস্থা হতো না। মুসলমানদের মধ্য থেকেই জন্মাতেন গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটনের মতো বিজ্ঞানীরা।

পাঁচ

মজিদের ব্যাপারটি মাথা থেকে যায়নি ইউসুফের। কিন্তু বুবু বা বাড়ির অন্য কেউ যে এ ব্যাপারে কথা বলতে আগ্রহী নয় সেটাও বোঝা যাচ্ছে। তাহলে উপায় হচ্ছে মজিদকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করা।

মজিদ ভাই রাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

মজিদের কালো মুখ প্রশ্ন শুনে একটু লালচে হয়। সে তখন গরুর জাবনা কাটছিল দা দিয়ে। ইউসুফের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু করে ফেলল। আবার শুরু করল জাবনা কাটা।

কী হলো কথা বলছেন না কেন?

কী আর শুনবেন কুটুম! থাকুক না!

কেন থাকবে কেন?

সে একটু শরমের কথা।

আগে এখানে এসে শুনেছে ইউসুফ একটা প্রবাদ বাক্য। এবার সেটা ঝেড়ে দিল সে– পুরুষ মানুষের আবার লজ্জা-শরম কীসের!

এবার কাজ হয়। লজ্জা-শরম দেখিয়ে কম পুরুষ হয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় মজিদের মতো মানুষও। সোজাসুজি বলে– গেছিলাম দুর্লভপুর।

দুর্লভপুর! সেখানে যায়নি কখনও ইউসুফ। কিন্তু এটা জানে দুর্লভপুর এখান থেকে কমপক্ষে তিন-সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে। রাতারাতি সেখানে হেঁটে যাওয়া, আবার সেখান থেকে সেহরির আগেই ফিরে আসা যথেষ্ট খাটুনির কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজিদকে কেন এই পরিশ্রমটুকু করতে হয়েছে? আর গেলই যদি, তাহলে রাতে গেল কেন? আবার রাতের অন্ধকারেই ফিরে আসতে হলো কেন তাকে? তার যাওয়াটাকে দুলাভাই এভাবে হেয় চোখে দেখলই বা কেন?

মজিদ এখন কথা বলতে আর কোনো রাখ-ঢাক রাখে না– গেছিলাম বউয়ের কাছে।

হেসে ফেলে ইউসুফ– ও ভাবী বাপের বাড়িতে গেছে! তা নিজের বউয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার হবে কেন?

মজিদ ঘাড় হেঁট করে বলে– তাঁই সেই জাগাতই থাকে। তুলে আনা হয়নি।

কেন তুলে আনছেন না কেন? বাড়িতে কি ভাবিকে রাখার জায়গা নেই? তরল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ইউসুফ।

সমাজের লোকে রাজি না।

রাজি না মানে? আপনি কি সমাজের অমতে বিয়ে করেছেন?

তা না।

তাহলে?

বিয়ার বেপার করা হয়নি।

এই এলাকায় 'ব্যাপার' মানে যে অনুষ্ঠান করা তা জানে ইউসুফ। তা ব্যাপার করে ফেলেন!

কীভাবে করি কুটুম? সমাজের সব মানুষেক গোস-ভাত খাওয়ানোর সাধ্যি কী আমার আছে!

সবাইকে খাওয়াতে হবে কেন? আপনি যে কয়জনকে পারবেন, দাওয়াত করবেন। যা পারবেন তাই-ই খাওয়াবেন!

সমাজের নিয়ম তা না। সগ্গলাকই দাওয়াত করা লাগবি। যতদিন তা না করা হচ্ছে তদ্দিন বউ গেরামে আনা যাবি না।

এ কেমন কথা!

ম্লান হাসে মজিদ– এডাই আমাগের সমাজের নিয়ম। আমার এই নিয়ম ভাঙার কুনো উপায় নাই। ভাঙলেই একঘরে হয়া যাব। গেরাম থেকে বার কর্যা দিবি।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ইউসুফ। এই রীতির অমানবিক দিকটাকে আঁচ করতে পেরে রীতিমতো বিরক্তি বোধ করছে। মজিদ একবার কথা বলতে শুরু করায় আর থামছে না। নিজেকে ভারমুক্ত করার এই সুযোগ সে অবচেতনে ছাড়তে পারছে না। বলে চলে– মানুষ মনে করে আমি বোধায় আমার ধোনের কুটকুটানি থামানের জন্যেই খালি রাতে রাতে দুর্লভপুরে ছুটে যাই। তা মরদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সেই খিদা তো থাকবিই। মিথ্যা কবো না, আমারও আছে। সেই জন্যেও বউয়ের কাছে যাই। কিন্তু ঐ মেয়াডার কথা একবার ভাবেন কুটুম। অর বাপ-ভাই আর ভায়ের বউরা সব সময় খোঁটা দেয়। নি-মরদ সোয়ামির বউয়ের কুনো সনমান নাই। যে মরদ বিয়ার এক বছর পরেও বউডাক নিজের ভিটাত আনতে পারে না, সে তো নি-মরদই। তাই না কুটুম?

তা কেন হবে? ইউসুফ প্রতিবাদ করে– মানুষ সবাই কি সব কাজ পারে?

তিক্ত কণ্ঠে বলে মজিদ– এই কথাডা সমাজরে বুঝায় কেডা! আর ঐদিক আপনের ভাবী কান্দে। খবর পাঠায়। আমি যদি তাড়াতাড়ি তারে ঘরে আনবার না পারি, তাহলে তাঁই গলাত দড়ি নিবি। তারে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই আমার মাঝে মাঝে যাওয়া লাগে। সমাজের মানুষ দেখলে ছি ছি করে, তাই রাতের আন্ধারে যাওয়া লাগে।

সমাজ কী এতই বড় এক অচলায়তন? এই একবিংশ শতাব্দীতেও!

সমাজের মানুষ তো জানেই যে আপনার সব মানুষকে খাওয়ানোর ক্ষমতা নাই। সেক্ষেত্রে অন্যরা মিলেমিশে কিছু কিছু করে সাহায্য করলেই তো হয়ে যায়।

মজিদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর উদাস কণ্ঠে যখন কথা বলে, ইউসুফ খেয়াল করে মজিদের কণ্ঠে সমাজের প্রতি কোনো উষ্মা বা অভিমান নেই– তা সমাজ আর কয়জনাক এইভাবে সাহায্য করবার পারে কন!

কয়জনাক মানে! আপনার মতো আরও অনেকেরই একই অবস্থা নাকি? এমন আরও কেউ আছে যে একবেলাও তার বউকে ঘরে তুলতে পারেনি?

কতজনা আছে! এই আমাগের পাড়াতেই আছে অন্তত পাঁচজনা। কয়েক জনার তো শ্বশুরবাড়িতই ছাওয়াল-মিয়া জন্মায় গেছে। নাছির মুন্সির ব্যাটার বউ তো অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়া তালাক দিয়া দিছে তার সোয়ামিরে।

সর্বনাশ! এত মানুষের সমস্যা! তবু সমাজ বিকল্প কিছু ভাববে না?

মজিদ এই কথার কোনো তাৎপর্য বুঝতে পারে না। সে অক্লেশে বলে– সমাজ আবার কী ভাববি ভাই? বেশি ভাবতে গেলে তো আর সমাজ থাকে না। আর সমাজ না থাকলে আমাগের গেরাম তো আর গেরাম থাকে না।

সমাজ না থাকলে কী হয়? শহরে তো সমাজ নেই।

তা টাউনের কথা আলাদা। গেরামের মানষের সমাজ ছাড়া কী চলে!

একটু রাগই হয় ইউসুফের– সমাজ ছাড়া চলবে না কেন? আর সমাজ আপনাদের জন্য ভালোটা কী করছে? যা শুনছি সবই তো খারাপ।

সমাজ না থাকলে গেরামে কুনো বিচার-আচার থাকে না। শৃঙ্খলা থাকে না। ধরেন যে গেরামের মসজিদ-মাদ্রাসা-গোরস্থান, তারপরে ধরেন হাট-বাজার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়া-প্রতিবেশীর কাইজ্জা– এইসব কে দেখবি সমাজ ছাড়া। সমাজ তো শালিস কর‍্যা অনেক ঝামেলা মিটায়। সবগুলানের জন্যে কোর্ট-কাচারি করা লাগলে গেরামের সব মানুষ মিসমার হয়া যাবি।

এবার নতুন এক দিক থেকে আলো এসে পড়ে ইউসুফের মনে। তাইতো, এভাবে তো ভেবে দেখতে পারেনি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মন! কিন্তু এটাও তো সত্যি যে সমাজের কিছু নিয়ম অন্তত পরিবর্তন করা দরকার। তা নাহলে মজিদের মতো মানুষদের সমস্যার কোনো সমাধান হওয়া মুশকিল। কিন্তু তাতেও অসুবিধা আছে। মজিদ বলে– এই রকম নিয়ম পাল্টালে অন্য গেরামের কাছে আমাগের গোটা গেরামের মান-ইজ্জত কমতা হয়া যায়। তখন অন্য গেরামের মানুষ রাস্তাঘাটে আমাগের মুখের উপর ছ্যাপ ফেলবি। সেডা বড় বেইজ্জতের বেপার।

সেই গ্রামে কি এমন ধরনের সমস্যা নেই?

থাকবি না ক্যান! অনেক আছে। আমাগের গেরামের চাইতেও অনেক বেশি আছে।

তাহলে দশ গ্রামের সমাজ একসাথে বসে বিষয়টা ঠিক করে নিলেই তো পারে!

তা পারে। কিন্তু আগে তো কুনো সমাজের মাথার মুখ দিয়া পরস্তাবখান বার হওয়া লাগবি। কে সেই ঝুঁকি লিবার চায় কন! যে আগে এই কথা উচ্চারণ করবি, বুঝা যাবি যে তার সমাজে সমস্যা বেশি। কে নিজের সমাজের জন্যে অন্য দশ গাঁয়ের মাথার কাছে নিজের মাথা হেঁট করবার চায়!

মজিদের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্য। সেদিকে খেয়াল হয় তার। বলে– ছাড়েন কুটুম এইসব কথা। আপনের গায়ে রোদ পড়তিছে। ঘরেত গিয়া বসেন। সন্ধ্যার পরে আবার গল্প করা যাবি। আমি ততক্ষণে জাবনাগুলান কাটি। ঠিক সময়ে খাবার না দিলে অবোলা জানোয়ারগুলানের কষ্ট হয়।

সামান্য অবোলা জীবের কষ্টের দিকে যে মজিদদের এত নজর, সেই মজিদদের কষ্টের দিকে মানুষের কোনোই দৃষ্টি নেই!

তবু সরে না ইউসুফ। মজিদের কাছ থেকে তার আরও অনেক কথা জানতে ইচ্ছা করে। সরাসরি সব কথা জিজ্ঞেস করা অভদ্রতা। আলতো করে জিজ্ঞেস করে– ভাবী কিছু বলে না?

হাতের দা কিছুক্ষণ শূন্যে ঝুলে থাকে মজিদের। সেটা নামিয়ে রাখে আস্তে আস্তে মুগুরের পাশে। মুগুরের ওপর বাম হাতের মুঠিতে ধরে রাখা খড়ের গোছা খুলে পড়ে ঢিলা মুঠি থেকে। তার মুখ থেকে অনেকখানি রক্ত সরে গেছে বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় ইউসুফের। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয় তার। মজিদের খুব স্পর্শকাতর জায়গায় ঘা দেওয়া হয়ে গেছে সম্ভবত। কিন্তু মজিদ তাকে কিছুই বলে না। কিছুক্ষণ পরে ফোঁওশ করে একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে আবার হাতের কাজে মন দেয়। ইউসুফ এই প্রসঙ্গ থেকে সরে আসার জন্য মনে মনে অন্য বিষয়ের খোঁজ করে। ঠিক তখনই কথা বলে ওঠে মজিদ– কুটুম, আমরা হচ্ছি গরীব মানুষ। তার উপর লেখাপড়া নাই। দিনের মধ্যে কতবার কত রকম অপমান যে হজম করা লাগে তার কুনো লেখাজোকা নাই। অনেক সময় অপমানরে অপমান বলে বুঝবারই পারি না। কিন্তু নিজের মানষের সামনে যখন মানুষ অপমান হয়, তখন আর না বুঝবার কুনো উপায় থাকে না।

মনটা ভারি হয়ে যায় ইউসুফের। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে মজিদকে– আমি ঠিক এইভাবে বলতে চাইনি মজিদ ভাই। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে ভাবী জেদ করে কি না? কিংবা আব্দার করে কি না?

আব্দার! ম্লান হাসে মজিদ– আব্দার মানে তো গালি গুলায়া কওয়া। তা নতুন নতুন বিয়ার পরে কিছুদিন করিছে। কিন্তু এখন আর আব্দার-টাব্দার নাই। যেদিন তার নিজেরও সহ্য পার হয়া যায়, সেদিন সে আমাকও বাপ-মা তুল্যা গালাগালি দেয়। নিমদ্দা বেটা ছাওয়ালের বিয়ার সব তইছিল ক্যান বলে শাপশাপান্ত করে।

কথা বলতে বলতে বুকটা পাতলা হয়ে এসেছে বলেই বোধহয় মজিদকে এবার সত্যিকারের হাসি হাসতে দেখা যায়– আমিও তখন কই যে নিমদ্দা ছাড়া তোমার বাপের জামাই হয় কেডা?

একথায় ইউসুফকেও হাসতে হয় একটু। এবার জ্ঞানদানের ভঙ্গিতে গলা নিচু করে কোনো গোপন কথা বলছে এমন ভাবে বলে মজিদ– তাছাড়া কুটুম, মিয়া-মানষের রাগ আসলে বেশি সময় থাকে না। এই ধরেন একটা লাল-নীল ফিতা, নাহয় দুই গাছা কাচের চুড়ি, তা-ও না পারলে ফুসলানি দিয়া দুইখান মিষ্টি কথা কইলেই তাগোর রাগ পানি।

এবার জোরেই হেসে ফেলে ইউসুফ। হাসতে হাসতেই বলে– ভাবী যাত্রা-সিনেমা দেখার বায়না ধরে না?

ধরে না আবার! তাঁই যখনই এইসব কথা তুলে, আমি না শুনার ভান করি, খালি পাশ কাটাই।

এক কাজ করেন। আমি গাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়ে যাব। আপনি ভাবীকে নিয়ে দিন সাতেকের জন্য আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। ঘুরবেন-ফিরবেন, সিনেমা দেখবেন, স্টুডিয়োতে গিয়ে ক্যামেরায় ছবি তুলবেন। তারপরে দেখবেন ভাবী আপনাকে আর জ্বালাতন করবে না।

মুসলমানমঙ্গল– জুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-ও কি কম খরচের বেপার কুটুম!

সে চিন্তা করতে হবে না আপনাকে। খরচ সব আমার।

কিন্তু ইউসুফের এই উচ্ছ্বাসে সেভাবে যোগ দেয় না মজিদ। বলে– তার চায়ে টাউনে আমাক একটা কাম জুটায়া দ্যান।

গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন?

না। তা না। কিছুদিনের জন্যে আর কী। গাঁয়ের কাম মানে তো বুঝেনই। আপখোরাকি। পয়সা জমানের কুনো সুযোগ নাই। টাউনে একখান কাম যোগার করে দ্যান। যত দরকার, আমি গতর খাটাতে রাজি আছি। খালি দেখতে হবি যে যাতে আমার খরচ বাঁচায়া হাতে কিছু থাকে। ট্যাকা জমলেই...

কত টাকা জমাতে হবে আপনাকে মজিদ ভাই?

কত ট্যাকা তা তো হিসাব করিনি। এই ধরেন, সমাজের মানষেক খাওয়ানোর মতোন ট্যাকা। ধরেন যে খুব রাজার বাড়ির খাওয়া তো না। জনাপ্রতি দুই টুকরা গরুর গোস, দুই টুকরা আলু, মোটা চালের ভাত, আর তারপরে মুখমিষ্টির জন্যে এক হাতা করে মিষ্টি জাউভাত। এই কামডা করতে পারলেই আমি আমার বউ আর মা-রে নিয়া সমাজে বাস করতে পারি।

ইউসুফ অবাক হয়ে খেয়াল করে, মজিদের সম্পূর্ণ চেতনাকে ছেয়ে আছে তার গ্রাম-সমাজ। নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক ঠেলে– যে সমাজ এমন মানুষদের ধারণ করতে পারে না, কাজে লাগাতে পারে না, তার কী কোনো ভবিষ্যৎ থাকতে পারে? সেই সঙ্গে তার মনের চোখে ভাসে না দেখা একটি শ্যামল যুবতীর মুখ। ভবিষ্যতের দিকে যে যুবতী তাকিয়ে রয়েছে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে– কোনোদিন কী সে তার স্বপ্নের শ্বশুর-ভিটায় পা রাখতে পারবে!

দুলাভাইকে মজিদের ব্যাপারে সুপারিশ করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। হয়তো সোজাসুজি বলে বসবে, যে মরদের বউ পুষার ক্ষমতা নাই, তার বিয়ার হাউস হয় ক্যান? ইউসুফের নিজেরও অবশ্য সেই একই মত। তবে মেয়ের বাপদের এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দোষ। এমন সব পাত্রের সাথে মেয়ে বিয়ে দেয় তারা কোন আক্কেলে! বাপ-মা হারা এতিম ভাতিজা মুহাম্মদকে খুবই ভালোবাসতেন তাঁর চাচা আবু তালিব। কিন্তু বেকার যুবক মুহাম্মদ যখন আবু তালিবের মেয়ে ফাখিতাকে বিয়ে করতে চাইলেন, তখন আবু তালিব ঠিকই এড়িয়ে গিয়েছিলেন সেই প্রস্তাব। মানুষ হিসাবে মুহাম্মদের সমতুল্য কেউ ছিল না, ভাতিজা হিসাবে তাকে ভালোবাসতে আবু তালিবের কোনো দ্বিধা ছিল না, কিন্তু জামাই হিসাবে তখন পর্যন্ত যে মুহাম্মদ ঠিক উপযুক্ত ছিলেন না, এটুকু বিচারবুদ্ধি আবু তালিবের ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বাড়িতে ইফতার, দেখা গেল, এক এলাহি কাণ্ড। বেলা দুপুর থেকে গড়াতে না গড়াতে শুরু হয়ে গেল ইফতারির প্রস্তুতি। সব কাজ অবশ্যই প্রধানত মেয়েদের। ছোলা ভেজানো রয়েছে তো সকাল থেকেই। এখন নানান ধরনের বড়া-পেঁয়াজুর জন্যে ডাল পেষা হচ্ছে পাটাতে। কুশরের গুড় ডুবিয়ে শরবত তৈরি হচ্ছে। আদা কাটা হচ্ছে। ভেজানো ছোলা দিয়ে বুটবিরানী বা ঘুগনি। পায়েস, পিঠা, ভাত-তেলানি। দুই রান্নাঘরের তিনটা চুলা আর দুই বারান্দা ভর্তি কর্মচঞ্চল বাড়ির মেয়েরা।

ইফতারির মিনিট পনেরো আগে থেকেই দুলাভাইয়ের হাঁক-ডাক। কিষাণ-চাকর, বাড়ির সব মানুষ, রোজদার-বেরোজদার সবাইকে বসতে হবে ইফতারিতে। বেরোজদারের ব্যাপারে দুলাভাইয়ের কথা হচ্ছে যে ইফতারির একটি নির্দিষ্ট সওয়াব আছে। রোজা না থাকলেও কেউ যদি ইফতারি ঠিকমতো করে, তাহলে সে অন্তত ইফতারির সওয়াবটুকু পাবে। আর যে রোজাদারকে ইফতার করায় সে তো অবশ্যই সওয়াব পাবে। বেরোজদারকে ইফতারির নিয়তে খাওয়ালেও সওয়াব পাওয়া যায়। সেই সওয়াবের জন্য যতটা, তার চাইতে সম্ভবত দুলাভাইয়ের এতবড় পরিবারের প্রধান হিসাবে এই সময়টাতে নিজেকে দেখতে ভালো লাগে বলেই তার এত ইফতারির তাগাদা। এই সময়টুকুতেই দুলাভাইকে সত্যিকারের প্রশান্ত দেখায়। এখানে সাইরেন নেই। মসজিদের আজানের মাধ্যমে সংকেত আসে ইফতারির। আজানের ঠিক আগে আগে দুলাভাই বলে– আল্লার কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া যে আল্লা আমাগের মুসলমান বানায়া দুনিয়াত পাঠাইছে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের উম্মত হওয়ার তৌফিক দিছে। নবী আমার পরশ পাথর। তাঁর স্পর্শ পাওয়ামাত্র সকলেই খাঁটি সোনা, খাঁটি মুসলমান! রাসুল মানেই সব অলৌলিক ব্যাপার। কুনো রাজনীতি দিয়া, দুনিয়াদারি দিয়া নবীরে বুঝবার ক্ষমতা কারও নাই।

ছয়

আসলে কি ব্যাপারটি তাই?

ইসলামে কি শুরু থেকেই রাজনীতি নেই? বিপক্ষে? এবং পক্ষে?

ইসলামের সবকিছুই কি অলৌকিক? রাসুলের সবকিছুই কি অলৌকিক? বরং উল্টোটাই তো সত্যি বলে দাবি করা হয়েছে। রাসুলের জীবনী পড়লেও তো সেকথাই জানা যায়। রাসুলের প্রথম পাঁচটি জীবনীর রচয়িতাদের নিয়ে অবশ্য অনেক কথা রয়েছে। কাউকে সুন্নিরা পছন্দ করে, কাউকে পছন্দ করে শিয়ারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রচনা নিয়ে সুন্নি মোল্লাদের ব্যাপক আপত্তি। বিশেষ করে ইবনে ইসহাকের ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যগুলি মেনে নিতে সরাসরি নিষেধও করেছে অনেক মোল্লা। মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকিদি নাকি অজস্র মিথ্যা ও ঘোর কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন রাসুলের জীবনী লিখতে গিয়ে। তাঁর রচনা সেই কারণেই নাকি খ্রিস্টান ও ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয়। তবে মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, মুহাম্মদ ইবনে হিশাম এবং ইমাম ইবনে জাবির তাবারি– এই তিনজনের বিবরণকে বিশ্বস্ত বলে মেনে নিতে আপত্তি করে না তেমন কেউ। সেগুলিকে ভিত্তি করেই লেখা ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর বই এখন সুন্নি মুসলমানদের কাছে খুব জনপ্রিয়। সেই বইতেও যেসব কথা আছে তা দুলাভাইদের মতো বিশ্বাসীদের পক্ষে হজম করা কঠিনই। বিশেষ করে যখন দুলাভাইদের মতো মানুষরা জানতে পারে যে তাদের নবীকেও এমন অনেক কাজের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, যেগুলোকে তারা কিছুতেই এখন ঐশ্বরিক বলে মেনে নিতে রাজি হবে না। সেগুলি রাজনীতি। একেবারে নিখাদ রাজনীতি।

আর সেই সময়ের আরবের গোত্রপ্রথা না বুঝলে রাজনীতিটা বিন্দুমাত্রও বোঝা সম্ভব হবে না।

রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক পরিবার এবং বংশ নিয়ে গোত্র। এই রক্ত-সম্পর্ক অনেক সময় বাস্তব, অনেক সময় কাল্পনিক। গোত্রের লোকদের বোঝানোর জন্য গোত্রের নামের আগে বসানো হয় বনু শব্দটি। যেমন– বনু কুরাইশ, বনু হাশিম। একই কওমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এক পরিবারের লোক নিজের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অন্য পরিবারের লোকের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। আবার একই কাবিলা বা গোত্রের মধ্যেই এক কওমের লোকেরা আরেক কওমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। তাদের প্রবাদ হচ্ছে– আমি এবং আমার ভাই আমার চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে; আমি ও আমার চাচাতো ভাই অন্য লোকের বিরুদ্ধে।

গোত্রের সব লোক ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোনো গোত্রের লোক অপর গোত্রের কাউকে হত্যা করলে তাদের মধ্যে প্রতিশোধের লড়াই শুরু হয়। আরবের গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোনো ব্যক্তি গোত্রের সম্পর্ক ছাড়া বাঁচতে পারে না। গোত্রহীন লোককে রক্ষার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করে না। তাই গোত্র-সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্য কিছু প্রথা চালু রয়েছে। যেমন কোনো ক্রীতদাস মুক্ত হলে সে যদি সেই গোত্রের কাছেই আশ্রয় নিয়ে থাকতে চায়, তবে তাকে সেই গোত্রে সচরাচর আশ্রয় দেওয়া হয়। তখন সেই ব্যক্তিকে বলা হয় মাওলা। এইভাবে যে কেউ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো গোত্রের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। একবার আশ্রয় দিলে সেই গোত্র তাকে প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করবে।

গোত্রের ভিত্তি সবসময়ই একজন পূর্বপুরুষ, যে কিনা অনেক সময়ই কাল্পনিক ছিল। যাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু ছিল না, তাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের, এবং এক ব্যক্তির সঙ্গে আরেক ব্যক্তির তুলনা হতো তাদের পূর্বপুরুষের মানমর্যাদার উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের দাবি করার জন্য ব্যবহৃত হতো 'হাসাব' শব্দটি। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বপুরুষদের কৃতিত্বের দাবি। শুধু শারীরিকই নয়, বরং মানসিক গুণাবলিও আসে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে– এই বিশ্বাস ছিল বদ্ধমূল। এই কারণেই তখনকার মক্কায় কুরাইশরা ছিল সর্বপ্রধান, আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীত ছিল বনু হাশিম। যেহেতু মুহাম্মদ ছিলেন বনু হাশিমের অন্তর্গত, তাই গোত্রের সবার কাছ থেকে তাঁর নিজের জান-মালের জন্য সহায়তা পাওয়ার অধিকার সবসময়ই তাঁর ছিল। আবু তালিবসহ বনু হাশিমের অনেকেই এই দাবি পূরণ করার চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে।

এই গোত্র-ব্যবস্থা বহুদিন পর্যন্ত সুরক্ষা দিয়েছে রাসুলকে। এবং তিনিও এই সুবিধাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন সতর্কতার সাথে। প্রথমে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের কথা তিনি বলেছেন শুধুমাত্র নিজেদের লোকদের কাছে। তাঁর স্ত্রী খাদিজা, কিশোর আলী, পালক পুত্র জায়েদ সহ মাত্র কয়েকজনকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাঁরা রাসুলের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আবু তালিব মুসলমান হতে রাজি হননি। পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে তাঁর মন সায় দেয়নি। যে কোনো ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসারীর ক্ষেত্রেই এই রকম অনুভূতি কাজ করে। রাসুলের বিরোধিতা যারা করেছে, এক অর্থে তারাও নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্ম রক্ষারই চেষ্টা করেছে। তাদের কাছে মুহাম্মদকেই পথভ্রষ্ট বলে মনে হয়েছে। আরব ছাড়া অন্য যে কোনো স্থানে হলে হয়তো মুহাম্মদকে এই অপরাধে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণ হারাতে হতো। যেমনটি হয়েছিল সক্রেটিসকে। কিন্তু আরবের গোত্রপ্রথা অনেকদিন যাবত রক্ষা করেছে রাসুলকে।

মক্কার লোকেরা আবু তালিবের কাছে গিয়েছিল এই অনুরোধ নিয়ে যাতে তিনি মুহাম্মদের ওপর থেকে আউলিয়া (নিরাপত্তা) প্রত্যাহার করে নেন। তারা বলেছিল– হে আবু তালিব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেবতাদের গালি দিয়েছেন, আমাদের ধর্মের অপমান করেছেন, আমাদের জীবনযাত্রাকে ব্যঙ্গ করেছেন, এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রান্তির দোষে অভিযুক্ত করেছেন। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় আপনি নিজে এর বিহিত করবেন, অথবা আমাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুমতি দেবেন।

আবু তালিব নিজেও তাঁর ধর্মের ওপর মুহাম্মদের আক্রমণের কারণে বিব্রত ছিলেন। কিন্তু ভাতিজার ওপর থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া মানে গোত্রের প্রধান হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন না করা। তাহলে তাঁর পুরো গোত্রই অসম্মানীত হয়ে পড়বে। কুরাইশরাও এই ব্যাপারটি বুঝত বলেই তারা আবু তালিবকে আরও কিছুদিন সময় দিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তারা আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল– দোহাই ঈশ্বরের, আমাদের পিতৃপুরুষদের গালিগালাজ করা হবে, আমাদের রীতি-নীতিকে ব্যঙ্গ করা হবে, আমাদের দেবতাদের অপমান করা হবে– এটা আমরা আর মেনে নিতে পারব না। আপনি যদি তাকে পরিত্যাগ না করেন, তাহলে আমরা সবাই মিলে আপনাদের গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব।

আবু তালিব তাঁর ভাতিজাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন– নিজেকে আর আমাকে রক্ষা করো। আমার ওপর এমন বোঝা চাপিয়ো না আমি যার ভার বহনে অক্ষম।

বলেছিলেন বটে, কিন্তু আবু তালিব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত মুহাম্মদের ওপর থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেননি।

ইবনে ইসহাক জানাচ্ছেন যে প্রথমদিকে মুহাম্মদের নবুয়ত লাভের সংবাদে এক ধরনের আনন্দিতই হয়েছিল মক্কার লোকেরা। আরবে যে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা বাস করত, তাদের তুলনায় হীনম্মন্যতায় ভুগত আরবরা। ইহুদি এবং খ্রিস্টানরাও হেয় চোখে দেখত কুরাইশদের। কারণ যদিও সবাই তারা আদিপিতা ইব্রাহিমের বংশধর, কিন্তু ইব্রাহিমের এক সন্তান ইসহাকের বংশে অনেক নবীর আবির্ভাব ঘটলেও অপর পুত্র ইসমাইলের বংশে কোনো নবীর আগমন ঘটেনি। কুরাইশরা নিজেদের ইসমাইলের বংশধর বলে দাবি করত। সেই সময়ের একজন মরু গোত্রপতির ভাষ্য ছিল এই রকম– আমরা ছিলাম বহু-ঈশ্বরবাদী, মূর্তিপূজা করতাম, আর ওরা ইহুদিরা ছিল ঐশীগ্রন্থের জাতি, আমাদের চেয়ে জ্ঞানী। আমাদের মধ্যে লাগাতার বৈরিতা ছিল। আমরা যখন ওদের থেকে ভালো কিছু পেতাম, ঘৃণা উস্কে উঠত তাদের মনে। তারা বলত– 'প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের আসার সময় হয়ে গেছে। তাঁর সাহায্যে আমরা তোমাদের হত্যা করব যেভাবে আদ আর ইরাম ধ্বংস হয়েছিল'। প্রায়ই ওদের মুখে এমন কথা শুনতাম আমরা। আরবরা নিজেদের ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে রয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী ভেবে দুঃখ পেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের প্রতিবেশী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে ঈশ্বর ঐশীগ্রন্থ পাঠিয়েছেন, কিন্তু আরবদের জন্য বিশেষ কোনো প্রত্যাদেশ পাঠাননি। তাই মুহাম্মদের নবুয়তের ঘোষণা ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি আরবদের জন্য ক্ষণিক সান্ত্বনার পরশ নিয়ে এসেছিল।

মনে রাখা দরকার 'আল্লাহ' শব্দটি রাসুলের আগে থেকেই মক্কার লোকেরা ব্যবহার করত। তারা বিশ্বাস করত যে আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র স্রষ্টা ও সকল দেবতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ দেবতা। তারা কাবা ঘরকে প্রচণ্ড ভক্তি করত। কাবা ঘরকে বলা হতো বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর। আল্লাহর কোনো মূর্তি ছিল না। হজ পালন ছিল বিশাল এক পুণ্যকর্ম। দূর-দূরান্ত থেকে আসত হজপালনকারীরা। তারা যেভাবে হজ পালন করত, মুসলমানদের জন্যও প্রায় একই রকম প্রথা বহাল রেখেছেন রাসুল। হজের মাসে যে কোনো রকম সহিংসতা ছিল নিষিদ্ধ। কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে বিশ মাইল ব্যাসার্ধের এলাকাকে ঘোষণা করা হতো সহিংসতামুক্ত তীর্থ-এলাকা। সবচেয়ে বড় শত্রুকে সেখানে নাগালে পেলেও কারও পক্ষে প্রতিশোধমূলক কোনো আচরণ করা সম্ভব ছিল না। কাবাঘরে তিনশো ষাটটি মূর্তি রাখা হয়েছিল। এছাড়া আরও তিনটি বড় উপাসনালয় ছিল যেগুলি ছিল 'বানাত আল্লাহ' বা আল্লাহর তিন কন্যার জন্য নির্ধারিত। প্রাচীর ঘেরা তায়েফ নগরীতে ছিল আল-লাতের মন্দির। সাকিফ গোত্র ছিল এই দেবীর পুরোহিত। তারা কখনও কখনও লাত দেবীকে আল্ রাব্বা বা সার্বভৌম দেবী বলেও অভিহিত করত। নাখলাহ নামক স্থানে ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় আল উজজা দেবীর মন্দির। উজজার অর্থ শক্তিমতী। আর সাগর তীরবর্তী কুদাইদ-এ ছিল আল মানাত বা ভাগ্য দেবীর মন্দির।

কিন্তু আরববাসীর একাংশের মনে এইসব প্রতিমা পূজা নিয়ে বীতশ্রদ্ধ ভাব তৈরি হয়েছিল বেশ আগে থেকেই। কেউ কেউ মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আদিপিতা ইব্রাহিমের ধর্মে প্রত্যাবর্তনের কথা বলতেন। সেখানে এক আল্লাহর কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের বিশ্বাসীদের 'হানিফ' বলা হতো। ইবনে ইসহাকের লেখা নবীর জীবনী থেকে জানা যায় যে রাসুল তাঁর বাণী প্রচার শুরু করার আগে মক্কা নগরীতে অন্তত চারজন হানিফ ছিলেন। উসমান ইবনে হুয়েরিথ ছিলেন মক্কার অত্যন্ত সম্মানীত বণিকদের একজন। তিনি এক পর্যায়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে মক্কাবাসীদের তাকে রাজা হিসাবে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাকে রাজা হিসাবে মেনে নিলে তিনি মক্কাবাসীদের বাইযানটাইনদের সাথে সহজ শর্তে ব্যবসা করার ব্যবস্থা করে দেবেন। রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী কুরাইশরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপর একজন হানিফ উবায়দাল্লাহ ইবনে জাহস ছিলেন রাসুলের চাচাতো ভাই। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও পরে আবার খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলেন। আরেকজন হানিফ ছিলেন বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ওয়ারকা বিন নওফেল। রাসুলের কাছে প্রথম ওহি নাজিল হওয়ার পরে ভীত-বিহ্বল স্বামীকে বিবি খাদিজা নিয়ে গিয়েছিলেন সেই ওয়ারকার কাছেই। তিনি প্রেরণা জুগিয়েছিলেন রাসুলকে। ইনিও খ্রিস্টান হয়েছিলেন। অপর যে হানিফের সঙ্গে কোনোদিন রাসুলের সাক্ষাৎ হয়নি, তার নাম ছিল যায়েদ ইবনে আমর। তিনি আজীবন সত্যসন্ধানী হিসাবেই রয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি কোনো ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করায় তার সৎভাই খাত্তাব ইবনে নুফায়েল তাকে শহর ছাড়তে বাধ্য করেছিল। হিজাজ ত্যাগ করে যায়েদ দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছেন। ইরাকের মসুল থেকে শুরু করে সিরিয়া পর্যন্ত ব্যাপক ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। যেখানেই গেছেন, সেখানকার ধর্মনেতাদের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছেন আদিপিতা ইব্রাহিমের ধর্মের সঠিক রূপ কী ছিল। সিরিয়াতে একজন ধর্মযাজক তাকে জানায় যে মক্কাতে অবিলম্বে এক পয়গম্বরের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে যিনি যায়েদের কাঙ্ক্ষিত ধর্ম প্রচার করবেন। তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু দক্ষিণ সিরিয়াতে দস্যুদলের আক্রমণে নিহত হন।

অর্থাৎ মক্কাতে একজন পয়গম্বরের আবির্ভাব আসন্ন এবং কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করা হচ্ছিল। এই মনোভঙ্গি নিশ্চিতভাবেই রাসুলকে কিছুটা হলেও সুবিধা দান করেছিল।

AMARBOI.COM

রাসুল সত্যিকারের বিপদে পড়লেন আবু তালিব এবং বিবি খাদিজার মৃত্যুর পরে।

কুরাইশরা একে তো তাদের দেবীকে অস্বীকার করার জন্য রাসুলের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল, তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল মুসলমানদের নামাজ পড়ার প্রতি ঘৃণা। আল্লাহ হোক আর যে-ই হোক, তার প্রতি মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে শ্রদ্ধা জানানো বা সেজদা করার দৃশ্য সীমাহীন ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল আরবদের মনে। পারস্য বা বাইযানটাইনের রাজ দরবারে গিয়েও কোনোদিন সম্রাটদের সামনে মাথা নত করে ভক্তি জানায়নি আরবরা। নামাজের এই প্রক্রিয়া তাদের কাছে তাই ছিল সহ্যের অতীত একটি ব্যাপার। তাই তারা নামাজরত মুসলমানদের গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিত বিভিন্ন অপবিত্র জিনিস।

আবু তালিবের মৃত্যুর পরে বনু হাশিমের প্রধান পদ লাভ করে রাসুলের আরেক চাচা আবু লাহাব। দায়িত্ব গ্রহণের পরে আবু লাহাবও রাসুলকে কিছুটা নিরাপত্তা দিয়েছিল। গোত্রের নিয়ম অনুযায়ী তা দিতে সে বাধ্য। কিন্তু এই দায়িত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালনে আবু লাহাব যে আন্তরিক ছিল না, তা বুঝতে কারও সময় লাগেনি। আবু জেহেলের কুমন্ত্রণায় আবু লাহাব একদিন রাসুলকে জিজ্ঞেস করল যে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব এখন বেহেস্তে আছেন না দোজখে আছেন? খুবই কৌশলী প্রশ্ন। কারণ রাসুল যদি বলেন যে সারাজীবন পৌত্তলিক ধর্ম মেনেও আব্দুল মুত্তালিব এখন বেহেস্তে আছেন, তাহলে কুরাইশরা বলবে যে তাদের পৌত্তলিক ধর্ম অবশ্যই সঠিক। কারণ পৌত্তলিক ধর্ম পালন করেই আব্দুল মুত্তালিব বেহেস্তে যেতে পেরেছেন। আর যদি রাসুল বলেন যে তাঁর দাদা এখন দোজখে আছেন, তাহলে পূর্বপুরুষকে অসম্মান করার অপরাধে আবু লাহাব রাসুলের ওপর থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিতে পারবে।

সবার মতো রাসুলও বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর গোত্র এখন তাঁকে আদৌ নিরাপত্তা দেবে না। ফলে কুরাইশরা তাঁর ওপর বেশি করে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন চালাতে শুরু করল। রাসুলকে তখন বাধ্য হয়েই হিজরতের কথা ভাবতে হলো।

প্রথমে তিনি গেলেন তায়েফে। সেখানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার পরে তাঁকে আবার ফিরে আসতে হলো মক্কায়। এবার তাঁকে নিরাপত্তা দেবে কে? তিনি নিরাপত্তা চাইলেন বনু যোহরার নেতা আখনাস ইবনে শারিক এবং বনু আমিরের নেতা সুহায়েল ইবনে আমিরের কাছে। কিন্তু এই দুজন তাঁকে নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করে। পরে বনু নওফেলের নেতা মু'তিম তাঁকে নিরাপত্তা দান করতে সম্মত হন, এবং রাসুল পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

এবার তাঁকে যেতে হয়েছিল ইয়াসরেব বা মদিনায়। এই ক্ষেত্রেও গোত্রপ্রথা তাঁকে সাহায্য করেছিল অনেকখানি। ইয়াসরেবের দুই প্রধান গোত্র আউস ও খাজরাজ নিজেদের মধ্যে কলহ নিয়ে অশান্তিতে ছিল চল্লিশ বছর ধরে। গোত্রীয় ঘৃণা তখন এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে আউস ও খাজরাজ গোত্রের কোনো সদস্যই প্রতিপক্ষ গোত্রের কেউ নেতা হবে বা তাদের নগরীর প্রধান হবে, এটি মেনে নিতে রাজি ছিল না। এমনকি উভয় গোত্র থেকে কয়েকজন মুসলমান হওয়ার পরেও প্রতিপক্ষ গোত্রের কোনো সদস্য পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করবে বা নামাজে ইমামতি করবে, এটা মেনে নেবার মতো পরিস্থিতি ছিল না। তাই মুহাম্মদকেই তারা নেতা হিসাবে একমাত্র পছন্দের ব্যক্তি হিসাবে খুঁজে পেয়েছিল। ইয়াসরেবের প্রতিনিধিরা রাসুলকে বলেছিল– 'আমরা আমাদের জাতিকে ছেড়ে এসেছি, কেননা আর কোনো গোত্র ওদের মতো ঘৃণা আর হিংসার কারণে বিভক্ত হয়ে নেই। হয়তো ঈশ্বর আপনার মাধ্যমে তাদের আবার ঐক্যবদ্ধ করবেন। চলুন ওদের কাছে যাই, এবং ওদের আপনার ধর্মে আহ্বান জানাই। যদি ঈশ্বর ওদের সবাইকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ধর্মের মাঝে একত্রিত করে দেন, তাহলে আপনিই হয়ে উঠবেন আরবের সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ।'

এই পর্যন্ত তো বটেই, মদিনার জীবনের পুরোটাই রাসুলের সফল রাজনীতির ইতিহাস। সেই কারণেই তাঁকে বারবার বলতে শোনা গেছে– 'আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আমিও তোমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। তফাৎ কেবল একটি জায়গায়। তা হচ্ছে– আমার ওপর ওহি নাজিল হয়।'

সাত

সিগারেট খাওয়া আর সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, এই দুই জিনিসকে মনে মনে ভীষণ অপছন্দ করলেও দু'টোর একটাকেও এড়ানো সম্ভব হয় না ইউসুফের পক্ষে। অভ্যাসের দাসত্ব কাকে বলে তা এই দুই বদভ্যাস ছাড়তে না পারার মাধ্যমেই পরিষ্কার বুঝতে পারে সে। তাহলে চিন্তার অভ্যস্ততায় পরিবর্তন আনা যে কত কঠিন ব্যাপার তা যুগ যুগ ধরে একই রকম চিন্তায় অভ্যস্ত জনগোষ্ঠীকে দেখলে ভালো ভাবেই বোঝা যায়।

ইচ্ছ ছিল আজ সকালে সে পাগলদের পাড়ায় যাবে। গতবার এসে সেখানে এক মজার লোককে পেয়েছিল সে। তার কাছাকাছি বয়সেরই হবে যোগেন। পালপাড়ার মানুষ বলে, যোগেনের নাকি মাঝে মাঝে ভাব ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যায়। তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা কোনো ডাক্তার-কবরেজের পক্ষেই সম্ভব হয় না। যখন জ্ঞান ফিরে পায়, নিজে নিজেই ফিরে পায়। জেগে ওঠার পরে সে একটা না একটা নতুন কথা বলে। এমন সব কথা, যার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না কেউই। এসব শুনে তাকে দেখতে গিয়েছিল ইউসুফ। প্রথমে তাকে তেমন পাত্তা দেয়নি যোগেন। টাউনের মানুষ গাঁয়ে এলে তার দিকে যেমন ঔৎসুক্য নিয়ে তাকায় গ্রামের মানুষরা, তেমন কোনো লক্ষণ ছিল না যোগেনের আচরণে। ইউসুফের সঙ্গে গল্প করতে বা কথা বলতেও তাকে তেমন আগ্রহী মনে হয়নি। তবে এক সময়ে ঠিকই ভাব হয়ে গিয়েছিল দু'জনের। ইউসুফের কাছে তখন চরমতম গোপনীয় কথাটি বলতেও দ্বিধা করেনি যোগেন। না, তার কোনো ভাবসমাধি-টমাধি হয় না। কবরেজ কীভাবে তার জ্ঞান ফেরাবে! সে অজ্ঞান হলে তবেই না জ্ঞান ফেরানোর কথা আসে। সে তো আদৌ অজ্ঞান হয় না। ঐ ধরেন যে মটকা মাইরা পড়্যা থাকি।

কারণ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ ঐ রকম না করলে, মানে, ভেক না ধরলে কে আমার কথা শুনবার চাবে?

কী কথা শোনাতে চান আপনি?

দুনিয়ার মানষের কাছে আমার একটা পরস্তাব আছে। তা হচ্চে যে দুনিয়াত আলাদা আলাদা এত রকম ধর্ম থাকা উচিত না।

তা আপনি কী করতে চান?

আমি বলব যে সক্কলে আপন আপন ধর্ম ত্যাগ করেন, তারপর এক জাগাত বসে ফয়সালা করে ন্যান কোন একখান ধর্ম সক্কলে মিলে পালন করবেন।

আপনি বলতে চাইছেন যে পৃথিবীর সাতশো কোটি মানুষ একসঙ্গে বসে মিটিং করবে?

একথা শুনে একটু ধাক্কা খায় যোগেন। এত মানুষ দুনিয়াত! তা তাদের একসঙ্গে বসাবে এমন মাঠ আর কোথায় পাওয়া যাবে! যোগেন তখন বিকল্প খোঁজে– তাহলে নাহয় সব মানষের একসাথে বসার দরকার নাই। নিজের নিজের মোড়ল-মাতব্বরগো পাঠালেই হয়। কিন্তু সমাধান তো একটাই। মানুষে মানুষে বিভেদ ঘোঁচাতে হলে সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে যে কোনো একটি ধর্মের ছায়াতে আসতে হবে। তাহলে পৃথিবীতে আর কোনো হানাহানি থাকবে না, ছোট-বড় বলে কোনো ভেদ থাকবে না, মানুষ যে যেখানেই থাকুক শান্তিতে থাকতে পারবে। মুসলমানের জন্যে পাকিস্তান হিন্দুর জন্যে হিন্দুস্তান ইহুদির জন্যে ইসরায়েল লাগবে না।

তার এই প্রস্তাব গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরতে হলে সে যে বিশিষ্ট একজন কেউ, কিংবা ধ্যানের মাধ্যমে সে এই সত্য আবিষ্কার করেছে, এটি না দেখালে মানুষ তো তার কথায় পাত্তা দেবে না।

হাসি গোপন করে ইউসুফ জিজ্ঞেস করেছিল– তা আপনি কতদিন পরে কথাটা বলবেন? মানে প্রস্তাবটা দেবেন?

যোগেন নির্দ্বিধায় উত্তর দিল– আমার উপর এই দেবতার ভর হওয়ার খবরডা দিকে দিকে আগে ছড়ায়া পড়ুক।

তা এখন পর্যন্ত কতদূর ছড়িয়েছে?

এই ধরেন যে বিশ-পঁচিশটা গেরাম হবার পারে।

তাহলে তো অনেক দেরি হবে!

তা হোক। ভালো কামে একটু-আধটু দেরি হয়ই।

কিন্তু ঘুম থেকে উঠে রোদের আঁচ দেখে মনে মনে দমে গেল ইউসুফ। এখন যদিও আশ্বিন, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে চোত মাস পড়ে গেছে। আশ্বিন মাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো সকালে বাতাস থাকবে মৃদু মৃদু, মুগ-মসুর-দূর্বার গায়ে অল্প অল্প শিশিরের মতো জলকণা থাকার কথা, ছোটবেলায় দাদি বলত এগুলো শিশির না, রাতের আকাশের ঘাম। সেই সঙ্গে ছোট হয়ে আসা দিন, আর শেষরাতে শিরশিরে অনুভূতির জন্য গায়ের ওপর পাতলা কাঁথা ফেলে রাখা। এইসব নিয়েই না আশ্বিন মাসের সুন্দর দিনরাতগুলি! অনেক মানুষই বলে, সব কেমন যেন উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। যে সময়ে যা হওয়ার কথা, তা হচ্ছে না; যা না হওয়ার কথা, তা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর যে কী ইচ্ছা আছে এইসব পরিবর্তনের পেছনে তা তিনিই ভালো জানেন। ইউসুফ তো সবাইকে বলতে পারে না যে এই জলবায়ুর এমন পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ নন, মানুষই দায়ী। দায়ী যন্ত্রসভ্যতা, সিএফসি, ওজোন স্তরের ক্ষয়, পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া। যাদের এসব কথা মানুষকে জানানোর দায়িত্ব, তারা আমেরিকার ধমকে মুখ বুঁজে চুপচাপ বসে থাকে। মানুষ শীত-গরম-বর্ষার উল্টাপাল্টা হওয়ার পেছনে আল্লাহর কোনো খেয়াল আছে মনে করে নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করে।

ইউসুফকে বেরোনোর উদ্যোগ করতে দেখেই হাঁ হাঁ করে ওঠে বুবু– এই রোদের মধ্যে তুই কই যাস!

বেশি দূরে যাব না বুবু। এই একটু পালপাড়ায়।

মানে কুমারপাড়াত! সে কী, ইকটু-আধটু দূর! খবদ্দার এই রকম ছাতিফাটা রোদের মধ্যে বার হোস না। মাথা ঘুরে কোন জাগাত পড়ে থাকবু তার কোনো ঠিক নাই। যারা বলে রোজ-রোজ এই রোদের মধ্যে বার হয়, তাগোরই সহ্য হয় না, আর তুই বীরত্ব দেখাবার জন্যে বার হচ্ছিস এই রোদে!

ছাতা নিয়ে যাব বুবু। অসুবিধা হবে না।

ছাতা নিয়াও বার হওয়ার দরকার নাই। কী এমন মহাকাজ পড়িছে তোর যে এই রোদের মধ্যে কুমারপাড়াত যাওয়া লাগবি?

যাব একটু যোগেনের সাথে গল্প করতে।

ও যোগেন পাগলা। তা তোর যাওয়ার দরকার কী? মজিদেক পাঠায়া খবর দিচ্ছি, যোগেন আসুক।

একটু হাসল ইউসুফ– মজিদের বা যোগেনের রোদে কষ্ট হয় না।

বুবু পাত্তা দেয় না ইউসুফের কণ্ঠের শ্লেষকে– মজিদের অভ্যাস আছে। আর যোগেন তো পাগলা মানুষ। বিষ্টি-রোদে অর কিছু হয় না।

এই সময় দুলাভাই ঢোকে ঘরে। যোগেনের নাম কানে গিয়েছিল তার। জিজ্ঞেস করে– কোন যোগেনের কথা কও? কুমারপাড়ার যোগেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাচ্ছিল্যের হাসি তার মুখে। কণ্ঠে তারচেয়ে অনেক বেশি তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বলে– সেই ব্যাটা মালু আবার নাকি সাধক হইছে! কলির অবতার না হয়া যায় আবার!

এই রকম কথা কয়ো না তো! একটু ঝাঁঝের সাথেই বলে বুবু– আল্লা কার মধ্যে কখন কোন জিনিস দিয়া দেয় তা কে কবার পারে?

দুলাভাইও উষ্মা দেখায়– মিয়ামানষের বুদ্ধি দ্যাখো! যোগেন একে হিন্দু তায় আবার ছোটজাত। এই রকম মানষেক আল্লা বাতেনি জ্ঞান দিবার পারে? একটা সামঞ্জস্য থাকা লাগবি না!

বুবু নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ে না– আল্লার কাছে ছোটজাত-বড়জাত বলে কোনো কথা নাই। আল্লা যারে খুশি তার নেয়ামত দিবার পারে

তা পারে। কিন্তু কোনো হিন্দু যতই ভেক ধরুক না ক্যান সে তো আর আল্লার বান্দা হবার পারে না। আর তার মতোন বিধর্মী মানুষ নিয়া আমাগের ভাবনা করার কিছু নাই। তা তোমার আবার যোগেনের দরকার পড়ল ক্যান?

আমার দরকার নাই। ইউসুফ যাবার চাচ্ছে যোগেনের পাড়াত।

কুটুমের দিকে প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে হয় দুলাভাইকে– যত উদ্ভট জিনিসের দিকে খেয়াল তোমার ভাইয়ের। উদ্ভট মানষের সাথে দোস্তিও পাতায় তাড়াতাড়ি। তোমার ভাই...

নিজেও উদ্ভট তাই না দুলাভাই? হাসতে হাসতেই দুলাভাইয়ের অসম্পূর্ণ বাক্যটা নিজেই টেনে নেয় ইউসুফ।

না না আমি ঠিক তা কবার চাইনি। তবে তুমি এখনও তো ছেলেমানুষ। এখনও ঠিকমতো বুঝদার হবার পারোনি। তা যাহোক, যোগেনের কাছে কী কাম তোমার?

এই একটু গল্প-গুজব করব আরকি।

তা যাও। ঘুরে আসো। কিন্তু নামাজের সময় হলে দুইডা টিপ মেরে দিয়ো রে ভাই। পালপাড়ার পাশেই এখন মসজিদ হইছে একটা।

দুলাভাই তো জানেই যে ইউসুফ বাড়িতেই নামাজ পড়ে না, তাকে হিন্দু পাড়ায় গিয়ে নামাজ পড়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া কেন! একটু অবাক হয়ে দুলাভাইয়ের দিকে তাকায় ইউসুফ। দুলাভাই হেসে বলে– আরে মনে করায়া দিলাম যে হিন্দু পাড়াত গেলেও তুমি যে হিন্দু না, মুসলমান, তা তাগোরে মনে করায়া দেওয়া উচিত।

তাতে লাভ কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ-লোকসানের ব্যাপার না। আমরা যে আলাদা মানুষ, এইডাই বুঝানো দরকার।

বুবু এই প্রসঙ্গ বদলে দেয়– নামাজের সময় হতে অনেক বাকি আছে। সারা দুপুর তোর গরমের মধ্যে ঐ জাগাত সিদ্ধ হওয়ার কাম নাই। তুই দুপুর মাথার উপর উঠার আগেই ফিরা আসিস ভাই।

এইসব কথা শুনতে শুনতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ইউসুফ। সে বিদায় নিতে চাইল তাড়াতাড়ি। সেই সময় দরজা ঠেলে ঢুকল মালতি। জিয়োনি পাড়ার মেয়ে। আগে এই বাড়িতে কাজ করত। কিন্তু দুলাভাই হজ্জ করে আসার পরে বিধর্মীর ছোঁয়া থেকে দূরে থাকতে চায় বলে তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আসতে দেখে দুলাভাই চট করে সরে যায় নিজের ঘরের দিকে। বুবু মালতিকে ইশারা করে– তুই এই জাগাতই দাঁড়া।

তারপর ঘরের ভেতর থেকে দশ টাকার একটা নোট এনে মালতির হাতে দেয়।

ইউসুফের সামনে টাকা হাতে নিচ্ছে মালতি। সম্ভবত তার মনে হয় যে ইউসুফ ভাবতে পারে এই টাকা সে মাহিনা হিসাবে নিচ্ছে। তাই সে তড়িঘড়ি করে বলে– মনসা পূজার টাকা মামা। বড়মা সব মাসেই পূজার লগ্নে চান্দা দেয়।

বুবুর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় ইউসুফ। বুবু তড়িঘড়ি করে বলে– বিল অঞ্চল, সাপখোপের দ্যাশ। বাড়িত ছোট ছাওয়াল-পাওয়াল। কে কখন সাপের মুখে পড়ে! তাই মনসা পূজার ট্যাকা না দিলে মনডা ভয়ে ভয়ে থাকে।

হো হো করে হেসে ফেলল ইউসুফ। বুবু চাপা গলায় ধমকে উঠল– আস্তে আস্তে, তোর দুলাভায়ের কানে যেন না যায়! আর তোরও ছুঁড়ি আসার একটা সময়-অসময় নাই! দেখতেই তো পাইছিস তোর জ্যাঠা বাড়িত আছে, একটু পরে আসলে কী ক্ষতি ছিল! যদি জানবার পারে যে আমি পূজার ট্যাকা দিচ্ছি তাহলে চিল্লায়া বাড়ি মাথাত তুলবি।

ইউসুফের মনে পড়ল, এক সময় এইভাবেই এদেশের হিন্দু আর মুসলমানের ধর্ম পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছিল। এগুলিকেই ওহাবি-ফারায়েজি আন্দোলনের সময় শেরেকি-বেদআতি বলে চিহ্নিত করে এই উপমহাদেশের মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তার ফলাফল বাইরে কিছুটা দেখা যায়, কিন্তু একটু শহরের সীমানা ছাড়ালেই বুবুর মতো মানুষ লাখে লাখে রয়েছে মুসলমান সমাজে এখনও। ওহাবি-ফারায়েজিদের সবচেয়ে বেশি রাগ পীর-দরবেশদের মাজার আর তাদের ওরশের ওপর। তাদের কাছে এসব কবর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূজা ছাড়া আর কিছু নয়। এতদিনেও ওরশ থেকে, মাজার থেকে মানুষকে দূরে সরাতে না পেরে কট্টর শরিয়তপন্থী মৌলবাদীরা বায়েজীদ বোস্তামীর মাজারের পুকুরে শত শত কছর ধরে বেঁচে থাকা বিরল প্রজাতির কাছিমগুলিকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছে। কবে যে খানজাহান আলীর মাজারের কুমীরকে মেরে ফেলবে কে জানে! কিন্তু লোকগুলি আরেকটা দিক কেন ভাবে না? এই দেশে ইসলাম ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন তো এইসব আউলিয়া-দরবেশরাই। তাঁরাই ছিলেন প্রথম মুসলিম মিশনারি। তো তাদেরকে যদি মানুষ ওরশের মাধ্যমে স্মরণ করে, শ্রদ্ধা জানায়, তাহলে ক্ষতিটা কোথায়? এদেশসহ ভারত ও পাকিস্তানকে মুসলমান বাদশা-সম্রাটরা শাসন করেছে সাতশো বছর ধরে। তারা যদি চাইত তাহলে একজনও তো অমুসলিম থাকতে পারত না। কিন্তু তারা আসলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেনি। তারা এসেছিল রাজত্ব করতে। রাজত্ব করেছে। যত কম সংখ্যক মানুষ মুসলমান হবে, তাদের লাভ তত বেশি। কেননা অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া কর পাওয়া যেত। কেউ মুসলমান হলে তাকে জিজিয়া কর দিতে হতো না।

মনে মনে হাসল ইউসুফ। এই ইতিহাস জানলে শরিয়তপন্থী ওহাবিরা বোধহয় পাক-ভারতের মুসলমান রাজা-বাদশাদের কবর ধ্বংস করতে ছুটত।

দুলাভাই কথায় কথায় বলে, দুলাভাইয়ের মতো অনেক মানুষই বলে– সত্যিকারের মুসলমান দেখতে চাও তো যাও সৌদি আরবে। নামাজের আজান হবে তো যে যেখানে আছে সব কাজ ফেলে ছুটবে মসজিদে নামাজ পড়তে। রোজার সময় কোনো খাবার দোকান তো দূরের কথা, পানির দোকান পর্যন্ত বন্ধ থাকে। আর চুরি কাকে বলে, জানেই না সেখানকার মানুষ। কেউ কোথাও যাওয়ার সময় দোকানে তালা লাগায় না। সম্ভবত তালা লাগানো কাকে বলে তা ভুলেই গেছে সেখানকার মানুষ। কারণ চোর তো নেই। চোর ধরা পড়লেই তার শাস্তি হাত কেটে নেওয়া। একেবারে শরিয়া আইন। তাই চুরি নাই, রাহাজানি নাই, ঠকবাজি নাই। মানুষের পোশাক দেখলে মনে হবে তুমি নবীর জামানায় আছো। সর্বত্র শরিয়া। আল্লাহর আইন ছাড়া মানুষের কোনো আইন সেখানে অচল।

ইউসুফ তিক্তমনে হাসে। গোড়াতেই যে গলদ রয়ে গেছে সেখানে! সৌদি আরবে চলে আসছে রাজতন্ত্র। অনেক আলেমই তো বলেছেন যে ইসলামে রাজতন্ত্র হারাম। আর এই রাজতন্ত্র হচ্ছে সরাসরি ওহাবিদের বংশধর। সেখানে বাদশাহ বা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই তার শিরোচ্ছেদ। সৌদি প্রিন্সদের কেচ্ছাকাহিনীতে সারা পৃথিবীর খবরের কাগজ সয়লাব। ওরা রাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলায় নিজেদের বিমান নিয়ে যায় লন্ডন-প্যারিসে ফুর্তি করতে। জুয়া খেলে একরাতে এক লাখ ডলার হারার ইতিহাস আছে রাজপুত্রের। সেই জুয়ারির পেছনে আবার হজের সময় নামাজ পড়তে হয়েছে সারা পৃথিবীর হাজিদের। আমরা বাঙালি মুসলমানরা ওদের অর্থ-বিত্ত দেখে খুশি হই। ভাবি, অন্তত আমাদের মুসলমান ভাইদের একটা অংশ তো সুখে আছে! কিন্তু আমরা ওদের ভাই বলে জান দিয়ে দিলে কী হবে, ওরা আমাদের মিসকিন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে রাজি না। হজের সময় বাংলাদেশের হাজি দেখলে ওরা নাক কোঁচকায়। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার পাসপোর্ট দেখলে তার সামনে কালো মুখে বত্রিশ পাটি সাদা দাঁত বের করে লম্বা সালাম ঠোকে। মেয়েদের সেখানে পর্দায় জড়িয়ে পুটলি হিসাবে রাস্তায় বেরুতে হয়; আর রাজ পরিবারের ধনী পুরুষরা নিজ নিজ বাড়িতে হেরেমখানা বানায়। এই তো হচ্ছে সেখানে ওহাবি সংস্কারের ফসল।

AMARBOI.COM

আট

ওহাবি আন্দোলনের ইতিহাস খুব কম মুসলিম দেশেই ঠিকভাবে পড়ানো হয়।

কোনো জাতি যখন অধঃপতিত হতে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার বিভিন্ন স্তরে উত্তরণের পথ খোঁজা শুরু হয়। তখন তার পিছিয়ে পড়ার কারণও অনুসন্ধান করা শুরু হয়। ইসলামের ক্ষেত্রেও তেমনটি এখন যেমন খোঁজা হচ্ছে, আগেও তেমনই খোঁজা হয়েছিল। এই রকমই একটি চেষ্টা ছিল ওহাবি আন্দোলন। ওহাবি আন্দোলনকে বলা হয় মরুভূমির শুদ্ধতাবাদী আন্দোলন। আধুনিক পৃথিবী, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদিকে বিবেচনায় না নিয়ে এই আন্দোলনের প্রবক্তারা ফিরে যেতে চেয়েছিলেন রাসুলুল্লাহর জামানায়। এবং সেই ফিরে যাওয়ার পথও ছিল একেবারেই যান্ত্রিক। যার নামে এই আন্দোলনের নাম, সেই মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের জন্ম ১৭০২ বা ১৭০৩ সালে বর্তমান সৌদি আরবের পিছিয়ে পড়া মরু-পর্বতময় লোকালয় নজ্‌দ-এ। তবে যাকে এই আন্দোলনের তাত্ত্বিক হিসাবে ধরা হয় সেই ইবনে তাইমিয়ার জন্ম অনেক আগে; ১২৬৩ সালে সিরিয়াতে। বাগদাদের পতনের পরে গ্রেট খানদের নেতৃত্বে পারস্যকেন্দ্রিক যে ইসলামি রাজতন্ত্র চালু হয়, তারা ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। ইবনে তাইমিয়া নিজে ছিলেন সুন্নিদের মধ্যে সবচেয়ে শুদ্ধতাবাদী হাম্বলী মজহাবের অনুসারী। তাঁর মত ছিল মোঙ্গলদের নেতৃত্বাধীন শিয়া রাজত্ব ইসলামের পরিপন্থী। চার ইমামের চার মজহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সুন্নিরা ঘোষণা করে যে ইসলাম ধর্মে আর কোনো ইজতিহাদের প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই; ফলে আর কোনো মুজতাহিদকে গ্রহণ করা হবে না। ইজতিহাদ হচ্ছে যুগোপযোগী জ্ঞানী সিদ্ধান্ত, যা জাতিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। ইজতিহাদকারীকে বলা হয় মুজতাহিদ। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া দাবি করলেন যে ইজতিহাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি এবং তিনি নিজেকে সেই সময় মুজতাহিদ ঘোষণা করে ইসলামের ধর্মীয় সিদ্ধান্তগুলিকে পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আল-আরাবির তীব্র সমালোচনা করলেন এই বলে যে আল-আরাবির মতো সুফিদের মাধ্যমে ইসলামে অনেক বেদআত প্রবেশ করেছে। তিনি মোঙ্গলদের খলিফা বলতে অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন যে এখন একটি ইসলামি রাষ্ট্র কেবলমাত্র পরিচালিত হতে পারে একজন শাসক (আমির) এবং একজন ধর্মীয় নেতার (ইমাম) যৌথ নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে আমিরকে চলতে হবে ইমামের পরামর্শে, কেননা একমাত্র ইমামই পারেন কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ শাস্ত্রের আলোকে বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। এমনকি ইমামের অনুমতি ছাড়া কোনো আমির যুদ্ধে বা জিহাদেও অগ্রসর হতে পারবেন না।

ইসলামের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংহত হওয়ার পরে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জিহাদে কবীর বা ছোট জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এখন থাকবে শুধু জিহাদে আকবর বা নিজের প্রবৃত্তিকে শুদ্ধ করার সংগ্রাম। বদর যুদ্ধের পরে স্বয়ং মহানবী মুহাম্মদ(সাঃ) এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, এমনকি সবচেয়ে কট্টরপন্থী বলে পরিচিত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল পর্যন্ত এই একই সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে ইবনে তাইমিয়া রাসুলের হাদিসের সেই ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করলেন এবং বললেন যে জিহাদ এখন আবার যুগের দাবিতে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অর্থ নিয়েই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি নিজে তাঁর অনুসারীদের সংগঠিত করে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে দামেস্কের কাছে এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং কিছু কিছু খণ্ডযুদ্ধে বিজয় লাভও করেছিলেন। তবে শুধু এটুকুতেই তিনি তাঁর জিহাদ সীমাবদ্ধ রাখলেন না। তিনি জানালেন যে জিহাদ হচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র কর্ম এবং সকল বিধর্মীর বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে। তিনি ইসলামের শত্রুদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। প্রথম ভাগে ছিল খ্রিস্টানরা। তবে তাদের সাথে শান্তিস্থাপন করা যেতে পারে, তাদের সাথে ওঠাবসা করা যেতে পারে, খ্রিস্টান নারীকে মুসলমানরা বিবাহ করতে পারে, কোনো দোষী খ্রিস্টানকে হত্যার বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় শত্রু ঐসব মুসলমানরা, যারা নিজেদের আগের জীবনের পৌত্তলিকতায় ফিরে গিয়েছিল। তাদেরকে আবার ইসলামে ফিরে আসার ডাক দেওয়া হবে। যদি তারা ফিরে না

মুসলমানমঙ্গল- ৪দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে, তবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তাদের সাথে কোনো রকম শান্তিচুক্তি করা যাবে না। তৃতীয় শত্রু হচ্ছে সেইসব মুসলমানরা, যারা ইসলামের আচার-আচরণ বা প্রথাগুলিকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে না। তাদেরকে কোনোভাবে ক্ষমা করা যাবে না, এবং অবশ্যই হত্যা করতে হবে। আর চতুর্থ দলে আছে সেইসব মানুষরা যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুন্নিদের বিচারে তারা মুসলমান নয়, তাদেরকেও অবশ্যই ক্ষমাহীনভাবে খতম করতে হবে।

এইসব চরমপন্থার কারণে ইবনে তাইমিয়ার সমর্থন ইসলামি জগতে বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। তার চিন্তাধারা সমকালীন বেশিরভাগ আলেম দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। বিশেষ করে ইবনে তাইমিয়া যখন ঘোষণা করেন যে রাসুলুল্লাহর রওজা মোবারক জেয়ারত করাটাও এক ধরনের কবর-পূজা, সুতরাং সেটিও তার মতে নিষিদ্ধ, তখন প্রায় সব মুসলমান আলেমই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু আব্দুল ওহাব পাঁচশো বছর পরে ইবনে তাইমিয়ার পথকে নিজের জন্য অনুসরণীয় বলে মনে করলেন।

সেই সময় নজদ ছিল একেবারেই বিরাম মরুভূমি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি যাযাবর বেদুইন গোষ্ঠী ছাড়া আর কোনো স্থায়ী অধিবাসী ছিল না বললেই চলে। বলা হতো যে 'নজদ থেকে ভালো কোনো কিছু উঠে আসা অসম্ভব।' এমনকি এই ধরনের একটি হাদিস প্রচলিত ছিল যে স্বয়ং রাসুল নাকি তিন-তিনবার নজদের জন্য দোয়া করেছিলেন কিন্তু কোনোবারই সেই দোয়া কবুল হয়নি। শেষের বার নাকি উত্তর এসেছিল যে– 'সেখানে আছে শুধু ভূমিকম্প এবং কলহ; এবং সেখান থেকেই উত্থিত হবে দুইটি শয়তানের শিং।' অনেক ইতিহাসবিদের মতে এই দুই শয়তানের শিং হচ্ছে যথাক্রমে ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাব এবং পরবর্তীতে তারই গোত্রের উত্তরপুরুষ আব্দুল ওহাব।

আব্দুল ওহাবের গোত্র বনু তামেন কোনো কালেই আরবে কোনো সম্মানীত বংশ হিসাবে পরিগণিত ছিল না। তাদের পরিচিতি ছিল অশ্বপালক গোত্র হিসাবে। তবে শৈশব থেকেই আব্দুল ওহাব ধর্মীয় শিক্ষায় খুবই অনুরাগের পরিচয় দেন এবং দশ বছর বয়সেই কোরআনের হাফেজ হন। একটু বয়স বাড়ার পরে তিনি তালেবে-এলেম হিসাবে মদিনা এবং বসরাতে চলে যান। এই সময় তিনি খুম শহরে সুফিদের সংস্পর্শেও কিছুদিন ছিলেন। পরবর্তী দশ বৎসর তিনি মদিনায় বিভিন্ন ইসলামি তাত্ত্বিকের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে সাইফের কাছে দীর্ঘদিন ছাত্র হিসাবে অবস্থান করেন। তাঁর এই শিক্ষক ছিলেন ইবনে তাইমিয়ার আদর্শের অনুসারী। আব্দুল ওহাব এখানেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহপাঠী হিসাবে পান ভারতবর্ষ থেকে হিজরত করে চলে আসা সিন্ধুর মোহাম্মদ হায়াতকে, যিনি ছিলেন হাদিসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। মোহাম্মদ হায়াত হাম্বলী মজহাবের অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর অনুগত। আবার ভারতবর্ষের নকসবন্দীয়া সুফি তরিকারও অনুসারী ছিলেন। এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ষোড়শ শতকের পুনরুত্থানপন্থী কট্টর সাধক শেখ আহমদ শেরহিন্দি। তবে তা সত্ত্বেও মোহাম্মদ হায়াত ছিলেন ইবনে তাইমিয়ার প্রচণ্ড অনুরাগী। এখানে আব্দুল ওহাবের আরেক বিখ্যাত সহপাঠী ছিলেন দিল্লী থেকে আসা আরেক শিক্ষার্থী শাহ ওয়ালীউল্লাহ। শাহ ওয়ালীউল্লাহর জন্মসালও আব্দুল ওহাবের কাছাকাছি। তিনি ১৭৩০ সালে হজ করতে দিল্লী থেকে মক্কায় গিয়েছিলেন। পরবর্তী চোদ্দ মাস মদিনায় ইবনে সাইফের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ফলে এই দুই বিপ্লবীর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। মোহাম্মদ হায়াত এবং তাঁর পিতা সবাইকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁদের অনুপ্রেরণা এবং ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী ইবনে সাইফের শিক্ষা নিয়ে দুই ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী আব্দুল ওহাব এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ মদিনা থেকে ফিরে গেলেন নিজ নিজ জনপদে।

বর্তমানে সৌদি আরবে যে আব্দুল ওহাবের পরেই সবচেয়ে সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয় ইবনে তাইমিয়ার নাম, তার পেছনের ঐতিহাসিক কারণ লুকিয়ে রয়েছে এখানেই। মদিনা থেকে ইবনে তাইমিয়ার আদর্শে দীক্ষা নিয়ে আব্দুল ওহাব নজদে শুরু করলেন ইসলামের আদিযুগ তথা রাসুল এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন। ভারতবর্ষে একই পথ গ্রহণ করলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে এক যাত্রায় পৃথক ফলের কারণেই সম্ভবত একজনের পরিচিতি ঘটেছে সম্মানীন ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনকারী হিসাবে, আরেকজন ঘৃণিত হয়েছেন ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসাবে।

ভারতবর্ষে শাহ ওয়ালীউল্লাহর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই সেখানকার আলেম-উলামার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কিন্তু নজদে আর কোনো প্রভাবশালী ধর্মীয় আলেম না থাকায় আব্দুল ওহাব প্রায় নিষ্কণ্টক পথে চলতে পেরেছেন। আব্দুল ওহাব ইবনে তাইমিয়াকে গোঁড়া ও আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করলেন। তাঁর মিশনের নাম হলো– আদ দাওয়ালিল তাওহিদ। যারা এই পথ গ্রহণ করল তাদের বলা হতো মুয়াহেদুন। তবে শিগগিরই তাদের সবাই চিহ্নিত করল মৌলবাদী ওহাবি বলে। তারা আব্দুল ওহাবকৃত ব্যাখ্যা ছাড়া কোরআন ও হাদিসের অন্য সকল ব্যাখ্যা বর্জন করল। তাদের মতে ইসলামের পুনরুত্থান সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জিহাদের মাধ্যমে। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাবি ছিল যে প্রকৃত মুসলমান হতে হলে তাকে চারটি শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। প্রথমত তাদের ধর্মীয় নেতা আব্দুল ওহাবের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিনা প্রশ্নে তাঁর সকল শিক্ষা মেনে চলতে হবে। তৃতীয়ত, সকল বিধর্মী, মুরতাদ ও কাফেরের বিরুদ্ধে তাদের নেতার নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ ও সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। চতুর্থত, ঐ সমস্ত বিধর্মী, মুরতাদ ও কাফেরদের প্রতি মনে মনে প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করতে হবে। বিনিময়ে, তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো যে, তারা লাভ করবে আল্লাহ-প্রদত্ত নিরাপত্তা, তাদের সাথীদের ভালোবাসা, এবং যুদ্ধে নিহত হলে লাভ করবে শহীদের মর্যাদা এবং পরকালে বেহেস্তের সুখ-শান্তি।

এই ঘোষণা নজদে খুব ভালোভাবে গৃহীত হয়নি। আব্দুল ওহাব নিজ গ্রাম উহেনাহ-তে চিহ্নিত হলেন ধর্মে বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসাবে, এবং তাঁকে বাধ্য করা হলো গ্রাম ছাড়তে। তিনি তখন চলে গেলেন তাঁর পিতার কাছে হুরেমিলা গ্রামে। সেখানেও তাঁকে বলা হয়েছিল যে আব্দুল ওহাব যদি এখানে বাস করতে চান, তাহলে তার মতাদর্শ প্রচার করা চলবে না। ১৭৪৩ সালে তার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত আব্দুল ওহাব এই শর্ত মেনে নিয়ে সেখানে বসবাস করেছিলেন। এরপরে তাঁকে সেখানকার কাজি হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আব্দুল ওহাব নিজের পুরনো শিক্ষা ভোলেননি। তিনি বিচারে নিজের মতাদর্শ অনুযায়ী রায় দিতে শুরু করেন। এবার লোকজন তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। একবার রাতের আঁধারে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। এর ফলে তিনি আবার হুরেমিলা থেকে পালিয়ে নিজের গ্রামে চলে আসেন।

এরপর আব্দুল ওহাব নজদের নতুন গভর্নরের ফুপুকে বিয়ে করার কারণে তার সুনজরে পড়েন। এবার গভর্নরের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় তিনি ও তাঁর অনুসারীরা কিছু কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করেন। এসবের মধ্যে ছিল বেদআত ও কবরপূজার অভিযোগ তুলে রাসুলের একজন সাহাবির কবর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, এবং ব্যাভিচারের অভিযোগে এক মহিলাকে অর্ধেক শরীর মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা। এবার আবার স্থানীয় গোত্রপতিরা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। ফলে তাকে এরপরে আশ্রয় নিতে হয় দারিয়াতে। এখানে তার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী ছিল।

তার অনুসারীরা আব্দুল ওহাবের দারিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করাকে রাসুলের মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার সাথে তুলনা করে থাকে। এখানে আব্দুল ওহাব স্থানীয় গোত্রপ্রধান মোহাম্মদ ইবনে সউদ-এর সমর্থন লাভ করেন। ইবনে সউদ ছিলেন শক্তিশালী বনু আনিজা গোত্রের লোক, এবং ইতোমধ্যেই এই অঞ্চলে বীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোদ্ধা হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ইবনে সউদ নিজে শুধু যে ওহাবি মতবাদ গ্রহণ করলেন তাই নয়, একই সাথে তিনি তার বড় ছেলে আব্দ আল আজিজ ইবনে সউদ-এর বিয়ে দিলেন আব্দুল ওহাবের কন্যার সাথে। এভাবেই স্থাপিত হলো বর্তমানের সউদ-ওহাব প্রবর্তিত সৌদি ডাইনাস্টির ভিত্তি।

১৭৪৪ সালে মোহাম্মদ ইবনে সউদ এবং আব্দুল ওহাবের মধ্যে একটি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। এই অনুষ্ঠানে প্রথম জন নিলেন 'আমির' উপাধি, আর শেষের জন গ্রহণ করলেন 'ইমাম' উপাধি। কিছুদিনের মধ্যেই ইমামের মর্যাদা আরও বেড়ে তার পদবী হলো 'শাইখ-উল-ইসলাম'। এর ফলে প্রথম জন আরবের একজন আঞ্চলিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলেন, আর দ্বিতীয় জন পেলেন নজদকে দার-উল-ইসলাম ঘোষণা দিয়ে শরিয়া আইন চালুর সুযোগ। আরবরা নিজেদের গোত্রের বাইরের কাউকে তেমন একটা সহ্য করতে পারে না। তাদের কাছে সচরাচর অন্য গোত্র মানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কখনও কখনও শত্রুতা। এছাড়া ভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহ-রীতি না থাকায় গোত্রের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না তেমন একটা। নিজের পুত্রকে আব্দুল ওহাবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে সউদ এই প্রথা ভেঙে ফেললেন। সেই সাথে ছোট ছোট গোত্রগুলির সমন্বয়ে বড় একটি জাতি গঠনের পথও উন্মুক্ত করে দিলেন।

যদিও আব্দুল ওহাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুফি এবং শিয়াদের ওপর দমননীতি চালানো, তবে একই সাথে তিনি সুন্নিদের কয়েকটি উপদলের বিরুদ্ধেও নিজের শক্তি প্রয়োগ করলেন এই অজুহাতে যে তারা ইসলামের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কিছু কিছু সুন্নি এলাকায় শত শত বছর ধরে কিছু নিয়ম পালিত হয়ে আসছিল। যেমন, সিরাতুন্নবী বা রাসুলের জন্মদিন উদযাপন, বিভিন্ন দরবেশ-আউলিয়ার জন্মদিনে ওরশ উদযাপন, কোনো সুফিসাধকের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণে মিনার স্থাপন ইত্যাদি। এসব কর্মকাণ্ডকে বেদআত বলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। হাসিস বা অন্য নেশা তো বটেই, ধূমপানকেও পাপকার্য বলে ঘোষণা করা হলো, নাচে অংশ নেওয়া বা গান শোনা, রেশমি কাপড় পরা, জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা করা, বাজি ধরা এবং তাবিজ-কবচ ধারণ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। দাড়ি কাটা, গোড়ালি ঢাকা কাপড় পরা, আল্লাহর নিরানব্বই নাম জপ করার জন্য তসবিহ ব্যবহার করা অনৈসলামিক বলে ঘোষণা করা হলো। আরও অগ্রসর হয়ে বলা হলো যে, ওহাবি পন্থা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি মানেই হলো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, তার জান-মালের অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্দুল ওহাবের লেখা থেকে জানা যায় যে পার্শ্ববর্তী কোনো গোত্রকে ওহাবি মতবাদ মেনে নিয়ে সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার জন্য তিন বার আহ্বান জানানো হতো। তৃতীয় আহ্বানে সাড়া না দিলে সেই গোত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত মোহাম্মদ ইবনে সউদ-এর সৈন্যরা।

১৭৬৬ সালে মোহাম্মদ ইবনে সউদ আততায়ীর হাতে নিহত হলে তার স্থলাভিষিক্ত হন পুত্র আবদ আল-আজিজ ইবনে সউদ। তার নেতৃত্বে বহাল থাকে পিতার আমলের সমস্ত কার্যক্রম। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সাফল্য পিতাকেও ছাড়িয়ে যায়। ১৭৭৩ সালে সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বি গোত্রকে পরাজিত করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নজদ প্রদেশ ওহাবিদের দখলে আসে। দখলে আসে রিয়াদ শহরও। রিয়াদে স্থাপন করা হয় ওহাবিদের সামরিক সদর দপ্তর।

এই বছরেই সত্তর বৎসর বয়স্ক ইমাম আব্দুল ওহাব বার্ধক্যের কারণে তার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবে এই অবসর তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন কি না সে ব্যাপারে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তবে তার পরে তার কোনো পুত্র বা অনুসারীকে আর ইমামের পদ দেওয়া হয়নি। আমির আবদ আল-আজিজ ইবনে সউদ নিজেই ইমামের পদও গ্রহণ করেন। পরবর্তী দুই দশক তিনি একাই যুগপৎ আমির এবং ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। ১৭৯২ সালে মৃত্যু হয় আব্দুল ওহাবের। তিনি কুড়ি জন বিধবা স্ত্রী এবং আঠারো জন ছেলে-মেয়ে রেখে যান। তার পুত্রদের মধ্যে পাঁচজন পরবর্তীতে ওহাবি নীতি-শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তখন থেকে আব্দুল ওহাবের পরিবারের বড় ছেলেকে রাষ্ট্রের গ্রান্ড মুফতি বা প্রধান বিচারপতির পদ দেওয়া হয়ে থাকে।

১৮০২ সালে ওহাবিরা ইরাকে মহানবী হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) প্রিয় দৌহিত্র ও শিয়াদের অন্যতম প্রধান ইমাম হোসাইনের কবর ধ্বংস করে দেয়। বাঁধানো কবরটি পুরোপুরি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি তুর্কী, পারসি ও আরবদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে তুরস্কের খলিফা এবার ওহাবিদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অগ্রসর হন। কিন্তু এই ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। উপরন্তু ১৮০৪ সালে ওহাবিরা মক্কা এবং মদিনা আক্রমণ করে নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয়। তারা জান্নাতুল বাকি-র মাজার এবং সকল সাহাবার মাজার নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এমনকি তারা মহানবী হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর রওজা মোবারকের একটি অংশ পর্যন্ত ধূলিস্মাৎ করে দেয়। এবার অটোমান সম্রাট পুরোপুরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন ওহাবিদের বিরুদ্ধে। মিসরের গভর্নর মোহাম্মদ আলি পাশা ওহাবিদের পুরোপুরি পরাজিত করেন। পলায়নপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওহাবিদের ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পাশা ঘোষণা করেন যে ওহাবিদের যে কোনো এক জনের কাটা মুণ্ডু হাজির করলে হত্যাকারীকে ছয়টি রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। শোনা যায়, এই ঘোষণার একদিনের মধ্যেই মোহাম্মদ পাশার দপ্তরের সামনে ওহাবিদের কাটা মুণ্ডুর স্তূপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ মনে করেন যে, ওহাবিদের উত্থানের পেছনে ইংরেজদের সক্রিয় সহায়তা ছিল। তুরস্কের খলিফাকে দুর্বল করার জন্যে ইংরেজরা ওহাবিদের কাজে লাগিয়েছিল। ইবনে সউদ-এর বংশধররাই যে বর্তমানে সৌদি আরবের রাজত্বে আসীন এটাও যেমন সত্য, তেমনই সত্য এটাও যে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভে ইংরেজদের সর্বাত্মক সহায়তা ছিল। সৌদি আরবে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। এমনকি সেখানে এখন আমেরিকার সৈন্যদের ঘাঁটি করার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তার প্রতিবাদেই ওসামা বিন লাদেন রাজ পরিবারের সদস্য হয়েও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। জনগণের কোনো সমর্থন যে তাদের পেছনে নেই, তা বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনায় বোঝা যায়। সৌদি রাজতন্ত্র টিকে আছে শুধুমাত্র আমেরিকার সমর্থনেই।

মুসলমানরা যখন পৃথিবীর অন্য জাতিগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে, বিশ্বে ইসলামের আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক-জাগতিক প্রভাব যখন কমে আসছে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যখন একের পর এক ইউরোপীয়দের পদানত হচ্ছে, তখন মুসলমানদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা নিজ জাতির পতনে বেদনা বোধ করবেন এটাও যেমন সত্য, তেমনই সেখান থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধান করবেন, এটাও সত্য। ওহাবিরা এই পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন রাসুলের যুগের সকল ধরনের নিয়মাবলিতে যান্ত্রিক প্রত্যাবর্তনকে। যান্ত্রিকভাবে বা আক্ষরিকভাবে অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যাওয়া যে আদৌ সম্ভব নয়, তা তাদের ধারণাতে আসেনি। এখনও অনেকের ধারণাতে এই বিভ্রান্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সৌদি আরবে শেষ পর্যন্ত ওহাবি আন্দোলন জন্ম দিয়েছে গণধিকৃত রাজতন্ত্রকে। শিব গড়তে গিয়ে গড়া হয়ে গেছে বানর।

অন্যদিকে ভারতবর্ষে ওহাবিদের আন্দোলন বিভিন্ন নামে পরিচালিত হয়েছে। আরবভূমির মতো এখানেও অনেক ধরনের ভুল মতবাদ চালু হয়েছে ওহাবিদের দ্বারা। ভারতবর্ষের জঙ্গি ওহাবি নেতা আহমেদ ব্রেলভি সম্পর্কে তার মুরিদ ইসমাইল দেহলভি ঘোষণা করেন যে, আহমদ ব্রেলভি সরাসরি আল্লাহর কুদরতি হস্ত দ্বারা ফয়েজপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং তার আর নবীর সুন্নত অনুসরণের প্রয়োজন নেই। এছাড়া যে কেউ আহমদ ব্রেলভির মুরিদ হবে– সে চোর, জেনাকারী, হিন্দু, বৌদ্ধ, সুদখোর, মাতাল, দস্যু– যাই হোক না কেন, সে অবশ্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরকালে মুক্তিলাভ করবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জিহাদের নামে বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বালাকোটে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহমেদ ব্রেলভি নিহত হন। বাংলার বারাসতে বাঁশের কেল্লা তৈরি করে হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন মীর নিসার আলী তীতুমীর।

পরবর্তীতে বিভিন্ন নামে নিজেদের বিভক্ত করে ফেলে এই উপমহাদেশের মুসলমান নেতারা। তবে ইজতিহাদের যে ধারা ইবনে তাইমিয়া শুরু করেছিলেন, তার অন্যতম প্রধান বিচ্যুত রূপ দেখা যায় জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদীর হাতে। কোরআন ও ফিকাহ শাস্ত্রের নিজের মতো নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে ইসলামকে একটি সন্ত্রাসী পরিচিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করার মূল কৃতিত্ব আবুল আলা মওদুদী ও তার অনুসারীদের।

AMARBOI.COM

নয়

যোগেন এখন মত্ত অনুকূল ঠাকুরকে নিয়ে। প্রায়ই সে গিয়ে পড়ে থাকে পাবনার পাগলা গারদের পাশে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে। এখনও সে বাড়িতে নেই। তার বউ ইউসুফকে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে ছাড়ে না– সারা জীবনই তো মানুষডা পরিবারের দিকে খিয়াল রাখে নাই। তা পাগলামি করুক ছাগলামি করুক, অ্যাদ্দিন বাড়িত চোখের সামনে থাকিছে, ঠেকায়-বেঠেকায় কাজে-কামে হাত দিছে। এখন তো তাই আর বাড়িমুখেই হবার চায় না। পড়ে থাকে আশ্রমে আশ্রমে। কীভাবে যে আমি ছাওয়াল-পাওয়ালের মুখে দুইবেলা অন্ন তুলে দিব, সেই ভাবনা তার একবারে নাই। এইডা কি একখান কথা ভাইজান!

তার পরেও যোগেনের বউ ইউসুফকে জল না খেয়ে আসতেই দেবে না। লক্ষীপূজায় বানানো নারকেলের নাড়ুর সাথে ঝকঝকে মাজা কাঁসার গ্লাসে ঠাণ্ডা পানি আনা হলো। বিব্রত ইউসুফ জানাল যে সে রোজা রেখেছে। আরও বিব্রত হয়ে বউদি পালিয়ে বাঁচল ইউসুফের সামনে থেকে। তবে বারবার অনুরোধ করল, ইউসুফ যেন পারলে একবার কথা বলে যোগেনের সাথে। অন্তত পরিবারের প্রতি এই রকম অবিচার করা যে তার উচিত হচ্ছে না, এটি ইউসুফ বললে বোধহয় যোগেন শুনবে। সে তো মুখ্যু মেয়েমানুষ। যা বলতে চায়, যোগেন সেগুলিকে পাত্তাই দেয় না। তার জ্ঞান-বুদ্ধি ইদানিং আবার এত বেশি হয়েছে যে বউয়ের যুক্তিকে সে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। একমাত্র ইউসুফের মতো লোক, যার বুদ্ধি-জ্ঞান যোগেনের চাইতে বেশি, সে-ই শুধু পারবে যোগেনকে আবার সংসারমুখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে। কচি বাচ্চাগুলির মুখ চেয়ে ইউসুফ যদি এই কাজটি করে, তবে বউদি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে তার কাছে।

তার কথা শুনতে শুনতে ভাবছিল ইউসুফ। অপ্রচলিত পথে যে হাঁটে, কিংবা বড় কোনো কাজ যে করতে চায়, তার জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয় এবং বেশি বঞ্চিত হতে হয় তার নিকটজনদের। যখন মানুষ সাফল্য অর্জন করে, তখন হয়তো স্বীকৃতির পাশাপাশি কিছু অর্জনেরও ভাগ পায় তার নিকটজনেরা। কিন্তু সাফল্য বা স্বীকৃতি জোটে কয়জনের! একজন সফল চিন্তাবিদের বা সংস্কারকের সাফল্যের সোপান তৈরি করে যায় তার আগের শত শত পথিকৃৎ। কিন্তু তাদের কারও কোনো স্বীকৃতি তো দূরের কথা, লাঞ্ছনা, অবজ্ঞা এবং নির্যাতন ছাড়া হয়তো কিছুই জোটেনি। যোগেনের মতো মানুষদের ভবিতব্য যে এটাই তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এখনই।

তবুও তো কেউ কেউ ভিন্ন পথে হাঁটে। ভিন্ন চিন্তা করে। এই ধরনের মানুষ আছে বলেই তো সমাজটা অগ্রসর হতে পারে। সমাজ মানুষের বাসযোগ্য হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। যারা প্রথাগত চিন্তা এবং জীবনযাপন নিয়ে থাকে, তা দেশের ভিক্ষুক থেকে আমলা-ব্যবসায়ী-অধ্যাপক-রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত, তাদেরকে নেহায়েত সাধারণ স্তরের জন্তু ছাড়া আর কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে না ইউসুফের। গরু-ছাগল যেমন সকালবেলা চরতে বের হয়, সারাদিন খায়, মৈথুন করে, খাবার নিয়ে ও মৈথুন উপভোগ নিয়ে গুঁতোগুঁতি করে আর রাতে এসে খোঁয়াড়ে ঢোকে, পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই এই একইরকম জীবনযাপন করে। তাদের কাছে যোগেনদের মতো মানুষ অসফল হিসাবেই চিহ্নিত। এই সব তথাকথিত সফল মানুষরা কল্পনাও করতে পারবে না যে মানবেতিহাসের চোখে তারা নেহায়েত কীট-পতঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজকে এগিয়ে নিতে এই সব সফল মানুষদের কোনো অবদান তো নেই-ই, বরং বেশিরভাগ সময় এরা সমাজের রথের রশি পেছনে পেছনে টেনে ধরে রাখে।

মনের মধ্যে চিন্তা নিয়ে পথ হাঁটলে এখানে শহরের মতো গাড়িচাপা পড়ার ভয় হয়তো নেই, কিন্তু পাশের অনেক কিছু চোখ এড়িয়ে যায়। সেইভাবে মওলানা আব্দুল খালেককেও দেখতে পায়নি ইউসুফ। কিন্তু তাকে ঠিকই দেখতে পেয়েছে আব্দুল খালেক। খুব মোলায়েম কণ্ঠের 'আসসালামু আলাইকুম' শুনে চটকা ভেঙে মার্কিন কাপড়ের জোব্বা পরা লোকটার দিকে তাকায় ইউসুফ। তাকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাতে দেখে আবার সালাম দেয় আব্দুল খালেক। এবার সালামের উত্তর দিয়ে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ইউসুফ। মনে করার চেষ্টা করে, এই লোকের সাথে তার আগে পরিচয় হয়েছিল কি না। স্মৃতি হাতড়ে কোনো সূত্র না পেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চিত হয় যে এই লোকের সাথে আগে তার কখনোই পরিচয় হয়নি। সে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু জোব্বা পরা মওলানা তার পিছু ছাড়ে না। বলে– আপনি যোগেন দাদার কাছে গিয়েছিলেন তাই না। যোগেন দাদা ঠাকুরের আশ্রমে আছেন। পাবনাতে। এই সপ্তাহে ফিরবেন বলে মনে হয় না।

এবার মওলানার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে বাধ্য হয় ইউসুফ। জিজ্ঞেস করে– আপনি কীভাবে জানলেন? আপনি কি আমাকে চেনেন?

স্মিত হাসে মওলানা। তখন তাকে দেখে বুঝতে পারে ইউসুফ লোকটার বয়স তার চাইতে কিছু কমই হয়তো হবে। মুখে কচি বয়সের আভা এখনও আছে। এবং বেশ সুদর্শন এই তরুণ মওলানা। সচরাচর দাড়ি-টুপিঅলা লোকের চেহারার সৌন্দর্য বোঝা যায় না। তার ওপর, নিজের বদ্ধমূল অবজ্ঞা এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই হয়তো, এইসব মওলানাদের চোখে সবসময় একটা ধূর্তামির ছাপ সে দেখতে পায়। কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করে ইউসুফ, এই তরুণের মুখটিকে যথেষ্ট সৌম্য এবং ধূর্তামির ছাপমুক্ত মনে হচ্ছে। তার প্রশ্নের উত্তর শোনা যায় মওলানার মুখে– যোগেন দাদার কাছে আমিও মাঝে মাঝে আসি। মানুষটা ঈশ্বরচিন্তা করেন। মানুষের ভালোর চিন্তা করেন। তার সাথে কথা বলে শান্তি পাওয়া যায়। আর আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও আমি আপনাকে চিনি। আপনি খন্দকার সাহেবের বড় কুটুম। আপনার বড় বোন খুব ভালো মানুষ। গোটা গাঁয়ের মানুষ তাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে।

লক্ষ্য করে ইউসুফ, মওলানা তার দুলাভাইয়ের কথা তুলল না। সে জিজ্ঞেস করে– আপনি কোথায় থাকেন?

আমি বাঁশহাটা মসজিদে ইমামের চাকরি করি। আমার নাম আব্দুল খালেক।

মনে মনে আবার একটু সচকিত হয় ইউসুফ। লোকটার কথাবার্তা একেবারেই অন্য রকম শোনাচ্ছে। এই ধরনের মোল্লারা সবাই বলে, আমি ইমাম, আমি মুয়াজ্জিন, আমি মাদ্রাসা শিক্ষক। কিন্তু এই লোকটি বলছে 'আমি ইমামের চাকরি করি'। কথাটা কানে লেগে থাকে ইউসুফের। বলে– তা চাকরিই যদি করেন তবে ইমামের চাকরি কেন? অন্য চাকরি করলেই পারেন। আর বেতনও নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়।

একটু যেন ছায়া পড়ে মওলানার স্বতস্ফূর্ত হাসিতে– আমাদের আবার অন্য চাকরি জুটবে কীভাবে! গাঁও-গেরামের মসজিদে নামাজ পাঞ্জেগানা পড়ানো, কিছু বাড়ির ছেলেমেয়েদের আলেফ বে তে সে শিখানো, মানুষ মরলে দোয়া-মিলাদ পড়ানো, আর জিয়াফত যোগার করে করে মাঝে-মধ্যে ভালো-মন্দ কিছু খাওয়া– এইভাবেই তো চলতে হয় আমাদের মতো মানুষদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামবাসে এর মধ্যেই একঘেয়েমি এসে গেছে ইউসুফের। নেহায়েত বুবু ছাড়ছে না বলে তাকে আরও কয়েকটা দিন থাকতেই হবে। কিন্তু বইয়ের মধ্যে মুখগুঁজে আর চর্ব্য-চোষ্য খেয়ে খেয়ে আর কাঁহাতক দিন কাটানো যায়। নিজেকে খুব একটা সামাজিক মনে হয় না তার। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে কথা বলার মতো লোক না পেয়ে সে মনে মনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই মওলানাকে অন্য রকম মানুষ মনে হওয়াতে সে একটু আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে বলে– আপনি যেভাবে বললেন, মনে হলো এই পেশাটি আপনার একেবারেই পছন্দ নয়!

উদাস কণ্ঠে বলে আব্দুল খালেক– পছন্দ হবে কীভাবে বলেন! কোনো সম্মান আছে এই পেশার? তাছাড়া আর করারও তো কিছু নাই। মাদ্রাসায় পড়েছি। বিদ্যাবুদ্ধি বলতে যা বোঝায় তা তো এই-ই। সেই পুঁজি দিয়ে অন্য কিছু তো করা সম্ভব নয়।

তা মাদ্রাসায় পড়তে গেলেন কেন?

এবার আরও কালো ছাপ পড়ে আব্দুল খালেকের চেহারায়– ভাইজান কি জানেন না আমাদের সমাজে মাদ্রাসায় কারা পড়ে?

মাথা ঝাঁকায় ইউসুফ। আব্দুল খালেক নিজেই উত্তর দেয়– গরীবের ছেলে-মেয়েরাই মাদ্রাসায় পড়ে। পড়ে আরও গরীব হয়।

এবার আব্দুল খালেকের সাথে আরও কথা বলার ইচ্ছাটা তীব্র হয়ে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করে– এখন তো গাঁয়ে গাঁয়ে বেশ চায়ের দোকান হয়েছে। এখানে আশ-পাশে চায়ের দোকান আছে?

হাসে আব্দুল খালেক– ভাইজানের খুব চায়ের নেশা?

তা একটু আছে। কিন্তু এখন চায়ের দোকান খুঁজছি নেশার কারণে নয়। আপনার সাথে বসে কথা বলার জন্যে।

বাঁশহাটাতে আমাদের মসজিদের পাশেই চায়ের দোকান আছে। চলেন সেখানে গিয়েই আপনি হয়তো বসতে পারবেন।

সেখানে পৌঁছুতে সময় বেশি লাগে না। মিজানের চায়ের দোকানে বেশি ভিড় নেই। একে রোজার দিন, তার ওপর লোকের হাতে এখন কাজ আছে। ধান কাটার কাজে প্রায় সব পুরুষই এখন ব্যস্ত। বছরের বাকি সময় তাদের বেকার থাকতে হয় প্রায়ই। সেই রকম সময়ে এলে দেখা যাবে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে আছে গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ।

দোকানে এখন অল্প খদ্দের। জনা চারেক লোক বসে বসে গুলতানি মারছে। তবু ভেতরে বসতে ইচ্ছা করে না ইউসুফের। তাদের দু'জনের কথপোকথন অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ শুনুক তা চায় না সে। কিন্তু রোজার কথা মনে পড়ায় ইউসুফ জিভ কাটে। সে কোন আক্কেলে আব্দুল খালেককে নিয়ে এলো চায়ের দোকানে! সে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস বলে– খুব ভুল হয়ে গেছে হুজুর। রোজার কথা আমি একেবারেই ভুলে গেছি।

তাতে কী! ইউসুফকে আশ্বস্ত করে আব্দুল খালেক। আপনি রোজা যদি না রাখেন, তাহলে পর্দার আড়ালে বসে চা খাবেন, তাতে কার কী বলার আছে!

কিন্তু মিজান দিনের বেলা চা বিক্রি করে না। কয়েকদিন আগে ভাতের হোটেল নিয়ে সালিশ-বিচারের পরে সে সতর্ক হয়ে গেছে।

ভেতরে বসবেন?

রোজার দিনে আব্দুল খালেকের মতো মওলানাকে নিয়ে চায়ের দোকানের ভেতরে বসা ঠিক হবে না। লোকটা হাজার হলেও মলজিদের ইমাম। এই ব্যাপারে কথা উঠলে বেকায়দাতে পড়ে যেতে পারে। তাই ইউসুফ মিজানকে বলে– ভাই আমাদেরকে একটা বেঞ্চি দেন। আমরা বাইরে বসে একটু কথা-বার্তা বলি।

বলতেই মিজান বেঞ্চি বের করে দেয় বাইরে নিমগাছের ছায়ায়। বসতে বসতে আবার আগের কথার খেই ধরে ইউসুফ– মাদ্রাসায় শুধু গরীবের ছেলে-মেয়েরাই পড়ে?

মোটামুটি বলতে পারেন তাই-ই।

কিন্তু তা তো হওয়ার কথা নয়। আমাদের দেশের বড় বড় ধার্মিক বুদ্ধিজীবীরা তো বলে যে মাদ্রাসা শিক্ষাই একমাত্র উত্তম শিক্ষা। তাতে যেমন দুনিয়ার সাফল্য পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় আখেরাতের মুক্তি।

ম্লান হাসে আব্দুল খালেক– যারা এইসব কথা বলে, খোঁজ নিয়ে দেখেন তাদের কোনো সন্তান বা আত্মীয়কে তারা মাদ্রাসায় পড়তে পাঠান কি না। দেখবেন কেউ পাঠায় না। যারা ইসলামি দল করে, দেশে ইসলাম কায়েমের কথা বলে, তাদের ছেলে-মেয়েরাও কেউ মাদ্রাসায় পড়ে না। এমনকি যারা মাদ্রাসার উঁচু দরের শিক্ষক, মানে ওস্তাদ এবং প্রিন্সিপ্যাল, তাদের ছেলেমেয়েরাও কেউ মাদ্রাসায় পড়ে না। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় পীর আছে না! তাদের মুরিদের মধ্যে লাখপতি কোটিপতি অনেক। সেই পীররাও যে মাদ্রাসা বানান, তাতে সেই পীরদের ছেলে-মেয়েরাই পড়ে না। যেহেতু শুধুমাত্র পীরালি ব্যবসাটা বজায় রাখতে হলে পরিবারের একটি ছেলেকে পরবর্তীতে গদীনশীন করতে হবে, তাই সন্তানদের মধ্য থেকে একজনকে পীরসাহেব ইসলামি লাইনে শিক্ষা নেওয়াতে বাধ্য হন।

কথাগুলি ইউসুফের কাছে নতুন নয়। নতুন হচ্ছে, এই কথাগুলি এমন একজন মানুষের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যাদেরকে আধুনিকতার সবচেয়ে বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরায় বলে মনে করা হয়। তার মানে মোল্লা সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিশ্চয়ই কিছু মানুষ আছে, যারা কাঠমোল্লা আর ধর্ম ব্যবসায়ীদের মতো দৃষ্টিতে ধর্মকে না দেখে মানবিক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে।

আব্দুল খালেককে আরেকটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা হয় ইউসুফের। জিজ্ঞেস করে– আপনি যোগেনের সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলতে যান? শুনেছি যোগেন নাকি সবার জন্য একটা ধর্মের কথা বলে।

এবার যে কথা বলে আব্দুল খালেক তা শুনে রীতিমতো চমকে ওঠে ইউসুফ– ধর্ম তো একটাই।

একটাই ধর্ম মানে?

মানে ধর্ম তো একটাই। একটাই ধর্ম যুগে যুগে বিভিন্ন নবীর কাছে পাঠানো হয়েছে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

তাহলে যে পৃথিবীতে এত এত ধর্ম!

এগুলি না বোঝার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আর বিভেদ তৈরি করে রাখলে যাদের লাভ, তারা বিভেদ তৈরি করে রেখেছে। তাদের কাছে দুনিয়ার মানুষ জিম্মি।

মিজান এই সময় এগিয়ে আসে। হাত কচলাতে কচলাতে বলে– রোজার দিন, আপনাগেরে চা খাওয়াবার পারলাম না। মগরেবের নামাজের পরে আসলে আমি চা খাওয়াতে পারব।

হেসে উঠল আব্দুল খালেক– ভালো ব্যবসায়ী তো ভাই আপনি। সন্ধ্যার খদ্দের দিনের বেলাতেই ঠিক করে রাখছেন।

মিজান মুখ কাঁচুমাচু করে বলে– ব্যবসার কথা না। আপনাগের মতোন মান্যিগণ্যি মানুষ আমার দোকানে পায়ের ধূলা দিলে সেইডাই বড় কথা। দাম নিয়া চিন্তা নাই। আপনেগেরে এক কাপ চা বিনা দামে খাওয়ালে আমার রুজিত টান পড়বি না। আর খন্দকার সায়েবের বড় কুটুম তো আমাগের এই তল্লাটের সক্কলের মেহমান। তারে এক কাপ চা খাওয়াতে পারা আমাগের জন্যে ভাগ্যের কথা।

ঠিক আছে, আমি কবুল করলাম আপনার দাওয়াত। জানেনই তো মোল্লা মানুষ মাঙনা পেলে কিছুই খেতে অরাজি হয় না।

একথায় জিভ কাটে মিজান। আরও কিছু বলতে চায় সে। কিন্তু আবার নিজেদের আলাপে ফিরে আসে ইউসুফ এবং আব্দুল খালেক।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করে– তা আজ আপনি পালপাড়ায় গিয়েছিলেন কেন? যোগেন যে এখন বাড়িতে নেই তা তো আপনি জানতেনই।

এই গিয়েছিলাম একটু তার পরিবারের খোঁজখবর নিতে আরকি। আমার তো অন্য কোনো সাহায্য করার ক্ষমতা নাই, তাই তার বউ-বাচ্চাদের একটু সান্ত্বনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া শুধু। তাছাড়া ঐ পাড়াতে যেতে আমার খুব ভালো লাগে। ওরা সবাই এক-একজন শিল্পী জানেন! ওদের মাটির হাঁড়ি-পাতিল-সরা-জালা সব তো আছেই। তাছাড়া ছোটদের জন্যে ওরা সস্তায় অনেক ধরনের মাটির খেলনা তৈরি করে। কত রকম জীবজন্তু বানায় ওরা! ছোট ছোট। কিন্তু দেখলে মনে হবে একবারে জ্যান্ত। খুব সুন্দর লাগে ওদের এই কাজ করা দেখতে।

হাসে ইউসুফ। বলে– আপনার তো এসবের বিপক্ষে থাকার কথা। এইসব পাপের কাজ নয়? আমাদের ধর্মে এইসব নিষিদ্ধ নয়?

কেউ কেউ বলে যে নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার কাছে তা মনে হয় না। সুন্দর জিনিস বানানো হচ্ছে। তা দেখে মানুষ আরও বেশি করে বুঝতে পারছে যে আল্লার সৃষ্টি কত সুন্দর। ওরা তো আল্লার মূর্তি বানাচ্ছে না। এইসব বানানো নিষিদ্ধ হতে যাবে কেন!

একটু থামে আব্দুল খালেক। তারপর আবার স্বভাবসুলভ নিচুকণ্ঠে বলতে শুরু করে– ওহাবি আর ফারায়েজিরা আমাদের দেশের গ্রামের মানুষদের জীবন থেকে আনন্দ-উৎসব নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে ইসলামের নামে। ওহাবিদের শিক্ষায় আমরা মোল্লারা কম-বেশি সবাই শিক্ষিত। ধরেন একসময় ওহাবি মোল্লাদের তৎপরতায় গ্রামে গ্রামে অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের পূজাপার্বনের আনন্দে, মেলাখেলায়, ব্রতের উৎসবে মুসলমানদের যোগ দেওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, মেলা, কুস্তি, বলীখেলা, এমনকি পুঁথিপাঠকেও হারাম বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। ফলে কী হয়েছিল? গ্রামগুলো হয়ে উঠেছিল আনন্দহীন শ্মশান। যেখানে আনন্দ না থাকে, সেখানে মানুষের কাজের উৎসাহ কি থাকতে পারে ভাইজান?

দশ

আজকের দিনটাকে ইউসুফের কাছে খুব সফল একটা দিন বলে মনে হচ্ছে। আব্দুল খালেকের মতো একজন মানুষের খোঁজ পেয়ে যাওয়া সত্যিসত্যিই আনন্দের।

রাতের খাবারের পরে হাঁটার নাম করে সিগারেট খেতে বেরিয়েছিল ইউসুফ। মজিদ তার কাছে ঘুরঘুর করার চেষ্টা করেছে কিছুক্ষণ। টাউনে তার জন্য কাজ জুটিয়ে দেওয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছে বারবার। তাকে আব্দুল খালেকের কথা জিজ্ঞেস করলে মজিদ বলেছে, এই এলাকার অন্য মোল্লারা আব্দুল খালেককে দেখতে পারে না। আব্দুল খালেক কখনও কাউকে নামাজ পড়ার জন্য জোড়াজুড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে না। মোল্লারা বলে এই কারণে আব্দুল খালেক সবচেয়ে বড় গাফেল। কারণ মানুষকে নামাজ পড়তে ডাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তবলিগ। এবং গ্রামের যে কোনো মসজিদের ইমামের প্রধান কাজ হচ্ছে পাঞ্জেগানা নামাজ এবং শরিয়তের পাবন্দি করার জন্য মানুষকে নিরন্তর তাগাদা দেওয়া, দরকার হলে নামাজের কথা বলতে বলতে তার কানের পোকা বের করে ফেলা যাতে সে এই তাগাদার হাত থেকে বাঁচার জন্য হলেও নামাজ পড়তে শুরু করে। একবার শুরু করলে তার অন্তরে নামাজের জন্য ভালোবাসা ঠিকই পয়দা হয়ে যাবে, পয়দা হয়ে যাবে আল্লার প্রতি ভীতিও এবং সে আর তখন নামাজ ছাড়বে না। কিন্তু আব্দুল খালেক এই কাজে গাফিলতি করে। মজিদ বলে– আমাগের মজ্জিদের ইমাম তো তার নামই শুনবার পারে না। কিন্তু আব্দুল খালেককে এই তল্লাটের সব মানুষ খুব ভালোবাসে বলে প্রকাশ্যে কিছু বলবার সাহস পায় না।

মজিদকে বিদায় করে ঘরে ফিরে আসে ইউসুফ। আব্দুল খালেক কি এই চিন্তাধারা নিজে নিজে আয়ত্ত করেছে না কি অনুসন্ধানী পাঠকের মতো বই-পুস্তক পড়েছে? আমাদের দেশের জবরদস্ত বুদ্ধিজীবীরা যেসব কথা উচ্চারণের সাহস পান না, হয়তো বা তারা জানেনও না, আব্দুল খালেক অম্লানবদনে সেসব কথা বলে যেতে পারে।

ইসলামে চিত্রকলা, সঙ্গীত, নাটক– এইসব হারাম কি না, তা নিয়ে অনেক অনেক বছর ধরে বাহাস চলেছে আমাদের দেশেই। প্রথম দিকের বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম এবং ধর্মসংস্কারকে নিজেদের বড় একটি কাজ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা নিজেরা ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করতেন। কোরআন, হাদিস, ফিকাহ শাস্ত্র, ইসলামের ইতিহাস তাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। সেই কারণেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কাঠমোল্লাদের বিরুদ্ধে কোরআনের ভাষাতেই কথা বলা। যারা সমাজকে পেছনে টেনে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি কোরআন-হাদিস-ফিকাহর জ্ঞানকেও কাজে লাগাতে হবে, এটি তাঁরা পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন।

খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন– 'যে গীত রচনা করতে পারে, তাকে তা করতে দেওয়া হবে না, যে গাইতে জানে তাকে গাইতে দেওয়া হবে না, যে চিত্র আঁকতে পারে তাকে চিত্র আঁকতে দেওয়া হবে না, যে অভিনয় করতে জানে তাকে সে শক্তির বিকাশ করতে দেওয়া হবে না– পদে পদে বাধা বিপত্তি। ফল এই হয়েছে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে হাসি ও আনন্দ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহিত্য শিল্প বিকাশ অসম্ভব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে বাধা সৃষ্টি করলে যে সমাজে যৌথ অবদমনের সৃষ্টি হয়, এবং তা যে সমাজকে বিকৃতির পথে নিয়ে যায়, এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এস. ওয়াজেদ আলী– 'গান-বাজনা, তাস-দাবা প্রভৃতি নিরীহ খেলা মানুষকে অনেক পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, অবসর সময়কে আনন্দে কাটাতে সাহায্য করে...। এই জন্য প্রত্যেক সভ্য সমাজে এই জিনিসের বহুল প্রচার দেখা যায়। আমাদের নির্ব্বোধ মোল্লা-মৌলভীরা কিন্তু এই সবের বিরুদ্ধে এমন কড়া হুকুম জারি করে রেখেছেন যে, এই নির্দোষ আমোদ-প্রমোদগুলি সমাজ থেকে লোপ পেতে বসেছে আর ফলও ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ...সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি অনুশীলনের অভাবে লোপ পায়, আর কলহের প্রবৃত্তি নিত্য নতুন আহার পেয়ে এত সবল হয়ে ওঠে যে, শেষে সে আর সকল প্রবৃত্তিকে গ্রাস করে বসে। ঝগড়াই তখন সমাজের অবসর যাপনের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়।'

মওলানা আকরম খাঁ অনেক ক্ষেত্রেই গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছেন। সেই তিনিও বলেছিলেন– 'এছলামে সকল প্রকার সঙ্গীত সার্বোতভাবে নিষিদ্ধ এই দাবী যাঁহারা করিবেন তাঁহাদিগকেও ঐ প্রকারের কোরআনের আয়াত বা হযরতের হাদীস উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টভাবে নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করিতে হইবে। আমরা দাবী করিয়া বলিতেছি– ত্রিশ পারা কোরআনের মধ্যে এইরূপ একটি আয়াতও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাতে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হযরত রসুলে করিম সঙ্গীতমাত্রকেই নিষিদ্ধ বা নাজাএজ বলিয়া আদেশ প্রমাণ করিয়াছেন– এইরূপ একটিও ছহী হাদীস আজ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।'

আরেকজন কবি, যিনি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, সেই গোলাম মোস্তফা 'ইসলাম ও সঙ্গীত' নিবন্ধে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে মুসলমানদের অবদান নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছিলেন অত্যন্ত গর্বের সাথে। একই সাথে তাঁর লেখায় উঠে এসেছিল সঙ্গীত সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা। গোলাম মোস্তফার মতে হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর সময় এবং তাঁর পরে আরবে সঙ্গীতের বহুল চর্চা ছিল। মহানবী নির্দোষ ও শুদ্ধ সঙ্গীতের বিরোধী ছিলেন না। হজরত আলী ও মুয়াবিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করতেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি– এই চার বিভাগের মধ্যে একমাত্র ধ্রুপদ ছাড়া বাকি তিনটিরই স্রষ্টা ছিলেন মুসলমান সঙ্গীতকারবৃন্দ। আমির খসরু ছিলেন খেয়ালের স্রষ্টা। মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞদের এক বিরাট তালিকা তুলে দিয়েছেন গোলাম মোস্তফা তাঁর প্রবন্ধে। তানসেন, ধোঁধি খাঁ, সুরুজ খাঁ, চাঁদ খাঁ, শোভন খাঁ, ওশারী, হমদম, মৌলাদাদ, ইলিয়াস, গোলাম নবী, সনদ, কদর, সদারঙ্গা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশাল খাঁ, নবাব ওয়াজেদ আলীসহ পরের প্রজন্মের আলাবন্দে খাঁ, ফৈজ খাঁ, নাসিরুদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, জমিরুদ্দিন খাঁ প্রভৃতি সঙ্গীত-মনীষাকে তিনি মুসলমানদের গর্ব বলে উল্লেখ করেছেন।

ছবি আঁকা বা চিত্রকলাতে মোগলদের পৃষ্ঠপোষকতা কিংদন্তির খ্যাতি অর্জন করেছে। গোঁড়া বাদশাহ আলমগীরের সময় ছাড়া নবাব সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত সবাই চিত্রকলার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে বেদআতের নামে চিত্রকলাকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কীভাবে তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের স্মৃতিচারণে– '১৯১৮ সালে সওগাতের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই আমি শিল্পীর আঁকা ছবি কার্টুন ঐতিহাসিক পুরুষ ও মহিলাদের ছবি ছাপানোর ব্যবস্থা চালু করি। আমাদের সমাজে তখন কোন চিত্রশিল্পী ছিলেন না বলে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা এক রঙা ও বহু রঙা ছবি সওগাতে মুদ্রণ শুরু করি। সেই সময় প্রতিক্রিয়াশীল দলের লোকেরা ছবি ছাপানোর জন্য আমার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এমনকি আমাকে মুসলমান বলতেও নারাজ হলেন। মহিলাদের ছবি ছাপানোর জন্য আমার জীবনের ওপরও হুমকি দেওয়া হয়েছিল।'

মওলানা আকরম খাঁর শিক্ষক ও সেই সময়ের প্রসিদ্ধ আলেম মওলানা নেয়ামতউল্লাহ তদানীন্তন চিন্তাবিদ কংগ্রেসনেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদের 'আল হেলাল' পত্রিকায় মানুষের ছবি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন– 'শুনিয়াছিলাম মওলানা আবুল কালাম আজাদ একজন জবরদস্ত আলেম, তবে তাহার পত্রিকায় মানুষের তছবির ছাপা হইল কেন?'

তবে তাঁর শিষ্য মওলানা আকরম খাঁ কিন্তু পরবর্তীতে হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রমাণের সাহায্যে ঘোষণা করেছিলেন যে চিত্রকলা অবশ্যই ইসলামসম্মত। তিনি প্রখ্যাত মুফতি আবদুহ, আল্লামা রশীদ রেজাসহ মিশর, সিরিয়া, ত্রিপোলির বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমের বক্তব্য উদ্ধৃত করে অভিমত প্রকাশ করেন যে ছবি আঁকা, ছবি ছাপা, ফটো তোলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। পৌত্তলিকতা বা পূজার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে মূর্তি বা ভাস্কর্য গড়াও পাপ নয়। তিনি ছহি হাদিস এবং কিছু সূত্র উল্লেখ করে দেখান যে–ক. সকল প্রকার ছবি ও মূর্তির ব্যবহার সাধারণভাবে হারাম হয় নাই। খ. হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) নিজে জীবজন্তুর চিত্র সম্বলিত কোনো কোনো জিনিসপত্র ব্যবহার করেছিলেন। গ. তাঁর পরিজনবর্গের অনেকেই চিত্রিত পর্দা ও জীবজন্তুর মূর্তি ব্যবহার করতেন। ঘ. হজরত আয়েশা পুতুল ব্যবহার করতেন। ঙ. সাহাবাদের অনেকেই জীবজন্তুর চিত্র অংকিত বস্ত্র ব্যবহার করতেন।

মুসলমানমঙ্গল– দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব প্রমাণ সাপেক্ষে মওলানা আকরম খাঁ লিখেছিলেন– 'সকল শ্রেণীর চিত্র ব্যবহার করাকে এছলাম কোনদিনই হারাম বলিয়া নির্দ্ধারণ করে নাই। বরং রছুলে করিম স্বয়ং ও তাঁহার ছাহাবাগণ, জীবজন্তুর চিত্রাংকিত পর্দ্দা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি– চিত্র বলিয়াই চিত্রকে হারাম করা হয় নাই, উহা হারাম হওয়ার অন্য কিছু গভীর সঙ্গত কারণ আছে। সেই কারণ যেখানে পাওয়া যাইবে, সেখানে জানদার ও বে-জানদার সকল শ্রেণীর চিত্রই হারাম হইবে। আর যেখানে সে কারণ পাওয়া যাইবে না, সেখানে চিত্র ব্যবহার করাও সিদ্ধ বা জাএজ হইবে।'

শেষে তিনি কাঠমোল্লাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করলেন অমোঘ সত্যটি– 'এই সকল মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা বা উলা পাশ করিয়া যে সকল ছাত্র আলেমের বেশে দেশময় সংক্রামক হইয়া পড়িতে লাগিল, ধার্মিক ও দার্শনিক প্রত্যেক দিকেই তাঁহারা সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, নিজেদের শিক্ষা, সভ্যতা ও কালচার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, কোরআন হাদীস শিক্ষার নৈতিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা হইতে তাঁহারা অতি শোচনীয়রূপে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।'

বই থেকে চোখ তুলে একবিংশ শতকের বাস্তবতায় ফিরে এলো ইউসুফ। আমরা এখন কোথায় আছি? আমরা বাঙালি মুসলমানরা?

AMARBOI.COM

এগার

আব্দুল খালেক বিনাপ্রশ্নে ইউসুফের এই কথা মেনে নেয়।

তখন রোদ বেশ কড়াভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে পানিশূন্য চলনবিলের ওপর। অনেক জমি থেকে ধান কাটা শেষ। সেগুলিকে এখন এতই ন্যাড়া এবং বিরান দেখায় যে বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের সাথে সাথে মনটাও কড়কড় করে ওঠে।

আব্দুল খালেক সেই ন্যাড়া মাঠের দিকে তাকিয়ে নিঃস্বের মতো বড় শ্বাস ফেলে বলে– আমাদের মুসলমানদের অবস্থা ঐ খালি মাঠগুলানের মতো ভাইজান। যে যার মতো ফসল-ফায়দা কেটে নিয়ে চলে গেছে। ফেলে রেখে গেছে খালি নিঃস্বতা।

তারা কারা?

কারা আবার! যারা ধর্মকে হাটে-বাজারে বিক্রি করেছে, ইসলামকে সিড়ি হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় গেছে এবং যাচ্ছে। আর তাদের সাহায্য করছে সবচেয়ে বেশি তো ধর্মজানা মোল্লারাই। সেই কারণেই দেখেন না, আল্লার লানত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে বেশি পড়েছে মোল্লাদের উপর। মোল্লা-মৌলভিদের কোনো সম্মান নাই। একটা ফকির-মিসকিনের দিকে মানুষ যতখানি মনোযোগ দিয়ে তাকায়, মোল্লা-ইমামদের দিকে তার চাইতেও তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকায়। ঠিকই আছে। এই রকমই হওয়ার কথা।

আত্মধিক্কারে যেন ফেটে পড়ে আব্দুল খালেক। লোকটার জন্য খারাপ লাগে ইউসুফের। এমন এক পেশাতে লোকটা থাকতে বাধ্য হচ্ছে যার প্রতি তার নিজেরই কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। সে আব্দুল খালেককে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে– সব দোষ মৌলভিশ্রেণীর ঘাড়ে তুলে দিচ্ছেন কেন? এই দেশের শাসনকাজ চালায় কারা? তারা তো কেউ মোল্লা-মৌলভি নয়। তারা তো কেউ মাদ্রাসা থেকে পাশ করা নয়। মন্ত্রী বলেন, আমলা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেন, বড় ব্যবসায়ী বলেন, পুলিশ অফিসার বলেন, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বলেন, জজ-ব্যারিস্টার বলেন, এনজিও-র মালিক-পরিচালক বলেন, মানে যারা দেশ চালায়, তারা সবাই তো তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার মানুষ। বেশিরভাগেরই আবার বিদেশ থেকে ঝুড়িভরে আনা ডিগ্রি আছে। তাদের ডিগ্রি, তাদের বিদ্যা, তাদের শিক্ষা তাদেরকে বড় বড় পদ দিয়েছে, কিন্তু মানুষ করেনি। এইসব অমানুষদের হাতে যুগের পর যুগ পিষ্ট হচ্ছে এই দেশ, আর এই দেশের মানুষ। এরাই তো ধর্মের ধুয়া তুলে বিভিন্ন সময় স্বার্থ উদ্ধার করে নিচ্ছে।

মেনে নেয় বটে আব্দুল খালেক, কিন্তু তার সাথে আরও যোগ করে সে– কিন্তু তাদের ধর্মের নামে ফাঁকি দেওয়ার কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে মানুষের কাছে ফাঁস করে দিতে পারতাম আমরা মোল্লা-মৌলভিরা। কিন্তু আমরা নিজেরাই বিক্রি হয়ে গেছি তাদের কাছে।

এরপরে অনেকক্ষণ কথা বলে না দু'জনের কেউই।

ইউসুফ স্তব্ধতা ভাঙে– শুধু যদি আমাদের পরিচালকরা ভালো হতো... ওরাই তো আমাদের সব সর্বনাশের মূল।

না ভাইজান। এই রাজা-বাদশারা একা কিছুই করতে পারত না যদি মোল্লারা শাস্ত্র নিয়ে তাদের পিছনে না দাঁড়াত।

একটু অবাক হলো ইউসুফ– আপনি কিসের কথা বলছেন?

আমি নিজের স্বার্থে হাদিস বদলে ফেলার কথা বলছি। নিজের স্বার্থে শরিয়ত বদলে ফেলার কথা বলছি।

ইউসুফ হাসে। বলে– এই কথাটা অবশ্য বলাবলি হয় যে অনেক বানোয়াট হাদিস আছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সেনসিটিভ। এই সব নিয়ে আলোচনা করলে আবার মুরতাদ ঘোষণা করে পেছনে লোক লেলিয়ে দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা পারে। এই দেশের মানুষ ইসলাম নিয়ে একপাতা না পড়ুক, ইসলাম সম্পর্কে কিছুই না জানুক, কিংবা নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত কিচ্ছু না করুক, কিন্তু খালি যদি বলা হয় যে অমুকে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছে, তাহলেই তার পেছনে কুত্তার মতো হাজার হাজার লোককে লেলিয়ে দেওয়া যায়। তা আমাদের আপাতত সেই ভয় নাই। আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছি। আমাদের কাছে সঠিক প্রমাণের দলিল আছে। আজ আস্তে আস্তে বললেও একদিন না একদিন এগুলি মানুষ জোরে-শোরে বলবেই। না বললে, এইসব মিথ্যা হাদিসের জাল ছিন্ন না করতে পারলে, ইসলামকে কিছুতেই পুনরায় জিন্দা করা যাবে না। মুসলমানরা কোনোদিনই সম্মানের জায়গাটা আবার উদ্ধার করে নিতে পারবে না।

কিন্তু এখন নাকি আর মিথ্যা হাদিস নাই? সবগুলি যাচাই-বাছাই করে সিয়াহ-সিত্তা নামের ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে সঠিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে?

সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না আব্দুল খালেক। বলে– পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে হলে আপনাকে আর একটু আগে থেকে শুরু করতে হবে। ভাইজান বেয়াদবি নেবেন না! আমি আপনাকে জ্ঞান দিতে যাচ্ছি না। সে যোগ্যতা আমার নাই। আমি শুধু আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এই কথাগুলান আমার বুকে বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে।

বলেন!

নড়েচড়ে বসে আব্দুল খালেক। কণ্ঠ তার কখনোই বেশি উঁচু হয় না। কিন্তু এখন সে এত নিচুস্বরে কথা বলছে যে মনে হচ্ছে সে শুধু নিজের সাথেই সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সবগুলি কথা ভালো করে শোনার জন্য ইউসুফকে তার দিকে আরও বেশি সরে আসতে হয়। একবার ইউসুফের মনে হয় আব্দুল খালেক ভীত নয়তো? কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যায়, আর যাই থাক, অন্তত ভয়ের কোনো চিহ্ন তার মুখে নেই। বরং তাকে একটু বিষাদগ্রস্ত মনে হয় ইউসুফের। সেই মুহূর্তে ইউসুফের আরও একবার উপলব্ধি হয় যে আব্দুল খালেকের মতো লোকেরা যে কোনো জাতিরই সত্যিকারের সম্পদ হতে পারে। কিন্তু এই দেশে এই রকম পরিবেশে এই ধরনের মানুষদের ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

জিজ্ঞেস করছিলেন না, কারা জাল হাদিস বানিয়েছে? একটু বিস্তারিত করে বলি, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবেন।

রাসুলে করীম(সাঃ) এর জীবদ্দশাতেই কোনো কোনো সাহাবি হাদিস লিখে রাখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু মহানবী সাহাবাদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেন যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওহি ছাড়া তাঁর অন্য একটি বাক্যও যেন কেউ লিখে না রাখেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে কেউ যদি ইতোমধ্যেই কিছু হাদিস লিখে রেখে থাকেন, তবে অবিলম্বে সেগুলিকে মুছে ফেলতে হবে। তিনি এই বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন যে তাঁর নামে কেউ যদি মিথ্যা কথা লিখে রাখে বা তাঁর কথার কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংকোচন করে, তবে সে অবশ্যই জাহান্নামি হবে।

তাঁর এই নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে সাহাবারা হাদিস লেখা থেকে বিরত থাকেন।

প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর(রাঃ) নিজে পাঁচশত হাদিসের একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে এসে তিনি নিজেই সেই সংকলনটি বিনষ্ট করে ফেলেছিলেন। কারও কারও মতে তিনি এই সংকলনটি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এই কাজের কারণ হিসাবে মুহাদ্দিস এবং ইতিহাসবিদরা বলেছেন যে, হাদিসগুলি সংকলন করার পর থেকে তিনি এ বিষয়ে কখনোই স্বস্তি লাভ করতে পারেননি। তাঁর মনে অনেক রকম ভয়ের উদয় হতে থাকে। তাঁর সংকলিত হাদিসগুলির মধ্যে একটি বাক্য বা একটি শব্দও যদি মহানবীর মূল বাণী থেকে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তাহলে রাসুলের কঠোর সতর্কবাণী উপেক্ষা করার পাপে তাঁকে অবশ্যই জাহান্নামি হতে হবে। তাঁর মনে আরও একটি ভয় কাজ করছিল যে তাঁর সংকলিত হাদিস গ্রন্থকে সাধারণ মুসলমানরা যদি কোরআনের সমতুল্য মর্যাদা দিয়ে ফেলে, কিংবা অন্য সাহাবিদের বর্ণিত ও সংকলিত হাদিসের চাইতে অধিক মর্যাদা দিতে শুরু করে, তাহলেও তা মুসলমানদের জন্য সুদূরপ্রসারী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর(রাঃ)-এর খেলাফতের সময় সরকারিভাবে বিচ্ছিন্ন হাদিসগুলিকে একত্রিত করার কাজ শুরু হয়েছিল। হজরত ওমর নিজেই এই বিরাট কাজটি সম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়ে অনেক বিচক্ষণ সাহাবির সঙ্গে তিনি একাধিকবার আলোচনা করেছিলেন। বেশিরভাগ সাহাবি তাঁর এই কাজের অনুকূলেই নিজেদের মতামত প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও হজরত ওমর সন্দেহমুক্ত হতে পারেননি। তিনি প্রায় একমাস ধরে গভীর চিন্তা ও ইস্তেখারা করার পরে সিদ্ধান্ত জানালেন এই বলে যে– 'আমি তোমাদের কাছে হাদিস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার কথা ঘোষণা করেছিলাম, একথা তোমরা জানো। কিন্তু পরে আমার মনে হলো যে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবগণও (ইহুদি ও খ্রিস্টান) এমন ভাবেই তাদের নবীর কথা সংকলিত করেছিল। পরে তারা সেগুলিকেই আঁকড়ে ধরল এবং আল্লাহর কেতাব পরিত্যাগ করল। আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর কেতাবের সাথে অন্য কিছুই মিশ্রিত করব না!' এরপরে তিনি হাদিস সংকলিত করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান(রাঃ) অল্প কিছু হাদিস বর্ণনা করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি হাদিস বিষয়ে নিজেকে খুব ওয়াকিবহাল বলে মনে করতেন না। তাঁর নিজের সম্পর্কে নিজের বক্তব্য হচ্ছে– 'রাসুলের সাহাবিদের মধ্যে অধিক সংখ্যক হাদিস-সংরক্ষক আমি নই। তবে শুধু এই কারণেই যে আমি বেশি হাদিস বলা থেকে বিরত থাকি তা নয়। বরং এই কারণে আমি ভয় পাই যে আমি রাসুলকে স্বয়ং বলতে শুনেছি, যে কথা তিনি বলেননি কেউ যদি তাঁর ওপর সেই কথা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আশ্রয় খুঁজে নেয়।'

চতুর্থ খলিফা হজরত আলী(রাঃ) নিজেও হাদিস সংকলনের ব্যাপারে উদ্যোগী হননি। তবে তিনি রাসুলের একটি বাণী বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। রাসুল বলেছিলেন– 'আমার মৃত্যুর পর আমার নামে অসংখ্য মিথ্যা বিষয় প্রচলিত হবে এবং যে কেউ আমার নাম দিয়ে মিথ্যা প্রচার করবে সে দোজখে নিজ আবাস তৈরি করবে।'

এই উক্তিটিও ছহি হাদিস হিসাবে বোখারি, তিরমিজি, মাজাহ, নায়সাবুরী গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

হজরত আলী হাদিস বর্ণনাকারীদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে তারা যারা ন্যক্কারজনক হাদিস বর্ণনা করে রাসুলের নামে চালিয়ে দিয়েছে। মিথ্যা হাদিস যে চালু করা হয়েছিল, একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। এই বিষয়ে একবার পিলা নেতা সাঈদ মুর্তাজার সাথে কয়েকজন সুন্নি আলেমের তর্ক হয়েছিল। সকল সাহাবার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে যেসব হাদিস প্রচলিত আছে সেগুলিকে ঐতিহাসিক প্রমাণসহ জাল বলে উল্লেখ করেছিলেন সাঈদ মুরতাজা। সুন্নি আলেমরা বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, কেউ রাসুলের নাম করে মিথ্যা হাদিস চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তা অসম্ভব। তখন সাঈদ মুরতাজা উপরের হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন। যদি কেউ মনে করে যে এই হাদিসটি সত্য, তাহলে তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে রাসুলের নামে অনেক মিথ্যা হাদিস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যদি কেউ এই হাদিসকে মিথ্যা বলে দাবি করে, তাহলেও বলা যায় যে রাসুলের নামে মিথ্যা হাদিস চালিয়ে দেওয়ার প্রমাণ স্বয়ং এই হাদিসটিই।

যাদের হৃদয় ছিল মোনাফেকিতে পূর্ণ, যারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও ফেৎনা সৃষ্টি করে দুর্বল ইমানসম্পন্ন লোকদের পথভ্রষ্ট করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য দলে ভেড়াতে চেয়েছিল, তারাই রাসুলের নামে মিথ্যা হাদিস রচনা করেছিল। রাসুল বেঁচে থাকার সময়ও এই ধরনের লোক ছিল, এবং তারা মোমেনদের সঙ্গে মিশে থাকত। রাসুলের ইন্তেকালের পরে এই ধরনের লোকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এরা ইসলামের মহান শিক্ষা ও জীবনপ্রণালীতে নানা ধরনের বিকৃতি ঢুকিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। রাসুলের জীবদ্দশায় তারা কিছুটা ভয়ে ভয়ে থাকত, পাছে রাসুল তাদের মোনাফেকি ফাঁস করে দেন। কিন্তু রাসুলের মৃত্যুর পরে তাদের সাহস অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু বিভিন্নভাবে এই রকম মোনাফেকি করার পরেও সাধারণ মুসলমানরা তাদের অবিশ্বাস করত না। কারণ তারা দাবি করত যে তারা রাসুলের সাহাবি, এবং যা কিছু করছে তা হাদিসের হুকুম অনুযায়ীই করছে। এরাই নিজেদের প্রয়োজনমতো মিথ্যা হাদিস বানিয়ে নিত। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে– 'রাসুলের সাহাবাগণ যে কোনো প্রকারের সমালোচনা ও প্রশ্নের উর্ধ্বে; তাদের কোনো কাজের আলোচনা-পর্যালোচনা করা যাবে না, এবং তাদের কাজের তিরস্কার করা যাবে না।'

আমরা সুন্নিরা এই হাদিসকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি। কিন্তু একথা মনে রাখি না যে সাহাবি হলেই সবার মর্যাদা সমান হতে পারে না। যিনি প্রথম দিকে রাসুলের অহ্বানে মুসলমান হয়েছেন, আর যিনি মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পরে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে মুসলমান হয়েছেন, তারা দু'জন সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারেন না। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে যে মুয়াবিয়া খিলাফতকে রাজতন্ত্রে পরিণত করার পরে মিথ্যা হাদিস রচনা করে জনগণকে সংগঠিত করার জন্য একটি সরকারি বিভাগ খুলেছিলেন। এই দপ্তরের কাজ ছিল উমাইয়াদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক হাদিস তৈরি করে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। মুয়াবিয়া তার বিভাগের কর্মকর্তাদের চিঠিতে আদেশ দিয়েছিলেন– 'আমার এই আদেশ পাওয়ামাত্র তোমরা লোকদের বলো যেন তারা সাহাবাগণ ও অন্য খলিফাদের সম্মানসূচক হাদিস তৈরি করে। এবং সাবধানে থেকো যদি কেউ আবু তোরাব (হজরত আলী) সম্পর্কে কোনো হাদিস বলে, তবে তোমরাও অন্য সাহাবি সম্পর্কে অনুরূপ হাদিস তৈরি করো। মনে রেখো, এতে আমি আনন্দিত হবো এবং আমার চক্ষু শীতল হবে। এতে আবু তোরাব ও তার দলের মর্যাদা ক্ষীণ হয়ে পড়বে এবং ওসমান বিশেষভাবে মর্যাদাশীল হবেন।'

এই সমস্ত কারণেই প্রখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞ আবু আবদুল্লাহ ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরাফাহ বলেছিলেন যে– 'সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকাংশ মিথ্যা হাদিস মুয়াবিয়ার সময় রচিত হয়েছিল। এসব বানোয়াট হাদিস দ্বারা তিনি জনগণের কাছে মর্যাদালাভে কৃতকার্য হয়েছিলেন। তার মূল লক্ষ্য ছিল বনু হাশিমকে অমর্যাদাকর ও হেয় করে দেখানো।'

এরপরে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদিস তৈরি করা যেন কিছু মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দুনিয়াদারগণ রাজা-বাদশাহর কাছে মর্যাদা পাওয়া এবং ধন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদ পাওয়ার লোভে হাদিস বানানোকে ব্যবসাতে পরিণত করেছিল। গিয়াস ইবনে আন-নাখাই এবং আবু সাঈদ মাদায়নি– এই দুইজন বকধার্মিক হাদিস বানানোকে নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এই সময় পরিস্থিতি এতদূর খারাপ হয়েছিল যে কাররামিয়াহ ও কতিপয় মুতাসাওয়াফাহ এই মর্মে ফতোয়া পর্যন্ত জারি করেছিল যে– পাপ হতে বিরত রাখার জন্য এবং আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ। এই ফতোয়ার ফলে প্রকাশ্যে যথেচ্ছভাবে হাদিস তৈরি শুরু হয়ে গেল। এই কাজকে তখন আর নৈতিক ও ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী মনে করা হতো না। বরং যাদেরকে বাহ্যিক আচার-আচরণে খুবই পরহেজগার মনে করা হতো, এবং যারা সারাদিন মসজিদে কাটাত; তারাই আবার সারারাত বিভিন্ন বানোয়াট হাদিস লিখে তাদের খাতা ভরে ফেলত। এই ধরনের বানোয়াট হাদিসের সংখ্যা কত তা একটি পরিসংখ্যান থেকেই অনুমান করা সম্ভব। ইমাম বোখারি ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে তিনি মাত্র দুই হাজার সাতশত একষট্টিটি হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম তিন লক্ষ হাদিসের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন মাত্র চার হাজার হাদিস। ইমাম আবু দাউদ পাঁচ লক্ষ সংগৃহীত হাদিসের মধ্যে সঠিক মনে করেছিলেন মাত্র চার হাজার আটশত হাদিস। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল দশ লক্ষ হাদিস থেকে ছহি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন মাত্র তিন হাজার হাদিস।

দ্বিতীয় প্রকারের হাদিস বর্ণনাকারী হলেন তারা, যারা পরিপ্রেক্ষিত বিচার-বিবেচনা না করে শুদ্ধ-অশুদ্ধ যা তাদের জানা ছিল, সেটাই বর্ণনা করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ একটি হাদিসের কথা বলা যেতে পারে। খলিফা ওমর আহত হলে সুহায়েব এসে তাঁর পাশে বসে কাঁদতে শুরু করলেন। হজরত ওমর বললেন– 'হে সুহায়েব তুমি আমার জন্য কাঁদছ অথচ রাসুল বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করলে তার (মৃতব্যক্তির) শাস্তি হয়।'

এরপরে হজরত ওমরের মৃত্যু হলে হজরত আয়েশাকে কাঁদতে দেখে তাকে হজরত ওমরের বর্ণিত হাদিস মনে করিয়ে দেওয়া হলে তিনি বললেন– 'আল্লাহ ওমরকে মাফ করুন। আত্মীয়-স্বজন কাঁদলে মৃতের শাস্তি হয় এমন কথা আল্লাহর নবী বলেননি। খোদ কোরআনেই বলা হয়েছে–" কারও পাপের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না।"(৬:১৬৪)'

তারপর হজরত আয়েশা বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেন যে, একদিন রাসুল একজন ইহুদি মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে তার আত্মীয়-স্বজন কান্নাকাটি করছে। তখন রাসুল বলেছিলেন– 'তার লোকেরা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য কাঁদছে, অথচ কবরে তার শাস্তি চলছে।' রাসুলের কথার অর্থ এই নয় যে আত্মীয়-স্বজনের কান্নার জন্য কবরবাসিনীর আজাব হচ্ছে। বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মুর্দার কৃতকর্মের শাস্তি কমানোর জন্য আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি কোনো কাজে আসছে না।

তৃতীয় প্রকারের হাদিস বর্ণনাকারী সেই মানুষরা যারা রাসুলের কাছে এমন কিছ আইন বা নিয়মের কথা শুনেছিলেন পরবর্তীতে যেগুলি রদ করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনাকারী সেই রদ করার ব্যাপারটি জানতেন না। যেমন–

রাসুল বলেছেন– 'কবর জিয়ারত করতে আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তোমরা তা করতে পারো।'

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে একসময় রাসুল কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। যারা সেই কথাটি শুনেছিলেন, কিন্তু নিষেধ প্রত্যাহারের কথা জানতেন না, তারা সেই নিষেধের হাদিসই প্রচার করে গেছেন। ফলে ইবনে তাইমিয়া তাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি জেনে স্বয়ং রাসুলের রওজা মোবারক জিয়ারত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বসেছিলেন।

চতুর্থ প্রকারের হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন তারা, যারা ন্যায়-নীতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত, এবং যাদের নিজেদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা রয়েছে। তারা হাদিসের উপলক্ষ বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। একই সাথে তারা বাতিলকৃত হাদিস এবং প্রতিস্থাপিত হাদিসের খবরও জানতেন। তারা কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি, মিথ্যা, বানোয়াট ও অতিরঞ্জনের ধার ধারেননি। তারা যা কিছু শুনেছেন, স্মৃতিতে তা অবিকল ধরে রেখেছেন; এবং সামান্যতম পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষা করে মানুষের কাছে বর্ণনা করেছেন। এদের বর্ণিত হাদিসগুলিই মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ এবং কেবলমাত্র এই ধরনের হাদিস অনুসারেই আমাদের আমল করতে হবে।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁফিয়ে উঠেছে আব্দুল খালেক। কথা বলতে তার ক্লান্তি লক্ষ্য করে ঠাট্টা করল ইউসুফ– দূর মিয়া আপনি কিসের মোল্লা! মোল্লারা তো কথা বলতে শুরু করলে থামে না। মাইকে দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা চোঙ্গা ফোঁকার পরে বলে যে আমি এখন মহান আল্লাহর নামে আমার বক্তব্য শুরু করতে যাচ্ছি। আর আপনি এইটুকুতেই ধুঁকতে শুরু করলেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্দুল খালেক হেসে ফেলল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। ইউসুফ জিজ্ঞেস করল– তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে সিহা সিত্তাহ বা ছয়টি হাদিসগ্রন্থের হাদিসগুলি শেষের শ্রেণীর? মানে আমরা সেগুলিকে সঠিক বলে কি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারি?

সেটা মানতে পারলে তো খুশিই হতাম!

তার মানে! এগুলির মধ্যেও সন্দেহের অবকাশ আছে?

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল আব্দুল খালেক– কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রবিদ মনে করছেন যে কিছু ঝামেলা রয়েই গেছে। তবে আজ আর নয়। আল্লাহ চাইলে কাল আমরা আবার বসতে পারব।

বারো

তার সাথে যারা ইসলামের ইতিহাস বা ইসলামিক স্টাডিজে পড়ত, তাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়েছে ইউসুফ। ইসলামের ইতিহাস এত মসৃণ ভাবে লেখা যে সেখান থেকে কারও মনে কোনো রকম প্রশ্ন ওঠার অবকাশ পর্যন্ত নেই। সেখানে সবাই ভালো। মুসলিম শাসক মানেই ভালো। খোলাফায়ে রাশেদিনও ভালো, মুয়াবিয়াও ভালো, ইয়াজিদও ভালো, আব্বাসীয়রাও ভালো, মুতাজিলারাও ভালো, আশারিয়ারাও ভালো। কিন্তু সব রকম মুসলিম শাসন যে এক নয়, সবগুলি যে রাসুলের প্রবর্তিত পথের অনুসারী নয়, এই কথা কোথাও পরিষ্কার ভাবে তো দূরের কথা, আবছা ভাবেও ইঙ্গিত দেওয়া নেই। যে এই ইতিহাস পড়বে, তার মনে হবে ইসলামের ইতিহাস সোনায় বাঁধানো ইতিহাস, সবকিছু ঐশ্বরিক, সবকিছু অলৌকিক মসৃণতার সাথে ঘটেছে। মনে হবে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে কোনোদিন কোনো ভিন্ন মত ছিল না, কোনোদিন কোনো জাগতিক স্বার্থে কেউ ইসলামি শাসন ক্ষমতাকে ব্যবহার করেনি।

হজরত আলী (রাঃ)-এর বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও উপদেশের সংকলন 'নাহ্জ আল-বালাঘা' পড়ার আগ পর্যন্ত ইউসুফের মনে বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না যে খেলাফত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কত রকম বিভক্তিই না তৈরি হয়েছিল! যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে, তাতে মনে করা হয় যে রাসুলের সাহাবি মানেই হলো এক ধরনের অলৌকিক ধারণায় ঘেরা মানুষ। কিন্তু তারাও যে মানুষই ছিলেন, এবং তাদের অনেকেরই যে কামনা-বাসনা ছিল, ক্ষমতার লোভ ছিল, প্রতিপত্তির দিকে নজর ছিল, সেই বিষয়টির দিকে তাকানোর সাহস পর্যন্ত পায়নি ইউসুফ এই বইটা পড়ার আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা কি এখন উচিত? সারাবিশ্বে যখন মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী এবং পিছিয়ে পড়া ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে চাউর করা হচ্ছে, তখন কি এইসব প্রসঙ্গ তুললে মুসলমানরা আরও হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করবে না? তাদের মধ্যে কি উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে না?

আব্দুল খালেক খুব দৃঢ়তার সাথে বলে– এসব এখন মুসলমানদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেই হবে। আমাদের নিজেদের চেহারা আমাদেরকে দেখতে হবে। আমাদের যত গৌরবের ইতিহাস আছে, সেগুলোও যেমন জানতে হবে, সেই রকম গ্লানির ইতিহাসও জানতে হবে।

সিদ্দিক ভাইয়ের কথা মনে পড়ে তখন। একসময় গোলাম আজমের নিরাপত্তা বাহিনীর অন্যতম সদস্য এই মানুষটা এখন দারুণ বীতশ্রদ্ধ মোল্লাতন্ত্রের উপর। জামায়াত তার কাছে এখন নিছক ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দল ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সিদ্দিক ভাই তাকে অনেকবার বলেছে– আপনাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা কোরআনকে এবং ইসলামকে মোল্লাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন বলেই তো সারা পৃথিবীর মুসলমানদের এই দুরবস্থা। ভেতরে ঢুকে দেখেন, ইসলামের নিজস্ব গণতন্ত্র আছে, ইসলামের অন্তর্নিহিত এক অপরূপ সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য দেখতে পাওয়ার শক্তি ইসলাম নিয়ে যারা রাজনীতি করে, তাদের নেই। আপনারা যারা সৎ মানুষ, যাদের আধুনিক শিক্ষা আছে, যারা জ্ঞানের মাধ্যমে মুসলমানদের অধঃপতন এবং উত্তরণের পথ চিহ্নিত করতে চান, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামকে আপনাদের চিন্তাচর্চার প্রধান বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা। নিজেদের সুবিধামতো যারা কোরআনের ব্যাখ্যা করে, তাদের হাত থেকে কোরআনকে কেড়ে নিন। ফিরিয়ে দিন ইসলামের হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্য এবং গৌরব! কারণ আপনারাই পারবেন পাশ্চাত্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে লাগামহীন অপপ্রচার চলছে, ইসলামের তত্ত্বের আলোকে তার যথাযোগ্য উত্তর দিতে। তালেবানরা পারবে না, আল কায়েদারা পারবে না, জামায়াত পারবে না, কিংবা মাদ্রাসাওয়ালারা পারবে না।

আব্দুল খালেক বলে– কী এত ভাবেন ভাইজান! সাধারণ মুসলমানরা দাড়ি-টুপি দেখলেই ভাবে সে খাঁটি মুসলমান, মাদ্রাসার হুজুর দেখলেই ভাবে যে তারাই হচ্ছে ইসলামের জিম্মাদার, আগের জমানার লোকের নাম বললেই ভাবে যে তারা বেহেস্তি। অথচ ভেতরে যে অন্য কিছু আছে তা মানুষকে জানানো জরুরি। অন্ধ ভক্তি থেকে মানুষকে মুক্তি না দিলে, মুসলমানদের ইতিহাসের ফেৎনাগুলি জানিয়ে না দিলে কেউ আলো খুঁজতে বের হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধা যায় না ইউসুফের– কিন্তু হিতে বিপরীত হবে না তো? এই সব জিনিস সামনে আনলে মুসলমানদের শত্রুরা সেগুলিকে ব্যবহার করবে না তো?

হাসল আব্দুল খালেক– ভাইজান আপনে মাঝে মাঝে অবুঝের মতোন কথা বলেন। আপনে কি মনে করেন ইসলামের প্রতিপক্ষরা এইসব বিষয় জানে না? জানে। ওরা খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু আমার মত যদি শুনতে চান তাহলে বলি যে বাইরের শত্রুদের আমার কাছে তত ভয়ংকর মনে হয় না। সে আমেরিকাই হোক আর যে-ই হোক। তাদের বিরুদ্ধে আমরা ঠিকই এক সময় বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারব। কিন্তু সমস্যা বেশি আমাদের ভিতরে। যাদের গায়ে আছে ইসলামের লেবাস। এই সব লোক আর দলগুলি আমাদের কিছুতেই সঠিক রাস্তায় এগুতে দেবে না। বাইরের যুদ্ধের আগে আমাদের তাই এই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে হবে।

তা সে কথা আমাকে বলছেন কেন? আপনাদের মতো ইমামদেরই তো এইসব দায়িত্ব পালন করার কথা।

ম্লান হাসল আব্দুল খালেক– আমাদের মতো ইমামদের দিকে শিক্ষিত মানুষ ঘুরেই তাকাবে না। কথা শোনা তো দূরের কথা। আমাদের কাছ থেকে মানুষ কী জানতে চায়? জানতে চায় নামাজে দাঁড়ানোর সময় দুই পায়ের মধ্যে কতখানি ফাঁক থাকা উচিত? সোবহানাল্লাহ পড়ার সময় তসবিহ ব্যবহার করা ভালো না হাতের আঙুলে গোণা ভালো? কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েজ? বাড়িতে পাঁচজন মেহমান অথচ মুরগি একটা, সেক্ষেত্রে মুরগির কল্লা কাকে দিতে হবে? নিমের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা বেশি সওয়াবের নাকি শুটির ডাল দিয়ে করা বেশি সওয়াবের?

আব্দুল খালেকের বলার ভঙ্গি দেখে হো হো করে হেসে ফেলল ইউসুফ। আব্দুল খালেকের বলা শেষ হয়নি তখনও– হাসবেন না ভাইজান হাসবেন না। সত্যি কথাগুলানই তো আমি বলছি। শিক্ষিত মানুষের কাছে আমাদের দরকার পড়ে কখন? যখন তাদের কেউ মারা যায় তখন ভাড়া করে কোরআন খতম করানোর জন্য, বিয়ের আসরে দোয়া পড়ানোর জন্য, বছরে এক-আধবার বাড়িতে মিলাদ পড়ানোর জন্য। শিক্ষিত মানুষরা কি আমাদের দিকে তাকায় কোনো সময়? তাকায় না ভাইজান। তারা আমাদের হাতে যখন দোয়াপড়ার ভাড়া হিসাবে টাকা গুঁজে দেয়, তখনও কেউ আমাদের মুখের দিকে তাকায় না। সেই মানুষরা ইসলামের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমাদের কাছে শুনতে চাইবে এটা আপনি কীভাবে আশা করেন! দেখেন না তবলিগঅলাদের দেখলেই শিক্ষিত মানুষ পিছন ফিরে দাঁড়ায় যাতে তাদের সাথে কথা বলতে না হয়। কিন্তু শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামের দিকে না আনতে পারলে এই ভেতরের যুদ্ধে সঠিক ইসলাম কোনোদিনই নিজের জোর ফিরে পাবে না। তাহলে বাইরের শক্তির কাছে চিরদিনই সে পদানত হয়ে থাকবে।

আর দলাদলির কথা বলছেন! দলাদলি ছিল না কবে বলেন? শুধু রাসুল যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর বিচক্ষণতা তাঁর মহানুভবতা এবং সর্বব্যাপী প্রভাবের কারণে গোত্রে গোত্রে বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দলাদলি চাপা পড়ে ছিল? রাসুলের মৃত্যুর সাথে সাথেই, এমনকি তাঁর লাশ দাফন করার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল দলাদলি।

তের

খোৎবায়ে শিক্‌শিকিয়াহ-তে হজরত আলী(রাঃ) বলছেন:

'সাবধান! আল্লাহর কসম, আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর) নিজেনিজেই উহা (খেলাফত) পরিধান করে নিয়েছিল। সে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত ছিল যে, খেলাফতের জন্য আমার অবস্থান এমন যেন যাঁতার কেন্দ্রের শলাকা। বন্যার পানি আমা হতে প্রবাহিত হয় এবং পাখি আমা পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে না। আমি খেলাফতের সামনে একটা পর্দা টেনে দিলাম এবং নিজকে উহা হতে নির্লিপ্ত রাখলাম।

অতঃপর আমি প্রবল বেগে আক্রমণ করা অথবা ধৈর্য সহকারে চোখ বুঁজে অন্ধকারের সকল দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। এরই মধ্যে বয়স্কগণ দুর্বল হয়ে পড়ল, যুবকরা বৃদ্ধ হয়ে গেল এবং মোমেনরা চাপের মুখে আমরণ কষ্ট করে কাজ করছিল। আমি দেখলাম এই অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং আমি ধৈর্য ধারণ করলাম যদিও তাদের কর্মকাণ্ড কাঁটার মতো চোখে বিঁধছিল এবং সামগ্রিক অবস্থা শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে পড়েছিল। প্রথম জনের মৃত্যু পর্যন্ত আমার লুণ্ঠিত উত্তরাধিকারের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সে উহা ইবনে খাত্তাবের (ওমর) হাতে তুলে দিয়ে গেল। অতঃপর আমার দিন উটের পিঠে (অতি দুঃখ-কষ্টে) কাটতে লাগল। শুধুমাত্র জাবিরের ভ্রাতা হাইয়ানের সাহচর্যে ক'টা দিন ভালো গেল।

এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, জীবদ্দশায় সে খেলাফত হতে অব্যাহতি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মৃত্যুকালে সে তা অন্য একজনের হাতে তুলে দিয়ে গেল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরা দু'জনেই পরিকল্পিতভাবে একই স্তনের বাঁটগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। এইজন (ওমর) খেলাফতকে একটি শক্ত বেষ্টনীর মধ্যে রাখল যেখানে কথাবার্তা ছিল উদ্ধত এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পর্শ ছিল রূঢ়; অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল এবং তদ্রূপ ওজরও দেখানো হতো। খেলাফতের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিমাত্রই অবাধ্য উটের সওয়ারের মতো হয়ে যেত– লাগাম টেনে ধরলে নাসারন্ধ্র কেটে যায়, আবার টেনে না ধরলে সওয়ার নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহর কসম, ফলত, মানুষ বল্গাহীনতা, ভিন্নরূপীতা, অদৃঢ়তা ও পথভ্রষ্টতায় জড়িয়ে পড়েছিল।

এতদসত্ত্বেও কালের দৈর্ঘ্য আর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তার (ওমর) মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে রইলাম। সে খেলাফতের বিষয়টি একটি দলের হাতে ন্যস্ত করল এবং আমাকেও তাদের একজন মনে করল। হায় আল্লাহ! এই মনোনয়ন বোর্ড নিয়ে আমি কী করব? তাদের প্রথম জনের তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে কি কখনও কোনো সংশয় ছিল যে এখন আমাকে এই সকল লোকের সমপর্যায়ের মনে করা হলো? কিন্তু তারা শান্ত থাকলে আমিও শান্ত থাকতাম এবং তারা উঁচুতে উড়লে আমিও উঁচুতে উড়তাম। তাদের একজন আমার প্রতি হিংসাপরায়ণতার কারণে আমার বিরোধী হয়ে গেল এবং অপর একজন তার বৈবাহিক আত্মীয়তা ও এটা-সেটা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে চলে গেল। ফলে এদের তৃতীয়জন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সাথে তার পিতামহের সন্তানরা (উমাইয়া) দাঁড়িয়ে গেল এবং এমনভাবে আল্লাহর সম্পদ গলাধঃকরণ করতে লাগল যেভাবে বসন্তের বৃক্ষপাতা ক্ষুধার্ত উট গোগ্রাসে গিলতে থাকে। তার ক্রিয়াকলাপ তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেল এবং তার অতিভোজন তাকে অবনত করল।'

হজরত আলীর এই ভাষণ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে রাসুলের মৃত্যুর পরে খেলাফতের দাবি নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছিল। শিয়া বা হজরত আলীর অন্ধ অনুসারীরা যেমন ইতিহাসকে অতিরঞ্জন করেছে, তেমনই সুন্নি ইতিহাসবিদরা ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দিয়ে সত্য গোপন করে রাখতে চেয়েছে।

যখন রাসুলের ওফাত হলো তখন অন্যদের কিছু না জানিয়ে খলিফা নির্বাচনের জন্য আনসাররা সাদ বিন উবাদার নেতৃত্বে বনু সাঈদার মিলনায়তনে সভা আহ্বান করলেন। তখন হজরত আলী তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাসুলের গোসল-জানাজা ইত্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় একজন লোক হজরত আবু বকর ও ওমরের কাছে এসে খবর দিল যে আনসাররা বনু সাঈদার মিলনায়তনে একত্রিত হয়েছে। লোকটি হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে বলল– যদি জনগণের ওপর কর্তৃত্ব চাও তাহলে তাদের কাজ গুরুতর আকার ধারণ করার আগেই তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব নিয়ে নাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই খবর শুনে আবু বকর ও ওমর ছুটে গেলেন বনু সাঈদার মিলনায়তনে। তাদের সঙ্গে গেলেন আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ। সেখানে উপস্থিত হয়ে ওমর কিছু বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দিয়ে হজরত আবু বকর বললেন যে কুরাইশ বংশের লোক ছাড়া কোনো আনসারকে মুসলমানরা খলিফা হিসাবে মেনে নেবে না। তিনি তাই বললেন– মুহাজিরগণ হলো তারা যারা সর্বাগ্রে আল্লাহর ইবাদত করেছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান এনেছিল এবং তারাই রাসুলের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন। এই কারণে শুধু তারাই খেলাফতের যোগ্য। যারা তাদের সাথে দ্বন্দ্ব করবে তারা সীমালংঘনকারী।

হজরত আবু বকরের বক্তব্য শেষ হলে হজরত হুবাব ইবনে মুনজির উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– হে আনসারগণ, তোমাদের হাতের লাগাম অন্যের হাতে তুলে দিয়ো না। জনসাধারণ তোমাদের তত্ত্বাবধানে। তোমরা সম্পদে-সম্মানে-গোত্রে-সংখ্যায় কম নও। যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের ওপর মুহাজিরদের প্রাধান্য থেকে থাকে, তবে অন্য অনেক বিষয়ে তাদের ওপরেও তোমাদের প্রাধান্য রয়েছে। তোমরা তাদেরকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছ। যুদ্ধে তোমরাই ইসলামের বাহুবল, এবং তোমাদের সহায়তায় ইসলাম নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত তোমাদের শহরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে বিভেদ করো না এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করো। যদি মুহাজিরগণ তোমাদের অধিকার স্বীকার না করে তবে তাদের বলে দাও আমাদের মধ্য হতে একজন এবং তাদের মধ্য হতে একজন প্রধান নিয়োগ করতে হবে।

হজরত ওমর এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বললেন– এটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না যে একই সময়ে দুইজন শাসক থাকবে। আল্লাহর কসম, মুসলমানরা তোমাদের মধ্য হতে রাষ্ট্রপ্রধান কখনও মেনে নেবে না, কারণ রাসুলের আবির্ভাব তোমাদের মধ্য হতে হয়নি। নিশ্চয়ই আরবগণ এই যুক্তির থোড়াই পরোয়া করবে যে, খেলাফত সেই ঘরেই যাবে যে ঘরে রাসুল চিরনিদ্রায় শায়িত। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ভিন্নমত পোষণ করে তবে সে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে যুক্তি উত্থাপন করতে পারে। মুহাম্মদ (সাঃ) এর কর্তৃত্ব ও শাসনকার্য সম্পর্কে যে কেউ আমাদের সঙ্গে বিরোধ করবে সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে এবং পাপী বলে গণ্য হবে; ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হজরত ওমরের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হুবাব আবার বললেন– হে আনসারগণ তোমাদের দাবিতে স্থির থাকো। এই লোকটি ও তার সমর্থকদের কথায় কর্ণপাত করো না। তারা তোমাদের অধিকারকে পদদলিত করতে চায়। যদি তারা তোমাদের অধিকারকে মেনে নিতে না চায় তবে তাদেরকে তোমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহর থেকে বের করে দাও এবং তোমরা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করো। খেলাফতের হকদার তোমাদের চেয়ে বেশি কে আর আছে?

হুবারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাকে গালাগালি করতে শুরু করলেন। হুবারের তরফ থেকেও পাল্টা গালিবর্ষণ শুরু হলো। পরিবেশের এই অবনতি দেখে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করার জন্য বললেন– হে আনসার ভ্রাতাগণ, তোমরাই তো সর্বতোপায়ে আমাদের সাহায্য করেছিলে, সমর্থন দিয়েছিলে। এখন কেন তোমরা তোমাদের সেই মনোভাব ও আচরণ পরিত্যাগ করছ?

আনসারদের মধ্যে আবার অন্তর্কোন্দল শুরু হলো। বনু আউস ও বনু খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এতদিন রাসুলের প্রভাবে চাপা পড়েছিল, তা যেন শতগুণে উস্‌কে উঠল। অধিকাংশ আনসার ইতোপূর্বে সাদ ইবনে উবাদার হাতে বায়াত নিতে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন আউস গোত্রের। শুধু খাজরাজ নয়, নিজ গোত্রের মধ্যেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল। এমনকি তাঁর নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও কেউ কেউ চাইছিল না যে সাদের হাতে ক্ষমতা চলে যাক। তখন বশির ইবনে আমর আল খাজরাজি দাঁড়িয়ে বললেন যে– এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা দ্বীনকে সমর্থন করেছিলাম এবং জিহাদে এগিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা এবং তাঁর রাসুলকে মান্য করা। এতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে খেলাফতের ব্যাপারে গোলযোগ সৃষ্টি করা উচিত হবে না। মুহাম্মদ(সাঃ) ছিলেন কুরাইশ বংশের; সেহেতু খেলাফতে তাদের অধিকার বেশি এবং খেলাফতের জন্য তারাই অধিক যোগ্য।

এরপরে আরও কিছু বাদানুবাদের পরে হজরত ওমর হজরত আবু বকরের দিকে ফিরে তার হাত টেনে নিয়ে বায়াত গ্রহণ করলেন।

কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আবু বকরের খলিফা নির্বাচনকে সম্ভব করে তুলেছিল, তা পর্যালোচনা করলে আবার সেই আরবের গোত্রদ্বন্দ্বের কথাই এসে পড়ে। আরবরা অনেক মহৎ কাজ করেছে। বিশ্বজুড়ে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীণ করেছে। কিন্তু একমাত্র রাসুলের জমানা ছাড়া অন্য কোনো সময়ই নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উপরে উঠতে পারেনি। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই হজরত আবু বকরকে প্রথম খলিফা হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। আবু বকর ছিলেন বনু তাইম গোষ্ঠীর মানুষ। কুরাইশদের মধ্যে এই গোত্র কখনোই কোনো দিক দিয়েই প্রাধান্য অর্জন করতে পারেনি। তাই প্রধান প্রধান কুরাইশ গোত্রের মধ্যকার মজ্জাগত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ক্ষমতার লড়াই থেকে বনু তাইম সব সময়ই দূরে থেকেছে। দ্বিতীয়ত মুহাজিররা নিজেদের মধ্যে বিভেদের কারণে আনসারদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে খিলাফত চলে যাওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন। সেই কারণে হজরত আবু বকর ছিলেন শ্রেষ্ঠতম আপোসমূলক প্রার্থী। তৃতীয়ত বিবেচনায় নিতে হবে আনসারদের বনু আউস ও বনু খাজরাজ গোত্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের পারস্পরিক অপছন্দের কথা। সাদ বিন উবাদার প্রতিদ্বন্দ্বি গোত্র তার বদলে একজন মুহাজিরকে খলিফা হিসাবে মেনে নিতে রাজি ছিল। ঐতিহাসিক তাবারি লিখেছেন– ঐ সময় আনসারদের কেউ কেউ বলছিলেন যে, খোদার কসম, যদি খাজরাজরা একবার তোমাদের উপর শাসনক্ষমতা হাতে পায় তাহলে তারা সবসময় তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করে যাবে এবং এতে তোমাদের কোনো অংশীদারিত্ব থাকবে না। সুতরাং ওঠো, আবু বকরের হাতে বায়াত গ্রহণ করো।

তবে এর সাথে হজরত আবু বকরের গ্রহণযোগ্যতার কারণ হিসাবে তাঁর গাম্ভীর্য, বার্ধক্য, রাসুলের সাথে তার ঘনিষ্টতা, মহানবীর মিশনের প্রায় শুরু থেকে ইসলামের জন্য তার মূল্যবান সেবা– ইত্যাদি বিবেচনাও যোগ হয়েছিল।

কিন্তু এই কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে কোনো অর্থেই আবু বকরের খেলাফতলাভ কোনো একটি মুক্ত নির্বাচন কিংবা মুসলমানদের মুক্ত ইচ্ছার ভিত্তিতে হয়নি। এটা ছিল মুহাজিরদের একটি দল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত যা তাড়াহুড়া করে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কাজের প্রধান উদ্যোক্তা হজরত ওমর পরবর্তীতে নিজেই বলেছিলেন– 'আবু বকরের বায়াত গ্রহণ করা দারুণ ভুল হয়েছে; কোনো চিন্তা-ভাবনা (ফালতাহ) ছাড়াই তা করা হয়েছিল। কিন্তু এই রকম ভুল কাজের কুফল থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। সুতরাং যদি কেউ এই রকম ভুল করতে চায় তবে তোমরা তাকে কতল কোরো।'

এই সময় হজরত আলী রাসুলের দাফন-কাফনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বনু সাঈদা বা সকিফার ঘটনা শুনে বললেন যে তারা রাসুলের বংশধারার (সাজারা) যুক্তি দেখিয়ে আনসারদের দাবির মুখে জয়লাভ করেছে অথচ তারা সে গাছের ফল নষ্ট করেছে অর্থাৎ আহলুল বায়েতকে (রাসুলের বংশ) বঞ্চিত করেছে। মুহাজিরগণ সাজারার দাবিতে উচ্চকণ্ঠ, কিন্তু তারা কী করে সেই সাজারার ফলকে উপেক্ষা করল? এটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার যে, আবু বকর সাত স্তর এবং ওমর নয় স্তর উপরে গিয়ে রাসুলের সাজারায় যুক্ত হয়ে তাঁর পরিবারভুক্ত হবার কথা ব্যক্ত করেছে অথচ তারা রাসুলের আপন চাচাতো ভাই এবং জামাতাকে অস্বীকার করেছে।

এরপরে যখন হজরত আলীকে বায়াত গ্রহণের জন্য ডেকে পাঠানো হলো, তিনি সেখানে যেতে অস্বীকার করলেন। ওমর তখন হজরত আবু বকরকে দেরি

মুসলমানমঙ্গল– ডুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার আগেই পদক্ষেপ নিতে বলেন, কারণ আলী বায়াত গ্রহণ না করলে আবু বকরের ক্ষমতা কিছুতেই নিরংকুশ হতে পারবে না। হজরত ওমরের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল এসে হজরত আলীর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। ওমর এই বলে আলীকে হুমকি দিলেন যে আবু বকরের প্রতি এই মুহূর্তে আনুগত্য প্রকাশ না করলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। হজরত আলী বাইরে এসে খেলাফতের জন্য তার দাবির পক্ষে যুক্তিগুলো বলতে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল, তরবারিগুলি খাপমুক্ত হয়ে গেল। আচমকা হজরত ফাতিমা সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে চিৎকার করে বললেন– তোমরা রাসুলুল্লাহর দেহ আমাদের কাছে রেখে আমাদের পরামর্শ ছাড়া আমাদের অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ। আল্লাহকে সামনে রেখে আমি বলছি হয় তোমরা এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও, নয়তো আমি আমার অবিন্যস্ত চুল নিয়েই আল্লাহর কাছে আবেদন জানাতে বাধ্য হবো।

আবু বকরের বাহিনী তখন আলীর বায়াত ছাড়াই চলে যেতে বাধ্য হয়।

চৌদ্দ

এই শুরু। তারপরে যত দিন কেটেছে, সাহাবিদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের বিষবৃক্ষ বাড়তে বাড়তে একদিকে পাতাল পর্যন্ত বিস্তার করেছে শিকড়, অন্যদিকে আকাশ পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে পত্র-পল্লবে।

যতদিন হজরত ফাতিমা (রাঃ) বেঁচে ছিলেন ততদিন, অর্থাৎ প্রায় ছয়মাস, আলীকে আবু বকরের হাতে বায়াত গ্রহণে রাজি করানো যায়নি।

আবু বকরের প্রতি ফাতিমা আরও ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন আবু বকর তাঁর কাছ থেকে ফাদাক কেড়ে নেওয়ায়। ফাদাক ছিল মদিনার কাছে হিজাজের একটি সবুজ উর্বর গ্রাম। এটি শমরুখ নামক দূর্গের দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। ফাদাকের প্রথম মালিক ছিল ইহুদিরা। সপ্তম হিজরিতে এক শান্তিচুক্তির ফলে ফাদাক চলে যায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত দখলে। এই চুক্তির পেছনের কারণ হচ্ছে, খায়বারের যুদ্ধের পরে ইহুদিরা বুঝতে পেরেছিল যে মুসলমানদের সাথে আর কোনো যুদ্ধে তারা এঁটে উঠতে পারবে না। তারা একটি প্রস্তাব দিয়েছিল যে ফাদাক গ্রহণ করে রাসুল যেন ইহুদিদেরকে আর কোনো সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ না করেন। রাসুল তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে ইহুদিদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। এই ফাদাক রাসুলের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হলো। এতে কারও কোনো অংশ ছিল না। কারণ কোনো জিহাদের মাধ্যমে ফাদাক অর্জিত হয়নি। যেহেতু এই সম্পত্তি বিনা যুদ্ধে পাওয়া গেছে তাই এটাকে 'ফায়' বলা হতো, তাই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাসুল একাই এটির মালিক ছিলেন। কোরআনে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ওহি নাজিল হয়েছিল। কোরআনে বলা হয়েছে– "আল্লাহ ইহুদিদের নিকট হতে তাঁর রাসুলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উটে আরোহন করে যুদ্ধ করোনি। আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রাসুলের কর্তৃত্ব দান করেন।" (কোরআন– ৫৯ঃ৬)

কোনো প্রকার যুদ্ধ ছাড়া ফাদাক অর্জিত হয়েছে এ বিষয়ে কোনো ইতিহাসবিদেরই কোনো দ্বিমত নেই। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবও মনে করতেন যে আল্লাহ তাঁর রাসুলকে যা দিয়েছিলেন বনু নজিরের সম্পত্তিও এর অন্তর্গত।

বিশ্বস্ত সূত্রে এটাও সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, রাসুল তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমাকে এই ফাদাক দান করেছিলেন।

তাই আবু বকর ফাদাকের অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় ফাতিমা তার এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। এতে আবু বকর ফাতিমাকে সাক্ষী হাজির করার কথা বললেন। ফাতিমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন হজরত আলী এবং উম্মে আয়মন। উম্মে আয়মন ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্তা ক্রীতদাসী। তিনি ছিলেন উসামা ইবনে জায়েদ ইবনে আল-হারিছের মাতা। রাসুল প্রায়ই বলতেন যে 'আমার মাতার মৃত্যুর পর থেকে উম্মে আয়মনই আমার মাতা।' এছাড়া রাসুল তাকে বেহেস্তবাসীদের একজন বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন।

আবু বকর এই দু'জনের সাক্ষ্য যথেষ্ট নয় বলে আরও সাক্ষী আনতে বললেন। ইমাম হাসান ও হুসাইন সাক্ষ্য দিতে এলে পিতামাতার পক্ষে সন্তানদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার বৈধতা বাতিল করেন আবু বকর। এরপরে রাসুলের গোলাম রাবাহ্‌কে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করলে তাকেও বাতিল করে দেওয়া হয়।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। তা হচ্ছে ফাদাক ছিল হজরত ফাতিমা ও আলীর দখলে। এক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সাক্ষী উপস্থাপন করাটা আদৌ প্রয়োজনীয় ছিল না। কারণ আইন অনুসারে যার দখলে সম্পত্তি আছে তার সাক্ষী উত্থাপনের কোনো দরকার নেই। বরং যে দখলকারীকে উচ্ছেদ করতে চায়, তার দাবির যথার্থতা প্রমাণের জন্যই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কাজেই হজরত ফাতিমার সম্পত্তি দখল করে নেবার জন্য আবু বকর বা সরকার পক্ষেরই সাক্ষী উপস্থিত করা প্রয়োজন ছিল। যেহেতু আবু বকর এমন কোনো প্রমাণ বা সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারেননি, তাই স্বভাবতই রায় যাওয়ার কথা ফাতিমার পক্ষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ হজরত আবু বকরের কাছে অনেকেই এই ধরনের দাবি পেশ করার সাথে সাথে আবু বকর তাদের দাবি মেনে নিয়েছেন। জাবির ইবনে আবদিল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল বলেছিলেন, যখন বাহরাইন থেকে গণিমতের মাল এসে পৌঁছাবে তখন জাবিরকে অমুক অমুক জিনিস দেওয়া হবে। কিন্তু সেই সব মালামাল মদিনায় এসে পৌঁছানোর পূর্বেই রাসুল ইন্তেকাল করেছিলেন। আবু বকরের খেলাফতকালে উক্ত মালামাল মদিনায় এসে পৌঁছালে আবু বকর ঘোষণা করেন যে, রাসুলের ওপর যদি কারও কোনো দাবি-দাওয়া থাকে অথবা রাসুল যদি কাউকে কোনো জিনিস প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি যেন সামনে আসে। তখন জাবির বললেন যে রাসুল আমাকে অমুক অমুক জিনিসগুলি দিতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর তাকে সেগুলি প্রদান করেছিলেন।

কোনো সাক্ষ্য ছাড়াই যেখানে জাবিরকে রাসুলের প্রতিশ্রুত মালামাল দিয়ে দেওয়া হলো, সেখানে স্বয়ং রাসুলের কন্যাকে দুইজন সম্মানীত সাক্ষী উপস্থাপন করা সত্ত্বেও ফাদাক দেওয়া হলো না। একথা তো কেউই বিশ্বাস করবে না যে হজরত ফাতিমা এক টুকরো জমির জন্য রাসুলের নাম করে মিথ্যা বলতে পারেন। তাহলে কেন তাকে এইভাবে বঞ্চিত করা হলো?

কেউ কেউ বলেন যে, আবু বকর একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে, রাসুল বলেছেন– 'আমরা নবীগণের কোনো উত্তরাধিকারী নাই, এবং আমরা যা রেখে যাই তা জাকাত হয়ে যায়।' উল্লেখ্য হজরত আবু বকর ছাড়া রাসুলের এই উক্তিটি আর কারও জানা ছিল না।

এর পরে হজরত ফাতিমা আর কোনোদিন হজরত আবু বকরের সাথে বাক্যালাপ করেননি। এমনকি তিনি মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিলেন যে তার জানাজায় যেন আবু বকর এবং ওমর যোগ দিতে না পারেন। সেই সাথে এটাও বলেছিলেন যে তাকে যেন রাতের আঁধারে কবর দেওয়া হয়, যাতে কেউ জানতে না পারে তার কবর কোথায় অবস্থিত। হজরত ফাতিমার এই দু'টি ইচ্ছাই পূর্ণ করেছিলেন হজরত আলী।

হজরত ফাতিমার মৃত্যুর পরে আলী খলিফা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আবু বকরের বায়াত গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে আর কোনো কর্মকাণ্ডে সামনে দেখা যায়নি। রাসুলের অধীনে ইসলামের স্বার্থে সমস্ত কাজে সব চাইতে সক্রিয় ও উদ্যমী হজরত আলী, সকল জিহাদে সম্মুখ সারির যোদ্ধা হজরত আলী, হঠাৎ করে তার ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে প্রায় বন্দি এক নীরব জীবনে প্রবেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। তিনি তার সকল অনুসারীকে ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। আবু সুফিয়ান তাকে বিদ্রোহের পরামর্শ ও সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও আলী সেকথায় কর্ণপাত করেননি। রাসুলের মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে স্ত্রী ফাতিমার হৃদয় বিদারক মৃত্যুশোকের পাশাপাশি নিশ্চয়ই এই বিবেচনাবোধও তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল যে রাসুলের মৃত্যুর পরে নতুন ইসলামি রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করা দরকার। রাসুলের ওফাতের পরপরই আরবের গোত্রগুলি মদিনার সঙ্গে নিজেদের চুক্তিগুলি অবজ্ঞা করতে শুরু করল। শুরু হলো আবার ইসলাম ত্যাগ করে পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে যাওয়ার হিড়িক, দিকে দিকে দেখা দিল বেশ কয়েকজন ভণ্ড নবী, মদিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল অনেকগুলি বেদুইন গোত্র। সেই কারণেই আরও অনেকের মতো হজরত আলীও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের দাবি ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে সাহায্য করেছেন মুসলমানদের।

পনের

কিন্তু হজরত আলী ভুলতে চাইলেও হজরত আবু বকর, ওমর এবং তাদের সঙ্গীরা ভোলেননি যে আলীকে বা বনু হাশিমকে কিছুতেই খেলাফতে অধিষ্ঠিত হতে দেওয়া চলবে না।

হজরত আবু বকর খুব ভালোভাবেই জানতেন যে সাহাবিদের এক বিপুল অংশ আলীর সমর্থক। তাই তিনি কোনো ভোটাভুটি বা আলোচনার ঝুঁকি নিলেন না। সরাসরি ঘোষণা দিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে খলিফা হবেন হজরত ওমর।

আবার আবু লুলআহ কর্তৃক মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পরে যখন হজরত ওমরের মৃত্যুর আশংকা সৃষ্টি হলো, তখন হজরত আয়েশা একটি বাণী পাঠালেন ওমরের কাছে। তিনি লিখলেন– 'ইসলামি উম্মাহকে নেতাবিহীন অবস্থায় রেখে যাবেন না। একজন খলিফা মনোনয়ন করুন। অন্যথায় আমি অমঙ্গল ও সমস্যার আশঙ্কা করছি।'

হজরত ওমর তখন খেলাফত বিষয়ক একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিতে তিনি আলী ইবনে আবু তালিব, ওসমান ইবনে আফফান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, জুবায়ের ইবনে আওয়ান, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে সদস্য মনোনীত করলেন। তিনি পরামর্শক কমিটিকে ওয়াদাবদ্ধ করালেন যে তার মৃত্যুর তিন দিন পরে এই ছয়জনের মধ্যে একজন খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হবেন অন্য পাঁচজনের মতামত অনুসারে; এবং এই তিনদিন খেলাফতের কাজ চালিয়ে নেবেন সুহাইব। ছয়জনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা জানার পরে লোকেরা হজরত ওমরকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই ছয়জনের সম্পর্কে তার নিজের মতামত কী। ওমর প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে– সাদ রূঢ় মেজাজের ও উগ্র মস্তিষ্কের লোক; আবদুর রহমান ইসলামি উম্মাহর ফেরাউন; জুবায়ের তার স্বার্থ ঠিক থাকলে পূর্ণ ইমানদার, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটলে বেইমান হয়ে পড়েন; তালহা অহংকারী ও উদ্ধত প্রকৃতির, তাকে খলিফা নিয়োগ করলে তিনি খেলাফতের আংটি তার স্ত্রীর আঙুলে পড়িয়ে দেবেন; ওসমান তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বাইরে আর কিছুই দেখতে পান না; আলী খেলাফতের লাভের ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহী হলেও তাকেই আমার মনে হয় খেলাফত চালানোর যোগ্য।

ব্যক্তিগতভাবে এমন মূল্যায়ন সত্ত্বেও হজরত ওমর এই কমিটিকে বহাল রাখেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্তত আলী যেন এবারও খলিফা হতে না পারেন। সেভাবেই তিনি এই ছয়জনের কমিটি ও তার কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তৎকালীন মদিনার রাজনীতির প্রতি যার সামান্যতম জ্ঞানও আছে, সে-ই বুঝতে পারবে যে পরামর্শক কমিটি গঠন ও তার কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট করে দেওয়ার মধ্যেই হজরত ওসমানের জয়ের সকল উপাদান নিহিত ছিল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ ছিলেন ওসমানের ভগ্নিপতি; সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আবদুর রহমানের আত্মীয় এবং আলীর প্রতি প্রচণ্ড ঈর্ষাপরায়ণ। তালহা ছিলেন তায়মী গোত্রের, এবং একই ভাবে আলী বা বনু হাশিমের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। এমতাবস্থায় জুবায়ের যদি আলীর পক্ষে ভোট দেনও, তবু তার একটি ভোট হজরত ওসমানের জয়ের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আর তালহা যদি কোনো কারণে আলীর পক্ষে ভোট প্রদান করেন, তাহলেও আলী খলিফা হতে পারবেন না। কারণ হজরত ওমর সুকৌশলে এই রকমই কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কার্যপ্রণালী ছিল এই রকম–

যদি দুইজন সদস্য একজন প্রার্থীর পক্ষে যায় এবং অপর দুইজন সদস্য অন্য প্রার্থীর পক্ষে যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মধ্যস্থতা করবেন। আবদুল্লাহ যে পক্ষকে নির্দেশ দেবেন সেই পক্ষ খলিফা নিয়োগ করবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রায় যদি তারা মেনে না নেন তবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ যার পক্ষে থাকবেন, আবদুল্লাহ তার পক্ষ সমর্থন করবেন। অপর পক্ষ এই রায় অমান্য করলে তাদের মাথা কেটে হত্যা করা হবে।

এখানে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রায়ের কোনো অর্থ হয় না। কারণ আবদুর রহমান ইবনে আওফ যে পক্ষে থাকবেন, আবদুল্লাহকে সেই পক্ষে রায় দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে হজরত আলী তার চাচা আব্বাসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন যে ওসমান খলিফা হতে যাচ্ছেন, কারণ ওমর সেই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে গেছেন।

হজরত ওমরের মৃত্যুর তিন দিন পরে হজরত আয়েশার ঘরে নির্বাচনী সভা হয়েছিল। সভা চলাকালে আবু তালহা আল আনসারীর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন লোক উন্মুক্ত তরবারি হাতে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। তালহা সভার কাজ শুরু করলেন এবং সবাইকে সাক্ষী রেখে নিজের ভোট ওসমানের পক্ষে প্রদান করলেন। এতে জুবায়েরের আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগল, কারণ তার মা সাফিয়াহ ছিলেন আবদুল মোত্তালিবের কন্যা এবং আলীর ফুপু। তাই তিনি আলীর পক্ষে ভোট দিলেন। এরপর সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস তার ভোট আবদুর রহমানের পক্ষে প্রদান করলেন। এতে তিনজনের প্রত্যেকেই এক ভোট করে পেয়ে প্রত্যেকের সমান হলেন। সুচতুর আবদুর রহমান তখন বললেন– যদি আলী এবং ওসমান তাদের দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা হিসাবে মনোনয়ন দান করার ক্ষমতা আমাকে অর্পণ করেন তাহলে আমি আমার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেবো। অথবা তাদের দুইজনের যে কোনো একজন নিজের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে খলিফা মনোনয়নে অংশ নিতে পারেন।

আবদুর রহমানের এই ফাঁদ আলীকে সবদিক থেকেই জড়িয়ে ফেলল। কারণ এই প্রস্তাব অনুসারে হয় তাকে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে খলিফা মনোনয়নে অংশগ্রহণ করতে হবে; নতুবা আবদুর রহমানকে সেই ক্ষমতা দিতে হবে যার ফলে আবদুর রহমান যা খুশি তা-ই করতে পারেন। নিজের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিয়ে হজরত ওসমান কিংবা আবদুর রহমানকে খলিফা হিসাবে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কারণ প্রথম থেকেই বঞ্চিত হয়েও তিনি কখনোই তার দাবি ছেড়ে নড়েননি। কাজেই এবারও তিনি নিজের দাবি আঁকড়ে ধরে রইলেন। তা নাহলে তার মনোনীত খলিফা কর্তৃক ইসলামি উম্মাহর ক্ষতির জন্য তিনিও দায়ী হতেন। সুতরাং আবদুর রহমান নিজেই তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে খলিফা মনোনয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন এবং প্রথমেই আলীকে বললেন– আপনি যদি কোরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি পূর্ববর্তী দুই খলিফার কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতি মেনে চলার অঙ্গীকার করেন, তাহলে আমি আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করব।

আলী উত্তর দিলেন– আমি কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে আমার বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করব।

অর্থাৎ হজরত আলী পূর্ববর্তী দুই খলিফার রীতিনীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে রাজি হলেন না। তাকে পর পর তিনবার এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। তিনবারই তিনি এই একই উত্তর দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপরে হজরত ওসমানকে এই কলা বলা হলে তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন এবং ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসাবে আবদুর রহমান তাকে মনোনয়ন দিলেন।

অর্থাৎ তিনবার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে আলী বঞ্চিত হলেন খেলাফত থেকে।

ষোল

হজরত ওসমানের অনেক সদগুণ ছিল। তিনি নিজে যেমন ধনী ছিলেন তেমনই অকাতরে ইসলামের জন্য অর্থ খরচও করতেন। তিনি মুসলমানদের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন যে কাজটির জন্য তা হলো প্রথম কোরআনের লিখিত সংকলন তৈরি করা। কিন্তু হজরত ওমর যা বলেছিলেন, ওসমান সম্পর্কে সেই কথাটিও নিখাদ সত্য ছিল। হজরত ওসমান হাতে ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন অর্থাৎ উমাইয়ারা ইসলামি জগতের সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসল। ফলে হজরত ওসমানের সকল সদগুণ ঢেকে গিয়ে তার দোষগুলোই বার বার চিহ্নিত হতে শুরু করল।

শিয়া ইতিহাসবিদরা তাঁর নামে অনেক নেতিবাচক কথা বলেছেন। এমনকি হজরত ওসমানকে যে 'জুননুরাইন' বলা হতো, সেই দাবিকেও অস্বীকার করতে চেয়েছেন। হজরত ওসমানকে জুননুরাইন বলা হতো কারণ তিনি যুগপৎভাবে রাসুলের দুই কন্যা রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন। হজরত ওসমানের বিরোধী শিয়া লেখকদের কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, রুকাইয়া ও কুলসুম আদৌ রাসুলের ঔরসজাত কন্যা ছিলেন না। তারা ছিলেন হজরত খাদিজার আগের স্বামীর ঔরসজাত কন্যা। ওসমানের পূর্বে তাদের দু'জনেরই বিয়ে হয়েছিল আবু লাহাবের দুই পুত্র উৎবাহ ও উতায়বাহ-র সাথে। উৎবাহ-র সাথে বিয়ে হয়েছিল রুকাইয়ার এবং উতায়বাহ-র সঙ্গে উম্মে কুলসুমের। হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর নবুয়ত লাভের পরে আবু লাহাব তার দুই পুত্রকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে ওসমানের সঙ্গে বিয়ে হয় প্রথমে রুকাইয়ার, এবং তার মৃত্যুর পরে উম্মে কুলসুমের। রাসুলের জামাতা হিসাবে ওসমানকে উচ্চ মর্যাদা দিতে শিয়ারা মোটেই রাজি নন। তারা ইমাম বোখারি কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস তুলে ধরে তার প্রমাণ দেখান। হাদিসটি হচ্ছে– আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন, রাসুলের কন্যা উম্মে কুলসুমের দাফন অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত ছিলাম। রাসুল(সাঃ) কবরের পাশেই বসেছিলেন। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে গতরাতে পাপ করেনি?' আবু তালহা (জায়েদ ইবনে শহল আল আনসারী) বলল, আমি আছি। তখন রাসুল বললেন, 'তাহলে তুমি কবরে নামো।' ফলে সে কবরে নেমেছিল।

টীকাকারগণ সকলেই এখানে একমত যে রাসুল 'পাপ করা' বলতে যৌনকর্ম বুঝিয়েছেন। একথা বলে রাসুল ওসমানের ব্যক্তিজীবন মানুষের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছেন এবং তাকে কবরে নামা থেকে বিরত রেখেছেন। সবাই এই ব্যাপারে একমত যে রাসুল কারও ব্যক্তিজীবন জনসমক্ষে উন্মোচন করে তাকে হেয় করা অপছন্দ করতেন। এই কারণে তিনি অনেকের দোষ-ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তা মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে হজরত ওসমানের আচরণ তাঁর কাছে এমন অমার্জনীয় মনে হয়েছিল যে তিনি তা জনসমক্ষে উন্মোচন করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেহেতু ওসমান তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুমের মৃত্যুর প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শন করেননি, শোক প্রকাশ করেননি, এবং রাসুলের সাথে তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার জন্য দুঃখিত না হয়ে বরং রাসুলের কন্যার লাশ ঘরে রেখে অপর স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিলেন, সেই কারণেই রাসুল তাকে তাঁর জামাতার অধিকার ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করার জন্যই ওসমানকে উম্মে কুলসুমের কবরে নামা থেকে বিরত রেখেছিলেন।

হজরত আলী তার খোৎবাতে বলেছিলেন যে– ওসমান ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া গোত্র সুবিধা পেয়ে গেল এবং বায়তুল মাল লুটপাট করতে শুরু করল। খরায় শুকিয়ে যাওয়া অঞ্চলের উটের পাল সবুজ ঘাস দেখতে পেলে যেমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, উমাইয়া গোত্রও সেই রকমভাবে বায়তুল মালের (সরকারি সম্পদ) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল। বালাজুরী, হাদীদ, রাব্বীহ, কুতায়বাহ প্রমুখ শিয়া ইতিহাসবিদরা তাদের গ্রন্থে হজরত ওসমান ও তাঁর উমাইয়া আত্মীয়স্বজনের যে লুটপাটের চিত্র তুলে ধরেছেন, সেগুলি একত্রিত করলে তালিকাটা হবে এই রকম–

১. হাকাম ইবনে আবুল আসকে রাসুল(সাঃ) মদিনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। প্রথম দুই খলিফা এই বহিষ্কারাদেশ বহাল রাখেন। হজরত ওসমান খলিফা হওয়ার পরে হাকাম ইবনে আবুল আসকে মদিনায় এনে তাকে বায়তুল মাল থেকে তিন লক্ষ দিরহাম প্রদান করেছিলেন।
২. পবিত্র কোরআনে যে অলিদ ইবনে উকবাহকে মোনাফেক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অলিদ ছিল হজরত ওসমানের সৎভাই। ওসমান তাকে ডেকে এনে বায়তুল মাল থেকে এক লক্ষ দিরহাম দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. হজরত ওসমান তার কন্যা উম্মে আবানকে বিয়ে দিয়েছিলেন মারওয়ান ইবনে হাকামের সাথে, এবং তাকে বায়তুল মাল থেকে প্রদান করেছিলেন এক লক্ষ দিরহাম।

৪. হজরত ওসমান তার আরেক কন্যা আয়শার বিয়ে দিয়েছিলেন হারিছ ইবনে হাকামের সাথে, এবং তাকেও প্রদান করেছিলেন এক লক্ষ দিরহাম।

৫. আবদুল্লাহ ইবনে খালিদকে দিয়েছিলেন চার লক্ষ দিরহাম।

৬. আফ্রিকা থেকে খুম্‌স হিসাবে প্রাপ্ত পাঁচ লক্ষ দিরহাম মারওয়ান ইবনে হাকামকে দিয়েছিলে অন্যায়ভাবে।

৭. রাসুলের প্রাণপ্রিয় কন্যা হজরত ফাতিমার সম্পত্তি ছিল ফাদাক। সেই ফাদাকও হজরত ওসমান অন্যায়ভাবে দিয়ে দিয়েছিলেন মারওয়ান ইবনে হাকামকে।

৮. মদিনার মাহজুব নামক একটি বাণিজ্য এলাকাকে রাসুল নিজে সর্বসাধারণের সম্পত্তি বা ট্রাস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু হজরত ওসমান সেটিকে তার আরেক জামাতা হারিছ ইবনে হাকামকে দান করেছিলেন।

৯. মদিনার চারপাশের সরকারি তৃণভূমিতে উমাইয়া ছাড়া অন্য কোনো গোত্রের পশু চরতে দেওয়া হতো না।

১০. প্রধান প্রধান এলাকায় বড় বড় পদে হজরত ওসমান নিজের গোত্রের লোকদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। মিশরের শাসনকর্তা হিসাবে হজরত ওসমান নিয়োগ দিয়েছিলেন তার দুধ ভাই আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সাবাহকে। এই ব্যক্তিকে মক্কা বিজয়ের পরে রাসুলুল্লাহ(সাঃ) মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিলেন। কুফার শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল মদ্যপ মোনাফেক অলিদ ইবনে উকবাহকে। সে ফজরের নামাজে ইমামতি করার সময় ফরজ নামাজ দুই রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত পড়ে ফেলে। জনগণ এই কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলে হজরত ওসমান তাকে সরিয়ে আরেক মোনাফেক সাঈদ ইবনে আসকে কুফার শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

এই বর্ণনার মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জিন থাকার সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায় না। তবে এই ব্যাপারে প্রায় সব ঐতিহাসিকই একমত যে হজরত ওসমান তাঁর গোত্রের প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত ছিলেন, এবং তিনি তার ঘনিষ্টজনদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি। উল্টো যারা তাঁর ও উমাইয়াদের এই ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্যকলাপের বিরোধিতা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে হজরত ওসমান অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় ভাবে শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর দ্বারা অত্যাচারিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী সাহাবি হিসাবে পরিচিত হজরত আবু যর গিফারিও।

আবু যর আল-গিফারির পিতৃদত্ত নাম ছিল জুনদাব ইবনে জুনাদাহ। মদিনার পূর্বদিকে ছোট একটি গ্রাম রাবাযাহ ছিল তার বাসস্থান। রাসুলের ইসলাম প্রচারের কথা শুনে তিনি মক্কা এসেছিলেন এবং তাঁর সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাফেররা প্রচুর অত্যাচার করেও তাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ বা পঞ্চম জন। তাঁর তাকওয়া ও আত্মত্যাগ এত বেশি ছিল যে রাসুল বলেছিলেন– 'আমার লোকদের মধ্যে আবু যরের তাকওয়া ও আত্মত্যাগ মরিয়ম-তনয় ঈসার মতো।'

খলিফা ওমরের সময় আবু যর সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন এবং ওসমানের সময়েও তিনি সেখানেই ছিলেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া তাকে অপছন্দ করতেন। আবু যর খলিফা ওসমানের অন্যায় কার্যকলাপ ও তহবিল তসরুফের প্রকাশ্য সমালোচনা করতেন। মুয়াবিয়া খলিফা হজরত ওসমানকে চিঠি লিখে জানালেন যে আবু যরকে যদি এখানে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে তিনি জনগণকে হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে পুরোপুরি ক্ষেপিয়ে তুলবেন। চিঠি পাওয়ার পরে ক্রোধান্বিত হজরত ওসমান আদেশ দিলেন যে আবু যরকে জিনবিহীন উটের পিঠে বসিয়ে মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। হজরত ওসমানের আদেশ পালিত হলো। কিন্তু মদিনায় এসেও আবু যর ন্যায় ও সত্যের প্রচার শুরু করলেন। তিনি সব সময় মানুষকে রাসুলের জামানার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং হজরত ওসমান ও উমাইয়াদের রাজকীয় আড়ম্বরের বিষয়ে সতর্ক করতেন। হজরত ওসমান বিভিন্ন ভাবে তার এই প্রচার বন্ধ করতে না পেরে একদিন নিজের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন– আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি রাসুলের নামে একটি কথা প্রচার করে বেরাচ্ছ! রাসুল নাকি বলেছেন যে, 'যখন বনু উমাইয়া সংখ্যায় ত্রিশ জন হবে তখন তারা আল্লাহর নবীগণকে তাদের নিজেদের সম্পদ মনে করবে, তাঁর বান্দাগণকে তাদের গোলাম মনে করবে এবং তাঁর দ্বীনকে তাদের প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে।'

আবু যর বললেন যে তিনি রাসুলকে এই কথা বলতে শুনেছেন।

হজরত ওসমান তখন তাকে মিথ্যাবাদী বললেন এবং তার পাশের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন তারা কেউ রাসুলকে এমন কথা বলতে শুনেছে কি না। তার সভাসদরা উত্তর দিল যে তারা কেউ রাসুলকে এমন কথা বলতে শোনেনি। আবু যর তখন বললেন যে এই বিষয়ে আলী ইবনে আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক। হজরত আলীকে ডেকে আনা হলে তিনি আবু যরের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করলেন। হজরত ওসমান তখন আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কিসের ভিত্তিতে আবু যরের বর্ণিত এই হাদিসের সত্যতা স্বীকার করছেন? হজরত আলী উত্তর দিলেন, তিনি রাসুলকে বলতে শুনেছেন যে– 'আকাশের নিচে আর মাটির উপরে আবু যর অপেক্ষা অধিক সত্য বক্তা আর কেউ নেই।'

এতে হজরত ওসমান আর কথা না বাড়িয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কারণ এর পরেও আবু যরকে মিথ্যাবাদী বলার অর্থ হবে স্বয়ং রাসুলকে মিথ্যাবাদী বলা।

আবু যর তাঁর প্রচারণা অব্যাহত রাখলেন। তিনি যেখানেই হজরত ওসমানকে দেখতেন সেখানেই কোরআনের এই আয়াত আবৃতি করতেন– "...আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। সে দিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হবে এবং উহা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, ইহাই উহা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করতে।" (কোরআন– ৯ঃ ৩৪-৩৫)

কথিত আছে যে হজরত ওসমান প্রথমে অর্থ দিয়ে আবু যরের মুখ বন্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু লোভের ফাঁদে পা দেননি আবু যর। তখন তাকে শাস্তির ভয় দেখানো হলো। তাতেও দমানো গেল না তাকে। তখন আবু যরের তৎপরতা আর সহ্য করতে না পেরে হজরত ওসমান তাকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করলেন এবং সেই সাথে আরও একটি অমানবিক আদেশ দিলেন যে কেউ আবু যরকে বিদায় জানাতে যেতে পারবে না। কিন্তু হজরত আলী এই আদেশ মানেননি। তিনি তার পুত্র হজরত হাসান, হুসাইন, ভাই আকীল ইবনে আবু তালিব, সঙ্গী আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে সঙ্গে নিয়ে আবু যরকে মদিনার সীমা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সব কারণ একটু একটু করে তৈরি করছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দুঃখজনক গণ-অভ্যুত্থানের ভিত্তি, যার ফলে নিহত হতে হয়েছিল হজরত ওসমানকে।

সতের

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলার চেষ্টা করেছেন যে হজরত ওসমানের হত্যাকাণ্ড তাৎক্ষণিক বিশৃঙ্খলার ফলে ঘটে যাওয়া একটি চরম দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু হজরত ওসমানের খেলাফতকালের বিভিন্ন ঘটনা খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে হজরত ওসমান নিহত হতে পারেন, এমন আশংকা কেউ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেও তাঁর বিরুদ্ধে যে সমগ্র ইসলামি অঞ্চলে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি সেই অসন্তুষ্টদের মধ্যে রাসুলের স্ত্রী হজরত আয়েশাও ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে এবং জনসমক্ষে হজরত ওসমানের সমালোচনা করতেন। একবার হজরত ওসমান মিম্বরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এমন সময় উম্মুল মোমেনিন হজরত আয়েশা তাঁর বোরখার ভিতর থেকে রাসুলের জুতা ও কামিজ বের করে বললেন– এই জুতা ও কামিজ আল্লাহর রাসুলের যা এখনও বিনষ্ট হয়নি। এরই মধ্যে তোমরা তাঁর দ্বীন ও সুন্নাহর পরিবর্তন করে ফেলেছ! আয়েশার কথায় ওসমান ক্ষেপে গিয়ে তাঁর সাথে উচ্চকণ্ঠে বাদানুবাদ শুরু করলে আয়েশা এক পর্যায়ে রেগে গিয়ে বললেন– এই নাছালকে (নাছাল অর্থ হলো লম্বা দাঁড়িওয়ালা ইহুদি) হত্যা করা জায়েজ।

মারওয়ান ইবনে হাকামের ওপর নির্ভরশীলতা হজরত ওসমানকে অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। তার শরীরের পাতলা গড়ন ও তার কর্মকাণ্ডের জন্য মারওয়ানকে ডাকা হতো 'খায়ত বাতিল' বা 'অন্যায়ের সুতা' বলে। মারওয়ানের পিতা যদিও মক্কাবিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবুও তার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড রাসুলকে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত করে তুলত। একবার রাসুল অভিশম্পাত দিয়ে বলেছিলেন যে– 'এই লোকটির বংশধরদের হাতে আমার লোকদের অনেক দুঃখ-দুর্দশা ঘটবে।' অবশেষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার গুপ্ত চক্রান্ত ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলায় রাসুল তাকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। হাকাম তার পুত্র মারওয়ানসহ তায়েফের ওয়াজ উপত্যকায় চলে গিয়েছিল। রাসুলের জীবদ্দশায় তাকে আর মদিনায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। প্রথম দুই খলিফা আবু বকর ও ওমরও রাসুলের এই নির্দেশ পরিবর্তন করেননি। কিন্তু ওসমান খলিফা হয়েই তাদের মদিনায় ফিরিয়ে আনলেন, মারওয়ানের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে দিলেন এবং মারওয়ানকে এমন উচ্চপদে বসিয়েছিলেন যে খেলাফতের লাগাম মারওয়ানের হাতে চলে গিয়েছিল। মারওয়ান হজরত ওসমানকে না জানিয়ে অনেক আদেশ খলিফার নামে প্রচার করত। পরে এই ঘটনাগুলি ধরা পড়লেও হজরত ওসমান তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে চরম স্বজনপ্রীতির পরিচয় দিতেন, যা মুসলমানদের খুবই অপছন্দনীয় ছিল।

রাসুলের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবিদের ওপর অত্যাচার করায় মদিনার অধিবাসীরাও অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন খলিফার প্রতি। আবু যর গিফারি ও তাঁর গোত্রকে বহিষ্কার করায় তাদের বন্ধুগোত্রগুলি রুষ্ট ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদকে নির্দয়ভাবে প্রহার করায় হুজায়েল গোত্র ও তাদের বন্ধুগোত্রগুলি ক্ষিপ্ত ছিল। আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে দেওয়ায় বনু মখজুম গোত্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের বন্ধু বনু জুহরাহ গোত্র ক্রোধে বারুদ হয়ে ছিল। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করায় বনু তায়েম গোত্রও খলিফার প্রতি বিদ্বেষী ছিল। অন্যান্য শহর এবং প্রদেশের অধিবাসীরা উমাইয়া শাসনকর্তাদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে খলিফার কাছে একের পর এক আবেদন পাঠাচ্ছিলেন প্রতিকার চেয়ে। কিন্তু তেমন কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সম্পদ আর জাঁকজমকের নেশায় ইসলামের মূল কার্যক্রম থেকে সরে গিয়েছিল। রাসুলের সাহাবাগণ যখন দেখলেন যে শান্তি পুরোপুরি বিনষ্ট হওয়ার পথে, প্রশাসনে দেখা দিয়েছে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা, পরিত্যক্ত হচ্ছে রাষ্ট্রপরিচালনায় ইসলামের মূলনীতি, তখন তারাও হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। দীন-হীন বুভুক্ষু মানুষ এক টুকরো রুটির অভাবে পেটে পাথর বেঁধে দিন কাটাচ্ছিল অথচ উমাইয়া গোত্রের লোকেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। কুফা, বসরা ও মিশর থেকে বহু মানুষ মদিনায় এসে আহাজারি করছিল। তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল মদিনার সাধারণ মানুষরাও। মদিনাবাসীদের এই আচরণ দেখে চিন্তিত খলিফা তার প্রিয়ভাজন মুয়াবিয়াকে চিঠিতে লিখেছিলেন– মদিনার জনগণ মতবিরোধী হয়ে গেছে; আমার অনুগত থাকার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এবং আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করেছে। কাজেই তুমি আমাকে দ্রুতগামী বলিষ্ঠ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাও।

মুয়াবিয়া কিন্তু খলিফার আদেশ মানেননি। কারণ তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে হজরত ওসমানের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেছে। এই সময়ে যদি মদিনার সাহাবিদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা হয়, তা কোনো কাজেই আসবে না।

হজরত ওসমানের সৎভাই ও মিশরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারাহর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মিশরের জনগণের একটি প্রতিনিধিদল অভিযোগ জানানোর জন্য মদিনায় এসে শহরের অদূরে জাকুশুব উপত্যকায় অবস্থান করছিল। তাদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে একটি স্মারকলিপি সহ পাঠানো হলো খলিফার কাছে। কিন্তু হজরত ওসমান তার সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে তাকে তাড়িয়ে দেন। তিনি বলেন যে এই অভিযোগ তিনি শুনতে পর্যন্ত রাজি নন। এই ঘটনার পরে মিশরের লোকজন চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে শহরে প্রবেশ করল এবং মদিনাবাসীদের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করল। এই সময় বসরা এবং কুফা থেকে স্থানীয় শাসনকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে যেসব প্রতিনিধিদল এসেছিল, তারাও মিশরবাসীর সঙ্গে এক হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করল। এমনিতেই মদিনার সাহাবি এবং সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিলেন। এবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হজরত ওসমানের বাড়ি অবরোধ করলেন। তারা খলিফার বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। অবশ্য মসজিদে যাওয়াতে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। অবরোধ চলাকালে শুক্রবার জুমার নামাজের সময় হজরত ওসমান তাদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন সন্ত্রাসী ও অপরাধীচক্র আখ্যা দিয়ে। এতে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তার প্রতি ঢিল-পাটকেল নিক্ষেপ করেছিল, যার ফলে হজরত ওসমান মিম্বর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। এর পরে অবরোধকারীরা তাঁর মসজিদে যাওয়া-আসার পথও বন্ধ করে দেয়।

পরিস্থিতির অবনতির কারণে হজরত ওসমান এবার আলীর শরণাপন্ন হলেন। তিনি আলীকে বললেন অবরোধ থেকে তাকে মুক্ত করতে। হজরত আলী বললেন– যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তাদের দাবি-দাওয়া ন্যায়সঙ্গত সেখানে কী শর্তে তাদের আমি অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাব?

হজরত ওসমান বললেন– এ বিষয়ে আপনাকে আমি সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করলাম। আপনি যে শর্তে নিষ্পত্তি করবেন আমি সেটাই মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

এই কথায় হজরত আলী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। ব্যাপক আলোচনার পরে ঠিক হলো যে আব্দুল্লাহ ইবনে সাদের পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে মিশরের শাসনকর্তা নিয়োগ দেওয়া হলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেবে। হজরত ওসমান এই প্রস্তাবসহ অন্যান্য দাবিগুলি বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন। তবে কয়েকদিনের সময় চাইলেন। হজরত আলী বললেন– মদিনাবাসীদের দাবিপূরণে দেরি করার কোনো কারণ নেই। তবে অন্য প্রদেশগুলিতে খলিফার আদেশ পৌঁছানো পর্যন্ত দেরি করার যৌক্তিকতা আছে।

হজরত ওসমান তবুও অন্তত তিনদিন সময় চাইলেন।

মিশরীয়দের কাছে হজরত আলী তাদের দাবি খলিফা-কর্তৃক বাস্তবায়নের কথা জানালে তারা অবরোধ তুলে নিয়ে জাকুশুব উপত্যকায় ফিরে গেল। কয়েকজন মহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে রওনা হলো। মনে হলো এখানেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

অবরোধ তুলে নেবার পরের দিন মারওয়ান ইবনে হাকাম খলিফাকে বলল– আপদ দূর হয়েছে, ভালোই হলো। এখন অন্যান্য শহর থেকে লোকজন আসা বন্ধ করতে হলে আপনাকে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিতে হবে যে, অবান্তর কথা শুনে কিছু লোক মদিনায় সমবেত হয়েছিল। যখন তারা জানতে পারল যে তারা যা শুনেছিল তা ভুল, তখন তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেছে।

হজরত ওসমান প্রথমে এমন মিথ্যা কথা বলতে রাজি হননি। কিন্তু মারওয়ানের বারংবার প্ররোচনায় তিনি মসজিদে নববীতে বললেন– মিশরীয়গণ তাদের খলিফা সম্পর্কে কতিপয় সংবাদ পেয়েছিল। যখন তারা শুনল যে এসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা মিথ্যে ও ভিত্তিহীন, তখন তারা নিজেদের শহরে ফিরে গেছে খলিফার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে সমবেত মুসল্লিরা হই-চই শুরু করলেন। তারা চিৎকার করে বললেন– তওবা করুন, আল্লাহকে ভয় করুন, এ কী ডাহা মিথ্যা কথা বের হচ্ছে আপনার মুখ থেকে!

জনগণের দাবির মুখে সেদিন বাধ্য হয়ে হজরত ওসমান তওবা করে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বিলাপ ও কান্নাকাটি করে ঘরে ফিরে গেলেন।

এই ঘটনার পরে হজরত আলী বললেন– আপনার অতীত কাজের জন্য সর্বসমক্ষে তওবা করা উচিত। তাতে এই ধরনের বিদ্রোহ আবার দেখা দেওয়ার ভয় কমে যাবে। নইলে আবার অন্য কোনো প্রদেশের লোক বিদ্রোহ করে এখানে চলে আসতে পারে।

এই পরামর্শ অনুযায়ী হজরত ওসমান মসজিদে নববীতে খোৎবার সময় নিজের ভুল স্বীকার করে তওবা করলেন, এবং ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করার পরামর্শ দিলেন। জনগণের সকল ন্যায্য দাবি পূরণ ও তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার অঙ্গীকার করলেন। এর ফলে জনগণ সন্তুষ্ট হয়ে তাদের মন থেকে হজরত ওসমান সম্পর্কে সকল খারাপ ধারণা মুছে ফেলল। মসজিদ থেকে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ান হজরত ওসমানকে কিছু বলতে এগিয়ে এলে তার স্ত্রী নাইলাহ বিনতে ফারাফিসাহ বাধা দিয়ে বললেন– আল্লাহর দোহাই তুমি চুপ করো। তুমি এমন সব কথা বলবে যা উনার মৃত্যু ডেকে আনবে।

মারওয়ান বিরক্ত হয়ে বলল– এসব বিষয়ে আপনার মাথা ঘামানো উচিত নয়। আপনি এমন এক লোকের কন্যা যে কোনোদিন তো অজু করতেও শেখেনি।

তাদের ঝগড়া থামিয়ে হজরত ওসমান মারওয়ানের কাছে জানতে চাইলেন সে কী বলতে চায়।

মারওয়ান বলল– মসজিদে আপনি এসব কী কথা বললেন? আর কেনই বা তওবা করতে গেলেন? আমার মতে এই ধরনের তওবা করার চেয়ে পাপে লিপ্ত থাকাও অনেক সম্মানের। কারণ পাপ যত বেশিই হোক না কেন তার পরেও তওবা করার পথ খোলা থাকে; কিন্তু এই তওবা কোনো তওবাই নয়। আপনি সরল বিশ্বাসে কথাগুলি বলে এসেছেন মসজিদে, আর এখন দেখুন হাজারে হাজারে মানুষ জমা হয়েছে আপনার দরজায়। এখন করুন তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ!

হজরত ওসমান বললেন– ঠিক আছে আমি যা বলার বলেছি। এখন তুমি এই জনগণকে ঠেকাও। ওদের সামনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আমার আর নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারওয়ান এই সুযোগ হাতছাড়া করল না। সে বেরিয়ে এসে সমবেত মানুষকে লক্ষ্য করে বলল– তোমরা কেন এখানে জড়ো হয়েছ? তোমরা কি লুটপাট করতে চাও? মনে রেখো, তোমরা এত সহজে আমাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারবে না। আমাদের পরাভূত করার চিন্তা নিজেদের মন থেকে মুছে ফেলাই তোমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কেউ শক্তি দেখিয়ে আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। এখন তোমাদের কুৎসিত কালো চেহারাগুলো নিয়ে দূর হও। আল্লাহ তোমাদের অপমানিত করুন! তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমরা বঞ্চিত হও!

হতভম্ব মদিনাবাসী আবার ভিড় করল হজরত আলীর কাছে গিয়ে। আলী সব শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ হজরত ওসমানের কাছে গিয়ে বললেন– হায় আল্লাহ! আপনি মুসলমানদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার কেন করলেন! একজন বেইমান এবং চরিত্রহীনের জন্য আপনি নিজের ইমান ত্যাগ করলেন! আপনার বোধশক্তি কি লুপ্ত হয়ে গেছে? নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষাটা অন্তত আপনি করতে পারতেন! এটা কেমন কথা যে আপনি মারওয়ানের সকল কুকর্ম নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছেন! আপনি মারওয়ানের বাহনে পরিণত হয়েছেন। কাজেই সে এখন আপনার উপর চড়ে যা খুশি করতে পারছে। আমি ভবিষ্যতে আপনাকে আর কিছুই বলব না। এখন আপনি আপনার ঝামেলা সামলে দিন!

আলী চলে যাওয়ার পরে আল্লাহ হজরত ওসমানকে বললেন– আমি কি আপনাকে মারওয়ান থেকে দূরে থাকতে বলিনি? সে আপনাকে এমন ফাঁদে ফেলবে যেখান থেকে আপনি বের হওয়ার কোনো রাস্তাই আর খুঁজে পাবেন না। এখনও সময় আছে, আলীকে ডাকুন, তার পরামর্শমতো চলুন!

হজরত ওসমান অনুতপ্ত হয়ে আলীকে ডাকার জন্য লোক পাঠালেন। কিন্তু আলী তার ডাকে আর সাড়া দিলেন না।

ওদিকে যারা মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে নিয়ে মিশরের দিকে রওনা দিয়েছিল তারা হিজাজ সীমান্ত অতিক্রম করে লোহিত সাগরের উপকূলে আয়েলা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল এক ব্যক্তি এত জোরে উট ছুটিয়ে যাচ্ছে যেন তাকে কোনো শত্রু তাড়া করেছে। লোকটির হাবভাব দেখে সন্দেহ হওয়ায় তারা লোকটিকে থামাল এবং পরিচয় জিজ্ঞেস করল। সে বলল যে সে হজরত ওসমানের দাস। কোথায় যাচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে মিশরে যাচ্ছে। কার কাছে যাচ্ছ? এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল সে যাচ্ছে মিশরের শাসনকর্তার কাছে। মিশরের লোকজন বলল যে শাসনকর্তা তো তাদের সাথেই আছেন। সে কোন শাসনকর্তার কাছে যাচ্ছে। উত্তর পাওয়া গেল– আবদুল্লাহ ইবনে সাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে। তার কাছে কোনো চিঠিপত্র আছে কি না জানতে চাইলে সে বলল যে তার কাছে কোনো চিঠিপত্র নেই। তখন তার কাপড়-চোপড় তল্লাশি করা হলো। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এমন সময় কিনানা ইবনে বিশর তুজিবী বলল– লোকটার পানির মশক দেখা হোক। পানির মশক তল্লাশি করে তার মধ্যে একটি সীসার নল পাওয়া গেল। তার মধ্যে একটি চিঠি। এই চিঠিতে খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে সাদকে লিখেছেন যে– 'যখন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ও তার দলবল তোমার কাছে পৌঁছাবে তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে অমুক অমুককে হত্যা করবে এবং অমুক অমুককে বন্দি করে জেলে রাখবে।'

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবার এই দাসকে বন্দি করে মিশরবাসীদের সঙ্গে মদিনায় ফিরে এসে খলিফার চিঠি ও দাসকে হাজির করলেন সাহাবিদের সামনে।

এমন ঘটনা চোখের সামনে দেখেও সাহাবিদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যেন। মুসলমানদের খলিফা এমন কাজ করতে পারেন! কয়েকজন সাহাবি তৎক্ষণাৎ গেলেন হজরত ওসমানের কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেন– চিঠির সিলমোহরটি কার?

হজরত ওসমান নির্দ্বিধায় বললেন– সিলটি তার নিজের।

চিঠিটা কার হাতের লেখা?

আমার সচিবের।

ধৃত লোকটি কার দাস?

আমার নিজের দাস।

এই লোককে বহনকারী উটটি কার?

এটি সরকারি উট।

কে লোকটিকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে?

হজরত ওসমান বললেন– আমার জানা নেই।

উপস্থিত সাহাবিদের একজন বললেন– আশ্চর্য! সবকিছু আপনার, অথচ আপনি নিজেই জানেন না কে এটি পাঠিয়েছে! আপনি যদি এতই অপারগ হয়ে থাকেন তাহলে খেলাফত ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। তাহলে আমরা এমন কাউকে খলিফা পদে বসাতে পারব যিনি মুসলমানদের রাষ্ট্র ঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন।

হজরত ওসমান বললেন– খেলাফতের এই পোশাক আল্লাহ আমাকে পরিয়েছেন। আমি তা ত্যাগ করতে পারব না। তবে আপনারা বললে আমি তওবা করতে রাজি আছি।

কিন্তু জনতা শুধু হজরত ওসমানের তওবায় আর সন্তুষ্ট হতে রাজি নয়। কারণ মাত্র কয়েকদিন আগেই খলিফা তওবা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তওবা ভঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। তারা বললেন– আমরা আর ধাপ্পাবাজিতে পড়তে চাই না। আমাদের তরবারি এখনও ভোঁতা হয়ে যায়নি। আমরা নিজেরাই অপকর্মের হোতাদের ব্যবস্থা করতে পারব। আপনি মারওয়ানকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা তাকেই জিজ্ঞেস করতে চাই কার শক্তি ও সমর্থন নিয়ে সে মুসলমানদের জীবন ও রাষ্ট্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সাহস পাচ্ছে।

হজরত ওসমান তাদের দাবি অস্বীকার করলেন। অর্থাৎ তিনি মারওয়ানকে তাদের সামনে হাজির করতে রাজি হলেন না। তখন জনতার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে হজরত ওসমানের নির্দেশেই এই চিঠিটা লেখা হয়েছে।

শান্ত পরিবেশ আবার অশান্ত হয়ে উঠল। যে সব মানুষ জাকুত্তব উপত্যকায় অবস্থান করছিল তারা স্রোতের মতো এসে মদিনাবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হজরত ওসমানের বাড়ি ঘেরাও করল। এই সময় জনতার মধ্য থেকে রাসুলের সাহাবি নিয়ার ইবনে ইয়াদ কথা বলতে চাইলেন ওসমানের সাথে। ওসমান ওপর থেকে উঁকি দিলে নিয়ার বললেন– ওহে ওসমান! আল্লাহর ওয়াস্তে খেলাফত ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করুন!

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওসমানের লোকেরা তীর ছুঁড়ে নিয়ারকে হত্যা করল।

এতে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে দাবি তুলল যে নিয়ারের হত্যাকারীকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। হজরত ওসমান সোজা জবাব দিলেন যে নিজের লোককে তিনি কারও হাতে তুলে দিতে রাজি নন।

খলিফার এই কথায় যেন আগুনে ঘৃতাহুতি হলো। তারা সক্রোধে এগিয়ে এলো হজরত ওসমানের দরজার দিকে। এই সময় মারওয়ান ইবনে হাকাম, সাঈদ ইবনে আস ও মুঘিরাহ ইবনে আখনাস তাদের সৈন্যদল নিয়ে জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মরিয়া জনতার সামনে তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। কেউ কেউ পালিয়ে আশ্রয় নিল উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানের ঘরে। যারা পালাতে পারেনি তারা সবাই নিহত হয়েছিল হজরত ওসমানের সাথে সাথে।

এই সময় হজরত আলী জনতার সঙ্গেও ছিলেন না, আবার হজরত ওসমানের পক্ষেও দাঁড়াননি।

আঠার

আব্দুল খালেক জোর দিয়ে বলে– মানুষকে সব ইতিহাস জানানো দরকার।

কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন মানে! আব্দুল খালেক যেন অবাক হয়েছে এই প্রশ্ন শুনে– ভাইজান আপনারাই তো বলেন যে ইতিহাস না জানলে মানুষ ভবিষ্যতে কীভাবে চলবে তা নির্ধারণ করতে পারে না।

ইউসুফকে কোনো উত্তর দিতে না শুনে আব্দুল খালেক নিজেই আবার জিজ্ঞেস করে– এইসব ইতিহাস আমরা জানি না কেন? মানে মানুষ জানতে পারে না কেন?

ইউসুফ একটু হেসে বলে– মানুষ খোঁজ করে না, পড়ে না, তাই জানতে পারে না। এইসব বই তো বাজারেই পাওয়া যায়। সেগুলি এমন নয় যে পড়তে মানা। আবার নিষিদ্ধও নয়। মানুষ যেভাবে চলছে সেভাবে দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই খুশি হয় হুজুর। নতুন কোনো জিনিস মানেই নতুন চিন্তা। নতুন ভাবে চিন্তা করার ধাক্কা সব মানুষ সহ্য করতে পারে না।

যাই বলেন, এই সব ইতিহাস আমাদের খুব ভালোভাবে জানা দরকার।

জেনে কী হবে?

মানুষ তখন আরবি নাম শুনেই আর বিভ্রান্ত হবে না। মানুষ অন্তত এইটুকু জানবে যে রাসুলের জামানায় বা খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে সবকিছু অলৌকিকভাবে চলত না। চলত দুনিয়ার নিয়ম মেনেই। যে মানুষদের নাম শুনলেই আমরা তাদের নামে দরুদ পাঠ করি, তারাও যে মানুষই ছিলেন, ফেরেস্তা নয়, তারাও ভুল-ভ্রান্তি করতেন, কেউ কেউ জেনে-শুনে নিজের স্বার্থে অন্যায় পর্যন্ত করতেন, সেই কথা মানুষের জানা উচিত।

ইউসুফ বলে– আমি আসলে মনস্থির করতে পারছি না। এইসব কথা মানুষকে জানালে মুসলমানদের মধ্যে আবার ফেৎনা তৈরি করা হবে কি না!

হবে না। আব্দুল খালেক জোর দিয়ে বলে– ফেৎনা তৈরি হবে না। বরং মুসলমানরা ফেৎনার হাত থেকে বাঁচার পথ খুঁজে পাবে। তখন মোল্লাদের বা তথাকথিত অশিক্ষিত আলেমদের কথা হুবহু না মেনে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে শিখবে।

আব্দুল খালেক হাতজোড় করে বলে– ভাইজান আপনারা শিক্ষিত মানুষরা ইসলাম নিয়ে না গবেষণা করলে এই জাতির মুক্তি আসবে কীভাবে! আমাদের মতো মোল্লা-মওলানা আর ইসলাম ভাঙিয়ে রাজনীতি করা অসৎ লোকদের হাত থেকে মুসলমানদের বাঁচাতে হলে সঠিক ইসলামি জ্ঞানকে মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

হেসে ফেলে ইউসুফ– আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে বলছেন এই কাজের দায়িত্ব নিতে। আরে হুজুর অত ক্ষমতা আমার নাই।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com

না থাকুক ক্ষমতা। সময়মতো ক্ষমতা আল্লাহই আপনাদের দিয়ে দেবেন। আল্লার দোহাই লাগে মানুষের মুখের দিকে চেয়ে আপনারা কাজটা শুরু করেন।

একটু আনমনা হয়ে ইউসুফ বলে– কাজটা শুরু হয়েছে হুজুর। সারা মুসলিম বিশ্ব জুড়েই শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে কাজটা করা খুব কঠিন।

কেন? কঠিন কেন?

আমাদের মোল্লা-মওলানারা অশিক্ষিত বটে, কিন্তু নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ষোলআনা বোঝে। তার ওপর তাদের পরিচালনা করে, যারা ইসলাম বিক্রি করে আমাদের দেশে রাজনীতি করে, সেই ধুরন্ধর লোকগুলো। আপনি এমন কাজ করতে গেলেই ওরা আগে আপনাকে ঘোষণা করবে মুরতাদ। তারপর মসজিদে মসজিদে প্রচার করবে যে অমুক লোকটা ইসলাম বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে, মুসলমানদের ক্ষতি করছে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত মানুষের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তারা তখন আপনার ফাঁসি চেয়ে রাস্তায় নেমে পড়বে। আপনি কী বলেছেন বা কী করেছেন সেটা কেউ শুনতে পর্যন্ত চাইবে না। তখন হয় আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, নয়তো জেলে যেতে হবে, নয়তো দেশত্যাগ করতে হবে। এখন তো আবার তালেবান-বাংলাভাইরা হয়েছে। ওরা গুপ্তঘাতক লেলিয়ে দেবে আপনার পেছনে।

ম্লান হয়ে গেল আব্দুল খালেকের মুখ– তাহলে কাজটা শুরু করা যাবে না? কেউ শুরু করার সাহস দেখাবে না?

অবশ্যই কাজটা শুরু হবে। সত্যি বলতে কী, কাজটা শুরু হয়ে গেছে। এই যে আপনি আর আমি কথা বলছি, এটাও তো সেই কাজেরই একটা অংশ। যেহেতু কাজটা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে তাই তার বিস্তারটা দেখা যাচ্ছে না। পৃথিবীতে সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকে না হুজুর। কেউ না কেউ জেগে থাকে, ভাবনা-চিন্তা করে, পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য বেদনা বোধ করে, তাদের উত্তরণের পথ খোঁজে। এই দেশেও কিছু মানুষ পথ খুঁজছেন। কাজ করছেন। এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধগুলো বন্ধ করা।

কেন যে শুরু হলো এই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ! কারা যে শুরু করল এই সর্বনাশা কাজটা!

উনিশ

মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হজরত আলী আর হজরত আয়েশার মধ্যে। জামালের যুদ্ধ। বলা হয়ে থাকে হজরত ওসমানের হত্যার বদলা নেবার জন্য আয়েশা এই যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন আলীর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই সময়কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় সকল ইতিহাসবিদ স্বীকার করছেন যে এই যুদ্ধে আয়েশা জড়িত হয়েছিলেন যতটা না ওসমানের প্রতি সহানুভূতির কারণে, তার চেয়ে বেশি জড়িত হয়েছিলেন আলীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষের কারণে। হজরত আলীর প্রতি হজরত আয়েশার আচরণ সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন ছিল। প্রায়শই তাঁর এই মনের কালিমা মুখের কথায় প্রকাশিত হয়ে পড়ত। কোনো কারণে কেউ তাঁর সামনে আলীর নাম নিলে ক্রোধ তার কপাল কুঞ্চিত হয়ে যেত। এবং তিনি কখনও মুখে আলীর নামটি উচ্চারণ পর্যন্ত করতেন না।

আলীর প্রতি আয়েশার এই বিদ্বেষের পেছনে মূল কারণ ছিল হজরত ফাতিমার প্রতি তাঁর ঈর্ষা। সতীনের কন্যাকে ভালোবাসার মতো উদারতা খুব কম জনেরই থাকে। তদুপরি ফাতিমার প্রতি রাসুলের আলোবাসা এবং স্নেহ এত বেশি পরিমাণে ছিল যে ফাতিমা তাঁর কাছে আসতে চাইলে রাসুল অন্য কাজ ফেলে তার জন্য অপেক্ষা করতেন এবং নিজের বসার জায়গাতে তাকে আদর করে বসতে দিতেন। তিনি ফাতিমাকে পৃথিবীর সকল নারীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশালিনী বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফাতিমার দুই পুত্র হাসান এবং হুসাইন ছিলেন যেন রাসুলের দুই চোখের মণি। হজরত আয়েশার কোনো সন্তান ছিল না। তিনি তার বোনের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেত যে সেই ছেলের প্রতি রাসুলের মনোযোগ হাসান-হুসাইনের তুলনায় কিছুই নয়। আয়েশা বিভিন্ন সময় ফাতিমার বিরুদ্ধে কান-কথা বলেও তার প্রতি রাসুলের ভালোবাসা বিন্দুমাত্র কমাতে পারেননি। আয়েশা তার পিতা আবু বকরকে এসব দুঃখের কথা বলতেন। কিন্তু রাসুল জীবিত থাকা পর্যন্ত আবু বকরের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। রাসুলের মৃত্যুর পরে খেলাফত লাভ করে প্রথম দিনেই হজরত আবু বকর ফাতিমার ওপর প্রতিশোধ নিলেন তার কাছ থেকে ফাদাক মরুদ্যান কেড়ে নিয়ে। এতে ফাতিমা নিদারুণ আর্থিক কষ্টে পতিত হয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত কোনোদিনই এই কারণে আবু বকরের সাথে কথা বলেননি। আবার ফাতিমা অসুস্থ হয়ে যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন রাসুলের অন্য স্ত্রীগণ ফাতিমাকে দেখতে গেলেও আয়েশা যাননি। বরাবরই আয়েশা তার পিতার ওপর রাসুল কর্তৃক আলীকে প্রাধান্য দেওয়া সহ্য করতে পারতেন না। আবু বকরসহ অন্য সাহাবিদের ঘরের দরজা মসজিদে নববীর দিকে খোলা থাকত। রাসুল সেগুলি বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আলীর ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য ছিল না।

অন্যদিকে ইক্‌ফ-এর ঘটনায় হজরত আয়েশার চরিত্রে যখন কলঙ্ক লেপন করা হলো সাফওয়ান নামক তরুণ সাহাবিকে কেন্দ্র করে, তখন রাসুল নিজেও তীব্র মনঃকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রাজ্ঞ সাহাবির কাছে এই ব্যাপারে পরামর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইলে হজরত আলী নাকি রাসুলকে বলেছিলেন যে– সে (আয়েশা) আপনার জুতার ফিতা অপেক্ষা অধিক কিছু নয়। তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করুন।

এই কথাও আয়েশাকে আলীর প্রতি আরও বিদ্বেষী করে তুলেছিল। ফলে যে ওসমানকে হত্যা করা জায়েজ বলে আয়েশা রায় দিয়েছিলেন, সেই ওসমানের হত্যার বদলা নেবার নাম করে তিনি আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। অথচ যার বিরুদ্ধে তিনি ওসমান হত্যার বদলা নেবার জন্য যুদ্ধে নামলেন, সেই আলী যে ওসমানের হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন না, তা সম্ভবত আয়েশাও ভালো করেই জানতেন।

কিন্তু রাসুলের জামানার যুদ্ধগুলোর সাথে এই জাতীয় যুদ্ধের যে পার্থক্য আছে তা মুসলমানরা ঠিকই বুঝতে পারছিলেন। অন্তত হজরত আলীর পক্ষের লোকদের মনে যে সবসময়ই দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল তা অনেক সূত্র থেকেই জানা যায়। যেমন খুজায়মাহ ইবনে ছাবিত আল-আনসারী, যাকে রাসুল ডাকতেন 'যুশ-শাহাদাতাইন' নামে। অর্থ হচ্ছে তার একার সাক্ষ্য ছিল দুইজনের সমান। সত্যবাদিতার কারণে তাকে এই উপাধি দিয়েছিলেন রাসুল। তিনি এবং হজরত আলীর দলের অনেকেই যুদ্ধ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। যারা আজান দেয় এবং নামাজ আদায় করে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে ইতস্তত করছিলেন আম্মার ইবনে ইয়াসিরও। খারিজিদের বিপক্ষে যখন হজরত আলী যুদ্ধে অগ্রসর হলেন তখন তাদের কপালে সেজদার চিহ্ন বা কালো দাগ দেখে অনেকেই অস্ত্রধারণ করতে চাইছিল না।

একই ভাবে শোনা যায়, হজরত আয়েশা যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন পথের মধ্যে একটি জায়গায় তিনি কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শুনতে পেলেন। আয়েশা তার উটের চালককে জিজ্ঞেস করলেন এই জায়গার নাম কী। চালক উত্তর দিল যে সেই জায়গার নাম হাওয়াব। একথা শুনে আয়েশা আঁতকে উঠলেন। কারণ তার মনে পড়ে গেল রাসুলের একটি সতর্কবাণীর কথা। একদিন রাসুল তাঁর স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন– আমি জানি না তোমাদের কোন জনকে দেখে হাওয়াবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠবে!' আয়েশা আর যুদ্ধে অগ্রসর হতে চাইলেন না। তখন হজরত তালহা এবং জুবায়ের এসে তাকে বোঝালেন যে উটচালক ভুল বলেছে। এই জায়গার নাম হাওয়াব নয়।

এই ভাবেই সেই নিদারুণ দুঃখময় যুদ্ধটির সূত্রপাত হলো। এবং মুসলমানের হাতে মুসলমানের রক্ত ঝরা শুরু হলো।

এরই ধারাবাহিকতার সুযোগ নিলেন মুয়াবিয়া। তিনিও হজরত ওসমানের হত্যার বদলা নেবার কথা বলে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত ক্রোধ ছিল হজরত আলীর প্রতি। কেননা বদরের যুদ্ধে হজরত আলীর হাতেই নিহত হয়েছিল তখনকার পৌত্তলিকদের পক্ষে যুদ্ধরত মুয়াবিয়ার পিতামহ উতবা ইবনে রাবিয়াহ, ভাই হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান এবং চাচা অলিদ ইবনে উতবা। তবে নিঃসন্দেহে মুয়াবিয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল বনু হাশিমের কাছ থেকে ক্ষমতা বনু উমাইয়ার হাতে ফিরিয়ে আনা। মনে রাখা দরকার বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়ার দ্বন্দ্ব ছিল বহু যুগের পুরাতন। এবং এই শত্রুতাই নবীর মৃত্যুর পরে প্রথম বিভক্তি এনেছে মুসলমানদের মধ্যে। এই বিভক্তির শিকড় ছিল অনেক গভীরে প্রোথিত।

খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে হজরত ইসমাইলের বংশে ফিহিরের জন্ম হয়। আদনানের পুত্র মাঙ্গদের সন্তান ছিলেন ফিহির। ফিহির নিজের বুদ্ধিমত্তায় সে যুগের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছিলেন। সেই কারণে লোকে তাকে ডাকত কুরাইশ বা ব্যবসায়ী বলে। সময়ের পরিক্রমায় ফিহিরের এই ডাক নামটিই তার বংশের নাম হয়ে যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে এই ফিহিরের বংশে জন্ম নেন কুশাই। তিনি তার অসাধারণ নেতৃত্বের গুণে কুরাইশ বংশের সকল শাখাকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী গোত্র স্থাপন করেন। তারা তখন কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্জন করেন। এর ফলে তারা পরিণত হন আরবের সবচাইতে সম্মানীত গোত্রে। কুশাই কাবার পাশে দারুল নদওয়া নামে একটি মিলনায়তন স্থাপন করেন। এখানে বসেই কুরাইশরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

কুশাই-এর মৃত্যুর পরে কাবাগৃহের দেখাশোনার দায়িত্ব পান তার পুত্র আবদুদ দার। আবদুদ দারের মৃত্যুর পরে তার ভাই আবদুল মান্নাফ এবং আবদুদ দারের অন্য সন্তানদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় নেতৃত্ব নিয়ে। সংঘাতে প্রাণহানি হয় বহু লোকের। এরপরে সালিশের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় যে আবদুল মান্নাফের পুত্র আবদুস শামস থাকবেন কাবাগৃহের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে, আর গোত্রের সামরিক শাখার দায়িত্বে থাকবেন আবদুদ দারের অন্য পুত্রের সন্তানরা।

আবদুস শামস মৃত্যুর পূর্বে তার ছোট ভাই হাশিমকে কাবার তত্ত্বাধায়কের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু আবদুস শামস-এর পুত্র উমাইয়া পিতার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হননি। উমাইয়া বিদ্রোহ করলেন। কিন্তু হাশিম ছিলেন আরবদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। উমাইয়ার এই আচরণ সমগ্র আরব গোত্রের কাছে অন্যায় বিবেচিত হয়, এবং শাস্তিস্বরূপ উমাইয়াদের দশ বৎসরের জন্য মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

আরেকবার এই বিভক্তি স্পষ্ট রূপ নিয়েছিল। হাশিমের মৃত্যুর পরে কাবা গৃহের তত্ত্ববধায়ক হন আবদুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহর দাদা। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নেতৃত্বকে মানতে রাজি হননি বনু উমাইয়ার হারব। কিন্তু আরবদের বিচার-সালিশে তাকেও তার পূর্বপুরুষ উমাইয়ার ভাগ্যই বরণ করতে হয়।

এই বিভক্তি দূর হয়নি রাসুলের নেতৃত্বে মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত। রাসুলের মক্কা বিজয়ের পরে উমাইয়াদের অধিকাংশ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে মুয়াবিয়াও ছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে রাসুলের ওহিলেখক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সব কারণে সুন্নি আলেমরা মুয়াবিয়াকে উচ্চ মর্যাদা দান করে থাকেন। কিন্তু আরবের রীতিনীতি এবং ইতিহাস অনুযায়ী তা হতে পারে না। এ সম্পর্কে মুয়াবিয়া ও আলীর মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানও হয়েছিল। হজরত আলী একটি চিঠিতে লিখছেন– 'তুমি লিখেছ যে, আমরা উভয়েই আবদুল মান্নাফের বংশধর। তোমার একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু উমাইয়া কোনো ক্রমেই হাশিমের সমতুল্য নয়; হারব কোনো ভাবেই আবদুল মুত্তালিবের সমতুল্য নয়; এবং আবু সুফিয়ান কখনোই আবু তালিবের সমান মর্যাদার নয়। সেই ভাবে মক্কাবিজয়ের পরে সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্তরা কখনোই মুহাজিরদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। একজন দত্তকপুত্র কখনোই একজন বিশুদ্ধ বংশধরের সমতুল্য হতে পারে না।'

অর্থাৎ আলী বা মুহাজিররা কিছুতেই একজন তালিককে (মক্কাবিজয়ের পরে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণকারী) নিজেদের সমপর্যায়ের ভাবতে রাজি ছিলেন না। সত্যি বলতে কী, কোনো সাহাবি বা আরববাসীও এমনটি ভাবতেন না। এবং তারা যে ইমানের দিক দিয়ে বা আচরণের দিক দিয়ে এক রকম ছিলেন না, তা পরবর্তীতে বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

মুয়াবিয়ার সঙ্গে সেই রকম লোকেরাই যোগ দিয়েছিল, যারা বাস্তব বুদ্ধিতে সেরা এবং যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোরআন বা হাদিসকে যে কোনোভাবে ব্যবহারে দ্বিধা করত না। তারা প্রয়োজন অনুসারে মিথ্যা হাদিস তৈরি করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিত। সিফফিনের যুদ্ধে যখন মুয়াবিয়া নিশ্চিত পরাজয়ের পথে, তখন আমর ইবনে আসের পরামর্শে বর্শার মাথায় কোরআন বিদ্ধ করে তারা সন্ধি ও আলোচনায় অংশ নিতে হজরত আলী ও তার ধর্মভীরু সৈন্যদের বাধ্য করেছিল।

এই আমর ইবনে আস আরেকটি খল চরিত্র। বলা হয়ে থাকে তার সমকালে সে ছিল ইসলামি সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কূটনীতি জানা মানুষ। কিন্তু সে ছিল নীতি-নৈতিকতাহীন। নিজের স্বার্থে যে কোনো ন্যাক্কারজনক কাজ করতে সে দ্বিধা করত না। সিফফিনের যুদ্ধে সে এক পর্যায়ে হজরত আলীর মুখোমুখি এসে পড়েছিল। তাকে লক্ষ্য করে আলী তরবারি তোলার সাথে সাথে সে নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষার জন্য পরনের কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে গেল। আলী তা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর আমর পালিয়ে বাঁচল।

অনেকে মনে করেন যে আমর ইবনে আস ছিল জন্মগতভাবেই কুচরিত্রের। তার মা লায়লা বিনতে হারমালাহ আল-জিনজিয়াহ সম্পর্কেও একই কথা বলা হতো। তার ডাক নাম ছিল আন-নাবিগাহ। আমরকে ডাকা হতো তার মায়ের নামে ইবনে নাবিগাহ বলে। একদিন আরওয়া বিনতে আল-হারিছ কথা বলছিলেন মুয়াবিয়ার সঙ্গে। তাদের কথার মধ্যে আমর হস্তক্ষেপ করলে আরওয়া রেগে গিয়ে বলেছিলেন– ওহে নাবিগাহ-র পুত্র, তুই কোন সাহসে আমার কথার মধ্যে হস্ত ক্ষেপ করিস! তোর মা ছিল জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও মক্কার গায়িকা। সেজন্য পাঁচজন লোক তোকে পুত্র বলে দাবি করেছিল। তোর মাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে-ও স্বীকার করেছিল যে পাঁচজন লোক তার কাছে গিয়েছিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যার সাথে তোর চেহারার বেশি মিল হবে, তুই তার পুত্র বলেই পরিচিত হবি। সেই পাঁচজন লোক ছিল আস ইবনে ওয়াহিল, আবু লাহাব, উমাইয়া ইবনে খালাফ, হিশাম ইবনে মুগিরাহ, এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব।

অর্থাৎ ক্ষমতার লোভে মুয়াবিয়া যে কোনো চরিত্রের লোককে নিজের কাছে টেনে নিতে দ্বিধা করতেন না।

আর মুয়াবিয়ার ছেলে ইয়াজিদ, যা হজরত হুসাইনকে কারবালায় হত্যা করেছিল, তার নৃশংসতা শুধু হুসাইন ও তার সঙ্গীদের হত্যা করেই তৃপ্ত হয়নি। মদিনাবাসীদের প্রতি পৃথিবীর কোনো লোক সহিংসতা দেখানোর সাহস দেখায়নি।। কিন্তু ইয়াজিদ প্রথম এই জঘন্য কাজটি করে। সে মুসলিম ইবনে উকবা-র নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি দল পাঠিয়েছিল মদিনায় সেখানকার অধিবাসীদের উপযুক্ত শিক্ষা (!) দিতে। ইয়াজিদের নির্দেশে মুসলিম তার সৈন্যদের কাছে তিন দিনের জন্য মদিনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, যাতে তারা যা খুশি করতে পারে। সৈন্যরা রাসুলুল্লাহ যে ঘরে থাকতেন, সেটিকে পশুর আস্তাবলে পরিণত করল, সংসারবিরাগী সুফি ও দরবেশদের তাদের হুজরা থেকে বের করে দিল, মদিনার পথে পথে রক্তের স্রোত বইয়ে দিল, ধর্ষণ করল মুসলিম মহিলাদের। ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়েছিলেন এক হাজার নারী। ইয়াজিদের সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছিলেন ১৭০০ জন মুহাজির, আনসার, তাবেঈন ও আলেম। সেই সঙ্গে নিহত হয়েছিলেন ১০০০০ সাধারণ নাগরিক, ৭০০ জন হাফেজে কোরআন এবং ৯৭ জন কুরাইশ বংশীয় মানুষ।

তারপর থেকে মুসলমানদের হাতে মুসলমানের রক্ত ঝরাকে কেউ আর বন্ধ করতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুড়ি

তবে একটা কথা কিন্তু মনে রাখতেই হবে। হজরত আবু বকরের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আলীর পক্ষের লোকেরা কিংবা অন্যরা যত প্রশ্নই তুলুন না কেন, খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরে হজরত আবু বকর তাঁর মেধা ও ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা দিয়ে নিজের যোগ্যতা ঠিকই প্রমাণ করেছেন। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে খলিফা হিসাবে হজরত আবু বকর তাঁর উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পালন করেছেন। বিশেষ করে রাসুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে অরাজকতা নেমে এসেছিল সেই অরাজকতাকে ঠিকমতো সামাল দিতে না পারলে মদিনা তথা ইসলামের অস্তিত্বই বিপণ্ন হওয়ার আশংকা ছিল। রাসুলের ওফাতের আগেই কয়েকজন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল। মুহাম্মদ(সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যায়। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা প্রদান করার জন্য রাসুল যে সাহাবিদের নিয়োগ করেছিলেন, তাদের অধিকাংশকেই মদিনায় ফেরত পাঠানো হলো। কাউকে কাউকে ধর্মত্যাগীরা হত্যাও করল।

আসলে হিজাজ ছাড়া আরবের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম তখনও তেমন একটা বিস্তৃত হতে পারেনি। অনেক জায়গাতে বেদুঈনরা নামেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কোনো কোনো গোত্রে হয়তো নেতৃস্থানীয় দুই-একজন ছাড়া আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে ইয়ামেন, ইয়ামামা, ওমান এলাকার গোত্রপতিরা ছাড়া আর কোনো লোক মুসলমান হয়নি। রাসুলের মৃত্যুর মাত্র দুই-তিন বছর আগে এইসব গোত্র মদিনা বা ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেছিল। এরা মূলত মুসলমানদের আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিংবা ইসলাম গ্রহণ করলে যে সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে, সেগুলির লোভেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রাসুলুল্লাহর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের কারণে তারা তাঁর জীবদ্দশায় বিরোধিতা করার সাহস পায়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা বিদ্রোহ করে বসল। তারা দাবি তুলল যে হজরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর সাথে তাদের যেসব চুক্তি হয়েছিল, সেগুলি তারা করেছিল ব্যক্তি-মুহাম্মদের সাথে। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে এখন আর এইসব চুক্তির বাধ্যবাধকতা পালনে তারা রাজি নয়।

হজরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর আগে কোনোদিনই আরবের লোকেরা কোনো একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকেনি। তারা চিরকাল গোত্র হিসাবে পৃথকভাবে থেকেছে এবং জীবনযাপন করেছে। এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের সদ্ভাবের পরিবর্তে যুদ্ধই ছিল স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই মুহাম্মদ(সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তারা আর কোনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে রাজি ছিল না। যেহেতু মুসলমান হলেই তাকে মদিনা রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে চলতে হবে, অনেকেই তাই ইসলাম ত্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল। যেহেতু আবহমান কাল থেকে তারা কোনো সরকারকে কোনো কর দেয়নি, কেবলমাত্র মদিনার সরকারই তাদের কাছ থেকে কর আদায়ে সমর্থ হয়েছিল; এবার তারা মদিনায় কোনো কর পাঠাতে সরাসরি অস্বীকার করল। জাকাত প্রদান করাটা তাদের কাছে বিরাট বোঝার মতো মনে হলো। তুলায়হা নামের এক ভণ্ড নবীর অনুসারীরা হজরত আবু বকরের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠাল যে তাদেরকে যদি জাকাত দেওয়া থেকে মুক্ত রাখা হয়, তাহলে তারা ইসলাম ধর্মের অন্য রীতিনীতি মেনে চলতে রাজি আছে। এরা ছাড়া অন্য সব আজন্ম উশৃঙ্খল আরবের কাছে নামাজ-রোজা-অজু-গোসল এইসব অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হলো। তারা মনে করল এইসব নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মুসায়লামা নামক একজন ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিল। সে বিয়ে করেছিল নবুয়তের আরেক দাবিদার সাজা নামের এক খ্রিস্টান রমণীকে। এরা দুইজনে মিলে বিশাল এক বাহিনী গড়ে তুলেছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

হজরত আবু বকর(রাঃ) দৃঢ়তার সাথে এইসব বিপদ মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন।

খলিফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে প্রথম কর্মদিবসে তিনি উসামা ইবনে জায়েদকে সিরিয়া সীমান্তে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। উল্লেখ্য রাসুল মৃত্যুর আগে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুতার যুদ্ধে শহীদ সাহাবিদের রক্তের বদলা নেবার জন্য। মদিনাকে অরক্ষিত রেখে উত্তরাঞ্চলে এই অভিযান চালানোকে অনেকেই সঠিক বলে মনে করেনি। হজরত ওমর পর্যন্ত খলিফাকে অনুরোধ করলেন এই অভিযান স্থগিত রাখতে। তবে তিনি বললেন যে নিতান্তই যদি অভিযান প্রেরণ করতেই হয়, তবে উসামার চাইতে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কাউকে নেতৃত্ব দান করা হোক। আবু বকর পরিষ্কার বললেন– 'যদি চারদিক থেকে নেকড়ে বাঘের দল মদিনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর আমি এখানে নির্জন ও একা পড়ে থাকি তবুও এই অভিযান অগ্রসর হবেই। আল্লাহর রাসুলের মুখের আদেশ কিছুতেই বাস্তবায়িত না হয়ে পারে না।' আর দ্বিতীয় পরামর্শের উত্তরে আবু বকর বললেন যে, স্বয়ং রাসুল যাকে নেতা নির্বাচিত করে গেছেন, তাকে পদচ্যুত করে অন্য কাউকে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করার ধৃষ্টতা তাঁর নেই।

উসামার যুদ্ধযাত্রার পরে বনু আবস এবং বনু জুবআনের লোকেরা মদিনা আক্রমণ করতে এলো। তারা একদল অবস্থান নিল রাবাজায়, আরেকদল জুল-কাস্‌সায়। খলিফা পার্শ্ববর্তী অনুগত গোত্রগুলিকে ডেকে নিয়ে মদিনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে পাহাড়া বসালেন। জুল-কাস্‌সা থেকে শত্রুদল একবার আক্রমণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলমানরা দৃঢ়তার সাথে সেই আক্রমণ প্রতিহত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। পরদিন ভোরে স্বয়ং খলিফা একদল সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে জুল-কাস্‌সায় অবস্থিত শত্রুবাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে তাদের বিতাড়িত করলেন।

এই জয়ের ফল পাওয়া গেল অচিরেই। বনু তামিম ও বনু তায়ীর গোত্রের লোকেরা জাকাত দিতে মদিনায় এলো। ইতোমধ্যে উসামা তাঁর সফল অভিযান শেষে সৈন্যদল নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন। শত্রুরা তখন একত্রিত হয়েছে রাবাজায়। খলিফা উসামাকে মদিনা রক্ষার ভার দিয়ে নিজে একটি বাহিনীসহ আক্রমণ চালালেন রাবাজায়। তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল শত্রুদের। এরপর খলিফা ফিরে এলেন মদিনায়। এখন অনেক গোত্রই আবার বশ্যতা স্বীকার করে জাকাত দিতে রাজি হলো।

এরপর হজরত আবু বকর জুল-কাসসায় সকল সৈন্যদের একত্রিত করলেন। পার্শ্ববর্তী মিত্র গোত্রগুলিকে খবর দেওয়া হলো। সম্মিলিত বাহিনীকে হজরত আবু বকর এগারোটি ভাগে ভাগ করলেন। এগারো জনকে দিলেন নেতৃত্ব। আর প্রত্যেক ভাগকে নির্দিষ্ট করে দিলেন নির্দিষ্ট এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব। খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠানো হলো তুলায়হাকে দমনের জন্য। মুসায়লামার বিরুদ্ধে অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হলো ইকরামা ও সুরাহবিলকে। মুহাজিরকে পাঠানো হলো ইয়ামেনে, আল-আলাকে বাহরাইনে, হুজায়ফাকে মাহরায়, এবং আমরকে পাঠানো হলো বনু কাজায়ার বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে খলিফা এই মর্মে ফরমান জারি করলেন যে যারা তওবা করে আত্মসমর্পণ করবে, তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে এবং ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর যারা এই আহ্বানকে অস্বীকার করবে, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। তাদেরকে ধ্বংস করা হবে, এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দি করা হবে।

খালিদ বনু তায়ীর গোত্রকে পরাজিত করলেন। ভণ্ড নবী তুলায়হাকে তিনি পরাজিত করলেন বুজাখার যুদ্ধে। তুলায়হা পালিয়ে সিরিয়ায় চলে গেলে তার গোত্র বনু আসাদ খালিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করল।

মুসায়লামা এদিকে ধূমধামের সাথে বিয়ে করেছে সাজাকে। বিবাহের মোহরানা হিসাবে সে ইয়ামামার অর্ধেক রাজস্ব সাজাকে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। তাদের দু'জনের মিলিত বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। ইকরামা এবং সুরাহবিল এই বাহিনীর বিরুদ্ধে পরাজিত হলে এবার নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হলো খালিদকে। খালিদ প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণ করায় মুসায়লামা পিছু হটে একটি দূর্গে আশ্রয় নিল। কিন্তু একজন অসীম সাহসী মুসলমান সৈনিক দূর্গের প্রাচীর পেরিয়ে ফটক খুলে দিলে মুসলিম বাহিনী প্রবেশ করল দূর্গে। মুসায়লামা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহ তার দশ হাজার সৈন্য নিহত হলো খালিদের বাহিনীর হাতে। মুসলমানদের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন বারো শত যোদ্ধা। এই ইয়ামামার যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। মদিনার ঘরে ঘরে উঠেছিল স্বজন হারানোর কান্নার রোল। কোনো একটি পরিবারও ছিল না যে পরিবারের কেউ না কেউ শহীদ হয়েছিলেন।

হজরত আবু বকরের প্রেরিত অন্য সেনাদলগুলিও সাফল্যের সাথে ধর্মত্যাগীদের মোকাবিলা করলে মদিনা ও ইসলামের সার্বভৌমত্ব আবার নিষ্কণ্টক হলো। সেই কারণেই হজরত আয়েশা বলেছিলেন– 'যখন নবীজী মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন আরবগণ ধর্মত্যাগ করল, ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং বিদ্রোহ দেখা দিল। মুসলমানগণ নবীর মৃত্যুতে শীতরাত্রিতে বর্ষণসিক্ত মেষপালের মতো হয়ে পড়ল। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে আবু বকরের নেতৃত্বাধীনে একত্রিত করলেন।'

AMARBOI.COM

একুশ

এমন কান্না মানুষ তখনই কাঁদে যখন তার এমন সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে যা পূরণ হবার নয়, কিন্তু সেই সর্বনাশ ঠেকানোর কোনো উপায়ও তার জানা নেই। চেখের সামনে আত্মজ– ছেলেকে বা মেয়েকে জবাই হয়ে যেতে দেখলেই বোধহয় মানুষ এইভাবে কাঁদে। সেই কান্না ইউসুফের ভোরের দিকে পাতলা হয়ে আসা ঘুমের মধ্যে আচমকা দুঃস্বপ্নের মতো হানা দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়। সে এমন তাড়াহুড়ায় দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে যে মনে হয় কান্নার শব্দটি তার চোয়ালে এক বিশাল ঘুষি মেরে তাকে উঠিয়ে দিয়েছে বিছানা থেকে।

কান্নারত মহিলাকে সে চেনে বলে মনে হয় না। বুবুর ঘরের বারান্দায় মহিলা মাটিতে লেপ্টে বসে আছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বুবু, দুলাভাই, তার ভাগ্নে-বউ এবং বাড়ির আরও কয়েকজন মেয়ে। তাদেরকে কিছুটা বিমূঢ়ই দেখাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামের প্রেক্ষাপটে চিরকালের ডাকসেটে দুলাভাইকে এমন কী-করবে-বুঝতে-না-পারা অবস্থায় আগে কখনোই দেখেনি ইউসুফ। বুবু মাটিতে লুটিয়ে পড়া মহিলার হাত ধরে তাকে মাঝে মাঝে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু মহিলাকে বড়জোর আরেকটু ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তোলা যাচ্ছে না মাটি থেকে। বুবুর নিচুগলার সান্ত্বনাসূচক শব্দগুলি মহিলার সরব কান্নায় অসহায়ের মতো হারিয়ে যাচ্ছে। ইউসুফ যে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে, সেই রকম পরিস্থিতিও যেন নেই। ভোরের ঘুমমাখা চোখে সবাইকে বোকা বোকা দেখাচ্ছে। শেষে নিজেই সামনে এগিয়ে এলো ইউসুফ। ভালো করে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল মহিলাকে। প্রথমেই নজরে পড়ে মহিলার পরনে দামি শাড়ি। হাতে মোটা মোটা মকরমুখি সোনার বালা। ভালো করে তাকালে বোঝা যায় তার নাক-কানের সোনার গয়নাও যথেষ্ট ভারি। ইউসুফ এটুকু বোঝে যে অন্তত অভাবগ্রস্ততার কারণে বিপদে পড়ে এই মহিলা বুবু বা দুলাভাইয়ের কাছে আসেনি। এবং এটাও বোঝা যায় যে সে আর যা-ই হোক গরীবের ঘরের মেয়ে বা বউ নয়।

ইউসুফকে দেখে দুলাভাই যেন একটু নড়ে-চড়ে ওঠে। ধমকের সুরে মেয়েটাকে বলে– থামো তো বাপু! কথা-বার্তা না বলে খালি খালি কান্দলে কি সুরাহা হয়ে যাবি!

দুলাভাইয়ের ভরাট কণ্ঠ মহিলার কান্নার শব্দকে অতিক্রম করে তার কানে বোধহয় ঢুকতে পারে। সে একটানা সরব কান্নাকে তখন হেঁচকি তুলে তুলে সবিরাম কান্নায় রূপান্তরিত করতে পারে। কিন্তু হঠাৎ মহিলার চোখ ইউসুফের উপর পড়ায় সে এমন ত্বড়িৎ গতিতে ইউসুফের দিকে ছুটে আসে যে ইউসুফ সরে যাওয়ার সময় পর্যন্ত করে উঠতে পারে না। তার আগেই মহিলা ছুটে এসে তার কোমর আঁকড়ে ধরে যেন পরম আশ্রয়স্থল পেয়ে গেছে এমনভাবে। ডুকড়ানো কান্নার মধ্যেই সে বলতে থাকে– ভাইরে তুমি আমার নিজের মায়ের প্যাটের ভাই! তুমি টাউনের শিক্ষিত মানুষ। আমাক একটা বুদ্ধি-পরামিশ্য দিয়া বাঁচাও ভাই!

হতবাক ইউসুফ কোনোক্রমে বলতে পারে– আহা আগে বলেন শুনি কী হয়েছে আপনার। তারপরে না বুদ্ধি-পরামর্শের ব্যাপার।

এবার মহিলা তাকে ছেড়ে বারান্দায় রাখা খাটিয়ার ওপর বসে। শব্দ করে কাঁদা বন্ধ করে বটে, কিন্তু কথা বলার মতো পরিষ্কার স্বর ফিরে পেতে তার বেশ সময় লাগে। কয়েকবার আঁচলে চোখ মুছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এক সময় কান্না থামাতে পারে। তারপর ইউসুফকে কিছু না বলে বারান্দা থেকে নেমে আবার বুবুর ঘরের বারান্দায় গিয়ে ওঠে। বুবু তাকে হাত ধরে একটা মোড়ায় বসায়। মহিলা ধরা গলায় বলে– আমার আর গলাত দড়ি দিয়া মরা ছাড়া উপায় নাই বড় ভাবি!

বালাই-ষাট, এমন কথা কোস না তো বোন! ব্যবস্থা একটা না একটা হবিই। আল্লা নিশ্চয়ই একখান ব্যবস্থা করবি।

কথাগুলোতে খুব যে জোর ফোটে তা নয়। বোঝা যায় বুবু নিজেও তার কথিত একটা-না-একটা ব্যবস্থার নিশ্চয়তার ব্যাপারে সন্দিহান।

তারপর আস্তে আস্তে সব জানা যায়। গাঁয়ের যত সমস্যা সব অভাবী মানুষের, এমন ধারণা ঠিক নয়। বেশি বড়লোকদের সমস্যাও বেশি। এই যে লালু শেখের বউ রাজিয়া। তার তো সংসারে অভাব কাকে বলে জানা নেই। কিন্তু এখন সে এমন সমস্যায় পড়েছে যে সমস্যায় আমাদের দেশে শুধু মেয়েমানুষই পড়ে। অর্থাৎ তার ধনী স্বামী লালু শেখ এখন আরেকটা বিয়ে করতে চাইছে। এখন এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা তার একার পক্ষে তো সমাধান সম্ভবই নয়, দুলাভাইয়ের পক্ষেও সামাল দেওয়া বেশ মুশকিল। লালু শেখ তো আর গরীব-গুর্বো কিংবা প্রভাবহীন কেউ না যে তাকে দুলাভাই এক ধমক দিয়ে এই কাজ থেকে নিবৃত করতে পারবে। আসলে দুলাভাই পারেওনি। বেশ কিছুদিন থেকে লালু শেখকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু লালু শেখ নতুন বিয়ে করবেই করবে। এই মেয়েকে বিয়ে করতে না পারলে তার নাকি জীবনই বৃথা। আর তাছাড়া সে আরেকটা বিয়ে করলে অসুবিধা কোথায়! এমন তো নয় যে দুনিয়াতে সে-ই প্রথম দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই গ্রামেই দুই বউঅলা লোক বেশ কয়েকজন আছে। আর লালু শেখ নিজে এখন বড় ব্যবসায়ী। জেলা শহরেও তার বাড়ি আছে, ব্যবসা আছে। সে শুধু দুই বউ না, বরং আরও বেশি বউকেও ভাত-কাপড়-সোনা-দানা দিয়ে পুষতে পারে। যেহেতু আওয়ামী লীগ-বিএনপি– এই দুই বড় দলকেই সে নিয়মিত চাঁদা দেয়, তাই তাদের জেলা-উপজেলা লেভেলের নেতারা তার সাথে সহবত নিয়েই ওঠা-বসা করে। তাই লালু শেখ গ্রামের বনেদি পরিবারের না হলেও খোনকার সাহেবরা, মানে ইউসুফের দুলাভাইরা, তাকে সমীহ না করে পারে না। তাকে আর কীভাবে বাধা দেওয়া যেতে পারে!

তবু দুলাভাই সান্ত্বনা দেয় রাজিয়াকে– তুমি বাড়িত যাও বউমা! আমি কথা তো আগেও কইছি লালুর সাথে। আজ আবার কবো। দেখি বুঝায়া-সুজায়া অর মত পাল্টান যায় নাকি! অন্তত জাওয়াল-মিয়া দুইডা বড় হইছে। তাগের মুখের দিকে তাকায়াও যদি লালু... তুমি বাড়ি যাও! আমি দেখতিছি কী করবার পারি! এই মজিদ, তুই লালুর কাছে গিয়া খবর দে! বল আমি অর সাথে কথা বলবার চাই।

এতক্ষণে মুখ খোলে ইউসুফ– দুলাভাই, প্রথম বউ যদি স্বেচ্ছায় সম্মতি না দেয়, তাহলে তো দ্বিতীয় বিয়ে কেউ করতে পারে না। বোঝাই তো যাচ্ছে, ইনার সম্মতি নাই। আপনারা গ্রামের সবাই সাক্ষী। উনি তো কোর্টে গেলে তার স্বামীর নির্ঘাত জেল হবে।

ইউসুফের দিকে এমনভাবে তাকাল দুলাভাই যেন সে এক অদ্ভুত কথা বলেছে। এমনকি লালুর বউকেও এই কথা শুনে তেমন আশান্বিত হতে দেখা গেল না। বুবু বলল– ঐসব টাউনের ব্যাপার এই অজ পাড়া-গাঁয়ে চলে না রে। এই বউ যাবি আদালতে! তাহলে লালু তো অক আর ঘরেই রাখবি না। সোজা তালাক দিয়া দিবি। সতীন থাকলে তা-ও তো ঘরে থাকবার পারবি রাজিয়া। কিন্তু সোয়ামি তালাক দিলে অর তো আর কিছু করার থাকবি না।

বিনা দোষে বউকে তালাক দেওয়া যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা তালাক দেওয়ার মতোন একটা অজুহাত কি আর পাওয়া যাবি না? মেয়েমানষের দোষ খুঁজে পাওয়া হলো দুনিয়ার সবচায়ে সহজ কাম।

দুলাভাইয়ের দিকে ফিরে বুবু বলে– ইউসুফের কথাত কান দিবার দরকার নাই। আপনে নিজে আর একবার লালুর সাথে কথা কন। দ্যাখেন যদি মিয়াডার কপাল পুড়া ঠেকাবার পারেন!

দুলাভাই বোধহয় নরম সুরেই কথা বলতে গিয়েছিল। কিন্তু লালু শেখ টাকার গরমে আর শহরের ক্ষমতাশালীদের সাথে সম্পর্কের গরমে দুলাভাইকে কোনো একটা অপমানসূচক কথা বলে ফেলেছে। এবার দুলাভাই আর পিছু হটতে রাজি নয়। লালুর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে নয়, খন্দকার সাহেবের সাথে অপমানসূচক আচরণ করার কারণে সমাজের সালিশে হাজির হতেই হলো লালুকে। সেই সালিশের কথায় লালু আবার বলে ফেলেছিল, আজ তার আর্জেন্ট কাজ আছে টাউনে। আজ সে সালিশে থাকতে পারবে না। অন্যদিন সালিশ ডাকা হোক। এটাই লালু শেখের সর্বনাশ ডেকে আনল। যে নিজে আসামী, তার কথায় সমাজের বসার দিন-ক্ষণ ঠিক হবে! গ্রামের সব মাতব্বর এবার এক সাথে বিপদ দেখে লালু আজকেই বসতে রাজি। ইফতারের পরে বসা। যদি বেশি সময় লাগে সালিশ করতে তাতেও কারও আপত্তি নেই। দরকার হলে তারাবি-র নামাজ পিছিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যে কোনো মূল্যে সমাজের শৃঙ্খলাকে বাঁচাতে হবে।

সুযোগটা নিল ইউসুফ আর আব্দুল খালেক।

সালিশ শুরু হতেই আব্দুল খালেক পরিষ্কার বলল– জনাব লালু শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ দুইটি। এক নম্বর অভিযোগ, তিনি স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ করতে চান। দুই নম্বর হলো, তিনি আমাদের সমাজের মাথা খোন্দকার সাহেবকে অপমান করেছেন। যেহেতু এই বিষয়ের সূত্রপাত লালু শেখ সাহেবের দ্বিতীয় বিবাহ নিয়েই, তাই আগে সুরাহা করা হোক এই বিষয়টি।

কাজেম প্রামাণিক একটু আপত্তি তুললেন– দ্বিতীয় বিবাহের বেপারডা ঠিক সমাজের বেপার না। পুরুষ মানুষ দুই বিয়া করতে চাইলে তারে কেউ জোর করে বাধা দিবার পারে না। যেহেতু শরিয়তে মুসলমান পুরুষের চার বিয়ার পর্যন্ত বিধান আছে।

জোর দিয়ে বলল আব্দুল খালেক– না, এখন আর মুসলমান পুরুষের চার বিয়ে জায়েজ নয়। একাধিক বিয়ে ইসলামসম্মত নয়।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বেশ কয়েকটা মসজিদের ইমাম। এতদিন পরে যেন তারা বাগে পেয়েছে আব্দুল খালেককে– আপনে কোন মাদ্রাসার ছাত্র আছিলেন? সারা দুনিয়ার মানুষ জানে ইসলামের শরিয়তে মরদ মানুষের চার বিয়া

জায়েজ। আর আপনে এই আইন জানেন না? আপনে কোন যোগ্যতায় মসজিদে ইমামতি করেন?

পুরো মজলিস এই কথা জানে এবং মানে। তাই এই কথার সমর্থনে গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে। সুযোগ কাজে লাগানোর ভঙ্গিতে লালু শেখ বলল– কালে কালে যে আর কত রকম কথা শুনা লাগবি তা আল্লাই মালুম। এমন দিন পড়ল যে ইমান-আমান রক্ষা করাই দায়।

সমাজের লোকদের শান্ত করার ভঙ্গিতে হাত তুলল আব্দুল খালেক। বলল– আমি তো বলিনি যে শরিয়তে এই কথা নাই। আছে। অবশ্যই আছে। কিন্তু শরিয়তে থাকা মানে ইসলামে থাকা নয়। শরিয়ত মানেই ইসলাম নয়।

এ আবার কেমন কথা!

কোরআনে কেউ কি দেখাতে পারবেন যে চার বিবাহ মুসলমান পুরুষের জন্য বৈধ?

এবার একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হুজুররা। কোরআন তারাও পড়েছে বটে, কিন্তু ঠিক কোথায় এই সংক্রান্ত আয়াত আছে, এটি তাদের মনে নেই। আসলে এমন একটি বিধানকে কেউ যে কোরআনের নামে চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে, তা কারও মাথাতেই আসেনি। কিন্তু হেরে গেলে তো তাদের সব শেষ। তাই মরিয়া হয়ে এক ইমাম বলে– এই জাগাত তো মসলা-আয়াত নিয়া কথা বলা মুশকিল। যদি আপনেরা চান আমলে এই বিষয়ে বাহাসের দিন ঠিক করেন!

আব্দুল খালেক বিনয়ের সঙ্গে বলে– বাহাসের কোনো দরকার নেই। আমি জানি আপনারা সবাই কোরআন-সুন্নাহ-ফিকাহ শাস্ত্র পড়েই মওলানা হয়েছেন। আপনাদের কারও যোগ্যতা আমার চেয়ে কম নয়, বরং বেশি। কিন্তু মানুষ তো সব জিনিস সব সময় মুখস্ত রাখতে পারে না। আমি সঙ্গে কোরআন শরীফ এনেছি। সেই সঙ্গে এই যে অর্থসহ তফসির বইও আছে।

দুই হাতে উঁচু করে সেগুলি সালিশের মানুষদের দেখাল আব্দুল খালেক। তারপর কোরআন শরীফের পৃষ্ঠা উল্টে এক জায়গায় এসে থামল– এই যে এখানে। সুরা নিসার তিন নম্বর আয়াত। সুর করে আরবিতে তেলাওয়াত করল আব্দুল খালেক। তারপর অর্থ বলল তফসির বই থেকে– "এতিমদের তাদের সম্পদ বুঝাইয়া দাও। খারাপ মালামালের সহিত ভালো মালামালের অদল-বদল করিও না। আর তাহাদের ধনসম্পদ নিজেদের ধনসম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা গ্রাস করিও না। নিশ্চয়ই ইহা বড়ই মন্দ কর্ম। আর যদি তোমরা ভয় করো যে এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে সেইসব মেয়েদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে ভালো লাগে তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাও দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এই রূপ আশংকা করো যে তাহাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখিতে পারিবে না তবে একটিই...।"

এই আয়াতটিকে ভিত্তি করেই শরিয়তে বলা হয়েছে যে পুরুষ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। কিন্তু ভালোভাবে পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবে যে এই আয়াতের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়েছে। এবং প্রকারান্তরে সেখানেও একাধিক বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এ আবার কেমন কথা!

একটু ধৈর্য ধরে শোনেন দয়া করে। অনুনয় ঝড়ল আব্দুল খালেকের কণ্ঠে– আমি বিস্তারিত বলব। তবে তাতে বেশি সময় লাগবে না। আর আমার কথার পরেও যাদের সন্দেহ থাকবে, তারা চাইলে এই কোরআন শরীফ এবং এই তফসির বই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়তে পারবেন। এবার একটু ব্যাখ্যা শোনেন মনোযোগ দিয়ে।

ওহুদের যুদ্ধে অনেক মুসলমান নিহত হলে এতিমের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তাদের স্বার্থরক্ষা করা ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং ইসলামের স্বার্থে দরকার হয়ে পড়েছিল। তখন সমর্থ মুসলমান পুরুষের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কিন্তু দুনিয়ার অন্য মেয়েকে বিয়ে করলে তো আর এতিম মেয়েদের সমস্যার সমাধান হয় না। তারই সমাধান দিয়েছিল এই আয়াত।

উম্মুল মোমেনিন হজরত আয়েশাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন– অনেক সময় এতিম মেয়ে ধনশালী ও সুন্দরী হলে অভিভাবক নিজেই উপযুক্ত মোহরানা না দিয়ে তাকে আপনার সুবাদে বিবাহ করে; কিন্তু এতিম বালিকা ধনবান না হলে বা সুন্দরী না হলে সেইরূপ করে না। এই ধরনের অন্যায় বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

'এই ধরনের অন্যায় বন্ধ করার জন্যই এই আয়াত নাজিল করা হয়েছে' কথাটার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে যেখানে 'এই ধরনের অন্যায়' নেই, সেখানে বন্ধ করারও কিছু নাই। সেখানে এই বিধান প্রয়োগের নির্দেশ কোরআন দেয়নি।

তারপরে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ১২৯ নম্বর আয়াতে– "তোমরা কখনও নারীদিগকে সমান রাখিতে পারিবে না যদিও ইহা চাও।"

আর সমান রাখতে না পারলে কিছুতেই একাধিক বিবাহ বৈধ নহে। কিন্তু মানুষ যে সমান রাখতে পারে না, সে কথা কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে। কারণ সমান রাখতে হলে প্রেম-ভালোবাসাকেও সমান ভাগে ভাগ করতে হবে। তা আদৌ সম্ভব নয়। এই কারণেই হজরত ফাতিমা বেঁচে থাকা পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ(সাঃ) আলীকে কিছুতেই দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেননি। বরং তিনি বলেছিলেন– 'আলী আমার কন্যা ফাতিমাকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমতি দেবো না। কেননা ফাতিমা হচ্ছে আমার শরীরের অংশ। আমি ঐ জিনিস ঘৃণা করি যা সে ঘৃণা করে এবং তাকে যা আঘাত করে আমাকেও তা আঘাত করে।'

এবার এই প্রথম কথা বলল ইউসুফ– এই কারণেই মরক্কো, তিউনিসিয়া, সেনেগালের মতো মুসলিম দেশে বহুবিবাহ আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এবার শেষ চেষ্টা করল লালু শেখ– তাহলে আমাগের নবী যে অতগুলান বিয়া করিছিলেন!

তাৎক্ষণিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল আব্দুল খালেক।

ইউসুফ বলল– তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ পেয়েছেন বলেই তো এত জোরের সাথে নিষেধ করতে পেরেছেন।

বাইশ

রাসুলুল্লাহর বহুবিবাহ নিয়ে রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ইউসুফ। এই ব্যাপারটি নিয়ে ইসলামবিরোধীরা সুযোগ পেলেই কটুক্তি করে। কিছুদিন আগেও এই প্রশ্নে নিজেরই খটকা ছিল ইউসুফের। কিন্তু এখন আর নিজেকে এই কারণে মুসলমান হিসাবে ছোট মনে হয় না ইউসুফের। কেননা এখন অন্তত এটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে রাসুলের এই বহুবিবাহের ব্যাপারটিকে বিচার করতে হবে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে যাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, তা ঐ সময় অর্থাৎ চৌদ্দ শো বছর আগে অস্বাভাবিক ছিল কি না, তা গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে। তাছাড়া রাসুলের বিভিন্ন বিয়ের সঙ্গে বিভিন্ন কার্য-কারণ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। তার সাথে নারীলোলুপতা কতখানি ছিল, আর কতখানি ছিল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির দাবি?

ক্যারেন আর্মস্টং-এর ব্যাখ্যাটাই তার কাছে সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ বলে মনে হয়। যে ক'টি বই ইউসুফ এই বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এই লেখকের ব্যাখ্যাটিই তার কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) সম্পর্কে অযথা ওকালতির কোনো কারণ এই লেখকের নেই। প্রথমত তিনি নিজে একজন নারী। দ্বিতীয়ত তিনি মুসলমান নন। তিনি মনে করেন যে, ঐ সময় আরবে বহুবিবাহ সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন ছিল। হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসাবে, তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের হিসাবে তুলনামূলকভাবে অনেক কম সংখ্যক বিবাহই করেছিলেন। তিনি প্রথম বিয়ে করেছিলেন হজরত খাদিজাকে, যিনি ছিলেন বয়সে রাসুলের চাইতে পনেরো বছরের বড়। পঁচিশ বৎসর বয়সের একজন সমর্থ যুবক হিসাবে এই বিয়ে রাসুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনঃকষ্টের কারণ হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। বরং তাঁদের এই দাম্পত্য জীবন ছিল মধুর ও সুখের। হজরত খাদিজা ছিলেন সকল কর্মে রাসুলের সাহায্যকারিনী, তিনিই ওহিপ্রাপ্তির পরে নির্দ্বিধায় মুহাম্মদ(সাঃ) কে আল্লাহর মনোনীত নবী হিসাবে স্বীকার করেছেন এবং প্রথম মুসলমান হওয়ার সম্মান অর্জন করেছেন। কেউ কেউ বাঁকা দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছে এই বিবাহকে। বলার চেষ্টা করেছে যে খাদিজার সম্পদের লোভই মুহাম্মদকে এই বিবাহে প্রণোদনা যুগিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে একটি বাক্য বলাই যথেষ্ট হবে যে, মুহাম্মদ বিবাহসূত্রে তাঁর স্ত্রীর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই ধনসম্পদ তিনি নিজের ভোগের জন্য ব্যয় করেননি; বরং ব্যয় করেছিলেন মানবতার কল্যাণে। খাদিজা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমতী। যখনই মুহাম্মদ(সাঃ) শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, তখনই তিনি সোজা চলে যেতেন খাদিজার কাছে। খাদিজা তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, ভারমুক্ত করতেন, সহজ করতেন, তাঁর তথা সত্যের জয় ঘোষণা করতেন। খাদিজা যতদিন বেঁচে ছিলেন, রাসুল ততদিন অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি। বরং খাদিজার মৃত্যুর পরেও অন্য স্ত্রীদের কাছে, তারা কেউ যে তাঁর জীবনে খাদিজার বিকল্প হতে পারবেন না, এমন কথা বলে তাদের ঈর্ষার কারণ করে তুলেছেন মৃতা খাদিজাকে।

তিনি বিয়ে করেছিলেন আবু সালামাহ-র বিধবা পত্নী হিন্দ বিনতে আল মুঘিরাকে। যাঁকে সবাই চিনত উম্মে সালমা নামে। মক্কার শক্তিশালী মাখজুম গোত্রের মেয়ে ছিলেন তিনি। তখন উম্মে সালমার বয়স উনত্রিশ বৎসর, কিন্তু তখনও অসম্ভব রূপবতী। তিনি প্রাজ্ঞ মহিলা ছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাঁর উপদেশ রাসুলকে উপকৃত করেছিল। তিনি অবশ্য প্রথমদিকে বিবাহে সম্মত হননি এই বলে যে তাঁর বয়স হয়ে গেছে, এবং তাঁর মধ্যে ঈর্ষাবোধ কাজ করে, ফলে তিনি সম্ভবত হারেমের জীবন বেছে নিতে পারবেন না। মুহাম্মদ(সাঃ) মৃদু হেসে তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে, তাঁর নিজের বয়স আরও বেশি এবং আল্লাহ উম্মে সালমার ঈর্ষার দায়িত্ব নেবেন।

হজরত ওমরের কন্যা হাফসা বিধবা হলে ওমর তার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন ওসমানের কাছে। ওসমান অসম্মতি জানিয়েছিলেন। এবার আবু বকরের কাছে গেলে তিনিও বিয়ে করতে রাজি হননি হাফসাকে। তখন রাসুল বিয়ে করেছিলেন প্রিয় সাহাবি ওমরের কন্যাকে। হাফসার বয়স তখন আঠারো বছর। সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। কিন্তু পিতার মতোই প্রচণ্ড রগচটা।

জয়নাব বিনতে জহ্‌শ ছিলেন রাসুলের চাচাতো বোন। তিনি ছিলেন রাসুলের পালক-পুত্র জায়েদের স্ত্রী। জায়েদ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে মুহাম্মদ(সাঃ) বিয়ে করেছিলেন জয়নাবকে। এই বিয়ে নিয়ে অন্য ধর্মের মানুষরা সবচেয়ে বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুৎসা রটনা করেছে। জয়নাব যখন জায়েদের স্ত্রী, তখন একদিন দুপুরে মুহাম্মদ(সাঃ) গিয়েছিলেন জায়েদের কাছে। জায়েদ বাড়িতে ছিলেন না। দরজা খুলেছিলেন জয়নাব। কোনো অতিথির আগমনের আশংকা করেননি তিনি, ভেবেছিলেন স্বামীই বাড়িতে ফিরে এসেছেন। তাই তখন তিনি ছিলেন স্বল্পবসনা। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সেও অসাধারণ রূপবতী জয়নাবকে দেখে তাঁর সৌন্দর্যে মোহিত নবী বিড়বিড় করে বলেছিলেন 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটান।' জয়নাব কোনো সময়েই এককালের ক্রীতদাস কুৎসিতদর্শন জায়েদের সঙ্গে বিয়েতে রাজি ছিলেন না। এবার জয়নাব রাসুলের মুগ্ধতাকে নিজের উদ্ধার পাওয়ার পথ হিসাবে বেছে নিলেন। জায়েদের কাছে বারবার এত জোরের সাথে রাসুলের ওপর নিজের রূপের প্রভাবের কথা বলতে শুরু করেছিলেন যে জায়েদের পক্ষে দাম্পত্যজীবন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। জায়েদ তখন সরাসরি রাসুলের কাছে গিয়ে বললেন যে, পয়গম্বর যদি চান তাহলে তিনি জয়নাবকে তালাক দিতে রাজি আছেন। রাসুল তাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়ে স্ত্রীকে কাছে রাখার আদেশ দেন। কিন্তু বিয়ে টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। জয়নাবের জ্বালাতনে অতিষ্ট জায়েদ শেষ পর্যন্ত তাকে তালাক দিলেন, এবং এক ধরনের দায়িত্ববোধ থেকে রাসুল জয়নাবকে বিয়ে করলেন। রাসুলের সবচেয়ে সমালোচিত বিবাহ এটি। এমনকি হজরত আয়েশাও এই নিয়ে রাসুলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। জয়নাব ছিলেন রাসুলের পোষ্যপুত্রের স্ত্রী। তাকে বিয়ে করা আরবের তৎকালীন বিধি অনুযায়ী সঠিক ছিল কি না, তা নিয়ে অনেকেই দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু এই সময় ওহি নাজিল হয়ে সব সন্দেহের নিরসন করে। ওহিতে বলা হয়েছে যে এই বিয়ে অসঙ্গত নয়। কারণ জায়েদ ছিলেন মুহাম্মদ(সাঃ) এর পালকপুত্র, অতএব দু'জনের সম্পর্ক ছিল কৃত্রিম। কাজেই জয়নাবকে বিয়ে করার মাধ্যমে রাসুল কোনো অন্যায় করেননি। এই ওহি নাজিল হওয়ার সময় রাসুল ছিলেন আয়েশার কাছে। হজরত আয়েশা ওহি শুনে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন– 'সত্যিই এই বিয়েতে একটু তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন আল্লাহ!'

উম্মে সালমা নিজের ঈর্ষার জন্য সংকুচিত থাকলেও রাসুলের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঈর্ষার প্রকাশ দেখিয়েছেন হজরত আয়েশা। যদিও জীবিতা স্ত্রীদের মধ্যে তাঁকেই নাকি সবচেয়ে প্রাধান্য দিতেন রাসুল। কিন্তু রাসুলের মুখে মৃতা খাদিজার প্রশংসাও শুনতে রাজি ছিলেন না আয়েশা। খাদিজাকে তিনি একবার বলেছিলেন 'দাঁতপড়া বুড়ি।'

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বনু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে এক জিহাদে নেতৃত্ব দেন রাসুল। সেবার তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়েশাকে। এই জিহাদে জয়লাভ করে মুসলমানরা গণিমতের মাল হিসাবে অর্জন করে দুই হাজার উট, পাঁচ হাজার ছাগল ও ভেড়া, এবং গোত্রপ্রধানের কন্যা জুরাইয়া বিনতে আল হারিসসহ দুইশো জন মহিলাকে। নিজের মুক্তিপণের জন্য দর-কষাকষি করতে মুহাম্মদ(সাঃ)-এর কাছে এসেছিলেন জুরাইয়া। এই অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে দেখে হৃদয় কেঁপে উঠেছিল আয়েশার। তিনি পরবর্তীতে বলেছিলেন– আল্লাহর কসম, আমার ঘরের দরজায় তাঁকে (জুরাইয়া) দেখামাত্র অপছন্দ করে ফেলেছিলাম। আমি জানতাম আমার মতো উনিও (রাসুল) তাঁকে দেখতে পাবেন।

জুরাইয়া ইসলাম গ্রহণের পরে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এক শত্রু গোত্রকে চিরস্থায়ী মিত্রে পরিণত করেন রাসুল।

বলা হয়ে থাকে বৈধ স্ত্রী ছাড়াও দুইজন উপপত্নী ছিল রাসুলের। একজন রায়হানা। তাঁকে রাসুল ঘরে এনেছিলেন ইহুদি গোত্র বনু কোরাইজাকে উচ্ছেদের পরে। অপরজন মারিয়া কিবতিয়া (মেরি দ্য কপ্‌ট)। মেরি ছিলেন খ্রিস্টান সুন্দরী যুবতী। তাঁকে রাসুলের কাছে পাঠিয়েছিলেন মিশরের তদানীন্তন গভর্নর। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে রাসুলের ঔরসে মেরির গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল ইব্রাহিম। এই পুত্রকে অসম্ভব ভালোবাসতেন মুহাম্মদ(সাঃ)। তাকে সবসময় নিজের কাছে রাখতে চাইতেন। শিশুপুত্র ইব্রাহিমকে কাঁধে নিয়ে মদিনার রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন উৎফুল্ল নবী– এমন দৃশ্য সাহাবিদের মনেও এনে দিত খুশির আমেজ। কিন্তু ৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসে আংশিক সূর্যগ্রহণের সময় রাসুলুল্লাহকে শোকে নিমজ্জিত করে মৃত্যুবরণ করে পনেরো মাসের শিশু ইব্রাহিম।

তবে বহুবিবাহ যে সুখের নয়, বরং অনেক সময়ই মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা নিজের জীবনেও টের পেয়েছেন রাসুল। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা মাঝে মাঝে তাঁর জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছে। এমনকি একবার রাসুল তাঁর সব স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

তেইশ

আব্দুল খালেককে বেশ বিমর্ষ এবং চিন্তিত মনে হচ্ছে।

কী হয়েছে জিজ্ঞেস করায় সরাসরি উত্তর না দিয়ে উল্টা প্রশ্ন করল সে ইউসুফকে– আচ্ছা ভাইজান, এই যে লক্ষ লক্ষ ছেলে কওমি মাদ্রাসায় পড়ছে, মানে আমার মতো যারা আরকি, তাদের জন্যে কি আমাদের রাষ্ট্রের কিছু করণীয় নাই?

অবশ্যই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে রাষ্ট্র এই ধরনের তালেবে এলেমদের জন্য কিছু করছে না কেন?

আমাদের দেশে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতিই বা তার দায়িত্ব পালন করছে বলেন? রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাদের হাতে সেই মুষ্টিমেয় একটা শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কেউ কি আছে যে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট নয়?

আপনার এই কথা অবশ্য ঠিক আছে। কিন্তু দ্যাখেন, যারা আপনাদের মতোন লেখাপড়া শিখছে, কিংবা হাতের কাজ, মানে কারিগরি বিদ্যা শিখছে, তারা কিন্তু কোনো-না-কোনো ভাবে নিজেদের জীবন চালিয়ে নিতে পারছে। কিন্তু আমার মতো এই লক্ষ লক্ষ মানুষের বাচ্চাগুলান যাবে কোথায়?

উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আব্দুল খালেক। কিন্তু ইউসুফ কোনো কথা বলছে না দেখে ফের নিজেই বলতে থাকে– তারা কেউ কেউ আমার মতো কোনো গাঁয়ে-মহল্লায় লোকদের ফুসলিয়ে অপ্রয়োজনীয় মসজিদ বানিয়ে নিজের জন্য একটা খোঁয়াড় খুঁজে নেবে। কেউ কেউ নিচ্ছেও। এখন আপনি অনেক পাড়ায় দেখবেন, প্রত্যেক রাস্তার বাঁকে বাঁকে মসজিদ। দেখা যায়, নামাজের সময় একটা কাতারই পূরণ হয় না; জুম্মার দিনও হয়তো কোনো মসজিদেরই অর্ধেক খালি থাকে, তবু মসজিদ বানানো চাই। এখন আবার ফ্যাশান হয়েছে। সারাজীবন দুই নম্বরি পথে টাকা কামিয়ে কেউ কেউ নিজের খরচে মসজিদ বানাচ্ছে। যাতে মরার পরেও সে ছদকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে মুসল্লিদের নামাজের ছওয়াব পেতে পারে। এই লোকগুলান আল্লাকে ভয় বোকা ভাবে, নাহয় ভাবে অবিবেচক। তা নাহলে হারাম পয়সায় মসজিদ তৈরি করে ছদকায়ে জারিয়ার আশা করে কীভাবে? তা তারা যা ভাবে ভাবুক। কিন্তু আমাদের মতো মোল্লারা যখন জানে যে এই লোকের মসজিদ দুই নম্বরি টাকায় বানানো, তখনও তাকে সেখানে পেটের দুঃখে কাজ করতে হয়। কিন্তু সবার তো এই কাজও জোটে না। তখন তারা কী করবে? তারা তো হত-গরীবের ছেলে। তখন চরমপন্থী মৌলবাদী দল তাদের ভিড়িয়ে নিতে পারে খুব সহজেই। সেসব দলে যোগ দিলে অন্তত ভাতা পাওয়া যায়। তাতে কি তাদের দোষ দেওয়া চলে?

ইউসুফ বলে– একেবারে যে দোষ দেওয়া যাবে না তা নয়। কারণ তারা তো নিজেরা অন্তত জানে যে ইসলাম এই ধরনের সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে। তাছাড়া এই ধরনের সন্ত্রাস, কয়েকটা বোমা ফাটানো, কিছু লোককে কতল করা– এগুলির মাধ্যমে একটা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করা যায় না। চরমপন্থী বাম দলগুলো গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই একই ভুল করে আসছে। সেটা জেনেও যারা এই পথে মানুষকে পরিচালিত করে, তারা নিঃসন্দেহে অপরাধী। আইনের কথা আমি বলছি না; আমি বলছি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার একই কথা প্রযোজ্য তাদের সম্পর্কে, যারা এই সমস্ত কাজে বা দলে যোগ দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে মানুষ বাঁচবে কীভাবে? মানুষ এই সব অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের ধর্মের জীবন পাবে কীভাবে?

ম্লান হাসল ইউসুফ– বড় কঠিন প্রশ্ন করলেন ভাই। আমি তো আমি, সম্ভবত কেউই এখনও নিশ্চিত নয় ঠিক কোন পথে আসবে আমাদের দেশের মানুষের মুক্তি!

তবে– একটু থেমে দৃঢ় কণ্ঠে বলল ইউসুফ– এটুকু নিশ্চিত জানি, যেসব দল কাজ করছে, এবং যেভাবে কাজ করছে, তাদের মাধ্যমে এবং তাদের পথে যে বাঙালি মুসলমানের মুক্তি নাই, তা বোঝার জন্য কোনো বুদ্ধিজীবী হওয়ার দরকার পড়ে না। এরা কেউ কেউ জেনে-শুনে মুসলমানদের বিপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ আবার না জেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দলগুলি ক্রিমিনাল, আর দ্বিতীয় দলগুলি অজ্ঞ।

তাহলে আমাদের কী করার আছে?

যা করছি, আপাতত সেটাই আমাদের করার আছে।

কী করছি আমরা?

পথ খুঁজছি।

আপনি আর আমি– এই দুই জনে পথ খুঁজে লাভ কী? যদি আমরা পথ খুঁজেও পাই তাহলেও সেই পথের কথা, মানে আমাদের কথা শুনতে যাচ্ছে কে?

সেইটা পরের প্রশ্ন। সময় এলে তখন দেখা যাবে। এখন পথ খোঁজার কাজ চলছে। আর আমরা নিশ্চয়ই একা নই, আমাদের মতো আরও অনেকেই একইভাবে পথ খুঁজে চলেছেন।

নিজেকেই যেন ব্যঙ্গ করল আব্দুল খালেক– হাতি-ঘোড়া গেল তল...

হো হো করে হেসে ফেলল ইউসুফ– যাদের আপনি হাতি-ঘোড়া বলছেন, মানে দেশের নেতা-আমলা-বুদ্ধিজীবী-ফতোয়াবাজ ধর্মীয় নেতা– তারা তো কেউ পথ খুঁজতে ব্যস্ত নয়। বরং ব্যস্ত মানুষকে পথ ভোলাতে।

যাহোক, আমরা আগের আলোচনাতে আসি। আপনার কি মনে হয় এখনও, মানে সিয়া সিত্তাহর পরেও কি মিথ্যা হাদিস অবশিষ্ট আছে?

আব্দুল খালেক অম্লান বদনে বলল– শুধু আমি মনে করি না, আরও অনেকেই মনে করেন যে এখনও অনেক মিথ্যা হাদিস চালু আছে।

এত যাচাই-বাছাইয়ের পরেও!

উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল আব্দুল খালেক। ফিরে এলো কয়েকটা বই নিয়ে। হাতে নিয়ে দেখল ইউসুফ। বোখারি শরীফ ১ম খণ্ড মওলানা আজিজুল হকের অনুবাদ, আরেকটি বইও বোখারি শরীফের ১ম খণ্ড। তবে এটির প্রকাশক আধুনিক প্রকাশনী। আর তিনটি বইয়ের একটি মুসলিম শরীফ, একটি তিরমিজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং একটি আবু দাউদ। বইগুলি ইউসুফের দিকে এগিয়ে দিল আব্দুল খালেক। বিপন্ন স্বরে বলল ইউসুফ– আরে ভাই, আমি এতসব হাদিস-কেতাব ঘেঁটে কীভাবে বুঝব কোনটা সহি হাদিস আর কোনটা জইফ হাদিস! আর এতগুলি বই শুধু একবার চোখ বুলিয়ে যেতেই তো আমার এক সপ্তাহ লেগে যাবে।

এক সপ্তাহ লাগবে না! আব্দুল খালেক আশ্বাস দেয়– এখনই পড়া হয়ে যাবে আপনার। আমি কাগজ দিয়ে চিহ্ন রেখেছি। আপনি শুধু সেই পৃষ্ঠা কয়েকটা পড়ে ফেলেন।

প্রথমে বোখারি শরীফ খুলল ইউসুফ। আব্দুল খালেকের চিহ্নিত করে দেওয়া পাতায় যেগুলি রয়েছে, সেই হাদিসগুলি পড়তে শুরু করল। শিরোনাম লেখা আছে– অজু, গোসল, রোজা, নামাজ ও হায়েজ-নেফাস অধ্যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর(রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, লোকেরা বলে, যখন তুমি পেশাব-পায়খানায় বসবে, তখন তুমি কিবলার দিকে কিংবা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না। আমি একদিন ঘরের ছাদে উঠলাম। দেখলাম রাসুলুল্লাহ(সাঃ) দু'টি ইটের ওপর বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাবের জন্য বসে আছেন।

পরের চিহ্ন দেওয়া হাদিস– আয়েশা(রাঃ) বলেন: আমি রাসুলুল্লাহর(সাঃ) কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে দিতাম; নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে অতঃপর মামুলিভাবে ধুয়ে ফেলতাম। তারপর তিনি কাপড়ের পানি ভিজা দাগসহ নামাজ পড়তে যেতেন।

এরপর– মায়মুনা(রা) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল জানাবাতের (সঙ্গমোত্তর) গোসল করলেন। হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধুলেন, তারপর তা দেয়ালে রগড়ে ধুয়ে ফেললেন।

কান গরম হয়ে উঠল ইউসুফের। তবু সে পড়ে চলল– আয়েশা(রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি মাসিক ঋতু অবস্থায় রাসুলের চুল আঁচড়ে দিতেন। এমন অবস্থায় যখন রাসুল মসজিদে এতেকাফ করতেন, তিনি তাঁর মাথা আয়েশার দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং আয়েশা মাসিক অবস্থায় নিজের ঘর থেকে তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন। আয়েশা বলেন, আমার মাসিক ঋতু অবস্থায় তিনি আমার কোলে হেলান দিয়ে কোরআন পাঠ করতেন।

এবার মুখ তুলল ইউসুফ। আব্দুল খালেক হেসে বলল– পড়ে যান।

আবার পড়তে শুরু করল ইউসুফ– আনাছ ইবনে মালিক এবং কাতাদা(রাঃ) থেকে বর্ণিত: তারা বলেন, নবী(সাঃ) দিনে বা রাতে পর্যায়ক্রমে (মধ্যবর্তী ফরজ গোসল ছাড়াই) ১১জন বিবির সাথে সঙ্গম করতেন। কাতাদা বলেন, আমি আনাছকে জিজ্ঞেস করলাম, হজরতের কি এতই শক্তি ছিল? তিনি বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে রাসুলুল্লাহ ৩০ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত ছিলেন।

আয়েশা(রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুমতী হলে এবং সেই অবস্থায় রাসুলুল্লাহ তার সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে ঋতুর প্রাবল্যের সময় ঋতুর কটিবেশ পরার নির্দেশ দিতেন। তারপরে তিনি তার সঙ্গে মিশামিশি করতেন।

এবার তিরমিজি বইটি এগিয়ে দিল আব্দুল খালেক। চিহ্ন দেওয়া হাদিসটি পড়ল ইউসুফ– বিবি আয়েশা(রাঃ) বলেন, রাসুল বলেছেন, যখন পুরুষের খৎনাস্থল স্ত্রীর খৎনাস্থলে প্রবেশ করবে তখন উভয়ের গোসল ফরজ হবে। আমি ও রাসুল তা করেছি অতঃপর গোসল করেছি।

আরও বই এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল আব্দুল খালেক। ইউসুফ মাথা নাড়ল– আর দরকার নেই। আমার পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না।

আব্দুল খালেক বলল- আপনি কি আপনার উত্তর পেয়েছেন?

মনে হয় পেয়েছি। এই সব বিষয় এমন খোলাখুলি ভাবে...

আব্দুল খালেক মাথা নাড়ল– ভাবতে পারেন! এমন কত হাদিস যে রাসুলের পুত-পবিত্রা স্ত্রীদের নামে উল্লেখ করা হয়েছে! তাঁরা উম্মুল মোমেনিন। সকল মোমেনের জননী। তাদেরকে এইসব প্রশ্ন কোনো মোমেন-মুসলমান করতে পারেন! আর তাঁরাও লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে পর-পুরুষের কাছে এই সব বিষয় নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে পারেন!

ছহি হাদিস যাঁদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের কথা একবার চিন্তা করা দরকার। প্রথমেই আছেন আবু হুরায়রা। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৬৪টি। হজরত আয়েশার বর্ণিত হাদিস ১২১০টি। আবদুল্লাহ বিন আমরের ৭০০টি। আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের ১৬৬০টি। আবদুল্লাহ বিন ওমরের বলা হাদিস ১৬৩০টি। জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেছেন ১৫৪০টি হাদিস। আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন ২২৩৬টি হাদিস। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাসুলের নবুয়তের প্রথম থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে সমস্ত সাহাবি সুখে-দুঃখে-জিহাদে-শান্তিতে তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন, তাঁরা কেউ এই তালিকার ওপরের দিকে নেই। বেশির ভাগের নাম উল্লেখিতই হয় না। অর্থাৎ যারা সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করার যোগ্য ছিলেন, তাঁরা কেউ খুব একটা হাদিস বর্ণনা করেননি। অন্যদের কথা বাদ দিলেও হজরত আবু হুরায়রার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা ছিলেন দক্ষিণ আরবের আজ্‌দ গোত্রের মানুষ। তাঁর আসল নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর প্রকৃত নাম আবদুর রহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইবনে সাখ্‌র। আবার কারও মতে উমায়ের ইবনে আমির। তিনি বিড়াল খুব ভালোবাসতেন এবং বিড়াল পুষতেন বলে তাঁকে ডাকা হতো আবু হুরায়রা বলে। তার অর্থ হচ্ছে 'ছোট বিড়ালের পিতা'।

তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খায়বর যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর। মনে রাখা দরকার রাসুলুল্লাহর বয়স তখন ষাট বৎসর। অর্থাৎ আবু হুরায়রার ইসলাম গ্রহণের পরে রাসুল বেঁচে ছিলেন মাত্র তিন বৎসর। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি রাসুলের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং আসহাবুস সুফফার অন্তর্ভুক্ত হন। প্রথম দিকে তিনি জীবনধারণের জন্য শুধুমাত্র ন্যূনতম কাজটুকুই করতেন। যেমন জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করা, কিংবা মনিবের উটের রশি ধরে তা টেনে নিয়ে চলা ইত্যাদি। রাসুল প্রতিদিন হাদিয়া হিসাবে যে খাদ্যদ্রব্য লাভ করতেন, তা প্রায় সবসময়ই আসহাবুস সুফফার মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

সংসারত্যাগ করে চরম বৈরাগ্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতেন আবু হুরায়রা। কিন্তু রাসুলের মৃত্যুর পরে তিনি বিবাহ করেন, সন্তানাদির পিতা হন, এবং যথেষ্ট ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর(রাঃ)-এর সময় তাঁকে বাহরাইনের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে অর্থ সঞ্চয়ের অভিযোগে হজরত ওমর তাঁকে পদচ্যুত করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে খলিফা তাঁকে আবার উক্ত পদে নিয়োগ দিতে চান। কিন্তু আবু হুরায়রা নিজেই ঐ পদে ফিরতে অস্বীকৃতি জানান।

সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষে লেখা হয়েছে–'অনেকে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাঁর হাদিসকে অগ্রাহ্য করেন।' এমনকি আবু হুরায়রার খুব বড় অনুরাগী বাংলাদেশের হাদিস-বিশারদ আজিজুল হকও লিখেছেন যে, কোরআন নিয়ে কেউ কখনও হাদিস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে আবু হুরায়রার (রাঃ) একটি হাদিসও রক্ষা পাবে না, এই ভয়ে তিনি সর্বদা বিমর্ষ ও হতাশ জীবন যাপন করেছেন।

চব্বিশ

তবে– আব্দুল খালেক মনে করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল– একটা কথা হিসাবে রাখতে হবে ভাইজান। লোম বাছতে কষ্ট হবে বলে পুরো কম্বলটা ফেলে দেওয়া চলবে না। পুরো হাদিস শাস্ত্র বা আসমাউল রিজালকে অগ্রাহ্য করা চলবে না। তাহলে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণি-পরহেজগার মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য যে হাদিস-শাস্ত্রটি গড়ে তুলেছেন, তাদের ওপর অবিচার করা হবে। তাদের কষ্ট, মানুষের কল্যাণে তাদের নিবেদিত শ্রম– এসবের মূল্যায়ন না করাটা ভুল হবে। যারা হাদিস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার কাজটি করেছেন, তারা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই জানতেন রাসুলের সতর্কবাণী– 'যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আমার নাম দিয়ে কোনো মিথ্যা কথা প্রচার করবে, সে যেন নিজের স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।' এমন ঝুঁকি আছে জেনেও শুধুমাত্র বিশ্ব মানবতা এবং মুসলমানদের জীবনে আলোর দিশা হিসাবে সামনে রাখার জন্যই হাদিস-শাস্ত্রের প্রস্তুতকারীরা মানুষের সামনে রাসুলের জীবনকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য কাজ করেছেন। কেউ কেউ যে জেনে-শুনেই নিজের জন্য জাহান্নাম কিনে নিয়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানদের জীবনযাপন রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা জানার মাপকাঠি হিসাবে হাদিস-শাস্ত্রেরও প্রয়োজন আছে। যারা এই কাজ করেছেন, তাদের বেশিরভাগই চরম সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। তারপরেও ভুল হতে পারে। কিন্তু সেই ভুল তাদের ইচ্ছাকৃত নয়, এবং আল্লাহকে ন্যায় বিচারক হিসাবে মানলে আমরা নিশ্চয়ই এই কথাও বলতে পারি যে তাঁদের এই ভুলের জন্য আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁদের শাস্তি দেবেন না। কারণ তিনি তাঁদের নিয়তের কথা তো পরিষ্কার জানেন।

ইমাম মালেক(রঃ) বলেছেন– বিভিন্ন সময় আমি প্রায় সত্তর জন এমন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা মসজিদে নববীর খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে হাদিস বলেছেন। কিন্তু আমি তাঁদের একটি হাদিসও গ্রহণ করিনি। এই কারণে নয় যে তাঁদের আমি মিথ্যাবাদী মনে করেছি। বরং এই কারণে গ্রহণ করিনি যে তাঁরা যেসব বিষয়ের হাদিস বলছিলেন, সেই সব বিষয় সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না।

হাদিসের ক্ষেত্রে 'সনদ'-এর প্রচলন হয়েছে পরবর্তীতে। যিনি একটি হাদিস বলছেন, তিনি কার কাছে এই হাদিসটি শুনেছেন, আবার সেই বর্ণনাকারী কার কাছ থেকে শুনেছেন, এইভাবে রাসুলুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোকে হাদিসের সনদ বলা হয়। তার সঙ্গে আছে সাক্ষীর ব্যাপার। একবার আবু মুসা আশআরি বলেছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কারও বাড়িতে গিয়ে তিনবার ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চেয়েও যদি উত্তর না পাও, তাহলে ফিরে আসবে।' একথা শুনে হজরত ওমর বললেন– এই হাদিসের কোনো সাক্ষী হাজির করো। তা নইলে তোমাকে ছাড়া হবে না। তখন ভীত আবু মুসা সাহাবিদের সমাবেশে গিয়ে এই হাদিসের সাক্ষী কেউ আছেন কি না জানতে চাইলে সর্ব কনিষ্ঠ সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি এসে হজরত ওমরের সামনে আবু মুসা আশআরির বর্ণিত হাদিসের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। তখন হজরত ওমর বললেন– আবু মুসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু হাদিসের ব্যাপারে অবশ্যই সাক্ষী থাকতে হবে।

হাদিস-শাস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাসুলের রেসালতের চিহ্ন এই হাদিসগুলি মুছে গেলে মুসলমানদের অবস্থা আগের জমানার মানুষদের মতোই হয়ে পড়ত, যাদের কাছে তাদের নবীর কয়েকটি গাল-গল্প ছাড়া আর কিছুই নাই। যদি অন্য ধর্মের তাত্ত্বিকরা মুসলমানদের এই বলে চ্যালেঞ্জ জানাতেন যে যার ওপরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে বলে তোমরা দাবি করছ, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানাও, যাতে আমরা পর্যালোচনা করতে পারি যে তিনি সত্যি সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হওয়ার যোগ্য ছিলেন কি না। যদি হাদিস না থাকত, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কিছুই বলতে পারতাম না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত যে, তোমাদের কাছে কোরআনের দাবির সমর্থনে এমন কোনো বাহ্যিক সাক্ষ্য কি আছে, যার দ্বারা তোমাদের নবীর নবুয়ত প্রমাণিত হতে পারে? হাদিস না থাকলে আমরা এই প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিতে পারতাম না। আমরা নিজেরাই জানতে পারতাম না কোন অবস্থায় বা কী পরিস্থিতিতে কোরআনের আয়াতগুলি নাজিল হয়েছে। আমরা জানতে পারতাম না, কেমন করে রাসুলুল্লাহর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর পবিত্র জীবন যাপন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ দলে দলে মুসলমান হয়েছে। জানতে পারতাম না কেমন করে রাসুল তাঁর অনুসারীদের শিক্ষাদান করে তাঁদের অন্তরে নূর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেমন করে তিনি মানুষের জীবনে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন।

শুধু তাই-ই নয়, যদি হাদিস না থাকত, তাহলে আমরা কোরআনের সনদ তাদের বহনকারীদের পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারতাম না। আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ থাকত না যে এই কোরআনই প্রকৃতপক্ষে সেই কোরআন যা রাসুলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের কোরআনের অবস্থাও তখন বাইবেল, জেন্দাবেস্তা, বেদ, গীতার মতো হয়ে পড়ত। যদি হাদিস না থাকত, তাহলে নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত কোন পদ্ধতিতে আদায় করা হবে, তাও আমরা জানতে পারতাম না। আমরা এটাও জানতে পারতাম না যে রাসুল যে পদ্ধতিতে এগুলি পালন করতেন, আমরাও সেই একই পদ্ধতিতে নামাজ-রোজা পালন করছি কি না।

তাই বলা যায়, হাদিস-শাস্ত্রকে মুছে ফেললে ইসলাম নিছক একটা কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়। তার রক্ত-মাংস হিসাবে যেসব শাস্ত্র গড়ে উঠেছে গত চোদ্দ শো বছর ধরে, সেগুলি হাদিস-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, একথা তো অবশ্যই মানতে হবে যে সব হাদিস ছহি নয়। সময়ের প্রেক্ষিতে সেগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এবং কোরআনের বক্তব্যের সাথে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ, সেটি বিবেচনা করেই কোনো একটি হাদিসকে মেনে নেওয়া বা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে। এই কাজটা ঠিকমতো করতে পারলে আবার এই দেশের মানুষ খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ ফিরিয়ে আনতে পারবে।

হেসে ফেলল ইউসুফ।

তার হাসি দেখে একটু সংকুচিত হয়ে গেল আব্দুল খালেক– আমি কি কোনো হালকা কথা বলে ফেলেছি ভাইজান?

না তা নয়। আমি হাসলাম খোলাফায়ে রাশেদিনের কথা শুনে। আমাদের এই উপমহাদেশের মুসলমানদের, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের একটা অন্তরের টান রয়েছে খেলাফতের প্রতি। খেলাফতের প্রতি এত ভালোবাসা সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের মুসলমানদের মধ্যে নেই। তাই খেলাফতের কথা বলে এদেশের মুসলমানদেরকে দিয়ে যে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

যেমন?

এই দেশে একবার খেলাফত আন্দোলন হয়েছিল জানেন?

না তো! কোন সময়ে?

ব্রিটিশ আমলে।

তখনও খোলাফায়ে রাশেদিনের জন্যে আন্দোলন!

না। খোলাফায়ে রাশেদিনের জন্য নয়। তখন এই উপমহাদেশের মুসলমানরা, বিশেষ করে সুন্নিরা খলিফা হিসাবে মানত তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদকে।

ও হ্যাঁ। এখনও তো আমরা জুম্মার খোৎবা পাঠ করি সুলতান আবদুল হামিদের নামেই।

হ্যাঁ। কিন্তু নামে হলেও, প্রতীকি হলেও, একজন খলিফা সুন্নিদের চাই। সেই কারণেই তারা, মানে আমরা, মেনে নিয়েছিলাম উমাইয়াদের, আব্বাসীয়দের, এবং সবশেষে অটোমান তুরস্কের সুলতানদের আমাদের খলিফা হিসাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তুরস্ক যোগ দেয় জার্মানির পক্ষে। এবং হেরে যায়। তখন ব্রিটিশ আর ফরাসিরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয় তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে। সেই সময় ব্রিটিশরা যাতে তুরস্কের খলিফাকে উচ্ছেদ না করে, সেই দাবিতে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা শুরু করে খেলাফত আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন দুই ভাই মওলানা শওকত আলী এবং মওলানা মোহাম্মদ আলী। তখন দেশজুড়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে চলছিল অসহযোগ আন্দোলন। গান্ধীজী নিজেও মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করলেন। ফলে এই আন্দোলন তখন একযোগে খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন নাম ধারণ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এত বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলন আর হয়নি। মনে হচ্ছিল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার সমস্ত অবিশ্বাস এবং বিভেদ দূর হয়ে যাবে। বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ এই আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ লিখলেন– 'ইহা অনস্বীকার্য যে, ১৮৫৭-৫৮ সালে সংঘটিত ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের পর অসহযোগ আন্দোলনই আমাদের দ্বিতীয় দফা সংগ্রাম সূচিত করে। তবে উভয়ের মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্রথমটিতে নেতৃত্ব দান করেছিলেন মুসলমানরা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টিতে নেতৃত্ব ছিল মোটামোটি ভাবে হিন্দুদের হাতে। তত্রাচ সংখ্যানুপাতে মুসলমানদের দান ইহাতেও বেশী। ... ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল সশস্ত্র। কিন্তু অসহযোগ ছিল অহিংস, নিরুপদ্রপ, ত্যাগ ও কঠোর সংযমের। প্রথম সংগ্রাম ছিল রাজনীতিভিত্তিক। কিন্তু দ্বিতীয়টি ছিল রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক। ইহার সহিত অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং খিলাফতের পুনরুদ্ধার যুক্ত থাকায় অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে সমান গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল।'

সেই সময়ের অন্যতম প্রধান বাঙালি মুসলমান ধর্মতাত্ত্বিক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী লিখলেন– 'এই অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি– খেলাফৎ সমস্যার সমাধান, তুরস্ক ছোলতানের হৃতরাজ্যসমূহের পুনরুদ্ধার, এছলাম জগতের খলিফার পদমর্যাদা রক্ষা করা। ২য় টি ভারতে স্বরাজ লাভ।' তিনি আরও লিখলেন– 'সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, খেলাফৎ এছলাম ধর্মের অঙ্গ বিশেষ। খেলাফৎ রক্ষা না হইলে, খলিফার সিংহাসন, তাঁহার রাজ্য-রাজত্ব ও পদগৌরব রক্ষা না পাইলে এছলামের মহাক্ষতি এবং মোছলেম জাতির সর্বনাশ! মস্তকহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, খলিফাবিহীন মোছলেম জাতিরও সে রূপ কোন গুরুত্ব থাকিতে পারে না, খলিফা এছলাম ধর্ম ও মোছলমান জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ।'

মওলানা শাহ সুফি মোহাম্মদ আবু বকরের অভিমত ছিল, হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী যে ব্যক্তি মুসলমানদের দুঃখে দুঃখিত নয় সে তাঁর উম্মত নয়। সুতরাং তুরস্কের সুলতান ও বিপন্ন তুরস্কবাসীর বিপদে বিচলিত ও দুঃখিত না হওয়া বিস্ময়ের বিষয়।

আবদুল্লা-আল-আজাদ নামের একজন লিখলেন– 'অসহযোগিতার সহিত মুসলমানদের সম্বন্ধ দ্বিবিধ, প্রথমতঃ দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা তো তাহারও প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ খিলাফত যে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হাতে অপমানিত, লাঞ্ছিত, হৃতসর্বস্ব হইয়াছে তাহার নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের প্রয়াসী হওয়াও তাহার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিগত ও দেশগত স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে খেলাফত পুনরুদ্ধারে হিন্দু সম্প্রদায়ও লাভবান হবে। কারণ যতদিন সুয়েজ, এডেন, মাস্কাট, পারস্য উপসাগর, বসরা, ইরাক, সিরিয়া ও কনস্টান্টিনোপল ইংরেজদের অধীনস্ত থাকবে ততদিন ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব। খেলাফত পুনরুদ্ধার হলে ভারতের বাইরের মুসলমান শক্তিদের দ্বারা ভারত দখল করে নেওয়ার যে ভয় ইংরেজরা হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করছে তা অমূলক। একইভাবে স্বরাজ লাভ করার পরে ইংরেজরা বিদায় নিতে বাধ্য হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ভারতের মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করবে বলে যে ভীতি ছড়ানো হচ্ছে, সেটাও ভিত্তিহীন।

বাঙালি মুসলমানদের যেসব নেতা এই যুগপৎ খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ, আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুজিবর রহমান, আবদুল্লাহেল বাকী, আবদুল্লাহেল কাফী, পীর বাদশাহ মিয়া, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া), ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল কাসেম, কাজী নজরুল ইসলাম, আফতাবুদ্দীন চৌধুরী, সৈয়দ মজিদ বক্স, তৈয়বুদ্দিন আহমেদ, ফজলুল হক সেলবর্ষী, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী (নাটোর), আবদুর রশিদ খাঁ, শাহ বদিউল আলম (চট্টগ্রাম), মওলানা মনিরুদ্দীন (দিনাজপুর), সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী, শামসুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন উল্লেখ্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে খেলাফত আন্দোলনের শুরুর দিকে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তীব্র আবেগের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দেন। এমনকি তিনি আন্দোলনের স্বার্থে ওকালতি ত্যাগ করে অন্য কোনো পেশা গ্রহণের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এই আন্দোলন থেকে সরে আসেন, এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতেও ছাড়েননি।

তবে তুরস্কের খেলাফত রক্ষার জন্য ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের সর্বাত্মক এই অভূতপূর্ব আন্দোলন এক হাস্যকর পরিণতি লাভ করে। খোদ তুরস্কের মানুষই খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ তুরস্কের জাতীয় পরিষদ খেলাফত প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য আইন পাশ করে। খলিফা তথা খেলাফতের জন্য ভারতের মুসলমানরা যে সর্বস্ব পণ করে আন্দোলন করেছিলেন, তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তুরস্কবাসীরা নিজেরাই তুরস্ককে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক নিজেই ঘোষণা দিলেন যে, ধর্ম আর রাজনীতির গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে না। বরং রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভারতীয় মুসলমানের ঘোর তখনও কাটেনি। মওলানা মোহাম্মদ আলী ঘোষণা করলেন– 'তুর্কি জাতি তাহাদের ছোলতানকে সিংহাসনচ্যুত করে করুক, তারা তাকে খলিফা বলে স্বীকার না করুক, কিন্তু যতদিন তারা আল্লাহকে সিংহাসনচ্যুত করিতে না পারিবে ততদিন মোছলমানের খলিফা থাকিবেই।'

সৈয়দ আমীর আলীর মতো বিদগ্ধ ব্যক্তি পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া জানালেন এই বলে যে– 'আঙ্গোরার ব্যবস্থাপক সভা বা অন্য কোন জাতিরই খেলাফত বিলোপ সাধনের অধিকার নাই।' তাঁর এই দাবি এক অর্থে সঙ্গত। কারণ খলিফা শুধু তুরস্কের ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র সুন্নি মুসলমান বিশ্বের স্বীকৃত খলিফা। তাই খেলাফত বিলুপ্ত করার জন্য সারা পৃথিবীর সুন্নি মুসলমানদের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজন অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও স্বীকার করে নিতে হবে।

কিন্তু বাস্তবতাটা কী দাঁড়াল?

আব্দুল খালেক বলল– ধরেন যে মুসল্লিদেরকে সেজদায় রেখে ইমাম পালিয়ে গেছে। এখন মুসল্লিরা তো মাথা তুলে দেখতেও পারছে না। কারণ তাহলে তাদের নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এদিকে তাই তাদের আর সেজদা থেকে ওঠাও হচ্ছে না। যে রাষ্ট্রের জোরে খলিফা সেই রাষ্ট্রই নাই। অথচ আমরা খলিফা খলিফা করে কেঁদে মরছি!

AMARBOI.COM

পঁচিশ

অনেক দূর থেকে নিশানের মতো দেখা যায় তিসিখালির মাজারের বটগাছ। নৌকা নিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তো বটেই, দূর থেকে বটগাছের মাথা চোখে পড়লেও মানুষ সালাম জানায় ঘাসীপীরের মাজারকে। চলনবিলের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে হজরত দেওয়ান ঘাসী পীরই সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক পুরুষ। তিসিখালির ওরস তাই এই এলাকার মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। ঈদে-বকরিদে মানুষ মেয়ে-জামাইকে না আনুক, এই ওরসের সময় মেয়েদের নায়র না আনলে মেয়েরা কেঁদে বুক ভাসায়। ওরসের মেলায় কেনাকাটার জন্য চলনবিলের মানুষ পয়সা জমায় সারা বছর ধরে।

আগে পীর ঘাসী দেওয়ানের ওরসের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল দুলাভাই। ইউসুফের মনে আছে, দুলাভাই আগে তাদের বারবার পীরের ওরসের সময় আসার জন্য তাগাদা দিত। বলত, মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ যদি দেখবার চাও তাহলে এইসব ওরসে উপস্থিত থাকা খুবই দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এখন দুলাভাই এসবের ঘোর বিরোধী। নেহায়েত বহু পুরনো একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান, তাই হয়তো বন্ধ করতে পারে না। কিংবা এতটা শরিয়তপন্থা দেখাতে গেলে হয়তো পুরো চলনবিল অঞ্চলের মানুষ বেঁকে বসবে বলেই কোনো রকমে সয়ে চলে। কিন্তু যতভাবে পারা যায়, এই ওরসের ব্যাপারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে দুলাভাই। কয়েক বছর হলো ওরসের ঠিক আগে আগে এলাকায় ইসলামি জালসার আয়োজন করছে দুলাভাই। তা গাঁয়ের লোকের তাতে কোনো আপত্তি নেই। তারা জালসাতেও যায়, ঘাসীপীরের ওরসেও যায়। জালসাতে কত বর্ধমানী-যশোরী-বুলবুলে বাংলা-হেলালে বাংলা-তর্কবাগিশকে আনল দুলাভাই, তাদের দিয়ে কতভাবে বলিয়ে নিল যে এই ধরনের ওরস আসলে শেরেকি গুণাহ, এই গুণাহের ক্ষমা নেই– কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো লাভ হলো কই! লোকজন জালসার শেষে দোয়া মহফিলে হুজুরদের সাথে কেঁদে জারজার হয় বটে, সগিরা-কবিরা সকল গুণাহ থেকে তওবা করে বটে, কিন্তু ওরস এলে আবার যে কে সে-ই। সব ঝেঁকে চলে যায় ওরসে। মাঝখানে জালসার নামে এতগুলা পয়সা নষ্ট করার কারণে কয়েকদিন মনমরা হয়ে থেকে দুলাভাই নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, এখন আখেরি জমানা। মানুষের কলবে-অন্তরে সিলমোহর পড়ে গেছে, তারা আর হেদায়েতের বাণীতে কর্ণপাতও করে না। তবুও তার কাজ তাকে করে যেতেই হবে। যেদিন খবর এলো যে চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামির মাজারের শত বছরের কাছিমগুলিকে কারা যেন মেরে ফেলেছে, সেদিন দুলাভাইকে খুব খুশি দেখা গিয়েছিল। শতমুখে এই কাজের প্রশংসা– যারাই এই কাম করুক, একেবারে মর্দে-মোমেনের কাম করিছে। ইসলামের নামে বেদআতি দূর করার কামে এই লোকগুলান সত্যিকারের মুজাহিদ। তবে কাজটা আদ্দেক করল তারা। মাজারে যে গাছটার ডালে মানুষ মানসিক করে সুতা বান্ধে, সেই গাছটাও কাটা খুব দরকার ছিল।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করে– ঘাসীপীরের ওরসে আপনার এত আপত্তি কেন দুলাভাই?

এইগুলান শেরেকি কাম। কবরপূজা।

ওরস মানে কবরপূজা!

যা করা হয় তা তো কবরপূজাই। জানো না শিক্ষিত ছাওয়াল তোমরা! সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র 'লালসালু' উপন্যাস পড়োনি?

পড়েছি। কিন্তু তার সাথে এই প্রেক্ষাপটের তো কোনো মিল নেই। 'লালসালু' উপন্যাসের কবর-ব্যবসার সাথে কি হজরত বায়েজিদ বোস্তামি, শাহজালাল, খানজাহান আলী, শাহ মখদুম, কিংবা এই ঘাসীপীরের মাজারের ওরসের কি কোনো মিল আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু দ্বিধা করে দুলাভাই। কিন্তু তার শরিয়তিজ্ঞান দ্বিধা কাটিয়ে তোলে তাড়াতাড়িই। বলে– ওরস মানে যদি আল্লা-রাসুলের নাম নেওয়া বুঝায়, তার তো কুনো অসুবিধা নাই। কিন্তু দূর-দূরান্ত থেকে কবরের পাশে আসা লাগবি ক্যান? দূরে বসেও তো পীরের নামে ওজিফা পাঠ করা চলে, তার কবর জেয়ারতের দোয়া পড়া যায়। বছরে বছরে এত দূরের রাস্তা পাড়ি দিয়া কাজ-কাম নষ্ট কর‍্যা পীরের দরগাত আসার কাম কী? তার কবরে চুমা খাওয়ার অর্থ কি? এইগুলান একবারেই পাথরপূজা।

সহ্য করতে না পেরে ইউসুফের মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল– তাহলে আপনারা হাজিরা যে দুনিয়ার এইপার-ঐপার থেকে কাবাঘরের চারপাশে ঘুরতে যান, হাজরে আসওয়াদে চুমো খান, মদিনায় গিয়ে নবীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জিয়ারত করেন, সেগুলিকে কি বলবেন?

দুলাভাইকে হতভম্ব দেখায়। তারপরেই চেহারা আচ্ছন্ন হয়ে যায় ক্রোধে। কোনো রকমে নিজেকে সামলে থমথমে গলায় বলে– এই রকম কথা আর কখনও বলবে না। যেখানে-সেখানে এই ধরনের কথা বললে বিপদ আছে।

সে নাহয় থাকতেই পারে। কিন্তু বিপদ আছে বলে তো আর সত্যি কথা চিরদিন চাপা থাকতে পারে না। আমরা বুঝতেও পারি না, হজের সময় আমরা যে কালো পাথরে চুম্বন করি, একটি ঘরকে নির্দিষ্ট ভাবে সাতবার তাওয়াফ করি, একটি স্তম্ভকে শয়তান ভেবে তার দিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করি, এগুলোকে কেউ যদি এক ধরনের প্রতীকি পৌত্তলিকতা বলে তাকে তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। হজরত ওমর(রাঃ) এই ব্যাপারটি ঠিকই বুঝেছিলেন। তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে এই কারণেই সবাইকে শুনিয়ে বলেছিলেন– 'আমি জানি, তুমি একটা পাথর ছাড়া আর কিছুই নও। মানুষের ভালো বা খারাপ কোনো কিছু করার ক্ষমতা তোমার নাই। যদি আমি আল্লাহর নবীকে না দেখতাম তোমাকে শ্রদ্ধা জানাতে, তাহলে তোমার দিকে আমি ফিরেও তাকাতাম না।'

দুলাভাই কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল– তুমি কি সবকিছুই বাঁকা করে দেখবার চাও?

বাঁকা বলছেন কেন?

এই যে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ যা নিয়া কোনোদিন প্রশ্ন তুলে না, যেসব প্রশ্ন নিয়া মাথাই ঘামায় না, বিনাপ্রশ্নে পালন করে, সেইসব জিনিস নিয়া তুমি আলোচনা করো ক্যান?

না দুলাভাই, আপনার এই কথা ঠিক না। এই বদ্ধ জায়গার বাইরে গিয়ে দেখেন, মানুষ অনেক বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। এইসব বিষয় নিয়ে অসংখ্য বই-পুস্তকও লেখা হয়েছে। আপনি তো জানেন, ইসলামের আগে থেকেই মক্কাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হজ করতে সারা পৃথিবীর মানুষ আসত। তারা কেউ কেউ একেশ্বরবাদী ছিল। হজরত ইব্রাহিমের ধর্ম মানত। নিজেদের বলত– হানিফ। আর পৌত্তলিকরা ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। কিন্তু তারাও হজ করত। হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) মনে করতেন, তিনি কোনো নতুন ধর্ম আনেননি। হজরত ইব্রাহিমের ধর্মই তাঁর হাতে পরিপূর্ণতা পাচ্ছে। তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবের অনেক রীতি-নীতিই হুবহু একই রেখে দেন। হজের অনেকগুলি অনুষ্ঠান ঠিক সেই রকম।

একটু বিরক্ত দেখায় দুলাভাইকে– বাদ দাও তো এইসব কথাবার্তা। শরিয়তে কবরপূজা নিষেধ করা হইছে, তাই ওরসের ব্যাপারে আমাগের সেই নিষেধ মানা লাগবি। এইসব বেশরিয়তি কাম চলা উচিত না।

সেই বেশরিয়তি কাজ কী কী?

যেমন ধরো পীরের কবরে উবু হয়ে চুমা খাওয়া, ছোট ছাওয়ালেক নিয়া পীরের দোয়ার আশায় তার কবরের পায়ের দিকে গড়াগড়ি দেওয়ান, আরও কত কী আছে!

সেগুলি সংস্কার করে নিলেই তো হয়। রাসুল যতদিন বেঁচে ছিলেন, বিভিন্ন বিষয় তো সংস্কার করেছেন অবিরাম। নবম হিজরিতে যেসব সংস্কার আনা হলো সেগুলি একবার খেয়াল করা যায়। এই ঘটনার সাথে সুরা বারায়াহ(সুরা তওবা)-র আয়াত নাজিল হওয়ার সম্পর্ক আছে।

অষ্টম হিজরির রমজান মাসে মক্কা বিজয়ের পরেও জিলহজ মাসে মুশরিকদের তত্ত্বাবধানে, তাদের পূর্বের নিয়ম অনুসারেই হজ পালন করা হয়েছিল। সেবার মুসলমানরা মক্কার আমির আত্তাব ইবনে উমাদের সাথে হজ পালন করেছিলেন। নবম হিজরিতে এসে হজ পালন সম্পর্কে রাসুল প্রচণ্ড চিন্তিত ছিলেন। কারণ যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি সারজীবন সংগ্রাম করে গেলেন, সেই পৌত্তলিকতা তিনি কীভাবে বরদাশ্‌ত করে চলবেন। আবার মুশরিকদের নিষেধ করাও অসুবিধা ছিল। কারণ তিনি মক্কা বিজয়ের পরে নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, যে কেউ নিজের নিজের বাক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে, এবং যে কেউ আগের মতোই কাবা শরীফ জিয়ারত করতে পারবে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি আরব গোত্রের সাথে রাসুলের চুক্তি তখনও বলবৎ ছিল যে, আশহুরে হারামে (নিষিদ্ধ মাসে) কাউকে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না।

এইসব বিষয় বিবেচনা করে নবম হিজরিতে রাসুল নিজে হজ না করে জিলকদ মাসে হজরত আবু বকরকে (রাঃ) আমির নিয়োগ করে তিনশো মুসলমানকে হজে প্রেরণ করলেন। হজরত আবু বকর মুসলমান হজ কাফেলা নিয়ে মদিনা ত্যাগ করার পরে সুরা বারায়াহ-র ১-৪০ আয়াত নাজিল হয়। তখন রাসুল হজরত আলীকে তাঁর নিজের উট কুসওয়া দিয়ে দ্রুতগতিতে মক্কায় পাঠিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন। আজু নামক স্থানে আলী মিলিত হলেন আবু বকরের সাথে। হজ শেষে আলী এই সুরার আয়াতগুলি সমবেত মানুষকে পড়ে শুনালেন। তারপরে তিনি ঘোষণা করলেন রাসুলের আদেশ–

১. মোমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না।

২. এখন থেকে কোনো পৌত্তলিক কাবাগৃহে হজ করতে পারবে না, এবং কাবাগৃহে প্রবেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো।

৩. উলঙ্গ অবস্থায় কাবাঘরকে তাওয়াফ করা চলবে না।

৪. মুশরিকগণ চার মাসের মধ্যে নিজ নিজ জায়গায় চলে যাবে। এরপরে মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

৫. আল্লাহর রাসুলের সাথে যেসব গোত্রের ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ইউসুফ বলল– এইভাবে নাহয় ধাপে ধাপে কিছু কাজের সংস্কার করে নেবেন। কিন্তু এতবড় একটি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা ঠিক নয়।

দুলাভাই সম্ভবত এইভাবে কোনোদিন ভাবেনি। কিংবা এইভাবে যে ভাবা যেতে পারে– সেটাও ভাবেনি। এখন বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হয় কথাটা তো চিন্তা করার মতোই। পরক্ষণেই শব্দে নাউজুবিল্লাহ পড়ে দুলাভাই। বলে– যে সব কথাবার্তা বললে মানুষ গোমরাহির পথে যাবার পারে, আমি সেইসব বিষয় নিয়া আলোচনা করবার চাই না।

আচ্ছা, তা ঠিক আছে। আমরা সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা বাদই দিচ্ছি। আপনি খালি একটা প্রশ্নের উত্তর দেন!

কী?

এই দেশে, এই বাংলাদেশে, এই ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বা ইসলাম প্রচারের জন্য কারা এসেছেন প্রথমে? এদেশের মানুষকে আল্লাহর ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন কারা?

এই ধরো... আমতা আমতা করে দুলাভাই।

ইউসুফ বলে– এই দেশে ইসলামের বাণী বহণ করে এনেছেন এইসব আউলিয়া-দরবেশ-সুফিরাই। তাদেরকে মানুষ এখন পীর বলে জানে এবং মানে। তো তাদের জন্ম বা মৃত্যুদিনে মানুষ বা ভক্তরা যদি সমবেত হয়, পীরের শিক্ষা নিয়ে ওয়াজ-নসিহত করে, তাদের শ্রদ্ধা জানায় তাহলে আপত্তি কিসের?

বলতে বলতে ইউসুফ নিজেও অবাক হয়ে যায়। আরে এইভাবে সে নিজেও তো আগে কোনোদিন চিন্তা করেনি! তারপরেই মনে পড়ে, নির্বাচনের সময় শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া দু'জনেই ভোটের প্রচার শুরু করে সিলেটে হজরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহজালালের মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে। তাদের দলে বা জোটেই আছে সেইসব মোল্লা-মওলানারা, যারা দুলাভাইদের মতো মানুষদের ভাবতে শিখিয়েছে যে পীরের দরগায় যাওয়া মানে কবরপূজা করা। অথচ তারা কিন্তু তাদের নিজ নিজ নেত্রীকে একবারও বলে না, এই জিয়ারতে যাওয়া ঠিক নয়। সাঈদীর বক্তৃতার ক্যাসেট শুনেছে ইউসুফ। তীব্র ব্যঙ্গের সাথে তাকে বলতে শুনেছে যে কোনো রেললাইনের ধারে কোনো পীরের মাজার নাই। যত মাজার সব সড়কের পাশে। তার এই কথা বলার আসল উদ্দেশ্য এই কথা মনে করিয়ে দেওয়া যে, মাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ট্রেন থামে না, কাজেই লোকজন পয়সা দেয় না। আর বাসরাস্তার পাশে মাজার থাকলে বাস-মোটর সেখানে থামে এবং যাত্রীরা পয়সা দেয়। সাঈদীর বক্তব্যের প্রধান ব্যঙ্গ হচ্ছে এটাই যে পীর-দরবেশরা মৃত্যুর সময় বেছে বেছে সড়কের পাশে মরেছেন এবং সেখানে মাজার গড়ে উঠেছে; যাতে তাঁদের মাজারে থেমে যাত্রীরা টাকা-পয়সা দিতে পারে। ইউসুফের ইচ্ছা হলো সাঈদীকে জিজ্ঞেস করে যে এই গহীন চলনবিলের একেবারে ভেতরে, এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গাতেও শুধু ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে মানুষটি আস্তানা তৈরি করেছিলেন, তিনি কি তার শিষ্যদের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই এখানে এসেছিলেন না কি আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য? এই ধরনের মানুষকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার অধিকার সাঈদীদের কে দিয়েছে!

সত্যিকারের সুফিদের ওপর এই-ব্যবসায়ীদের আক্রমণ এটাই প্রথম নয়। তারা বলবে যে ইসলাম এই ভূখণ্ডে এসেছে ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজি-র হাত ধরে। কেউ কেউ বলবে যে সিন্ধু-বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাত ধরে। তার মানে দাঁড়ায় যে যতদিন এই দেশ মুসলমান বাদশাহদের হাতে আসেনি, ততদিন ইসলাম এই দেশে প্রচারিত হয়নি। আবার এই লোকেরাই যদি শোনে যে ইসলাম এই ভূখণ্ডে প্রচারিত হয়েছে একহাতে কোরআন আরেক হাতে কৃপাণ নিয়ে, তাহলে তারাই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটবে তার প্রতিবাদ করতে।

সত্যি ইতিহাস তো এটাই যে ভারতবর্ষের কোনো ভূখণ্ড মুসলমানদের অধিকারে আসার অনেক আগেই মিশনারি সুফি-দরবেশরা এখানে এসেছিলেন ইসলামের মহান সাম্যের আহ্বান নিয়ে। তাঁরা কেউ রাজনীতি করতে আসেননি, দেশ দখল করতে আসেননি, বাণিজ্য করতে আসেননি, সৌখিন পর্যটনের জন্যও আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন যে জীবনপ্রণালীকে তাঁরা সত্য বলে জেনেছেন তা এদেশের মানুষকে জানিয়ে তাদের উজ্জীবিত করতে; তাঁরা যে আধ্যাত্মিকতার নূর পেয়েছিলেন সেই নূরে তামাম হিন্দুস্তানকে আলোকিত করতে।

হজরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির আগে থেকেই আরব বণিকরা জলপথে ভারতবর্ষে আসতেন। আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ থেকেই আরবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎকৃষ্ট তরবারি বলতে হিন্দুস্তানের ইস্পাতের তরবারি বোঝাত। সেই সঙ্গে মসলিন তো ছিলই।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের আমলে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে একবার সিন্ধুতীরের দেবল বন্দরে মুসলিম হামলা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা সেটি দখলে রাখার কোনো চেষ্টা করেনি। চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর সময়ে আরবরা আরেকবার বোলান গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ৬৬৩ সালের ঐ অভিযান প্রতিহত করেছিল বোলান সীমান্তের কিকান আদিবাসীরা। এই অভিযান অর্থাৎ ৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের পরেও আরবদের সাথে ভারতবর্ষীয়দের বাণিজ্য আগের মতোই স্বাভাবিক গতিতে চলছিল। এমনকি বাণিজ্যের সূত্রেই সিন্ধুনদের মোহনা থেকে সিংহল পর্যন্ত, অর্থাৎ আরব সাগরের ভারতীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলের বন্দরগুলিতে ছোট ছোট মুসলিম বসতিও গড়ে উঠেছিল। শত্রুতার সৃষ্টি হলো ৭০৮ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময় সিংহল থেকে ইরাকে যাওয়ার পথে কয়েকজন মুসলমান রমণীসহ একটি জাহাজ জলদস্যুদের হাতে অপহৃত হয়। ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তখন সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ঐ মুসলিম রমণীদের উদ্ধার করে ফেরত পাঠানোর দাবি জানান। দাহির উত্তরে জানালেন যে ঐ জলদস্যুরা যেহেতু তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তাই তিনি মুসলিম রমণীদের উদ্ধার করে ফেরত পাঠাতে অক্ষম। এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে হাজ্জাজ তৎকালীন উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের কাছে সিন্ধু আক্রমণের অনুমতি চাইলেন। প্রথমে ওয়ালিদ রাজি হননি। তবে বারংবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি অভিযানের অনুমতি দিলেন। পর পর দুইটি অভিযান ব্যর্থ হলো। এরপর নেতৃত্ব দেওয়া হলো হাজ্জাজের ভাইয়ের ছেলে এবং জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে। মুহাম্মদ বিন কাসিম শুধু দেবল নয়, একের পর এক জয় করে নিলেন নেরুন, সেহোয়ান, রাওর, ব্রাহ্মণাবাদ, আলোর ও মূলতান। কঠোর স্বভাবের হাজ্জাজ প্রথমদিকে মুহাম্মদকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন নির্বিচার গণহত্যার। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম সেই আদেশ পালন করেননি। এই জন্য হাজ্জাজ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও পরবর্তীতে নতুন নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদের কাছে। তাতে বলা হয়েছিল– 'যেহেতু বিজিতরা এখন আমাদের জিম্মি, অতএব তাদের জীবন ও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। সুতরাং তাদেরকে আপন আপন উপাস্যের মন্দির গড়তে দাও। স্বধর্ম পালনের জন্য কেউ যেন বাধা বা শাস্তি না পায়, স্বদেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাসে কেউ যেন তাদের বাধা না দেয়।'

বাস্তব কারণেই দাহিরের পুত্র জয়সীমা খলিফা দ্বিতীয় ওমরের পরামর্শে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং তার সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের এক বিরাট অংশও ধর্মান্তরিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে নিরস্ত্রভাবেই মুসলমান সাধকরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই দেশে আসতে শুরু করেছিলেন। যতদূর জানা যায়, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব থেকে যিনি প্রথম এসেছিলেন, তাঁর নাম শেখ ইসমাইল। তারপরে এসেছিলেন শেখ আলী ওসমান আল-হুজায়রি ওরফে দাতা গঞ্জ বখ্‌স। তাঁদের দু'জনেরই কর্মক্ষেত্র ছিল লাহোর। ১১৬১ সালে পারসী সাধক খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (রঃ) গজনী থেকে লাহোরে আসেন। তিনি কিছুদিন দাতা গঞ্জ বখ্‌স-এর মাজারে অবস্থান করেন। তারপরে মূলতান ও দিল্লী পরিক্রমা শেষে আজমীরের কাছে পুষ্করে তাঁর আস্তানা স্থাপন করেন। হিন্দু এবং মুসলমান– দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁর শিষ্য প্রচুর। যে ব্রাহ্মণরা খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তারা 'হুসেনী ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হন। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে তারা অথর্ববেদকে মানেন, আবার বেদবিরোধী নয় এমন মুসলমানী আচার-অনুষ্ঠানও তারা মেনে চলেন। ভারতের সমস্ত ধর্মের মানুষের ওপর বিপুল আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণেই খাজা মইনুদ্দিন চিশতীকে বলা হতো 'আফতাব-ই-মূলক-ই-হিন্দ' বা 'ভারতীয় জগতের সূর্য'।

তাঁর পরেই আসে খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নাম। তিনি অনেক সাধকের কাছে শিক্ষা নিয়ে শেষে খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অনুসারীরা কাকা-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তারাও হুসেনী ব্রাহ্মণদের মতোই হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র রীতিনীতি মেনে চলেন। খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর আরেক শিষ্য শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ-ই-শক্কর এমনই মাধুর্যের অধিকারী ছিলেন যে তাঁর পদবী হয় শক্কর বা শর্করা বা চিনি। তাঁর দরগা ছিল পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলার আজুধান নামক স্থানে। কিন্তু তাঁর ভক্তরা এই জায়গার নাম পরিবর্তন করে রাখেন পাক পত্তন বা পবিত্র বসতি। ১২৬৫ সালে মৃত্যুবরণের আগে তিনি তাঁর খলিফা হিসাবে মনোনীত করে যান হজরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে। নিজের পীরের চাইতেও পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়ার নাম বেশি পরিচিত। তবে মনে করা হয় তাঁর এই ব্যাপক পরিচিতির অন্যতম কারণ তাঁর দুই জগদ্বিখ্যাত শিষ্য। তাঁরা দু'জন হলেন কবি আমীর খসরু, এবং প্রখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত আল বিরুনী। মনে রাখা দরকার এইসব সাধকরা কেউই খুব রক্ষণশীল ছিলেন না। এমনকি তাঁদের উদারতার কারণেই মুসলমানদের মধ্যে অনেক বেদআতি জিনিস ঢুকে পড়েছে বলে দাবি করেন শরিয়তপন্থী ধর্মনেতারা। তবে অনেকদিন পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে ইসলাম বলতে মানুষ এইসব সুফিসাধকদের উদার আচরণবাদকেই বুঝত। রাষ্ট্রের ক্ষমতায় মুসলমান সুলতান বা বাদশাহরা থাকলেও তাঁরা ধর্মীয় ব্যাপারে তেমন একটা মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘামাতেন না। এর ব্যত্যয় ঘটেছিল মোগল বাদশাহ আলমগীরের দ্বারা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল সুন্নি মুসলমান। ধর্মকে তিনি নিজে যেভাবে বুঝতেন, সেভাবেই নিজে তো পালন করতেনই, অন্যদেরও পালনে বাধ্য করতেন। কোনো রকম বিলাসিতা বা বিনোদনের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। মদ, ভাং, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, নৃত্যগীত– সবকিছুই তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মুসলমানদের দাড়ি এবং পায়জামার মাপ পর্যন্ত তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ১৬৬৯ সালে তিনি শিয়াদের আশুরার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই অনুষ্ঠান পালনের কারণে তিনি আমেদাবাদের শাসনকর্তাকে বরখাস্ত করেন। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, আলমগীর যে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় অভিযান চালিয়েছিলেন তার কারণ এই নয় যে ঐ দুই অঞ্চল খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঐ দুই এলাকার ক্ষমতাসীন শিয়া মতাবলম্বি মুসলমান শাসকদের ধ্বংস করা। তাঁরা শিয়া, আলমগীরের কাছে এটাই ছিল মূল অপরাধ। তিনি শিয়া এবং সুফিদেরকে বিধর্মীদের চাইতেও বেশি অপছন্দ করতেন।

তবে বাংলায় ইসলামের বিস্তারে আউলিয়া-দরবেশদের পাশাপাশি মুসলমান শাসকদের উদারতার কথাও মনে রাখতে হবে। বাংলার তুর্কী-পাঠান শাসকরা কেউই আলমগীরের মতো গোঁড়া ছিলেন না। তাদের উদারতার কারণেই ইসলামের সঠিক সমতার নীতি এই ভূমিতে বিস্তৃত হতে পেরেছিল। তারা কেউই কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধকে ধর্মান্তরিত করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগাননি। বরং ইসলামের উদার ও সাম্যবাদী চিন্তাকে জনজীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই মোগলদের রাজধানী দিল্লী বা আগ্রা বা উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশের তুলনায় বাংলায় ইসলামের বিস্তার ঘটেছে বেশি। কেননা ইসলাম বঙ্গভূমিতে নীচু ও অচ্ছুত শ্রেণীর মানুষকে যে সম্মান ও স্বাধীনতা দান করতে সক্ষম হয়েছিল, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে তেমনটি করতে পারেননি মুসলমান বাদশাহরা। একমাত্র সুরজিৎ দাসগুপ্তই এই ব্যাপারটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। ইসলাম স্বাতন্ত্র্যে গৌরবান্বিত বাংলার জনসাধারণকে এমন এক মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল, যা তারা আগে কোনোদিন পায়নি। বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ পেল ব্রাহ্মণ্য-নির্যাতন এবং কঠোর জাত-পাত বিচারের অনুশাসন থেকে মুক্তি; পদে পদে সামাজিক অপমানের হাত থেকে মুক্তি; পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের মানুষ মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে পেল সামুদ্রিক বাণিজ্যের সাহস, ফলে লাভ করল অর্থনৈতিক মুক্তি; সারা বাংলার মানুষ পেল কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষার বন্ধন থেকে মুক্তি; বাংলাভাষা জনসাধারণকে দিল মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশের অধিকার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রকাশের ভার লাঘবের সুযোগ; আচারের বদলে আত্মার স্বাধীনতার মুক্তি। তাই বাংলার মুসলমানরা শুরু থেকেই যতটা আচরণবাদী, তার চাইতে বেশি আধ্যাত্মিকতাবাদী।

ছাব্বিশ

বছর বছর দেওয়ানবাগী আর চরমোনাই পীরের মুরিদদের লাঠালাঠি দেখে সাধারণ মানুষের মনেও প্রশ্ন জাগে মারেফাতের পথেও তাহলে জোর-জবরদস্তি আছে! এই দেশে মানুষের আধ্যাত্মিকতা নিয়েও যে কত ব্যবসা হয়! কোনো কোনো পীরের তো নিজস্ব ঠাঙারে বাহিনী পর্যন্ত আছে। এক পীরের মুরিদের কাছে অন্য পীরের নাম বললেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। যে পীরের মুরিদ যত বড় বড় পদের অধিকারী, তার পশার তত বেশি। পীরগিরি এখন বিরাট কনসালট্যান্সি ব্যবসা। ঠিকাদার মুরিদ মনে করে পীর বুঝি অলৌকিকভাবে তাকে কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দিচ্ছে। আসলে যে পীরের আরেক অফিসার মুরিদকে টাকা দিয়ে সে কাজটা করিয়ে নিচ্ছে, তা মানুষ জানে না। আবার যে মুরিদ পীরের পায়ে পড়ে চাকরিতে বেশি ঘুষের জায়গাতে বদলি পাচ্ছে, সে-ও জানে না যে পীর তার উপরের অফিসারকে দিয়েই কাজটা করিয়ে দিচ্ছে। যে মামলার আসামী পীরকে ধরে মামলা থেকে খালাস পাচ্ছে, সে-ও জানে না যে জজ সাহেব নিজে বা তার কোনো আত্মীয় বা বন্ধু পীরের মুরিদ। তাকে দিয়েই পীরসাহেব কাজটি করিয়ে নিচ্ছে।

সাধারণ মানুষের অবশ্য এতকিছু দেখার অবকাশ নেই। পীরের মুরিদ হয়ে তার খানকায় বসে থাকার সময় তার নেই। কারণ তার রোজকার খাদ্য রোজ গতর খাটিয়ে জোগার করতে হয়। সে দাঁড়ি-টুপিঅলা মানুষ দেখলে সেলামালেকুম দেয়, দরগার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করে, গোরস্তানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বুকে ফুঁ দিয়ে বিড়বিড় করে শুদ্ধ-অশুদ্ধ উচ্চারণে বিশুদ্ধ ভক্তি নিয়ে কলেমা পড়ে।

কিন্তু মারেফতের তরিকায় এতসব মারেফতি কাণ্ড-কারখানা এখন এই দেশে ঘটে যে, পীর-তরিকা-মারেফত নিয়ে মানুষ বড় ধাঁধায় পড়ে আছে। কে যে ঠিক আর কে যে ভণ্ড তা খুঁজে বের করবে কে! তাই দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত মুসলমানরা এখন পীর-দরবেশ-সুফিদের এড়িয়ে চলে।

এরশাদ যে একটার পর একটা পীর বদল করে চলেন, বেনজীর ভুট্টো বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে এসে জয়পুরহাটের পীর মুজিবুর রহমানের কাছে যান, সামরিক বাহিনীর জেনারেলরা-ব্যবসায়ীরা যে পীরদের কাছে ছোটেন, তা কতখানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারেফতের স্বাদ নিতে আর কতখানি জাগতিক সুবিধার আশায়, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে সব মানুষেরই মনে। মারেফতের পীরের কাজ যে জাগতিক সুপারিশ করা নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করে দেওয়া নয়, ভালো বদলি বা প্রমোশন করে দেওয়া নয় তা মানুষকে জানিয়ে দেওয়া এখন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

চিরদিনই সঠিক মারেফতের আউলিয়া চিনতে পারা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন। কারণ তাঁরা সচরাচর নিজেদের সাধনা নিয়ে নিমগ্ন থাকেন, গুটিকয়মাত্র সাগরেদকে নিজের পথের উত্তরাধিকারি হিসাবে তৈরি করেন। খুব কম সুফিই অত্যাধিক জনসমাগম পছন্দ করতেন। আবার কেউ কেউ ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে নিজেদের খানকাতে টেনে এনেও নিজের অধ্যাত্মসাধনা চালিয়ে যেতে পেরেছেন।

সাতাশ

সুফিবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গবেষণা করেছেন পাশ্চাত্যেরই একজন পণ্ডিত। তাঁর নাম লুই ম্যাসিইনো। তিনি কোরআনকেই সুফিবাদের উৎপত্তির উৎস বলে মনে করেন। তিনি অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন, 'প্রতিনিয়ত আবৃতিকৃত, ধ্যান দ্বারা ধৃত, জীবনে আচরিত, কোরআন থেকেই ইসলামি মরমীবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে।' কাজেই সুফিবাদের নিগূঢ় তত্ত্ব (হাকিকত) মুসলমানদের আচরণের বাহ্যিক দিকগুলি (শরিয়ত) থেকে পৃথক বা পরিপন্থী কিছু নয়।

সুফিবাদের গূঢ়তত্ত্ব সাধারণ মুসলমানের কাছে বোধগম্য না হলেও যেহেতু সুফিবাদ প্রতীক ও চিহ্নের সাহায্যে অন্তর থেকে অন্তরে সঞ্চারিত হয়, তাই তার মূল আবেদন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে আকৃষ্ট করতে পারে। ইসলামের উন্মেষের সময় থেকেই কিছু ধ্যানী ও মৌন সাধক কোরআনের গূঢ়ার্থ অনুধাবনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কোরআনের অনেক আয়াতে ইহজগতের নশ্বরতা, মানুষের অতি নিকটে আল্লাহর উপস্থিতি, আত্মার উৎকর্ষ সাধন, আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবকিছুর লয় তথা বিনাশসাধন, আকাশে ও পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর নূরের পরিব্যাপ্তি ও দ্যোতনা– এইসব ভাবনা মরমী সাধকদের প্রেরণা যুগিয়েছে। হাদিসে কুদসিতে আছে– আল্লাহ বলেছেন, "আমার যে বান্দা আমাকে ভালোবাসে এবং যার মনোভাব আমি জানি তার সম্পর্কে আমি এভাবে দায়িত্ব নিয়েছি যে আমি হবো তার কান যা দিয়ে সে শোনে, আমি হবো তার চোখ যা দিয়ে সে দেখে, আমি হবো তার জিহ্বা যার সাহায্যে সে কথা বলে, আমি হবো তার অন্তর যা দিয়ে সে অনুভব করে।"

সুফিবাদ সম্পর্কে আবু সাঈদ খোরাসানি বলেছেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটি হচ্ছে দীনতার মধ্যে গৌরব, দারিদ্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্য, গোলামীর মধ্যে প্রভুত্ব, ক্ষুধায় তৃপ্তি, বসনহীনতায় ভূষিতের গৌরব, দাসত্বের মধ্যে স্বাধীনতা, মৃত্যুর মধ্যে জীবন, এবং তিক্ততার মধ্যে মিষ্টতা।'

আর– 'প্রকৃত দরবেশ জনসাধারণের মধ্যে আসা-যাওয়া করেন, তাদের সঙ্গে ভোজন ও শয়ন করেন, বাজারে কেনা-বেচা করেন, বিবাহ-শাদি করেন, সমাজে মেলামেশা করেন এবং এক মুহূর্তের জন্য কখনও আল্লাহকে ভোলেন না।'

ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে সুফিবাদকে তিনটি পর্যায় পার হয়ে আসতে হয়েছে।

হিজরি তৃতীয় শতক অর্থাৎ খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক থেকে নবম শতক। এই যুগটি সুফিবাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের যুগ। শরিয়তপন্থী আলেম, ধর্মনেতা ও সরকার অর্থাৎ কথিত খলিফা, যারা নিজেদের আমিরুল মোমেনিন বলে দাবি করতেন, তাদের বিরাগভাজন হয়ে সুফি ও সংসারত্যাগী সাধুপুরুষদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে দশম ও একাদশ শতক। এই সময়কালটি সুফিবাদের পুনর্বাসন, সমঝোতা ও বিজয়ের যুগ। ইমাম গাযযালীর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিদের চেষ্টার ফলে এটি সম্ভব হয়েছিল।

তৃতীয় পর্ব হচ্ছে দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক। এটি সুফিবাদের বিস্তার ও প্রসারের যুগ। মনে রাখা দরকার যে সারা বিশ্বে সার্বিকভাবে ইসলাম ধর্মের প্রসারের যুগও ছিল এটাই।

ইসলাম কঠোর সন্ন্যাস জীবনের বিরোধী হলেও প্রাথমিক যুগের বেশ কয়েকজন সাহাবির মনে নানা কারণে সংসারবিমুখতা দানা বেঁধে ওঠে। এঁদের মধ্যে উল্লেকযোগ্য ছিলেন আবুযর গিফারি ও হুযায়ফা। আবুযর গিফারি তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের সময়কালে জাগতিক ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। এই সময় মুসলমানরা পারস্য ও বাইজান্টাইন দখল করেছিল। সেখান থেকে মালে গণিমত হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল বিপুল ধনসম্পদ, অসংখ্য দাসদাসি, বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, অগণিত অশ্ব এবং উট। মক্কা ও মদিনায় গড়ে উঠেছিল অসংখ্য সুরম্য অট্টালিকা। আবুযর গিফারি এই বস্তুতান্ত্রিক ভোগ-বিলাসকে কোরআনের পরিপন্থী হিসাবে ঘোষণা করেন। এক পর্যায়ে খলিফা হজরত ওসমানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধ দেখা দেয়। হজরত ওসমান তাঁকে মদিনা থেকে মরুভূমিতে নির্বাসনদণ্ড প্রদান করেন। সেখানেই ৬৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। জাগতিক ঐশ্বর্য ও বিলাসের প্রতি আবুযর গিফারির চরম অবজ্ঞা, কঠোর আত্মসংযম, নির্জনবাস এবং আল্লাহর ধ্যানে আত্মনিয়োগ প্রথম যুগের অনেক মুসলমানকে আকৃষ্ট করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ব্যক্তির নামের সঙ্গে 'সুফি' পদবীর ব্যবহার প্রথম দেখা যায় অষ্টম শতক থেকে। কুফার শিয়া মতের কিমিয়াবিদ আল-জাবির ইবনে হাইয়ান এবং কুফারই আরেক মরমীসাধক আবু হাশিম সুফি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। আর প্রায় কাছাকাছি সময়ে বসরার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হাসান আল-বসরি সুফিবাদের জনক নামে পরিচিত হন। ইসলামের ইতিহাসের এক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিতর্ক-সংঘাতের যুগে তাঁর অবস্থান মুসলমানদের অনেক ফেৎনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা করে। তিনি ছিলেন সংসারবিমুখ আদর্শ জীবনের অনুসারি। ছিলেন একাধারে আইন বিশেষজ্ঞ ও হাদিস বিশারদ। হাদিসের রাবি হিসাবেও তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ইসলামের বেশ কয়েকটি ধর্মীয় আন্দোলন তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। মুতাজিলাপন্থীরা তাঁকে তাদের আন্দোলনের একজন নেতা হিসাবে সম্মান করেন। তিনি উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসনকালে তাঁর সামনেই প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলেন। তাঁর কৃচ্ছতা, স্বনির্বাচিত দারিদ্র্য এবং ধ্যান-আরাধনা বসরায় বহু অনুরক্ত ও ভক্ত সাধকের সৃষ্টি করে।

শ্রেষ্টতম মুসলিম মহিলা সুফি রাবিয়া আল-আদবিয়াহ, যিনি তাপসী রাবেয়া বসরি নামে পরিচিতা, সারাজীবন দারিদ্র্য, কৌমার্য, বৈরাগ্য ও আল্লাহর সান্নিধ্যের আশায় অবিরত প্রার্থনা করে জীবন কাটিয়েছেন। সুফিবাদের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ভালোবাসার (হুব্বা) ধারণা প্রবর্তন করেন। পূর্বতন সুফিরা শওক (উৎকণ্ঠা)-এর ধারণায় সাধনা করতেন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করে রাবেয়া বসরি তৎকালীন ইসলামি জগতে এক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনায় বলা হয়েছে, একদিন তিনি একহাতে পানিভর্তি জগ ও আরেক হাতে একটি মশাল নিয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে এই ব্যাপারের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে তিনি পানি দিয়ে দোজখের আগুন নিভিয়ে ফেলবেন, আর মশালের আগুন দিয়ে বেহেস্তের বাগান পুড়িয়ে ফেলবেন; যাতে লোকেরা দোজখের আগুনের ভয়ে বা বেহেস্তের সুখের লোভে আল্লাহর ইবাদত না করে। তারা যেন আল্লাহকে ইবাদত করে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভালোবেসেই। তিনি বলতেন– 'হে আল্লাহ, আমি দুই রকম ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি। প্রগাঢ় অনুরাগজনিত ভালোবাসা এবং ভালোবাসার বিষয় হিসাবে তোমার যোগ্যতার জন্য ভালোবাসা। গাঢ় ভালোবাসা হচ্ছে অপর সবকিছুকে ভুলে গিয়ে তোমার নাম ধরে অবিরাম জিকির। যোগ্যতার ভিত্তিতে ভালোবাসা হচ্ছে যে তুমি আবরণ উন্মোচন করো যাতে আমি তোমাকে দেখতে পারি। যাহোক, উভয় ক্ষেত্রেই কোনো গৌরবই আমার প্রাপ্য নয়, বরং সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম শতকের সুফিদের মধ্যে আরেক জন খুবই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধনীতি-প্রভাবিত ইরানের বলখ রাজ্যের বাদশাহ ইব্রাহিম ইবনে আদহাম। তিনি সুফিবাদে আকৃষ্ট হয়ে রাজ্য এবং রাজত্ব ত্যাগ করেছিলেন। তিনি নানা দেশ ঘুরে ঘুরে অবশেষে বাইজান্টাইন সীমান্তে এক জিহাদে শহীদ হন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে– 'তুমি যদি আল্লাহর বন্ধু হতে চাও অথবা তাঁর দ্বারা অনুরক্ত হতে চাও, তবে ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই ত্যাগ করো। এই উভয়ের কোনোটারই আকাঙ্ক্ষা করো না। উভয় জগত থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও। একমাত্র তাহলেই আল্লাহ তোমার দিকে মুখ ফেরাবেন, এবং তাঁর করুণা তোমাকে আচ্ছাদিত করবে।'

ইসলামের এই সুফিবাদী আন্দোলন মদিনা থেকে কুফা ও বসরা হয়ে অবশেষে বাগদাদে এসে কেন্দ্রিভূত হয়। বাগদাদের সুফিদের মধ্যে মারুফ আল-কারখি, মনসুর ইবনে আম্মার, বিশর আল হাফি এবং ইবনে আবি আদ-দুনইয়া প্রধান। বাগদাদ যে দুইজন শ্রেষ্ঠ সুফির জন্ম দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল মুহাসিবী এবং আল জুনায়েদ। আল মুহাসিবীর জন্ম বসরায়। পরে তিনি বাগদাদে চলে আসেন। এখানে হাম্বলী মজহাবের শরিয়তপন্থীদের সাথে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়। তাঁর মরমীবাদের ভিত্তি ছিল দুইটি– আল মুহাসাব বা আত্মপরীক্ষা। এখান থেকেই তিনি আল মুহাসিবী নামে খ্যাত হন। আর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে প্রেমাস্পদ অর্থাৎ আল্লাহর খেদমতে চরম দুর্ভোগ পোহানো। তিনি সুফিদের জন্য করণীয়গুলির তালিকায় রেখেছেন– মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুতি, পৃথিবীর প্রতি অবজ্ঞা, শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সকল কাজ শুধু আল্লাহর জন্যই করা, সকল কাজে আল্লাহর দিকে তাকানো, অহর্নিশ নিজের জীবনকে আল্লাহর চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত রাখা। ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করে আল মুহাসিবী ঈমানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

আবুল কাশেম আল জুনায়েদ ছিলেন শরিয়াপন্থী এবং বেশরিয়তি– উভয় ঘরানার কাছেই খুব গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আল মুহাসিবীর মতোই আল জুনায়েদও মনে করতেন যে সুফিবাদ কোরআন ও হাদিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর সুফিতত্ত্ব শুরু হয় কোরআনে বর্ণিত (৭:১৭১) মানুষ ও আল্লাহর আদিচুক্তি (মীসাক) থেকে।

সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সম্মিলিত মানবাত্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন– "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?"

তারা উত্তর দিল– 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল জুনায়েদ তাঁর সুফিতত্ত্বকে বলতেন ইফরাদ (চিরন্তনকে নশ্বর থেকে পৃথকীকরণ)। সুফিবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সত্তাকে নিশ্চিহ্ন (ফানা) করে দিয়ে আদি অর্থাৎ সৃষ্টিপূর্ব সত্তায় প্রত্যাবর্তন (বাকা) করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন।

নবম শতাব্দীর জুন-নুন আল মিশরী সুফিবাদের ইতিহাসের আরেক কিংবদন্তি। তিনি ছিলেন একাধারে সুফি, আল-কিমিয়াবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তাঁর মতে সুফি পথ পর্যায়ক্রমে কয়েকটি মাকাম (স্থান) ও হাল (অবস্থা)-এর সমষ্টি। মাকামগুলি মানুষ চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে, কিন্তু হাল বা অবস্থা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল। কৃচ্ছ্রসাধনা ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পাপমুক্ত করার পরে আত্মা প্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা অর্জন করতে পারে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বাকা অর্জন করতে পারে। এই মিলনের পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহর প্রেম, এবং অন্তর থেকে অপরাপর অনুভূতির বিসর্জন।

নবম শতাব্দীর অপর দুইজন সুফি সাধকের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ সারা পৃথিবীতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই দুই সুফির প্রাথমিক তন্ময়তার অভিব্যক্তি ছিল উন্মত্ততায় (সাকার বা মস্তি) পরিপূর্ণ। এই দুই সাধকেরই জন্ম পারস্যে। আবু ইয়াজিদ আল-বাস্তামি ছিলেন খোরাসানের অধিবাসী। তাঁর ওস্তাদ আবু আলী আস-সিন্দি তাঁর প্রিয় এই শিষ্য আল-বাস্তামিকে 'আল-ফানা ফি'ত তাওহিদ' বা 'একের মধ্যে লয়' মতবাদে দীক্ষা দেন। বলা হয়ে থাকে, আল-বাস্তামি কঠোর সংযম সাধনা ও ধ্যানের মাধ্যমে নিজ মানবীয় সত্তার বিলোপ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেন। তন্ময়তার মধ্যে আমি-তুমির পার্থক্য পার্থক্য ভুলে তিনি উচ্চারণ করেন 'সুবহানি মা আযামা শানী' (আমার কী গৌরব! আমার মহিমা কত বিশাল!)। এই অবস্থাকে সুফিরা একটি অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্যের পর্যায় বলে মনে করেন। পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছাতে পারলে আল্লাহর প্রকৃত জ্ঞান তাকে পূর্ণাঙ্গ সুফিতে পরিণত করে। আল-বাস্তামিকে শরিয়তপন্থীরা ছেড়ে দিলেও আরেক জন সুফিকে এই ধরনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে বলার কারণে রাষ্ট্রীয় বিচারে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তাঁর নাম আল-হুসায়েন ইবনে মনসুর আল-হাল্লাজ। তিনি আল জুনায়েদসহ আরও অনেক সুফির কাছে তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আল জুনায়েদ নিজে মনসুর আল-হাল্লাজের ধ্যান-ধারণা পছন্দ করতেন না। হাল্লাজ মুসলিম বিশ্বের অনেক অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি ভারত ও চীন সীমান্তেও গিয়েছিলেন। তিনি প্রচার করেন আইন-উল-জাম'আ বা স্রষ্টার সঙ্গে মিলনের তত্ত্ব। তন্ময় অবস্থায় তিনি বলতে থাকেন– 'আনাল হক'। এই ঘটনায় ইসলামি জগতের সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। বাগদাদের জনগণের মধ্যে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্যায়ে তাঁকে ধর্মদ্রোহের অভিযোগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদালতে বিচারের মাধ্যমে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে আল-হাল্লাজ বলেন যে সুফি অভিজ্ঞতায় আল্লাহ সুফির মাধ্যমে কথা বলেন; সুফি সেখানে নিমিত্ত মাত্র। এবার তাঁকে কারাদণ্ডের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁকে নৃশংসভাবে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর পরে তাঁর দেহকে আগুনে ভস্মিভূত করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর হত্যাকারীদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দোয়া করে বলেন– ' হে আল্লাহ! তুমি আমার কাছে যা প্রকাশ করেছ তা যদি তাদের কাছে প্রকাশ করতে তাহলে তারা যা করছে তা করত না। তুমি তাদের কাছে যা গোপন করেছ, তা যদি আমার কাছেও গোপন করে রাখতে তাহলে আমাকে এই ক্লেশ ভোগ করতে হতো না।'

মনসুর আল-হাল্লাজের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সুফিবাদকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। কারণ সুফিরা মনে করেন যে আল্লাহর সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের অবাধ সংযোগ ও মিলনের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। তবে এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে সুফিরা নিজেদের ভাব ও আচরণ জনসমক্ষে গোপন রাখতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে শরিয়ত-সর্বস্ব মানুষের সংস্পর্শ তাঁরা এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। অথচ দশম ও একাদশ শতাব্দী একদিকে যেমন ছিল যাবতীয় সুফিবাদের পরিণত রূপ লাভ করার যুগ, অপরদিকে তেমনই সুফিবাদের পুনর্বাসন ও প্রতিষ্ঠারও যুগ। অনেক খ্যাতনামা লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ সুফিবাদ নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইমাম গাযযালীর নাম। তাঁর চেষ্টায় সুফিবাদ সুন্নি মতবাদের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে ওঠে। একাদশ শতাব্দীতে সুফিবাদের অর্থ, সুফিতত্ত্ব ও আচরণ সম্পর্কে মুসলমানদের এক বিরাট অংশের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি সুফিবাদের মধ্যস্থতায় শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে মতপার্থক্যও অনেকখানি কমে আসে।

ইমাম গাযযালী যখন বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলেন এবং যখন খ্যাতির মধ্য গগনে ছিলেন, তখনই তাঁর জীবনে এক ক্রান্তি কাল নেমে আসে। আইনের চুলচেরা বিচার, কালামের তর্ক ও বাদানুবাদ, এবং দার্শনিকদের জ্ঞানের সূক্ষ্মতা তাঁকে বিচলিত ও বিভ্রান্ত করে ফেলে। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। সত্যের সন্ধানে সুদীর্ঘ এগারো বৎসর দরবেশের মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। পরে তিনি নিজেই সুফিপথ অবলম্বন করেন। এই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন– '...এই নির্জনবাসের সময় অগণিত ও অপরিমেয় বিষয় আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। সে বিষয়ে আমি কেবল এইটুকু বলব যাতে অন্যেরা এর দ্বারা সাহায্য পেতে পারে। আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে সবার ওপরে সুফিরাই আল্লাহর রাস্তায় চলেন, তাঁদের জীবন শ্রেষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন, তাঁদের পদ্ধতি নির্ভুল পদ্ধতি, তাঁদের চরিত্র পুত ও পবিত্র। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি, বিদ্বানদের বিদ্যা এবং পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য– যারা প্রত্যাদেশের গভীর জ্ঞানে সুদক্ষ– একত্রিত করে যদি সুফিদের জীবন ও চরিত্র উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো হয় তাতে কোনো কাজ হবে না, কারণ, সুফিদের যাবতীয় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গতি ও বিশ্রাম রাসুলের প্রত্যাদেশের প্রদীপের আলো থেকে আলো সংগ্রহ করে।'

এই কথা বলছেন সেই ইমাম গাযযালী, যিনি ইসলামি জ্ঞানের জন্য এমন কোনো দুয়ার নেই যে দুয়ারে না গিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়– ' আমার প্রাথমিক যৌবন থেকে বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আমার পঞ্চাশোত্তর বর্তমান বয়স পর্যন্ত আমি এইসব সাগরের গভীরতায় বিপজ্জনকভাবে সর্বদা যাত্রা করেছি, আমি সাহসিকতার সাথে সব সময় উন্মুক্ত সমুদ্রে কাপুরুষের সাবধানতা পরিহার করে পাড়ি জমিয়েছি। আমি প্রতিটি অন্ধকার গুহা হাতড়েছি, আমি প্রতিটি সমস্যার ওপর অভিঘাত করেছি, আমি প্রতিটি অতল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমি প্রতিটি দলের ধর্মমত পরীক্ষা করেছি। এ সবই আমি করেছি যেন আমি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, এবং নির্ভুল সুন্নাহ ও বিদআতের মধ্যে তারতম্য করতে পারি। যখনই আমি কোনো বাতেনিকে (গুপ্ত সম্প্রদায়ভুক্ত) দেখি, তখনই আমি তার মতবাদ পড়তে চাই। যখনই আমি কোনো জাহেরিকে (প্রকাশ্য ধর্মাচারী) দেখি তখন তার বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলি জানতে চাই। যদি তিনি দার্শনিক হন তবে আমি তার দর্শনের অন্তঃসারগুলি জানতে চাই। যদি তিনি মুতাকাল্লিম হন তাহলে আমি তার ধর্মতত্ত্বের যুক্তি পরীক্ষায় ব্যাপৃত হই। যদি তিনি সুফি হন আমি তার সুফিতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যাকুল হই। যদি তিনি সংসারবিরাগী হন আমি তাহলে তার বৈরাগ্যের আচার-ব্যবহারের ভিত্তি অনুসন্ধান করি। যদি তিনি যিন্দিক (নাস্তিক) হন তাহলে আমি তার এই ধরনের মত গ্রহণের সাহসিকতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেক গভীরে তাকাই। কোনো বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করার তৃষ্ণা প্রকৃতপক্ষে অল্প বয়স থেকে আমার স্বভাব ও রীতি। এটা আমার সহজাত আকর্ষণ ও আল্লাহপ্রদত্ত প্রকৃতির অংশ। এটি স্বভাবজাত; আমার পছন্দ ও পরিকল্পনার ফল নয়।'

ব্যাপক পথ পরিক্রমার পরে ইমাম গাযযালী শেষ পর্যন্ত সুফিবাদেই আস্থা স্থাপন করলেন। তিনটি জ্ঞানক্রিয়া সম্পর্কে ইমাম গাযযালীর মতামত এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনটি জ্ঞান পর্যায়ের নিম্নতম পর্যায় হচ্ছে ঈমান। এই পর্যায়ে মানুষ অন্যের কাছ থেকে, যেমন পিতা-মাতা বা শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করে। এটিকে বলা হয় তাকলিদ বা অন্ধ অনুকরণ। সাধারণ মানুষ তাকলিদে বিশ্বাসী। জ্ঞানের দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে যুক্তিসম্মত জ্ঞান। আলিম, ফকিহ ও বুদ্ধিজীবী এই শ্রেণীর জ্ঞানের ধারক। জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (যাওক্)। যাওক্-এর আভিধানিক অর্থ আস্বাদন। সুফিদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা যাওক্। তাই, ইমাম গাযযালীর মতে, সেই জ্ঞানই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

ইবনে আরাবি সুফিবাদ ও ইসলামের জ্ঞানতত্ত্বে এক উচ্চ আসন দখল করে আছেন। তাঁর মতে একটিমাত্র পরম সত্তাই শুধু ক্রিয়াশীল। এই সত্তা অবিভাজ্য, চিরন্তন এবং অপরিবর্তনশীল। তিনি এই সত্তার দু'টি দিকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। এর একটি হচ্ছে একত্বের দিক বা আহাদিয়া, যাকে জানা বা বর্ণনা করা যায় না। অপর দিক হচ্ছে প্রভুত্বের দিক বা রবুবিয়া, যার মাধ্যমে আল্লাহ স্রষ্টা হিসাবে ও প্রভু হিসাবে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। আল্লাহ যখন গোপন থেকে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেন, তখন তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব প্রদান করলেন। সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনার নেপথ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রেম। পরম একক সত্তা অবিভাজ্য, কিন্তু গুণ আরোপের ফলে তা অনেক রূপ লাভ করে। আমরা তখন তাতে বর্ণ, আকার, কালিক ও স্থানিক সম্বন্ধ আরোপ করি। ফলে তা বহু বা অনেক হিসাবে দেখা যায়। পরম একক সত্তা 'আল-হক' এবং বহু হচ্ছে 'আল-খালক'। যিনি সুফি, তিনি আকারের বহুত্বকে অতিক্রম করে অন্তর্নিহিত বাস্তব সত্তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

ইবনে আরাবির দ্বিতীয় মৌলিক মতবাদ হচ্ছে 'আল-ইনসান আল-কামিল' বা 'পূর্ণাঙ্গ মানুষ' মতবাদ। আল্লাহ নিজেকে কথার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করান। এই কথা বা বাণী হজরত আদম(আঃ) থেকে শুরু করে হজরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর মধ্যে গিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। হজরত মহাম্মদ(সাঃ) তাই পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তাঁর সত্তাই (হাকিকাতে মুহাম্মাদিয়া) বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানুষ বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ। মানুষকে সৃষ্টির জন্য বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলি প্রতিফলিত। বস্তুত প্রত্যেক মানুষই পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তবে পয়গম্বর ও সুফিগণ প্রকৃত পূর্ণতার অধিকারী হন। মুসলমানদের নবী হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) আল্লাহর সৃষ্ট প্রথম জীবন। কাল পরিক্রমায় পয়গম্বরদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ; এবং তিনিই ইবনে আরাবির 'আল-ইনসান আল-কামিল'।

ইবনে আরাবির শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সকল ধর্মের ঐক্যকে স্বীকার করে নেওয়া। যদিও প্রায় সকল সুফি এই একই মত পোষণ করেন, তবু ইবনে আরাবির আগে এত সুস্পষ্ট রূপে ও অকপটে কেউ এই ঐক্যের কথা ঘোষণা করেননি। ইবনে আরাবি চেয়েছেন সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্ম উদ্ধার করে সেগুলি যে মূলগতভাবে এক তা মানুষকে জানাতে। জীবনের অধিকাংশ সময় ইবনে আরাবি শরিয়তের নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেছেন। ইসলামি প্রথা অনুযায়ী নামাজ-রোজা করেছেন, জিকির-আজকার করেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরআন পাঠ করেছেন। একসময় সত্যের চরম শিখরে পৌঁছেছেন তিনি। সন্ধান পেয়েছেন আচার-অনুষ্ঠান-প্রথার অতিক্রমকারী বিশ্বজনীন সত্যের। এই সত্যেরই জয়গান ধ্বণিত হয়েছে তাঁর নিজের লেখা কবিতায়–

'আমার হৃদয় সকল আকার ধারণ করতে সক্ষম
এই হৃদয় হরিণের চারণভূমি আর খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম
এটি দেবপ্রতিমার মন্দির, হজযাত্রীর কাবা
তাওরাত কিতাবের ফলক, মহাগ্রন্থ কোরআন।
আমি অনুসরণ করি ভালোবাসার ধর্মকে
যে পথে ভালোবাসার ক্যারাভান আমাকে নিয়ে যায়;
ভালোবাসার ধর্মই আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস।'

ইবনে আরাবির এই 'ওয়াহদাত আল উজুদ' বা 'সত্তার ঐক্য' মতবাদ শরিয়তপন্থী মুসলমানদের সমালোচনার শিকার হয়েছে। চতুর্দশ শতকের অন্যতম সুফি আস-সামনানি আল্লাহ ও বিশ্বজগতের মধ্যে ধাঁধার সৃষ্টি করার জন্য ইবনে আরাবিকে দায়ী করেছেন। আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদ ফজলুর রহমানও ইবনে আরাবির 'অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী' মতবাদকে সনাতন ইসলামি চিন্তার পরিপন্থী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইবনে আরাবির মতবাদ ইসলামি আকিদার বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হিসাবে সুন্নিমহলে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে।

সুফিজগতের সবচেয়ে জনপ্রিয়, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব জালালউদ্দিন রুমি। তিনি ছিলেন হজরত আবু বকরের বংশধর, এবং বৈবাহিকসূত্রে খাওয়ারিজম রাজ-পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। তিন বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে নিশাপুরে সুফি ফরিদউদ্দিন আত্তারের কাছে নিয়ে যান। এক সময় তাঁর পিতাকে বাদশাহর রোষানলে পড়ে বলখ ত্যাগ করতে হয়। তরুণ জালালউদ্দিন রুমিকে নিয়ে পিতা বাগদাদ, মক্কা, দামেস্ক, মালাতিয়া এবং আরও অনেক জায়গা পরিভ্রমণের পরে অবশেষে কোনিয়াতে স্থিত হন। সেখানে তিনি অধ্যাপনা করতেন। পিতার মৃত্যুর পরে জালালউদ্দিন রুমিও অধ্যাপনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত সুফি শামস আদ দীন তাব্রিজি এই সময় কোনিয়ায় আসেন এবং তাঁর সঙ্গে জালালউদ্দিন রুমির সাক্ষাৎ হয়। রুমির আধ্যাত্মিক জীবনে এই সাক্ষাতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাব্রিজির অনুপ্রেরণাতেই রুমি জ্ঞানচর্চা ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনা ও কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। রুমি ছিলেন 'মাওলাবী সুফি সংঘের' প্রবর্তক। এদের জিকির-অনুষ্ঠানে সামা (সঙ্গীত) ও রাকস (নৃত্য) প্রচলিত, যা আদিম নরগোষ্ঠীগুলির প্রার্থনার ভঙ্গি মনে করিয়ে দেয়। এরা ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহর নাম জিকির করেন বলে তাদেরকে 'ঘূর্ণায়মান বা নৃত্যরত দরবেশ' আখ্যা দেওয়া হয়।

জালালউদ্দিন রুমির 'মসনবী' ফারসি ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। এই মহাকাব্য ৪৭০০০ শ্লোকের সমষ্টি। এতে সুফি মতবাদ ও সুফিসাধনা সম্পর্কে অজস্র বাস্তব ও কল্পিত উপকথা, নৈতিক উপদেশমূলক রূপক গল্প ও সুগভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার সমাবেশ ঘটেছে। তিনি চোদ্দ বছর ধরে এই মহাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অনেকেই রুমির 'মসনবী' গ্রন্থকে 'পাহলভি ভাষার কোরআন' আখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁর চিন্তার সারকথা হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম আসলে প্রেমিকের ধর্ম। প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও বিয়োগ-বিধুর আত্মার মর্মন্তুদ বিলাপই 'মসনবী' গ্রন্থের মূল সুর।

সুফিতত্ত্বের দীক্ষাগুরু হিসাবে রুমি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। নিজের আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে আরোহণের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বিবর্তনের ধারণারই অবতারণা করেছেন। প্রস্তর থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণী, এবং প্রাণী থেকে মানুষ জন্মলাভ করে ফেরেশতাদের অতিক্রম করে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়।

রুমির 'মাওলাবী সুফি সংঘ' ও তরিকা সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাদের অবিরাম ঘূর্ণায়মান নৃত্যকে স্বর্গীয় প্রেমাস্পদের জন্য বিরামহীন অন্বেষার প্রতীক বলে মনে করা হয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

আটাশ

আব্দুল খালেককে সকালে তার ঘরে না পেয়ে একটু বেকায়দায় পড়ে ইউসুফ। এই গাঁয়ের মধ্যে সে এখন কোথায় খুঁজবে আব্দুল খালেককে। লোকের মুখে শুনতে শুনতে আর কতদূর যাওয়া যায়! একটু বিরক্তিও আসে। লোকটা তো জানেই যে ইউসুফ আসবে। তাহলে হঠাৎ করে চলে গেল কেন? আর গেলই যদি, তাহলে ঠিক কোথায় গেছে তা কাউকে জানিয়ে গেলেই তো পারত। এখন ইউসুফ কী করে!

বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছা করছে না। সে তাই একটু চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত পালপাড়ার দিকেই হাঁটতে থাকে। এবং পরম খুশির সাথে দেখে যে যোগেন ফিরে এসেছে গাঁয়ে।

তাকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে যোগেন। বলে– আপনের আসার কী দরকার আছিল ভাইজান? আমি কাল অনেক রাতে বাড়িত ফিরিছি। আমার ছাওয়ালের মা কইছে আপনে গাঁয়ে আছেন। আমাক খুঁজবার আসিছিলেন সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাও কইছে। আমি এই সকালে চারডা পানি-পান্তা মুখে দিয়াই আপনের কাছে যাবার কথা ভাবতিছিলাম।

টুল এগিয়ে দিয়ে যোগেন বলে– বসেন, ভাইজান বসেন!

খুশির সাথে বসতে বসতে ইউসুফ জিজ্ঞেস করে– তা আপনি হঠাৎ অনুকুল ঠাকুরের আশ্রমে নাম লেখালেন কেন?

নাম লেখাইছি মানে! প্রশ্নটা বুঝতে পারে না যোগেন– ঐ জাগাত তো কারও নাম-ধাম লেখার দরকার পড়ে না ভাইজান! যে যায় তার জন্যেই অবারিত আশ্রমের দ্বার। কেউ আপনেক জিজ্ঞেস পর্যন্ত করবি না যে আপনে কোন জেলা থেকে গেছেন সেই জাগাত। কী উদ্দেশ্যে গেছেন সেডাও কেউ জিজ্ঞেস করবি না। কারণ ঠাকুরের ঘরে কেউ তো আর অন্য কাউরে খুঁজতে যায় না, ঠাকুররে খুঁজতেই যায়, ঠাকুরের বাণী শুনতে যায়, শান্তির জন্যে যায়।

তা আপনার আগের পরিকল্পনার কী হলো? মানুষে মানুষে যে ধর্মের বিভেদ আছে তা কি আর দূর করতে চান না?

অবশ্যই চাই। হাজার বার চাই। সেই পথ খুঁজতেই তো ঠাকুর-সন্ন্যাসির দুয়ারে দুয়ারে ঘুরা।

ঠাকুর মানে তো একটা নির্দিষ্ট ধর্মের লোক। ধর্মনেতা। তিনি তো নিজের ধর্মকেই সেরা বলেন। নিজের মতবাদকেই সঠিক বলেন। অন্য ধর্মের কথা তো তিনি শুনতে রাজি হবেন না। আর নিজের ধর্ম যাতে কিছুতেই বিলুপ্ত না হয়, সেটাও তো তিনি নিশ্চিত করতেই চাইবেন।

ঠাকুরের উদ্দেশ্যে জোড়হাতে প্রণাম জানাল যোগেন– এই ঠাকুর তেমন ঠাকুর না ভাইজান! তেমন ঠাকুর হলে যোগেন কি তার দুয়ার পারায়? যে পীর সব ধর্মের পীর না, সে আবার কিসের পীর? যে ঠাকুর-সাঁই সব ধর্মের মানুষের আশ্রয় হবার পারে না সে আবার কিসের ঠাকুর? আপনে বাঘার মাজারে যান, রাজশাহীত বাবা শাহ মখদুমের মাজারে যান, চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারে যান, দেখতে পাবেন সেথা ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নাই। শুনিছি ইন্ডিয়াত আছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আশ্রম। সেই ঠাঁই সক্কলের ঠাঁই। সেই জাগাত যাওয়া তো আর আমার মতোন মানষের কপালেত জুটবি না। তবে ভাইজান আমাগের দেশেও আছে এই রকম। নারাণগঞ্জের লাঙ্গলবন্ধে আছে, পাবনাত আমাগের বাড়ির কাছেত অনুকুল ঠাকুর আছে।

তো কী সাধন-ভজন অনুকুল ঠাকুরের?

আজ্ঞে ভাইজান তাগোর সাধন-ভজন তো একটাই। জীবে দয়া। জীবের সেবা। খাড়ান। আপনার জন্যে আমি আশ্রম থেকে একখান জিনিস আনিছি।

কী এনেছেন! মাদুলি-টাদুলি না চরণামৃত নাকি অন্য কোনো প্রসাদ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউসুফের কণ্ঠের তরল পরিহাস ঠিকই টের পায় যোগেন। বলে– ঐসব জিনিস যে আপনের জন্যে না সেটুক বুঝার মতোন বুদ্ধি অন্তত আমার আছে ভাইজান। আমি যা আনিছি তা দেখলে আপনে ঠিক ঠিক খুশি হবেন।

ঘরের ভেতরে গিয়ে যোগেন যে জিনিসটি এনে দিল তা হাতে পেয়ে সত্যি সত্যি খুশি হয়ে উঠল ইউসুফ। এমন একটা জিনিসের যে অস্তিত্ব আছে তা কস্মিনকালেও ভাবেনি ইউসুফ। শ্রী শ্রী অনুকুল ঠাকুরের লেখা বই– 'ইসলাম প্রসঙ্গে'। তার মুখের রেখা সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করছিল যোগেন। এবার নিজের অনুমান সত্যি হতে দেখে নির্ভেজাল আনন্দ ফুটে উঠল তার চোখে– কী ঠিক জিনিস আনিনি ভাইজান?

অবশ্যই যোগেন দাদা। অবশ্যই! এই বইটা পেয়ে আমি আসলেই খুব খুশি হয়েছি।

পড়ে দেখবেন ভাইজান, ঠাকুর কী সুন্দর করে দুই ধর্মের আদর্শের মিলের কথা বলিছেন। এরই নাম ধর্ম-সমন্বয়। যদি সব ধর্মের সমন্বয় হয়, তাহলে তো আমার ইচ্ছাই পূরণ হয়।

ঠিকই বলেছে যোগেন। মনে মনে ভাবে ইউসুফ। একবার মনে হয় এখনই বইটা পড়তে শুরু করবে। কিন্তু একটানা পড়াশোনা করতে করতে এক ধরনের ক্লান্তি এবং একঘেয়েমিও দেখা দিচ্ছে। গ্রামের জীবন তাকে আর তেমন ধরে রাখতে পারছে না। কিন্তু বুবুকে যেহেতু কথা দেওয়া আছে যে অন্তত দশটি দিন সে এবার থাকবেই, তাই যাওয়ার কথা বলতেও পারছে না। এমন বৈচিত্র্যহীন ঘটনাহীন দিন কীভাবে সে কাটাবে! তবু রক্ষা যে আব্দুল খালেকের মতো একজন লোক অন্তত পাওয়া গেছে। আব্দুল খালেকের কথা বলতেই যোগেন সায় দেয়– হ্যাঁ খাঁটি একজন মানুষ বটে খালেক হুজুর। যে ধর্মনেতার অন্তর মানষের জন্যে কান্দে না সে ধর্মনেতা হয় কীভাবে! সে তো জালেম-জল্লাদ। আমাগের খালেক হুজুরের বড় টান-বড় দরদ মানষের জন্যে।

তখনই জানা যায় আব্দুল খালেক রয়েছে উত্তর পাড়ায়। সেখানে নুরোল ব্যাপারির বউ খুব অসুস্থ। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যে আব্দুল খালেক ফজরের নামাজের পরেই সেখানে চলে গেছে। একটু আগেও তাকে সেখানেই দেখে এসেছে এ পাড়ার মেয়ে মালতি। তাকে সদরের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা শেষ করে তারপরে আব্দুল খালেক ফিরবে।

আব্দুল খালেকের ওপর থেকে বিরক্তি উবে গেল ইউসুফের। যুবক ইমামের প্রতি শ্রদ্ধা বরং বেড়ে গেল তার।

যোগেন বলল– কইছিলাম না, খালেক হুজুর একখান মানুষের মতোন মানুষ। আপনে তো জানেন না ভাইজান, এই চলনবিলে তো শ'য়ে শ'য়ে মজ্জিদ। সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজ্জিদেই ইমাম আছে, খাদেম আছে। কিন্তু একজনাও খালেক হুজুরের মতোন না। চলনবিলের সব মানুষই বোধায় ভালোবাসে তারে।

সত্যি সত্যিই হুজরালির এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে আব্দুল খালেক।

ইউসুফ বলে– ঠিকই বলেছেন যোগেন দাদা। এই যে আমাদের মসজিদের ইমাম আর মুয়াজ্জিনরা! তাদেরকে কে সম্মান করে বলেন! সম্মান করবেই বা কেন? এরা তো খালি ব্যস্ত থাকে জিয়াফত খাওয়া, মিলাদ পড়ানো আর ফতোয়াবাজি করার ধান্দায়। সমাজে এদের আর কোনো ভূমিকা নেই। তাই কোনো গুরুত্বও নেই। আপনাদের পুরুতগুলোরও একই অবস্থা। চংবং করে মন্ত্র পড়ে পূজার চাল-কলা পুটলিতে বেঁধে দক্ষিণা নিয়ে সরে পড়তে পারলেই বাঁচে। ধর্মীয় নেতার সম্মান যদি দেখতে চান, তাহলে খ্রিস্টানদের গ্রামে যান। সেখানে পাদ্রিরা হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানীত মানুষ।

তা তারা সন্মান পায় কী জন্যে ভাইজান?

ইউসুফ একটু চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে– আমি এই ব্যাপারে সবটুকু জানি না। তবে যেটুকু দেখেছি...। ধরেন আমি একটা পাদ্রিকে দেখেছি। ওরা তাকে ডাকে ফাদার বলে। সেই লোকটা সকালে গির্জায় প্রার্থনা সেরে বেরিয়ে পড়ে বালতি হাতে নিয়ে। গ্রামের যে যে বাড়িতে দুধেল গরু আছে, সেইসব বাড়িতে যায়। ওদের কাছ থেকে এক মগ, দুই মগ দুধ নিয়ে জড়ো করে। তারপরে সেই দুধ নিজে পৌঁছে দেয় বাড়ি বাড়ি ঘুরে গরীব মানুষদের ঘরে। সবার ঘরে নয়, যে বাড়িতে ছোট শিশু আছে, সেই বাড়িতে। গরীবের ঘরের শিশুটা অন্তত পুষ্টিহীনতায় ভোগে না। আপনি দেখবেন, আমাদের হিন্দু বা মুসলমান পরিবারে যত শিশু পুষ্টিহীনতায় মারা যায়, খ্রিস্টানপাড়ায় তত শিশু মারা যায় না।

যোগেন সোৎসাহে মাথা নাড়ে– বাহ বাহ রামকেষ্ট ঠাকুরের খাঁটি শিষ্য তো তাহলে খিস্টান পাদ্রিরাই!

তারপরে ধরেন, যে কোনো লোকের অসুখ-বিসুখে প্রথম খবর আসে পাদ্রির কাছে। লোকটা ফার্স্ট এইড জানে। ফার্স্ট এইড বোঝেন?

দাঁত বের করে হাসে যোগেন– অত ইংরেজি আমি কীভাবে শিখব!

ফার্স্ট এইড মানে হলো প্রাথমিক চিকিৎসা। ধরেন কারও জ্বর হলো। তখন ফার্স্ট এইড হলো মাথায় পানি ঢালা বা কপালে জলপট্টি দেওয়া। কোথাও কেটে-ছিঁড়ে গেল। তার প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে নিয়ে ঠিকভাবে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া। এইসব আর কী। ঠিকমতো ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করতে পারলে মানুষের অসুখ বেশি খারাপ দিকে গড়াতে পারে না। তো পাদ্রিদের ফার্স্ট এইডের ট্রেনিং দিয়ে তারপরে পাঠানো হয় গির্জাতে। আমি সেই লোকটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতে। সে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। ওষুধের দামও নেয় না।

তাহলে টাকা পায় কুন জায়গা থেকে? ও বুঝতে পারিছি। খিস্টান তো, বিদেশ থেকে ওগের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসে।

হেসে ফেলে ইউসুফ– টাকা মানেই বিদেশি সাহায্য তা তো না-ও হতে পারে। আমাদের মসজিদ-মন্দিরের মতো ওদের গির্জাতেও দানবাক্স রাখা আছে। সেই টাকা আমাদের মসজিদ কমিটির লোকেরা যেমন মেরে খায়, ওরা তা করে না। অর্থাৎ টাকাটা ঠিক কাজে লাগতে পারে। তবে বিদেশী সাহায্য যে আসে না তা-ও নয়। বিদেশী সাহায্য তো আমাদের মসজিদ-মাদ্রাসা-মক্তবেও আসে। কিন্তু সেই মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক-হুজুররা দেশের মানুষের কোন কাজে পাশে দাঁড়ায়!

আমাগের খালেক হুজুর ঠিক কুনো পাদ্রিক দেখে একই রকম কাজ করে।

কোনো পাদ্রিকে যে দেখতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। নিজের মধ্যে মানবিক চেতনা থাকলে মানুষের জন্য কাজ করার একটা না একটা পথ ঠিকই খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন আপনার কথাই ধরেন, আপনি যে কাজটা করতে চাইছেন, এটা তো আপনি কারও কাছে দেখে শেখেননি। যেহেতু আপনি মানুষের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, তাই একটা আইডিয়া আপনার মাথায় এসেছে।

একটু লজ্জিত দেখায় যোগেনকে– কী যে কন ভাইজান, আমি আবার একখান মানুষ!

ইউসুফ বলতে চায় যে প্রকৃত মানুষ তো যোগেনদের মতো মানুষরাই। কিন্তু বললে আবার যোগেন বেশি লজ্জা পেয়ে যাবে ভেবে বলে না।

বাড়িতে ফিরে ইউসুফ দেখে আব্দুল খালেক তার জন্যে ডোয়ারে অপেক্ষা করছে। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। সে অধৈর্যভাবে পায়চারি করছে ডোয়ারের একদিক থেকে আরেক দিকে।

ইউসুফ কাছে এসে তাকে আহ্বান জানায়– চলেন, ঘরে চলেন।

ঘরে ঢুকে হাতের একটা খবরের কাগজ মেলে ধরে আব্দুল খালেক। ধরা গলায় বলে– এই খবরটা পড়েন ভাইজান। দ্যাখেন কাঠমোল্লারা কী সব আকাম-কুকাম করে চলেছে!

খবরের কাগজ দেখে ইউসুফের মনে পড়ে, আরে সে তো এখানে আসা অব্দি কোনো খবরের কাগজও পড়েনি। অথচ বিলদহর বাজারে গেলেই খবরের কাগজ পাওয়া যায়। দুলাভাইকে বা বুবুকে জানালেই কোনো মুনিষ-চাকর দিয়ে রোজ আনিয়ে দিতে পারে। অথচ সে কথাটা একবারও মনে পড়েনি তার। নাকি নিজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আসলে এই কয়েকটা দিন বিচ্ছিন্ন থাকতে চেয়েছে বাইরের পৃথিবী থেকে! সম্ভবত শেষেরটাই সঠিক। তা নাহলে একবারও ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করেনি কেন? হ্যাঁ, এখানে ইলেকট্রিসিটি নাই বটে। কিন্তু তারপরেও গ্রামের কাউকে কাউকে মোবাইল ব্যবহার করতে দেখা যায়। তারা বিয়াস কিংবা ডাহিয়া কিংবা বিলদহরে গিয়ে মোবাইলে চার্জ করে আনে। একবার ফুল চার্জ করলে অন্তত দুইদিন চলে নিশ্চিন্তে। সেই কাজ তো ইউসুফও করতে পারে। কিন্তু সেই কথাও একবারের জন্যেও মনে আসেনি তার। বরং মোবাইল ফোনের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে কয়েকদিন থেকে খুবই নির্ভার মনে হচ্ছে। কিন্তু বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলেই তো আর বিচ্ছিন্ন থাকা যায় না। এই যুগে তা বোধকরি আদৌ সম্ভবই নয়। নিজে যোগাযোগ না করলেও বাইরের পৃথিবী নিজেই এসে ঢুকে পড়ে এখানে।

পত্রিকা হাতে নিয়ে আব্দুল খালেকের নির্দেশ করা অংশটি পড়তে শুরু করে ইউসুফ। হেডিং দেখেই রাগে শরীর জ্বলে ওঠে। আর পুরোটা পড়ার পরে স্থানু-পাথর হয়ে যায় সে। বগুড়ার গ্রামে এক পল্লীকবি ইনসানউদ্দিনকে শরিয়ত-বিরুদ্ধ কবিতা লেখার অপরাধে মুরতাদ ঘোষণা করেছে মোল্লারা। তারপর তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে। একঘরে করেছে। নির্যাতনে নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পড়া দরিদ্র লোকটি কোনো চিকিৎসাও নিতে পারেনি। বরং শয্যাশায়ী অবস্থাতেও তাকে আরও বেশি নির্যাতন করা হয়েছে। অসহায় কবিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি কেউ। শেষ পর্যন্ত মরতে হয়েছে তাকে মুরতাদ আখ্যা নিয়ে। তারপরে, তার জানাজা করতে দেওয়া হয়নি। কবর দেওয়ার সময় কেউ সহযোগিতা করতে পারেনি। গ্রামের গোরস্তানে দাফন করতে দেওয়া হয়নি তার লাশ। পরিবারের লোকেরাই কোনো রকমে তাকে মাটিতে পুঁতে রেখেছে।

ইসলামের নামে আর কত মানুষকে হত্যা করবে অশিক্ষিত মোল্লারা! আর মানুষ যে চেয়ে চেয়ে কেবল দেখে এইসব অবিচার, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সাধারণ মানুষ তো বটেই, তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরাও জানে না এইসব বিষয়ে ইসলাম ও কোরআনের সঠিক বিধান কী। তাই ইসলামবিরোধী- মানবতাবিরোধী ফতোয়া দিয়েও পার পেয়ে যায় ইসলাম-ব্যবসায়ীরা। আমাদের দেশের মানুষের অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু ইসলামের নামে বেসাতি এবং অন্ধকারের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার সমস্যাটাই আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে হচ্ছে ইউসুফের। এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে বাঁচার একটাই পথ। প্রত্যেক সচেতন শিক্ষিত মানুষকে কোরআন পড়তে হবে। ইসলামের সঠিক ইতিহাস পড়তে হবে। ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কোরআনকে অশিক্ষিত মোল্লারা তাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। মানবতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইনের শাসন, গণতন্ত্র– এসবের দোহাই দিয়ে তাদের থামানো যাবে না। তাদের হাত থেকে এই অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের কোরআন-পাঠ। প্রতিটি মুসলমানকে কোরআন এবং ইসলামের বিধান সম্পর্কে সঠিক ধারণায় শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া আর কোনো পথ আমাদের সামনে নেই।

উনত্রিশ

সাধারণভাবে মুরতাদ তাকে বলা হয় যে আগে মুসলমান ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে। শরিয়তের আইনে বা শারিয়া আইনে এই ধরনের ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। যেমন, আন্তর্জাতিক চাপে আফগানিস্তানে মুরতাদ বলে ঘোষিত আবদুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর আগে মুরতাদ-ঘোষিত ও শারিয়া আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত নাইজেরিয়ার আমিনা লাওয়াল ও সাফিয়া; এবং পাকিস্তানের ডঃ ইউনুস ও জাফরানি বিবিকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে। লেখক সালমান রুশদিকে শারিয়া আইনে মুরতাদ ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ও.আই.সি. বা মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সংগঠনের মধ্যে এক ইরান ছাড়া বাকি সব দেশ এই বিধানের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শারিয়া আইন পিছু হটছে। এই পিছু হটাই প্রমাণ করে যে শারিয়া আইনকে যেভাবে আল্লাহর আইন বলে চালানো হয়, শারিয়া সেই অর্থে আল্লাহর আইন নয়। কারণ আল্লাহর আইন কোনো অবস্থাকেই রদ হওয়ার নয়। পৃথিবী উল্টে গেলেও আল্লাহ নিজেই তাঁর ধর্ম ও আইনকে অবশ্যই হেফাজত করবেন। কাজেই শারিয়া আইন মানেই আল্লাহর আইন– এমন ভাবনাকে পুনরায় তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

মুরতাদ শব্দটি এসেছে মূল আরবি শব্দ 'রাদ্' থেকে। এর সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলি হচ্ছে 'ইরতাদ' 'রিদ্দা' এবং 'মুরতাদ'। এগুলি সবগুলিই স্বকর্ম। নিজে থেকে না করলে বা বললে বাইরে থেকে কেউই এইসব কাজ করাতে পারে না। যেমন আত্মহত্যা। আত্মহত্যা কেবল নিজে নিজেই করা যায়। অন্য কেউ করলে তখন আর সেটা আত্মহত্যা থাকে না, হয়ে যায় হত্যা। ঠিক তেমনই মুরতাদ ঘোষণা নিজেকেই করতে হয়। অন্য কেউ কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করতে পারে না। মুরতাদ-বিষয়ে কোরআনে প্রায় কুড়িটি আয়াত রয়েছে। এবং কোনোটিতেই কোনো পার্থিব দণ্ড প্রদানের কথা বলা হয়নি। আল্লাহ বলেছেন যে তিনি নিজেই মুরতাদকে শাস্তি দেবেন। কয়েকটি আয়াত দেখলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে ঈমান আনিবার জন্য?" (সুরা ইউনুস ৯৯)

"যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।" (সুরা কাহ্‌ফ ২৯)

"আর যে লোক বিমুখ হইল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ) তাহাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করি নাই।" (সুরা নিসা ৮০)

"আপনি তো কেবল উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন।" (সুরা গাসিয়াহ ২১, ২২)

"যে তোমাদেরকে সালাম করে তাহাকে বলিয়ো না যে তুমি মুসলমান নও!" (সুরা নিসা ৯৪)

"ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নাই।" (সুরা বাকারা ২৫৬)

"তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।" (সুরা কাফেরুন ৬)

"আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম।" (সুরা আশ শুরা ১৫)

"মোমেনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে যারা আল্লাহর সে দিনগুলি সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোনো সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন।" (সুরা জাসিয়া ১৪)

রাসুল তাঁর সমস্ত জীবনে আল্লাহর দেওয়া সমস্ত বিধানের মতো এই বিধানও নিঃশর্তে পালন করেছেন। ইবনে ইসহাক লিখিত রাসুলের জীবনী থেকে আমরা তিনজন মুরতাদের সন্ধান পাই। এই তিনজনের নাম হারিথ, ইবনে সা'দ, এবং উবায়দুল্লাহ। ইতিহাস বলছে, রাসুল তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা, কোনো শাস্তিই দেননি। বরং পরবর্তীতে তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান সা'দকে মিশরের গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

চিরকাল সুফি-দরবেশ ও ইসলামি পণ্ডিতরা এই একই নীতি পালন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে এসেছেন।

বিশ্ব-জামাতিরাও ভালোভাবেই জানে যে মুরতাদ-হত্যাসহ বেশ কিছু শারিয়া আইন রয়েছে যেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোরআন-হাদিসবিরোধী। বিশ্বে শারিয়া আইন প্রবর্তনের অন্যতম প্রচারক, ইউরোপিয়ান ফতোয়া ও গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য ড. জামাল বাদাওয়ি স্বীকার করেছেন যে কোরআনের কোনো আয়াতেই মুরতাদের দুনিয়ায় শাস্তির বিধান নাই। কোরআন বলে, এই শাস্তি পরকালেই হবে।

ড. ইউসুফ কারজাভি আগে এই আইনের সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীতে এই মত পরিবর্তন করেছেন। আল-আজহা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মতত্ত্বে উচ্চ ডিগ্রি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জনকারী মুবিন শেখও স্বীকার করেছেন যে মুরতাদ-হত্যার শারিয়া আইন কোরআনের মূলনীতির বিরোধী। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামির অন্যতম তাত্ত্বিক শাহ আবদুল হান্নান তার 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' গ্রন্থে মুরতাদের শাস্তি হিসাবে তাকে হত্যা করার বিধান রেখেছেন। সেই তিনিও বাংলার ইসলাম আলোচনা ফোরামে বলেছেন যে– 'অতীতের অনেক ইসলামি বিশেষজ্ঞের মতে সৈয়দ মওদুদী প্রাচীন মতে (মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডে) বিশ্বাস করিতেন। বর্তমানের বেশিরভাগ ইসলামি বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বা প্রাচীন বিশেষজ্ঞের সহিত একমত নহেন। যখন কোনো বিষয়ে মতভেদ হয় বা একাধিক মতামত হয় তখন কোনো একজন বিশেষজ্ঞের ইজতিহাদ মানিতে কেহ বাধ্য নহে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিষয়ে সৈয়দ মওদুদীর সহিত একমত নহি।'

তাহলে কোনো ব্যক্তিকে মুরতাদ ঘোষণা ও তার মৃত্যুদণ্ডের বিধান কোত্থেকে এলো?

এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আমদানি করা হয়েছে ইহুদিদের ধর্মপুস্তক 'ডিউটেরনমি' থেকে। সেখানে বলা হয়েছে– "(যদি কেহ) বলে 'চলো আমরা অন্য স্রষ্টাকে সেবা করি'... তবে তোমরা নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিবে!"

মওদুদী এবং চরমপন্থী কাঠমোল্লারা এই ইহুদি আইনকেই ইসলামি আইন বলে চালাতে চান। তারা ফতোয়া দেন যে মুরতাদকে হত্যা করতে হবে, তার বিবি তালাক হয়ে যাবে, মুরতাদের কোনো সাক্ষ্য বা উত্তরাধিকার গৃহীত হবে না। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফতোয়া হচ্ছে মুরতাদকে যে কেউ হত্যা করতে পারবে। এই হত্যার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না, বরং পুরস্কৃত করা হবে। এই ফতোয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান বা বাংলাদেশের অনুন্নত চিন্তার অধিবাসীরা ইতোমধ্যেই বেশকিছু এমন হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে।

মুরতাদ হত্যার সপক্ষে মওদুদী ও অনুসারীরা যেসব যুক্তি উত্থাপন করেন, সেগুলি কিছুটা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

তারা তাদের বক্তব্যের সপক্ষে সুরা তওবার ১১ ও ১২ নম্বর আয়াত দুইটি ব্যবহার করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে– "অবশ্য তাহারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনি ভাই... আর যদি প্রতিশ্রুতির পরে তাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো।"

প্রকৃতপক্ষে এখানে মুরতাদ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এই আয়াতের শানে নুজুল বা পটভূমি বিশ্লেষণ করলেই সেকথা বোঝা যায়। শারিয়া সম্পর্কে মওদুদীদের সঙ্গে মোটামুটি সহমত পোষণ করেন মওলানা মুহিউদ্দিন। তার অনুবাদ করা বাংলা কোরআন থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া যাক– 'সুরা তওবার সর্বত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধসংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম-আহাকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হোনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি... ষষ্ঠ হিজরি সালে... তাদের সাথে হোদাইবিয়ায় সন্ধি হয়... এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনু বকর গোত্র বনু খোজার উপর অতর্কিত হামলা চালায়... অর্থাৎ হোদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি... এখানে (১১ নং আয়াতে) বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ (যেমন) তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন... আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পরে শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো।'

কোরআনে সুবিধা করতে না পেরে মওদুদী ও তাঁর অনুসারীরা দ্বারস্থ হন হাদিসের। তখন তারা ভুলে যান যে যদি হাদিসের বক্তব্য কোরআন দ্বারা সমর্থিত না হয়, তাহলে সেই হাদিস আপনাআপনিই বাতিল হয়ে যায়। যে হাদিসের কথা তারা বলেন তাতে বলা হয়েছে যে, 'নবীজী বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করে তাহাকে হত্যা করো।' এই হাদিসের কোনো সূত্র উল্লেখ নেই। তদুপরি এই হাদিসের সমর্থনে তারা কেবলমাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করতে সমর্থ হয়েছেন, যে ঘটনার কথা লিখেছিলেন ইমাম বায়হাকি রাসুলের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে। বলা হয়েছে, নবীজী নাকি ইসলাম ত্যাগ করার অপরাধে একজন নারী-মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সেই মহিলার সঠিক নামও ইমাম বায়হাকি জানাতে পারেননি। একবার লিখেছেন উম্মে রুমান, আরেকবার লিখেছেন উম্মে মারোয়ান।

এবার মওদুদী ও সঙ্গীরা সাক্ষী মানতে চেয়েছেন হজরত আবু বকরের সময়কালকে। তারা দাবি করেন যে রাসুলের মৃত্যুর পরে দূরের কিছু গোত্র মুরতাদ হয়েছিল। তখন হজরত আবু বকর নাকি তাঁর সেনাদলের সিপাহসালারকে হুকুম দিয়েছিলেন– 'ইসলাম কবুল না করলে ওদের কাউকে জীবন্ত ছাড়বে না। আগুন দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। তাদের নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখবে।' মওদুদী এবং তার অনুসারীরা এখানে হজরত আবু বকরকে একবারে হালাকু খানের মতো নৃশংস বানিয়ে ছেড়েছেন।

রাসুলের ওফাতের পরে কিছুটা বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। কেউ কেউ হজরত আবু বকরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। যারা মুসলমানদের ভয়ে নিরুপায় হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মে ফিরে গেল। কেউ কেউ নবীত্ব দাবি করে বসল; তারা প্রচুর সাহাবাও জুটিয়ে ফেলল। তবে প্রধান কারণ ছিল ভিন্ন। বিদ্রোহী গোত্রের বেশিরভাগই মনে করত যে 'গাদীর-এ-খুম'-এর ভাষণে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুস্পষ্টভাবে হজরত আলীকে তাঁর উত্তরাধিকারি মনোনীত করা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্র করে তাঁর পরিবর্তে হজরত আবু বকরকে খলিফা করা হয়েছে। তারা ইসলাম ত্যাগ করেনি। কিন্তু রাজস্ব হিসাবে তাদের জাকাত মদিনায় পাঠাতে অস্বীকার করেছিল।

মুরতাদ-সংক্রান্ত শারিয়া আইনটি যে কোরআন-বিরুদ্ধ একথা জেনেও মওদুদী ও তার মতো লোকেরা কেন এই আইনের পক্ষে জীবনপণ করছিলেন? উত্তর লুকিয়ে আছে অন্যত্র। তাদের আতঙ্ক আসলে অন্য জায়গায়। মানুষ যদি একবার জেনে যায় যে শারিয়ার মধ্যে কোরআন-বিরোধী আইন আছে, তাহলে তারা শারিয়া আইনকে সন্দেহ করতে শুরু করবে। তখন আর শারিয়াকে 'আল্লাহর আইন' বলে চালানো যাবে না। অশিক্ষিত মানুষকে শারিয়া আইনের নামে সংগঠিত করে নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই তারা প্রাণপণে শারিয়ার সকল আইনকেই সমর্থন করার চেষ্টা চালিয়ে যান। এ ব্যাপারে স্বয়ং মওদুদীর বক্তব্য হচ্ছে– 'মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা কোনো কালেই ছিল না। যে ব্যাপারে ক্রমাগত ও অবিচ্ছিন্ন সাক্ষ্যের সমর্থন রহিয়াছে উহার প্রতি যদি সন্দেহ জন্মায় তাহা হইলে সে সন্দেহ একটি বা দুইটি সমস্যায় সীমাবদ্ধ থাকিবে না... ইহা এমন পর্যায়ে চলিয়া যাইবে যে, মুহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য পর্যন্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইবে।' এখানে যাকে তারা 'মুহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য' বলছেন, প্রকৃতপক্ষে তা তাদের নিজেদের ক্ষমতার মসনদে বসার লোভ। সেই কারণেই তারা ইসলামের চিরশত্রু ইহুদিদের আইনকে কোরআনের আইন বলে চালিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন না। আর তাই দেখে অশিক্ষিত, অবিবেচক মানুষরা দেশে দেশে মুক্তচিন্তার মানুষকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের উপর নাজায়েজ জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিশ

দুলাভাই তীব্র আপত্তি জানায়– তোমার এই কথাটা ঠিক না। আমাগের দেশে কেউ অন্য ধর্মরে অপমান করে না।

অপমান করা বলতে আপনি কী বোঝেন? এই যে সব সময় আমরা বলি যে আমাদের ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের নবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব– এইটুকু বলাই কি যথেষ্ট নয়? এই কথা বলা মানেই তো অন্য ধর্ম নীচু ধর্ম, সেকথা বলা হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুলাভাই এবার চুপ করে যায়। কারণ এইভাবে যে আমাদের সবসময় উচ্চারিত কথাটার মাধ্যমে আমরা অন্য ধর্মকে নিজের অজান্তেই ছোট করে দেখছি, তা আমরা কেউই আসলে ভেবে দেখি না।

ইউসুফ খেই ধরে– কেউ যদি, ধরেন, কোনো হিন্দু বা কোনো খ্রিস্টান আপনার সামনে দিনে-রাতে প্রকাশ্যে বলতে থাকে যে তার ধর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাহলে আপনার কেমন লাগবে? আপনি কি প্রতিবাদ করবেন না? কোনো হিন্দু যখন এই ধরনের কথা শোনে, সে-ও ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হয়। সে যে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে পারে না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সে এখানে সংখ্যালঘু এবং দুর্বল।

তাই বলে আমি আমার ধর্মরে...

নিশ্চয়ই আমি আমার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমি আমার ইসলাম ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, আমার রাসুলকে শ্রেষ্ট নবী ও মহামানব বলে মনে করি বলেই তো আমি এই ধর্মে আছি, এই ধর্ম পালন করছি। সেই কথা আমি নিজেকে সবসময় বলি। আমরা নিজেদের মধ্যে যখন-তখন আলাপ করতে পারি। নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য পরিশ্রম করতে পারি। এমনকি সাংগঠনিক কর্ম পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু একই সময় এই কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে কোনটি হিন্দু ধর্ম পালন করছে সে-ও নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করেই পালন করছে। যে খ্রিস্টান, যে বৌদ্ধ, যে ইহুদি, তাদের সবার ক্ষেত্রেই এই কথা খাটে। কী যোগেন দাদা, কেউ যখন আপনার সামনে বলে যে ইসলাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তখন হিন্দু হিসাবে আপনার খারাপ লাগে না?

গা মোচড়ায় যোগেন– তা ইকটু লাগে। কিন্তু খুব বেশি লাগে না। শুনতে শুনতে অভ্যেস হয়া গেছে তো!

হেসে ফেলল সবাই। ইউসুফ একটু গম্ভীর হয়ে বলল– এটাই হচ্ছে আসল পরাধীনতা। অভ্যস্ত হয়ে পড়া। এইভাবেই মানুষ অভ্যস্ত পথে চলতে চলতে নিজের চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে। ভাবে যা দেখছে, যা ঘটছে, সেটাই সব। অন্যভাবেও যে একটা জিনিসকে দেখা বা চিন্তা করা সম্ভব, তা সে ভুলেই যায়। আমাদের এই ধরনের ব্যাপারগুলি যোগেন বা জোসেফদের যেভাবে কষ্ট দিচ্ছে, ঠিক একই ভাবে পিছিয়ে রাখছে আমাদের বাঙালি মুসলমান সমাজকে।

দুলাভাই এতক্ষণে একটু সহজ হয়েছে। বাইরে একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক। কানে এসে বাড়ি খাচ্ছে মাঝে মাঝে। দুলাভাই রেগে গিয়ে হাঁক ছাড়ল– এই মজিদ, ঘুগড়ি পোকাডারে মার তো। এমন ডাক শুরু করিছে হারামজাদা যে কথা বলাই কঠিন।

মুসলমানমঙ্গল– দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরে ইউসুফের দিকে ফিরে বলল– তোমার পয়লা কথাখান বুঝা গেল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের পিছায় পড়ার সাথে এই কথার সম্পর্ক কী?

ইউসুফ ম্লান হাসল– একটা জাতি বা জনগোষ্ঠী যত পিছিয়ে পড়তে থাকে, তত বেশি করে সে নিজের কল্পিত অবস্থান নিয়ে গলাবাজি করতে থাকে। তখন তার ভুল কেউ ধরিয়ে দিলেও সে তা ভুল বলে মানতে চায় না। সে যত দিন যায়, তত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বাঙালি মুসলমান যে কতটা অসহিষ্ণু, তা রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই তিনি বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে কোনো লেখা লেখেননি। কারণ এটি অন্তত তিনি বুঝেছিলেন যে বাঙালি মুসলমানকে নিয়ে লিখতে হলে শুধু তার প্রশংসা করেই লিখতে হবে। সত্যি সত্যি এই সমাজের মধ্যে যেসব দুর্বলতা আছে, সেগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তারা সেটা সংশোধন তো করবেই না, উল্টো রবীন্দ্রনাথকে মুসলমানবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক বলে তার পেছনে লাগবে। সেই ঝুঁকি রবীন্দ্রনাথ নিতে চাননি।

রবীন্দ্রনাথ একথা বুঝলেন কেমন করে?

কোনো জাতি মনের দিক থেকে সাবালক হয়ে উঠছে কি না তা বোঝার একটা সহজ চিহ্ন আছে। সেই জাতি নিজের সমালোচনা, মানে আত্মসমালোচনা করতে শিখেছে কি না সেটাই হলো সেই চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকা পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এমন চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখতে পাননি। বাঙালি মুসলমান আত্মসমালোচনা করতে শেখেনি। যদি শিখত, তাহলে নিজেদের ভুলগুলিও শুধরে নিতে পারত।

একটু থামল ইউসুফ। তারপর তিক্ত একটু হাসির সাথে বলল– আর এখন খালি বাঙালি মুসলমানের কথা বলেই বা কী হবে! সারা পৃথিবীর প্রায় সব মুসলমানই নিজের মনের ঘরে তালাচাবি দিয়ে রেখেছে। সেই কারণে তারা শুধু পিছিয়েই যাচ্ছে, আর মার খাচ্ছে।

আব্দুল খালেক এতক্ষণে কথা বলে– তাহলে মুসলমানদের মধ্যে কি বরাবরই গোঁড়ামি বেশি ভাইজান?

তা কেন হবে! একসময় মুসলমানরাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উদার এবং যুক্তিপ্রিয় জাতি।

ভেতরের ঘর থেকে বুবুর অসন্তোষ ভেসে আসে– কাল সকালে যাওয়ার কথা তোর। অনেক রাস্তা হাঁটা লাগবি। সকাল সকাল ঘুমায় একটু বিশ্রাম করা বাদ দিয়ে এত বকবক করা কী জন্যে! আর রাত করিস না তো?

ইউসুফ হেসে বলে– মোটেই রাত হয়নি বুবু। আর সবাইকে এইভাবে যেতে বলার কোনো দরকার নাই। এখন সবাই যদি চলেও যায়, তাহলেও আমার ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে গায়ে ব্যথা হবে শুধু শুধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল সকালে ইউসুফ চলে যাবে বলেই আজ সে নিজে থেকে আব্দুল খালেক আর যোগেনকে দাওয়াত করে এনেছে। একটা বেলা অন্তত একসাথে খাওয়া যাক। ইউসুফের চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে বুবু কাঁদছে আর রান্না করছে। কত রকম পদ যে রেঁধেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কয়টা জিনিস আর মানুষ একসাথে খেতে পারে! এই কারণেই বুবুর উষ্মা একটু বেশি।

ইউসুফ গলা তুলে বলল– আপনি শুয়ে পড়েন বুবু।

তারপর আবার ফিরে এলো আলোচনায়– অসহিষ্ণুতা আর পিছিয়ে পড়া, এই দু'টি জিনিস একটা আরেকটার সঙ্গে সঙ্গে চলে। যতদিন মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনায় যুক্তির চর্চা করেছে, ততদিন তারা পৃথিবী শাসন করেছে। যখন বিজ্ঞানচিন্তা ত্যাগ করে গোঁড়ামিতে ফিরে গেছে, তখন থেকে তার পতন শুরু। সেই পতনের ধারা এখনও অব্যাহত। কবে যে থামবে সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা করা যাচ্ছে না।

মুসলমানদের মধ্যে যুক্তিবাদী অনেক গোষ্ঠী ছিল। মনে রাখতে হবে, যুক্তিবাদী হলেই তাকে ধর্মবিরোধী হতে হবে, এই ধারণা ভুল। বরং যুক্তি দিয়ে ইসলামকে আরও সুসংহত করার কাজটি করেছিলেন একসময় মুতাজিলারা। মুতাজিলা মতবাদ কয়েকটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সেগুলি ছিল– ১. আল্লাহর একত্ব। ২. আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি। ৩. আল্লাহর দীদার বা দর্শনলাভ। ৪. আল্লাহর কালাম। ৫. ভালো-মন্দ এবং সৎ-অসৎ। ৬. কোরআন সৃষ্ট কিংবা চিরন্তন। ৭. মানুষের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। ৭. বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য।

রক্ষণশীল মুসলমানদের মতোই মুতাজিলারাও বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ এক, অনন্ত, অনাদি। তারা আরও বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ কারও দ্বারা সৃষ্ট নন, এবং তার কোনো অংশীদার নেই। কিন্তু তাদের মতে আল্লাহ নিরাকার ও স্বীয় সত্তার অধিকারী। আল্লাহর কোনো গুণাবলির প্রতি তারা কোনো আস্থা রাখেনি। কারণ তারা মনে করে যে ঐসব গুণাবলির ধারণা আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্বকে ব্যাহত করবে। তারা বলে যে আল্লাহকে উপলব্ধি করার জন্যই ঐসব গুণাবলির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্বতায় দৃঢ় মতামতের জন্য মুতাজিলাদেরকে 'আহল-উল-তাওহিদ' বা 'একত্ববাদী'ও বলা হয়।

কিন্তু এই গোষ্ঠীটির প্রধান কৃতিত্ব মুসলমানদের মধ্যে যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগকে উৎসাহিত করার মধ্যে নিহিত।

জ্ঞান অর্জনের কথা কোরআনে এবং হাদিসে বার বার বলা হয়েছে। কিন্তু কোন ধরনের জ্ঞান অর্জনের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ তৈরি করা হয়েছিল। শুরু থেকেই এক শ্রেণীর মুসলমান দাবি করে আসছিলেন যে জ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে প্রধানত ধর্মীয় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাসুলের সবচেয়ে বহুল পরিচিত হাদিসটি বিশ্লেষণ করলে অন্য তাৎপর্য ধরা পড়ে। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীনে যেতে হলেও তা অর্জন করতে বলেছেন। এখন চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে রাসুল এই হাদিসে কোন জ্ঞানের কথা বলেছেন। যদি ধর্মীয় জ্ঞানের কথা দাবি করা হয়, তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন উঠে আসে। যেমন, ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য মদিনা ছেড়ে চীনে যেতে হবে কেন? ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য খোদ রাসুল ছাড়াও অন্য কোনো শিক্ষকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি না? চীনে তো তখন ইসলামের দাওয়াতই পৌঁছানো হয়নি। সেখানে কোনো মুসলমান ছিলেন না। তাহলে বিধর্মীর কাছে ইসলামি শিক্ষা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে? চীন তখন কি ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল না কি জাগতিক ও পার্থিব জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল?

এই ক'টি বিষয় বিশ্লেষণ করলে এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ থাকে না যে রাসুল শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানকেই এলেম বলতেন না, পার্থিব জ্ঞান যা মানুষের ইহকালীন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও মননের উন্নয়ন সাধন করে, সেগুলিকেও তিনি এলেম বলতেন। কাজেই আলেম মানে শুধু ধর্মজ্ঞানের ডিগ্রিধারী নয়, ফতোয়াদাতা নয়, আলেম মানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর যে কোনো সৎ ও মানবকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তি।

যে কয়েক শত বছরকে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়, সেই সময়ে সব ধরনের বিদ্যারই উন্নয়ন ঘটেছিল। খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ের তো কথাই নেই, উমাইয়া এবং আব্বাসীয় বংশের শাসনের সময়েও মুসলমানরা জ্ঞানচর্চায় শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিলেন। উমাইয়া যুগে অমুসলিম ও অনারবিয় ব্যক্তিরা যাতে কোরআন পাঠ করতে পারেন সেই জন্য আরবি ব্যাকরণ তৈরি করা হয়। আরবি ব্যাকরণের স্থপতি ছিলেন বসরার আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালি। কথিত আছে যে তিনি এই ব্যাপারে প্রেরণা লাভ করেছিলেন হজরত আলীর কাছ থেকে। আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ এবং আল মামুনের সময় বাগদাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠে পরিণত হয়। আল মামুন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি একাধারে ছিল পাঠাগার, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, এবং তর্জমা বা অনুবাদকেন্দ্র। ইতোপূর্বে খলিফা মনসুর এবং হারুনের সময় কিছু বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বায়তুল হিকমা স্থাপনের পরে সেইসব কাজ অনেক দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে পেরেছিল। খলিফা নিজের উদ্যোগে সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, মিশরসহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং অনুবাদকদের তাঁর প্রতিষ্ঠানে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন। এই কাজে তিনি ধর্মে বা মতবাদে কোনো পার্থক্য খোঁজেননি। যেমন তাঁর অনুবাদ সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা হুনায়ন ইবনে ইসহাক ছিলেন নেস্টোরিয় খ্রিস্টান। তাঁরা গ্রিক দর্শন, মানববিদ্যা, সাহিত্য ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হতেন না, বরং একই সাথে টীকাভাষ্যের পাশাপাশি নিজেদের মৌলিক গবেষণার ফলাফলও এগুলির সাথে সংযুক্ত করেছেন। ফলে পৃথিবী নতুন এক বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্যালেন, প্লেটো, এরিস্টোটল, টলেমি প্রমুখের রচনা এই সময়েই অনূদিত হওয়ার মাধ্যমে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

আল মামুন বাগদাদের শাম্মাসিয়া ফটকের সামনে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা হয়েছে। এই মানমন্দিরের পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ সিন্দ ইবনে আলী এবং ইয়াহিয়া ইবনে আবি মনসুর। এখানে জ্যোতির্বিদরা শুধু যে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন তা নয়, বরং টলেমি-লিখিত আলমাজেস্টের সূত্রগুলিও পরীক্ষা করে দেখতেন। দিবারাত্রির সমতা ও সৌর বছরের দৈর্ঘ্য নিয়ে এই মানমন্দিরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন আরববিজ্ঞানীরা। এই মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদরা পৃথিবীর আকৃতি ও পরিধি নির্ভুলভাবে নিরূপণ করেছিলেন। তাঁরা প্রথমে মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ানের মাত্রা নিরূপণ করে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, আরববিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে গোলাকার ধরে নিয়ে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এই সময়ই কাজ করেছেন অ্যালজেব্রার জনক আল খাওয়ারিজমি। এই সময়েই দূরবিন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী আবুল হাসান।

স্পেনের কর্ডোভায় খলিফা দ্বিতীয় হাকাম জ্ঞানচর্চার যে ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন, ইতিহাসে তা কিংবদন্তি হয়ে আছে। বাগদাদের নিজামিয়া বা মিশরের আল আজহারও আগে কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সারা পৃথিবী থেকে মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি এবং অন্য সকল ধর্মের শিক্ষার্থীরা এখানে আসতেন জ্ঞান অর্জনের জন্য। খলিফা বই সংগ্রহের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে রাজি ছিলেন। তাঁর লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়া, দামেস্ক ও বাগদাদের বইয়ের দোকানে নিয়মিত বই কিনতে যেতেন। তারা পুস্তক কিনে নিতেন অথবা পুস্তকের প্রতিলিপি তৈরি করে নিতেন। কেউ খলিফাকে কোনো বই উপহার দিলে তিনি সবচাইতে বেশি খুশি হতেন। তাঁর নিজের লাইব্রেরিতে বইয়ের সংগ্রহ ছিল ছয় লক্ষ। পণ্ডিতদের জন্য অকাতরে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দিতেন স্পেনের খলিফারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একত্রিশ

বুবু চোখ মুছে বলল– আব্বা আর মায়ের দিকে একটু খিয়াল রাখিস ভাই। আব্বার শরীরডা তো খুবই খারাপ। ঠিকমতোন ডাক্তার দেখাতে কোস।

ঠিক আছে বুবু। আমি দেখব। চিন্তা করবেন না।

এবার বুবুর ঠোঁটে একটু হাসি ফোটে– আমিও আবার যা! তোক দেখার জন্যেই তো লোক লাগে। তুই আবার অন্যের দেখাশুনা করবু কীভাবে! বড় বড় চিন্তা নিয়া থাকলে তো কাছের মানষেগের দিকে চোখ পড়ে না।

দুলাভাই বলে– যারা বড় কাম করে, তাগের নিজের ব্যাপারে একটু উদাসীন হওয়াই লাগে। খালি নিজের চৌহদ্দির মধ্যে ব্যস্ত থাকলে মানুষ দূরের কিছু দেখবার পায় না। সেইসব কাম আমাগের মতোন সাধারণ মানুষের। ইউসুফরে আল্লা বড় কামের জন্যে পাঠাইছে। আমরা যারা তার কাছের মানুষ, তাগোরে তো একটু স্যাক্রিফাইস করাই লাগবি।

চমকে উঠে দুলাভাইয়ের দিকে তাকাল ইউসুফ। দুলাভাই কি ব্যঙ্গ করছে? কিন্তু চেহারা দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। তাকে এভাবে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে দুলাভাই হাসে। অভয়দানের ভঙ্গিতে হাত রাখে ইউসুফের পিঠে– না ভাই, আমি তোমারে নিয়া ঠাট্টা করতিছি না। আল্লা তোমার মধ্যে উন্নত চিন্তা দিছে। তার মানেই হলো আল্লা তোমারে দিয়া বড় কাজ করাবার চায়। তুমি তোমার কাম করো। তোমার নিজের পথে চলো। আমরা দোয়া করি তোমার জন্যে।

এবার সত্যি সত্যিই লজ্জা পায় ইউসুফ। দুই কারণে লজ্জা। একটা কারণ মুখের সামনে এই ধরনের প্রশংসা। দ্বিতীয় কারণ দুলাভাইকে চিনতে না পারা। এই সামন্ততান্ত্রিক মানুষটার চেতনাতেও যে যুক্তি এবং বেদনাবোধ অনুরণন তুলতে পারে, তা আগে কোনোদিন মনেই করেনি সে। লোকটাকে চিরকাল স্থূল, দাম্ভিক, কুয়োর ব্যাঙ, সামন্তবাদী মানসিকতার ধারক বলে ভেবে এসেছে সে। এই রকম লোকের ভেতর যদি যুক্তির প্রতি সংবেদনা জেগে উঠতে পারে, তাহলে তো বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে!

একটু হাসে ইউসুফ– কাজ তো কারও একার নয় দুলাভাই। আপনাকেও তো কাজ করতে হবে।

আমি আবার কাজের মানুষ! তবে এইটুক বলবার পারি ভাই, এখন থেকে খালি শাস্ত্রে কী আছে তা দিয়া আমি কাজ করব না। বরং সেই সাথে চেষ্টা করব নিজের যুক্তি-বুদ্ধি আর মানুষের পরিস্থিতি বিবেচনা করার।

খুশিতে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছা হলো ইউসুফের। আব্দুল খালেক বলল– এই না হলে খোন্দকার সাহেবের কথা! আরে সবচেয়ে কট্টর যাকে বলা হয় সেই হজরত ওমর পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী কত সিদ্ধান্ত যে নিয়েছেন তার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়ত্তা নেই। এই জন্যেই না তাঁকে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খলিফা বলে অনেকে।

হজরত ওমর আবার কী করিছিলেন?

কত কিছু করেছিলেন! শুধু একটা ঘটনা বলি। ইসলামে চুরি আর ব্যাভিচার তো সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপ। চুরির শাস্তি রাসুলের জামানা থেকেই হাত কেটে নেওয়া। হজরত ওমরের আমলের প্রথম দিকে অভাব বেড়ে যাওয়ায় ছিঁচকে চুরির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু মানুষ কাজটি করছিল নেহায়েত প্রাণ বাঁচানোর দায়ে, তাই হজরত ওমর কিছুদিনের জন্য চুরির এই হাত কাটার শাস্তি রহিত করে দিয়েছিলেন। পরে যখন আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলো মদিনার জীবনে, তখন বহাল হলো সেই আগের শাস্তি।

এই জিনিসটা বুঝবার পারলে তো মোল্লা-মওলানাগোরে মানুষ গাল পাড়তে যায় না।

বুবুর এই কথায় খুব জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায় দুলাভাই।

এবার আসি বুবু! বিদায় চায় ইউসুফ।

তোর ঢাকাত যাওয়া কবে?

ঈদের আগে আর ঢাকায় বোধহয় যাব না। এই কয়েকটা দিন আব্বা-মায়ের সাথেই থাকব।

ঢাকাত যাওয়ার আগে সুযোগ হলে আর একবার আসিস।

আচ্ছা।

দুলাভাইকে দেখে মনে হচ্ছে আরও কয়েকটা কথা বলতে চায়। তার দিকে তাকিয়ে ইউসুফ জিজ্ঞেস করল– আর কিছু বলবেন আমাকে দুলাভাই?

একটু বিব্রত দেখায় দুলাভাইকে– একখান কথা। মানে এই কথাডা তুমি খিয়াল রাখবার পারো। মানে তুমি যে কাজ করবার যাচ্ছ, সেই ব্যাপারে আরকি।

বলেন!

না, কবো আর কী! মানে আমি বলবার চাচ্ছি যে তুমি যে কাজটা করবার চাও, তা তোমার করা দরকার এমনভাবে, মানে, মুসলমানরা যদি তোমাক নিজেগের লোক মনে না করে, তাহলে তোমার কথাত কান দিবি না। মানে, আমি বলতে চাই যে তুমি যদি নিজেরে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় দাও, কিংবা মুসলমানিত্বের বাইরে থেকে তোমার কথাগুলি বলবার চাও, তাহলে মুসলমানরা তোমার কথা শুনতে খুব একটা গা করবি না। তাছাড়া মোল্লাগের পক্ষে খুব সুবিধা হয়ে যাবে তোমাগে নাস্তিক, ইহুদি-এজেন্ট, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টিকারী হিসাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা। তাতে তোমাগের সব কাজই মাটি। তাই বলতিছি, তুমি যে নিজে অকৃত্রিম মুসলমান, তুমি যে এই কাজ করতে চাও মুসলমানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুরবস্থা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার জন্যে, এই কথাডা আগে নিজে বিশ্বাস করতে হবি তোমাগে, তারপর বিশ্বাস করাতে হবি সাধারণ মানুষগে।

কথাগুলো এতই যৌক্তিক যে এগুলোর কোনো একবিন্দুও সংশোধন করার প্রয়োজন নেই। বিনাপ্রশ্নে মেনে নিল ইউসুফ।

আর যারা নিজেরা এত বছর ধরে নিজেগে একচেটিয়া মুসলমানদের নেতা মনে করে, ভাবে যে মুসলমানদের সম্পর্কে বা ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার অধিকার খালি তাগেরই, তারা তো সহজে তোমাগের জন্যে জায়গা খালি করে দিবি না। কারণ, এর সাথে তাদের খালি ভাত-কাপড়ের প্রশ্নই জড়িত নাই, জড়িত আছে মান-সম্মান মানে দখলিসত্ত্বের ব্যাপারও। তাই তারা যে কোনো ভাবে এই ধরনের সংস্কারের বিরোধিতা করবি। কিন্তু তুমি যদি নিজেরে ইসলামের পাবন্দ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারো, তাহলে তারা তোমার বিপক্ষে খুব একটা সুবিধা করবার পারবি না।

তার মানে আমাকে দাড়ি-টুপি নিতে হবে? হেসে জিজ্ঞেস করল ইউসুফ।

দুলাভাই গম্ভীরকণ্ঠে বলল– দাড়ি-টুপি ছাড়াও যে মুসলমান থাকা যায়, এই জ্ঞানটুকুন এখন অন্তত আমাদের দেশের মুসলমানদের হইছে। আমি বাইরের লেবাসের কথা কইনি। আমি কী বলতে চাইছি, তা তুমি ঠিকই বুঝবার পারিছ।

হ্যাঁ দুলাভাই, বুঝতে পেরেছি। ভালোই হলো, আপনি মনে করিয়ে দিলেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা।

আব্দুল খালেকের দিকে ফিরে ইউসুফ বলল– তা আপনার তো কোনো সমস্যা নাই। আপনি এখন থেকেই কাজ শুরু করতে পারেন।

বুবুর দিকে ফিরে বলল– আমি আসি বুবু। স্লামালেকুম দুলাভাই!

ওয়ালেকুম সালাম। ফি আমানিল্লাহ!

গাড়িতে সারা পথ দুলাভাইয়ের শেষ সময়ে বলা কথাগুলি মনের মধ্যে বেজে চলল ইউসুফের। একেই বলে অভিজ্ঞতার প্রজ্ঞা। কী অবলীলায় মানুষটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেল, যা বেশিরভাগ সংস্কারপন্থীদের চিন্তাতেই আসে না। আর সেই কারণেই তাদের সংস্কার-আন্দোলন পরিণত হয় এক ধরনের হঠকারিতায়। আগে বিশ্বাস অর্জন, তারপরেই সংস্কারের কথা। আল্লাহর রাসুল হওয়ার আগে হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) কে আল-আমিন হতে হয়েছে। ড. ইউসুফ আল কারজাভির কথা মনে পড়ল– 'যারা নিঃস্বার্থ যাতনা ভোগ করে তারা ছাড়া আর কেউ তীব্র আকাঙ্ক্ষার তীক্ষ্ণ বেদনা উপলব্ধি করতে পারে না।' সমস্যাপীড়িত মুসলমান-জাতি সম্পর্কে যাদের কোনো অনুভূতি নাই, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলেই আত্মকেন্দ্রিক। আর এইসব লোকের কোনো অধিকার নাই মুসলমানদের ভুল ধরার অথবা তাদের সংশোধনের জন্য নসিহত করার।

আমাদের এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ কী?

এমন একদল ইসলামি বুদ্ধিজীবী ও ফকিহ গড়ে তোলা, যারা জানবে ইসলামি তত্ত্বসমূহ, এবং সেইসাথে জানবে সব ধরনের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলসূত্রগুলি। কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব হবে শত শত বছর ধরে অন্ধকারে ডুবে থাকা মুসলমানদের মুক্তির পথ দেখানো।

বত্রিশ

চরমপন্থা, গোঁড়ামি এবং ধর্মে বাড়াবাড়ি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন মিশরের বিখ্যাত ইসলামি তাত্ত্বিক ড. ইউসুফ আল কারজাভি।

চরমপন্থীর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে তার অন্ধত্ব। চরমপন্থী তার নিজের মতের প্রতি একগুঁয়ে এবং অসহিষ্ণুর মতো অটল থাকে। যে কোনো যুক্তিই চরমপন্থীর কাছে অচল। অন্য মানুষের স্বার্থ, আইনের উদ্দেশ্য এবং সমকাল বা যুগের অবস্থা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই থাকে না। চরমপন্থীরা এমনকি অন্যের সাথে আলোচনা করতেও রাজি নয়। ইসলামের সঠিক অনুসারীদের পক্ষে এই ধরনের চরমপন্থী, যারা কেবলমাত্র নিজের মতকেই নির্ভেজাল বিশুদ্ধ ও অন্য সবাইকে ভ্রান্ত মনে করে, তাদের নিন্দা করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। চরমপন্থী কেবল ভিন্নমতের জন্য অন্যকে গাফেল, ফাসেক, এমনকি কাফের পর্যন্ত আখ্যা দিয়ে থাকে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম উম্মাহর ইজমার পরিপন্থী। কেননা কেবলমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো মত প্রদান করার স্বাধীনতা রয়েছে। এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক চরমপন্থা নিঃসন্দেহে শারীরিক সন্ত্রাসও ডেকে আনতে পারে।

চরমপন্থীর দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে সে সর্বক্ষণ বাড়াবাড়ি করার নীতিতে অটল থাকে এবং সমঝোতার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও অন্যকে তার মতো আচরণ করতে বাধ্য করতে চায়, যদিও তার কাজটি আল্লাহর বিধানসম্মত নয়।

মানুষের জন্য কোনো কাজকে জটিল করে তোলা কিংবা তার ওপরে চাপ সৃষ্টি করা রাসুলের উজ্জ্বলতম গুণাবলির পরিপন্থী। যেমন রাসুলুল্লাহ যখন একাকি নামাজ পড়তেন তখন তিনি বড় বড় সুরা পাঠ করতেন। কখনও কখনও এমন হতো যে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেত। কিন্তু যখন তিনি মসজিদে ইমামতি করতেন, তখন নামাজ সংক্ষেপ করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন যে– 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাজের ইমামতি করে তখন তা সংক্ষিপ্ত করা উচিত, কেননা সেখানে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধলোক থাকে। কিন্তু কেউ একাকি নামাজ পড়লে নামাজ দীর্ঘায়িত করতে পারে।' এমনকি ইমামতির সময় নামাজ দীর্ঘায়িত করার অভ্যাসের কারণে তিনি তাঁর বিশিষ্ট সাহাবি হজরত মুয়াজের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

চরমপন্থীর তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে নির্দয় হঠকারিতা। চরমপন্থীদের স্থান-কালের বিবেচনা-বোধ নেই। এই প্রসঙ্গে ড. কারজাভি নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। একটি মসজিদে ঐতিহাসিক এবং শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করায় কোনো কোনো মুসল্লি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মসজিদকে মুভি থিয়েটারে পরিণত করা হচ্ছে। পরে জানা গেল, এরা ছিলেন চরমপন্থী। এই লোকেরা বেমালুম ভুলে গেছেন যে, মসজিদকে ব্যবহার করতে হবে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে। রাসুলের জামানায় মসজিদ ছিল একাধারে ইসলামের দাওয়াত, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সদর দপ্তর। এই তথ্য অনেকেই ভুলে গেছেন যে আবিসিনিয়া থেকে আসা একদল লোককে রাসুল মসজিদের মধ্যে তাদের বর্শা নিক্ষেপের নৈপুণ্য হিসাবে একটি খেলা দেখানোর অনুমতি দিয়েছিলেন, এবং হজরত আয়েশা সেই খেলা দেখার অনুমতি পেয়েছিলেন।

সন্দেহ ও অবিশ্বাস চরমপন্থীদের একটি লক্ষণ। চরমপন্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে একজনকে অভিযুক্ত করে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে রায় দিয়ে সেই রায়ের বাস্তবায়ন করতে চায়। 'দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একজন নির্দোষ'– এই নীতিকে তারা মানতে রাজি নয়। কেউ যদি এইসব চরমপন্থীর সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তবে তার ধর্মবিশ্বাস ও সাধুতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

কোনো ফকিহ যদি মুসলমানদের সুবিধা হতে পারে বা ইবাদতে স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হতে পারে, এমন ফতোয়া দেন তবে চরমপন্থীরা তার বিরুদ্ধে নিয়ে আসবে ধর্মীয় শৈথিল্যের অভিযোগ। যদি কোনো মুবাল্লেগ যুগের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে চান, তবে তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভক্ত, এমনকি ইহুদিদের গুপ্তচর বলেও অপবাদ দেওয়া হবে। এই চরমপন্থীরা হিজরি চতুর্থ শতকের সমগ্র ইতিহাসকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। যেহেতু এই সময়ে মুসলমানরা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করতে শুরু করেছিলেন, তাই চরমপন্থীরা এই যুগকে বলে বেদআতির যুগ। অথচ সারাবিশ্বের লুপ্তপ্রায় জ্ঞানভাণ্ডারকে পুনর্জীবন দান করে তারই ফলে পরবর্তীতে মুসলমানরা নজিরবিহীন এক সভ্যতার স্বর্ণযুগের সূচনা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিলেন এই যুগেই। সেই শুরু থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সংশয় ও অবিশ্বাসের চোখে দেখা চরমপন্থী ধর্মীয় মৌলবাদীদের একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

চরমপন্থার সবচেয়ে চরম ক্ষতিকর রূপ হচ্ছে অন্য সকল মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকার অস্বীকার করা। চরমপন্থীরা বিনাদ্বিধায় প্রতিপক্ষকে হত্যা ও তাদের বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস করার পথ বেছে নেয়। এই অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয় যখন চরমপন্থীরা নিজেদের বাইরের অন্য সবাইকে কাফের বলে মনে করতে থাকে। এই মনোভাব এবং আচরণের ফলে মুসলমানদের সকল অংশের সাথে তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর সময় খারেজিরা এই রকম চরমপন্থার ফাঁদে পড়েছিল। অথচ তারা নামাজ-রোজা-জাকাত-কোরআন তেলাওয়াতের মতো ইসলামি রীতি-নীতি পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিল। কিন্তু তাদের অবস্থান ছিল চরমপন্থার দিকে। রাসুল এই ধরনের বিপদ সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন– 'তাদের নামাজ, কিয়াম ও তিলাওয়াতের তুলনায় তোমাদের মধ্যে কারও (কারও) নামাজ, কিয়াম ও তিলাওয়াত অনুল্লেখযোগ্য মনে হবে।'

চরমপন্থীরা এইসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয় না। এরা কাউকে কাফের বলতে এতই উদগ্রীব যে তাদের ফলে তারা আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেননা কাউকে কুফরির অপবাদ দেওয়ার পরিণাম খুবই মারাত্মক। কাউকে কাফের ঘোষণা করলে তার সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত তখন আইনসিদ্ধ হয়ে যাবে, তার সন্তান ও স্ত্রীর ওপর অধিকার থাকবে না, সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, তার দাফন ও জানাজা নিয়ে সমস্যা হবে। সেই কারণেই রাসুল বলেছেন– 'যখন কোনো মুসলমান আরেক মুসলমানকে কাফের বলে তখন তাদের মধ্যে একজন তাই-ই।' এই কথার অর্থ হচ্ছে, কুফরির অভিযোগ প্রমাণিত না হলে যে অভিযোগ আনবে তার ওপরেই ঐ অভিযোগ বর্তাবে; এবং সে দুনিয়া ও আখেরাতে বিপদের সম্মুখীন হবে।

চরমপন্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্বের একটি বড় লক্ষণ হচ্ছে বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মেতে থাকা। যে বড় বিষয়গুলো মুসলমানদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত সেগুলি বাদ দিয়ে তারা দাড়ি রাখা, গোড়ালির ওপর কাপড় পরা, নামাজে তাশাহুদের সময় আঙ্গুল নাড়ানো, ছবি তুলতে বাধা দেওয়া, ভাস্কর্য রাখা-না-রাখা এইসব জিনিস নিয়ে অবিরাম মাতামাতি করতে থাকে।

চরমপন্থীরা ইতিহাস, বাস্তবতা এবং আল্লাহর সুনান বা রীতি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। তাই তারা সবসময় অলৌকিকত্বে বেশি বিশ্বাস করে। মনে করে যে আল্লাহ যখন খুশি তাদের জন্য নিজের জগৎ পরিচালনার নিয়ম পাল্টে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন খুশি, যে কোনো রীতি পাল্টে দিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি তা করতে যাবেন কেন? করতে যাবেন না এই কারণে যে তিনি তাঁর রাসুলের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ঠিক কী প্রক্রিয়ায় কোনো কাজ করতে হবে। সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো জ্ঞান অর্জনের ধার চরমপন্থীরা ধারে না। তাই তারা অসময়ে অসাধ্য সাধন করতে চায়, একের পর এক হঠকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, নিজেরা বিপদে পড়ে, মুসলমান সমাজকে বিপদে নিক্ষেপ করে।

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে দিয়ে কীভাবে কাজ করিয়েছেন তা খেয়াল করলে তারা এই ভুল নিশ্চয়ই করত না। তাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে নবুয়ত লাভের পরে মক্কায় ১৩টি বৎসর রাসুল কী প্রক্রিয়ায় কাজ করেছেন। তিনি তখন শুধু মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং ৩৬০টি মূর্তি থাকা সত্ত্বেও কাবা শরীফে নামাজ ও হজ করার কথা বলেছেন। তিনি কখনোই কমান্ডো হামলা চালিয়ে ঐ মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলতে বলেননি। তাহলে তাঁর আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেত। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনকে পরিবর্তিত করা। পরিবর্তিত মানুষ নিজেরাই মূর্তিকে অপসারণ করবে। বাস্তবে ঘটেছিল ঠিক তাই।

এই প্রসঙ্গে ড. কারজাভি মুসলমানদেরকে আল্লাহর দু'টি রীতি সম্পর্কে সচেতন হতে বলেছেন। প্রথম বিধি বা রীতি হচ্ছে, আল্লাহ সৃষ্টি ও বিধানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তো "হও" বললেই সবকিছু হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তা না করে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবী, মহাবিশ্ব, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ কীভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন, তা বোঝা যায় হজরত আয়েশার বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন– প্রথমে কোরআনের যেসব আয়াত নাজিল হয়েছে, সেগুলিতে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (পরে) মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন হালাল ও হারামের বিধান নাজিল করা হলো। যদি প্রথমেই 'মদ পান কোরো না' এবং 'ব্যাভিচার কোরো না' নাজিল হতো তাহলে লোকেরা বলত 'আমরা মদ্যপান ও পরনারীগমণ কখনোই পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারব না'। ফলে মুসলমান হতে চাইত না কেউ।

দ্বিতীয় রীতিটি প্রথম রীতির পরিপূরক। প্রতিটি জিনিসের পূর্ণতা বা পরিণতি লাভের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। এই ব্যাপারটি কাফেররাও বুঝত না। তারা রাসুলকে বিদ্রূপ করত এই বলে যে, তোমার কথা না মানলে আল্লাহ যদি শাস্তি দেন তাহলে সেই শাস্তি আসছে না কেন? তাদের উত্তর হিসাবে আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ– "তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় না থাকত তবে শাস্তি তাদের ওপর আসত। নিশ্চয়ই শাস্তি তাদের ওপর আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে।" (আল কোরআন ২২: ৪৭)

মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ ব্যাপারটি ঠিকমতো বুঝতে পারতেন না। এইজন্য রাসুল তাঁর সাহাবিদের ধৈর্য ধারণ করতে বলতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিজয়ের প্রত্যাশা করতে নিষেধ করতেন। একবার খারাজ ইবনে আল-আর্ত তাঁর দুঃখ-কষ্টের কথা বলে আল্লাহর কাছে অবিলম্বে সাহায্যের জন্য রাসুলকে অনুরোধ জানাতে বললে রাসুলুল্লাহ তাঁর প্রতি এতটাই ক্রুদ্ধ হন যে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। তিনি বললেন– 'তোমাদের আগে একজন বিশ্বাসীকে লোহা দিয়ে এমনভাবে পিষ্ট করা হয়েছে যে হাড় ছাড়া তার শরীরের গোস্ত ও শিরা-উপশিরা অবশিষ্ট ছিল না। আর একজনকে করাত দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় দু'ভাগে চিরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউই ধর্মত্যাগ করেননি। আল্লাহর শপথ, তিনি এমনভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যে একজন ভ্রমণকারী সানা থেকে হাদ্রামাউত পর্যন্ত সফরের সময় এক আল্লাহ এবং তার ভেড়ার জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা ধৈর্য।'

চরমপন্থীরা এই মহান রীতিগুলি বোঝে না বলে তারা একের পর এক হঠকারি কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

এবং অবশ্যই তারা খারেজিদের মতোই ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

AMARBOI.COM

তেত্রিশ

জুম্মার আজান শুনে ইউসুফ বলল– চলো নামাজ পড়ে আসি!

বন্ধুরা এমন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল যেন অচেনা কাউকে দেখছে। শেষ পর্যন্ত বাপ্পী বলেই ফেলল– শালা এ যে দেখি ভূতের মুখে রামনাম! এ আবার কোন ভেক ধরা?

ইউসুফ গম্ভীরভাবে বলল– ভেক ধরা না। সত্যিসত্যিই বলছি। আমাদের নামাজ পড়া দরকার।

কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে রফিক-মদনের চায়ের দোকানের আড্ডা অনেকদিন পরে জমে উঠেছে। জেলা শহরের সবাই জানে, শহরের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেদের আড্ডা এটি। এদের সঙ্গে কেউ কোনো বিষয়ে বিতর্কে যেতে চায় না। কারণ বাপ্পী-কামাল-স্বপন-মোটা বাবু-জ্ঞানী টিটু-সাদী ওস্তাদরা যে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক শুরু করলে মাটির গরুকে গাছে উঠিয়ে দিয়ে বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামাল একটু কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে– হঠাৎ নামাজের কথা কেন রে ভাই?

নামাজের কথা কেন মানে? নামাজ পড়াটা কি খারাপ কাজ?

না তা হবে কেন! মানে জানতে চাইছি নামাজ পড়া যে ভালো কাজ এটা সবাই জানে। আমরাও জানি। তা হঠাৎ এই ভালো কাজ শুরু করার শানে নুজুলটা কী? তোমার নতুন প্রেমিকা কি নামাজ পড়তে বলেছে?

একচোট হাসির পরে মোটা বাবু বলল– তোমার প্রেমিকা বলে থাকলে প্রেমিকার মন যোগানোর জন্যে তুমি গিয়া নামাজ পড়ো। আমাদের ধরে টানাটানি কেন বাবা!

ইউসুফ বলল– না সত্যি বলছি, প্রেমিকা-টেমিকার ব্যাপার নয়। আমাদের সবারই নামাজ পড়া উচিত।

কেন?

আমরা কি নিজেদের মুসলমান বলি না? মুসলমান ভাবি না?

অবশ্যই ভাবি। ভাবব কী? আমরাই তো খাঁটি মুসলমান। আমরা ঘুষ খাই না, ব্যবসাতে ভেজাল মাল বেচি না, মানুষের ইক মেরে খাই না, খারাপ লোকের কাছ থেকে দূরে থাকি।

মোটা বাবুর সাথে এবার সাদী ওস্তাদ যোগ করে– মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে দ্যাখো, তোমার পাশে দাঁড়ানো প্রশাসনের লোক, পুলিশের লোক, কাস্টমসের লোক, আয়করের লোক, উকিল, আওয়ামী লীগ-বিএনপির নেতা, বড় বড় ব্যবসাদার– সব শালা হারামখোর। আমরা না জানলে কথা ছিল। কিন্তু আমরা জানি যে ওরা হারামখোর। যার উপার্জন হারাম, তার ইবাদত আবার লোক দেখানো ছাড়া আর কী? এইসব লোকের পাশে দাঁড়াতে গা ঘিনঘিন করবে না?

নামাজ পড়ি আর না পড়ি, লোকে জানে আমরা কী। আমাদের মসজিদে গিয়ে মুসল্লির সার্টিফিকেটের দরকার নাই।

দরকার আছে! ইউসুফের কণ্ঠের দৃঢ়তা সবাইকে একটু থমকে দেয়। তার দিকে ভালো করে তাকায় বাপ্পী– আর ইউ সিরিয়াস?

ইয়েস আই অ্যাম সিরিয়াস।

তাহলে খুলে বলো কারণটা।

কারণ ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে। তার চাইতে আগে নামাজটা পড়ে এলে হয় না!

সাদী ওস্তাদ উঠে দাঁড়াল– ঠিক আছে চলো সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজু করে ওরা মসজিদে ঢুকতে মোটামুটি সাড়াই পড়ে গেল। যারা চেনে প্রায় সবাই নড়েচড়ে বসল। ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে বয়ান করছে। ওদের দলের দিকে চোখ পড়তেই তার মুখে পরম খুশির একটা ভাব ফুটে উঠল। বয়ানের মাঝখানেই একবার তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো 'আলহামদুলিল্লাহ' শব্দটি। ইমাম সাহেবের বয়ানের বিষয় মাদ্রাসায় দান-ধ্যানের সওয়াব।

কামাল চাপাস্বরে বলল– ডিসগাসটিং!

কী হলো?

দুনিয়ায় কত জ্বলন্ত বিষয় আছে, দেশে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, সেসব বাদ দিয়ে এই মোল্লারা সারাদিন একটা বিষয় নিয়েই বক্তৃতা ঝাড়ে। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাতে কৌটা নিয়ে ভিক্ষে করতে বের হয় ছোট ছোট বাচ্চারা। আর এইসব শোনার জন্যে আমরা এখানে এসে বসে আছি! মূর্খের বক্তৃতা শোনার মতো বিরক্তিকর আর কিছু হতে পারে?

নামাজের পরে সাদী ওস্তাদ চাইছিল বাড়ি যেতে। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার পরে নাহয় আবার আলোচনায় বসা যাবে। কিন্তু বাপ্পী হুংকার ছাড়ল– কভি নেহি! শালা ইউসুফ আজ আমাদের নামাজ পড়িয়েছে। এখন তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে হবে। ততক্ষণ কোনো শালা মদনের দোকানের বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে পারবে না।

আরে কথা বলতে বলতে তো খিধে লেগে যাবে!

খিধে লাগলে লাগুক। চা-বিস্কুট খেয়ে খেয়েই খিধে মারতে হবে। কিন্তু আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওঠা চলবে না। হ্যাঁ, ইউসুফ সাহেব, শুরু করেন!

ইউসুফ আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসল– ব্যাপারটা খুব বেশি কিছু না। আমরা তো বরাবরই দেশ নিয়ে সমাজ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করি। নিজেদের জায়গা থেকে কিছুটা কাজ করারও চেষ্টা করি। এটি সেই কাজেরই অংশ।

বুঝলাম না।

বলছি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করল ইউসুফ– আমরা তো সবসময়ই বঞ্চনার শিকার। সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সব সময়ই করে আসছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমাদের কাজের জায়গায় আমরা কখনোই ধর্মের গুরুত্বটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি।

বাধা দিল কামাল– উপলব্ধি করতে পারিনি কথাটা ঠিক নয়। আমরা ব্যাপারটা উপলব্ধি ঠিকই করেছি। কিন্তু ঠিক কীভাবে সেই শক্তিকে সঠিক দিকে প্রবাহিত করা যায় সেই পথটা ভেবে বের করতে পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক। সেই কাজটাই এখন আমাদের করতে হবে। ছফা ভাই, মানে আহমদ ছফা বেঁচে থাকতে বারবার আমাদের বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বারবার মনে করিয়ে দিতেন, বাঙালি মুসলমানদের আমরা যেন ভুল না বুঝি। কারণ পৃথিবীর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গুণটি বিরল, সেই অসাম্প্রদায়িকতা বাঙালি মুসলমানের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের দুর্বলতম জায়গা হচ্ছে তার মননের অপরিপক্কতা। ইমম্যাচিউরিটি। এই কারণেই বাঙালি মুসলমানকে বারবার ধর্মের নামে ভুল পথে পরিচালিত করা গেছে। জিন্নাহ বলো, মুসলিম লীগ বলো, জামায়াত বলো, ইসলামি চরমপন্থীরা বলো– সবাই আমাদের জাতিকে ভুল পথে বা আত্মবিনাশের পথে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছে এই দুর্বলতার কারণেই। আমরা বা আমাদের পূর্বসূরিরা সেই ভুল পথ থেকে বাঙালি মুসলমানকে টেনে আনতে পারিনি। তার প্রধান কারণ, আমরা আমাদের মুসলমান আইডেনটিটিকে তেমন গুরুত্ব দেইনি।

বাবু মাঝপথে কথা বলে ওঠে– তার দরকারই বা ছিল? এই দেশে মানুষের সমস্যা ভাত-কাপড়ের, জমি-কাজের, ন্যায় বিচারের। ধর্মপালন করা তো এই দেশে কোনোদিন কোনো সমস্যা ছিল না। মুসলমানদের জন্য তো বটেই, অন্য কোনো ধর্মের লোকেরই এই দেশে ধর্মচর্চা কোনোদিন কোনো কারণেই হুমকির মুখোমুখি হয়নি। কাজেই তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার কী?

এটাই আমাদের দেখার প্রধান ভুল। আমাদের, মানে আমরা যারা আধুনিক বলি নিজেদের। তারা এই জাতিকে কখনোই দিক-নির্দেশনা দিতে পারেনি। কারণ জাতির চিন্তার প্রকৃতির সাথে তাদের চিন্তার প্রকৃতি মেলে না।

সেটা কেমন?

আধুনিক শিক্ষার বুদ্ধিজীবীরা এই দেশের মানুষকে একটি ভৌগলিক জনগোষ্ঠী হিসাবেই চিরকাল দেখে এসেছে। ভেবেছে ইউরোপিয়ানদের যেভাবে মননের মুক্তি ঘটেছে, সেই একই প্রক্রিয়ায় এখানেও ঘটবে। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, এত বছরের ব্যর্থতাই তার প্রমাণ। এই দেশের মানুষ নিজেদের শুধু একটা ভৌগলিক জনগোষ্ঠী হিসাবে ভাবে না। তাদের কাছে ধর্মীয় পরিচয়টি অনেক বড়। তারা তাদের সত্তার সাথে ধর্মীয় পরিচয়টিকে অচ্ছেদ্য মনে করে। কাজেই তাদেরকে কোনো আহ্বান জানাতে হলে তাদের অন্তরের সেই সত্তাটির প্রতিই আহ্বান জানাতে হবে। তা নাহলে সাড়া পাওয়া যায়নি। যাবে না।

কিন্তু ইসলামের নামে যারা আহ্বান জানিয়েছে তারাও কি তেমন সাড়া পেয়েছে? এই যে ধরো ইসলামের নামে যারা রাজনীতি করে, ভোটের সময় এলেই যারা ইসলাম রক্ষা এবং ভারত বিরোধিতার জিগির তোলে, তারা কি খুব একটা সাড়া পেয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে সাড়া যে পায়নি তা-ও না। কিছুটা সাড়া তো পেয়েছে। তা নাহলে মুক্তিযুদ্ধের পরে এইসব অন্ধকার শক্তির তো অস্তিত্ব থাকারই কথা নয়। তবে খুব বড় সাড়া পায়নি। কারণ তারাও বাঙালি মুসলমানের অন্যতম মানসিক যে স্পিরিট, অসাম্প্রদায়িকতা, তাতে এখনও ঘূণ ধরাতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু এক সময় যে তারা সফল হবে না, এমন কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাবে না। তার আগেই আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

কেমন করে?

সত্যিকারের মুসলমান হয়ে। আমাদের বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত মহল যদি সত্যিকারের ইসলামের চর্চা করে, তবে তারাই মানুষের সামনে উদাহরণ হিসাবে দাঁড়াতে পারবে। তখন আর মৌলবাদীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পাবে না।

তাহলে এখন আমাদের সাধনা হবে সত্যিকারের মুসলমান হওয়া?

ঠিক তাই।

কিন্তু মানুষকে দেখিয়ে দেখিয়ে নামাজ-রোজা করাটা কি রিয়া হয়ে যাবে না? তার জন্যে তো আবার পরকালে শাস্তি পেতে হবে।

আমাদের ভেতর এই অনুভূতি আসছে আসলেই হলো আমরা তখন আর রিয়া করছি না। বরং সত্যিকারের প্র্যাকটিসিং মুসলমান হয়ে যাচ্ছি।

কথাটা ঠিক। কিন্তু এইভাবে ছাড়া কি কাজ হবে না?

কেমন করে হবে? নিজের ভুল মানুষ কখন স্বীকার করে? যখন নিজেদের কেউ সেই ভুল ধরিয়ে দেয়। আর সেই ভুলটা যে ধর্মীয় মতেও ভুল, তা না দেখালে ধর্মপ্রাণ মানুষ ভুল শোধরানোর কাজে নামবে না।

সাদী ওস্তাদ বলে– এই কথাটা লজিক্যাল। বাঙালি হিন্দুদের একটা অংশের মধ্যে অন্তত রেনেসাঁ প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তারাও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। রামমোহন রায় যে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করতে পারলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ চালু করতে পারলেন, এর পেছনে যতই ইউরোপিয় মনন থাকুক না কেন, হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রে যদি তারা এইসব বিধানের পক্ষে সমর্থন খুঁজে না পেতেন, তাহলে কোনো হিন্দুই সতীদাহ নিবারণ বা বিধবা বিবাহ প্রচলন মেনে নিত না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথদের শুধু আধুনিক বিদ্যা দিয়ে স্বজাতির সংস্কার করা সম্ভব হতো না, যদি তাঁরা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র না জানতেন। যদি তাঁদের পেছনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো ধর্মীয় নেতাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন না থাকত।

ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি। আমরা কোরআন-হাদিস-ফিকাহ বা ইসলামের ইতিহাস পড়ি না। সেই কারণেই ধর্ম-ব্যবসায়ী বা ধর্মীয় রাজনীতির

মুসলমানমঙ্গল– দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকেরা যখন ধর্মের দোহাই দিয়ে কিছু বলে, আমরা তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে পারি না। সেই কারণে এখন আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে কোনো ভালো আলেমের কাছে কোরআন শরীফের অনুবাদ এবং তফসির পাঠ করা।

কামাল আপত্তি তোলে– তার দরকার কী? নিজেরা বই কিনে এনে পড়লেই তো হয়!

হয়তো হয়। কিন্তু তাতে সময় এবং পরিশ্রম বেশি হবে। আমাদের বুঝতে হবে এটাও একটা স্পেশালাইজড শিক্ষা। যে কোনো স্পেশালাইজড শিক্ষার জন্য একটি ডিসিপ্লিন গড়ে তুলতে হয়। ইসলামি শিক্ষারও ডিসিপ্লিন গড়ে উঠেছে শত শত বৎসরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আমরা সেই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিলে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পারব। সেই সঙ্গে দেশী-বিদেশী আধুনিক লেখকদের ইসলামি রচনা পাঠ বা বিশ্লেষণের কাজ তো আলাদা ভাবে চলবেই।

বাপ্পী বলল– সবই তো ঠিক আছে বুঝলাম। কিন্তু এই কাজে নেমে শেষে আবার মারধোর খেতে হবে না তো!

সে আশঙ্কা যে একেবারে নাই তা নয়। যারা এটা নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করছে, তাদের পেটে আমরা লাথি মারতে যাচ্ছি। যেসব মানুষ অন্যের শোনা কথাকেই ইসলাম বলে মনে করে, নির্দ্বিধায় মেনে নেয়, সেইসব মানুষকে আমরা নিজেদের চিন্তাশক্তি জাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তথাকথিত ইসলামি নেতারা এমনি এমনি আমাদের কাছে ফিল্ড ছেড়ে দেবে তা আশা না করাই ভালো।

তার মানে আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল কাদিরদের মতো, মানে উনিশশো চল্লিশের দশকের 'শিখা গোষ্ঠী'র মতো আমাদেরও হামলার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।

সত্যি বলতে কী, অবশ্যই থাকছে।

ককিয়ে উঠল বাপ্পী– মরেছি রে মরেছি! এই বয়সে মারধোর খেতে হবে! কী আর করা! হোক। এই মদন আর এক রাউন্ড চা দে বাপ। চা-বিড়ি খেয়ে বাড়ি যাই।

চৌত্রিশ

গত শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকের ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এখন 'শিখা গোষ্ঠী' নামেই বেশি পরিচিত। কারণ তাদের মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা'। মুসলমান সমাজে বুদ্ধির মুক্তি নিয়ে আসা বা চিন্তার অচলায়তন সরানোর ইচ্ছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন এই সংগঠনের চিন্তাবিদ এবং কর্মীরা। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল–

মুসলমান শক্তিলাভ করুক
তার চিত্ত বিকশিত হোক
তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হোক
তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও দরদ বর্ধিত হোক
সে সকলকে বুকে ধরতে শিখুক!

কিন্তু তারা পরিণত হয়েছিলেন সেই সময়ের মুসলিম নেতাদের আক্রোশের শিকারে। নিজের জাতির, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের মুক্তি চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু মুক্তির পথ হিসাবে তারা যে কাজগুলিকে সামনে আনার কথা বলেছিলেন, সেই পথ গ্রহণ করতে আপত্তি ছিল তৎকালীন বাংলার মুসলমান নেতাদের। অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের যারা নেতা ছিলেন, তারা কেউই বাঙালি ছিলেন না। তারা কেউ কেউ বাংলা জানতেন বটে, কিন্তু বাংলাচর্চা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কারণ পরিবারের মধ্যে তাদের প্রচলিত ভাষা ছিল উর্দু। বাংলার দরিদ্র-অশিক্ষিত আপামর 'আতরাফ' মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ ছিল না। তারা সেই সংযোগ রাখাকে অপমানজনকই মনে করতেন। কাজেই সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের সঠিক সামাজিক অবস্থান কেমন, তা নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনারও কোনো ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু 'শিখা গোষ্ঠী'র সদস্যরা এই অবস্থা ভালোভাবেই জানতেন। শুধু জানতেন না, তারা এই নিয়ে মর্মযাতনায় ভুগতেন, ক্ষুব্ধ হতেন, অপমানিত বোধ করতেন। বাংলার মুসলমানদের যে অবস্থা আবুল হুসেন তুলে ধরেছিলেন, তা জেনে অপমানিত বোধ না করার কোনো উপায়ও ছিল না। 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন– 'হজরত মুহম্মদের নিষেধের মধ্যে কতকগুলি এই– খোদা ছাড়া আর কাহারও নিকট মাথা নত ক'র না। জেনা (পরস্ত্রী-স্পর্শ) ক'র না। মদ খেও না। নাবালক ও স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার ক'র না এবং তাদের স্বত্ব ও অধিকার হ'তে তাদিগকে বঞ্চিত ক'র না। প্রতিবেশীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার ক'র না। পুত্র-কন্যাকে মূর্খ রেখ না। ভিক্ষা ক'র না। শূকরের মাংস খেও না। ধর্মের জন্য জুলুম ক'র না। অন্যের অধিকার নষ্ট ক'র না। সৎপরিশ্রম-লব্ধ আয় ভিন্ন অন্য আয়ের চেষ্টা ক'র না। সুদ দিও না। এই সমস্ত নিষেধ লঙ্ঘন করা হারাম– তার শাস্তি পরকালে অনন্ত দোজখ ভোগ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান সমাজের জন্তুধর্মী মানুষগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তারা দোজখের ভয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদৌ ভীত সন্ত্রস্ত না হ'য়ে নির্বিকারচিত্তে ঐ নিষেধের প্রত্যেকটি লঙ্ঘন করে চলেছে।'

তারপর তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে প্রত্যেকটি অপরাধের ফিরিস্তি দিয়ে লিখলেন– 'যত গর্হিত পেশা তাহাই আজ মুসলমানের হাতে। তার কারণ বহু। তবে একটা কথা মনে হয়। অতীতের মোহে ক্ষুব্ধ হ'য়ে মুসলমান অন্যের জ্ঞানগুণ গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হয়েছে এবং অন্য জাতি যখন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে শক্তি অর্জন করতে প্রস্তুত হ'ল, মুসলমান তখন অতীতের নেশায় নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে রইল। ফলে, নিশ্চেষ্ট বা অল্প চেষ্টায় কাতর হওয়াটা তার ধাত হ'য়ে গেল। আজ নানা জাতির সংঘর্ষে জীবনসমস্যা যখন বিপুল হ'য়ে উঠেছে এবং সে সমস্যার সমাধান যখন অধিকতর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনা দাবী ক'রে বসেছে, তখন মুসলমান সে পরিমাণ পরিশ্রম ও ঐকান্তিক সাধনায় অনভ্যস্ত ব'লে বৃহৎ কল্যাণের অধিকার হ'তে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হয়েছে। সেজন্য তাকে আজ ঐ কল্যাণের অধিকার অর্জনের জন্য অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করতে ব্যাকুল হ'তে হয়েছে। যুগ-যুগান্তের সাধনা, অল্পচেষ্টার মহিমা ও বৃহৎ প্রয়াসের ব্যর্থতা আজ যে গৌরব মণ্ডিত হয়েছে, মুসলমানের চক্ষে সেই গৌরবই বেশী ক'রে ধরেছে, কিন্তু সে সাধনার দিকে, সে পরিশ্রমের দিকে তার দৃষ্টি পড়ছে না। সে সেই সাধনার ফলটি অতি অল্প আয়াসেই পেতে চাচ্ছে, কারণ কঠোর সাধনার অভ্যাস ও শক্তি তার নাই– অল্প পরিশ্রমে বেশী পুরস্কার লাভ করবার জন্য সে ব্যগ্র হয়েছে। সেজন্য সাধারণতঃ যেসব পেশায় অল্পত্যাগে অতি লাভের সম্ভাবনা, সেই সমস্ত পেশায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জুয়া খেলা, ঘোড়দৌড়ের বাজি, চুরি, গাঁটকাটা, কোকেন প্রভৃতি বিনা লাইসেন্সে বিক্রয় (smuggling), পাপ ব্যবসায়ের জন্য নারী সংগ্রহ (procuring) প্রভৃতি সমাজ-সংহারক ব্যবসায় ধরা যেতে পারে। পুলিশের অত্যাচার ও আইনের কঠোর শাস্তি তাদিগকে এ-সমস্ত ব্যবসায় হ'তে সরিয়ে দিতে পারছে না। মুসলমান সমাজ এই সমস্ত দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত নয়, কেননা এই সমাজে এদের বিরুদ্ধে কোন অনুষ্ঠান আজও সৃষ্টি হয়নি। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে মুসলমানকে বিপুল পরিশ্রম ও অল্প লাভের ধৈর্যে অভ্যস্ত ক'রে তোলা। কেমন ক'রে তা করা যেতে পারে তার জন্য ভাবতে-চিন্তে হবে।'

মুসলমান সমাজের কাজ দেখে বা অবস্থা দেখে মুসলমান নেতারা অপমান বোধ করেননি। কিন্তু আবুল হুসেন এই অবস্থা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করায় নেতারা খুবই অপমানিত বোধ করলেন।

এই পর্যন্ত থেমে থাকলেও নাহয় মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু থামার জন্য তো কাজে নামেননি শিখা গোষ্ঠীর লেখকরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধে লেখা হলো– 'কোন ধর্ম সর্বকাল সর্বদেশ ও সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ ধারণা যে জাতির আছে সে জাতি নিতান্ত হতভাগ্য এবং বলতে হবে তার মন সভ্যতার নিম্নস্তরে পড়ে নীরস ধর্মাদেশের মরু-বালুকায় আপনার জীবনস্রোত হারিয়ে ফেলেছে। ...দেশ-কালের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে ধর্ম-বিধিসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল তা কখনও সনাতন হতে পারে না। ...আজ একদল মুসলমান বলছেন, "হ্যাঁ ঠিক ত মুসলমান গোল্লায় গেছে, কিন্তু তাতে ইসলামের দোষ কি?" তাঁরা এই বলতে চান– ইসলাম একটি সনাতন ধর্ম, সর্বকালে সর্বদেশে সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এই দাবী গায়ের জোরেই করা চলতে পারে, যুক্তি বা মানব-ইতিহাসের ধারা বা প্রকৃতির নিয়মানুসারে সেই দাবী টিকতে পারে না। আজ মুসলমান কেন ইসলামের আদেশ পুরোপুরি পালন করতে পারছে না, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে; আর এও দেখতে হবে, সপ্তম শতাব্দীর আরব মরুর ইসলাম বিংশ শতাব্দীর শস্য-শ্যামল উর্বর দেশে কতখানি কার্যকরী হতে পারে।'

এখানে আবুল হুসেন ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা এবং বাস্তবতা মেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার-পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় ইজতিহাদ। কিন্তু ধর্মনেতারা দাবি করলেন যে এই বক্তব্যের মাধ্যমে আবুল হুসেন ইসলামকে অচল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

তার আগেই মোল্লাশ্রেণীর বিরুদ্ধে অগ্নিঝরা ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। নারী স্বাধীনতা তো দূরের কথা, নারীশিক্ষার ন্যূনতম অধিকার দিতে রাজি ছিলেন না সেই সময়কার ধর্মীয় আলেমরা। নারীশিক্ষার বিরোধিতায় তারা কোরআন-হাদিস থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা দিতেন। এতে বেগম রোকেয়ার রাগ গিয়ে পড়েছিল খোদ ধর্মশাস্ত্রগুলির ওপরেই। তিনি লিখলেন– 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ...পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য ও বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।... তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে নিয়ম শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুণির বিধানে তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে, মুণি ঋষি হইতে পারিতেন? যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত কি না, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের জন্য প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান নাই কেন? ...আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।'

বেগম রোকেয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে আবুল হুসেন লিখলেন– 'লেখিকা বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আদর্শ। তাঁহার অবরুদ্ধ ভগিনীগণের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান, শিক্ষা, নীতি, কর্ম ও স্বাধীনতায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ...পুস্তকে তিনি পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কিছু বলেন নাই যাহাতে পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারে। আমার মনে হয় পুরুষের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে তদপেক্ষা আরো অধিক কষাঘাত করা উচিত ছিল।'

হুমায়ুন কবীর মন্তব্য করেন যে দাম্পত্য প্রেম ছাড়াও যে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 'কামনা বিচ্যুত' প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে সমাজ সে কথাটি স্বীকার করতে পারছে না।

আর 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের তাত্ত্বিকপুরুষ কাজী আবদুল ওদুদ লিখলেন– 'মিসেস আর. এস. হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান-অন্তঃপুরে এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয় তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না।'

ধর্মনেতাদের প্রতি প্রত্যক্ষ অভিযোগ বারবার ছুঁড়ে দিয়েছেন আবুল হুসেন– 'আজ আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সকল প্রকার চিন্তার স্ফুর্তিকে রুদ্ধ করতে চাচ্ছি। ...মুসলমান জগৎ বুদ্ধির ঘরে তালা লাগিয়ে কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমানের চলার পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।'

অতীত ছাড়া অনেকদিন থেকেই, মানে কয়েকশো বছর ধরে আমাদের দেশের মানুষের আর কিছুই নাই। মানুষ বারবার অতীতকে অবলম্বন হিসাবে চেপে ধরে যখন তার বর্তমান থাকে অন্ধকার। মানুষের কাছ থেকে এই অবলম্বন কেড়ে না নিলে তারা নিজেদের বর্তমানকে সুন্দর করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চায় না। আবুল হুসেন তাই লিখলেন– 'আজকাল কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয়েই তাদের অতীতের ইতিহাসের পানে তাকিয়ে বর্তমানের অক্ষমতা ও দৈন্যের দারুণ লজ্জাকে ঢেকে রাখছে। হিন্দু মনে করছে, প্রাচীন হিন্দু আধুনিক জগতের কিছুই হাসিল করতে বাকী রাখেনি। আবার মুসলমান মনে করছে– প্রাচীন মুসলমান সভ্যতার চরমে পৌঁছেছিল। তাই হিন্দু চাচ্ছে প্রাচীন হিন্দুত্বকে পুনর্জীবিত করতে, মুসলমান চাচ্ছে প্রাচীন ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। দুঃখের বিষয়, এ দু'জনেই সাংঘাতিকরূপে বিভ্রান্ত। অতীত চিরকালই অতীত। তা আর ফিরে আসে না। অতীতের স্বপ্ন তারাই দেখে যারা বর্তমানের সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কথায়, বর্তমান যাদের সৃষ্টিহীন তারাই অতীতের বোঝা নিয়ে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়।'

'সম্মোহিত মুসলমান' লিখে সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তার প্রতিক্রিয়ায় কলম ধরেছিল যুক্তিবাদী বলে পরিচিত 'ছোলতান' এবং 'মোহাম্মদী' পত্রিকা। তীব্র বাদানুবাদের এক পর্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ লিখলেন– 'মুসলমান-সমাজের কি চেহারা ফুটেছে? সেখানে দেখছি অনুসন্ধিৎসা বন্ধ, মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নেই, আর ধর্ম হচ্ছে দরুদ-পাঠ, কোরআন-চুম্বন, আর শাস্ত্র নিয়ে আস্ফালন। এরই মধ্যে দুইএকজন আলেম অথবা তাঁদের সাগরেদ ইসলামের আদর্শ "ইসলামের সার্বজনীনতা" ইত্যাদি দুইএকটা গুরুগম্ভীর বচন আওড়াচ্ছেন। ..."মজহাব-পন্থী" আর "পীর-পরস্তের" দল কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুসলমান সমাজের সর্বত্র প্রবল ছিলেন; এখন তাঁরা সমাজের সদর আঙিনায় আসর আর তেমন জমাতে পারছেন না, যদিও ভিতরে ভিতরে তাঁদের প্রভাব এখনো অত্যন্ত প্রবল। সমাজের সেই সদর আঙিনায় আজকাল আসর জমিয়েছেন আপনারা, অর্থাৎ "যুক্তিবাদী শরিয়ৎপন্থী"। বর্তমান জগতে বাস ক'রে আধুনিক মুসলমান যুক্তি কথাটাকে যে অশ্রদ্ধা করবেন না এ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যুক্তির পুরো চেহারার সঙ্গে তাদের আজো পরিচয় হয়নি, তাই আপনাদের তথাকথিত যুক্তিবাদ আজ সমাজে আদৃত হচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু আপনাদের যুক্তিবাদ যে কত কত অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক তার এক উদাহরণ মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের বিরাটকায় "মোস্তফা-চরিত"। ...ঢাকার দলকে ধর্মবিচারে অনধিকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, ধর্ম বলতে তাঁরা কি বোঝেন, অর্থাৎ, এ বিষয়ে আপনাদের ধারণার সঙ্গে তাঁদের ধারণার কোনো বড় অমিল রয়েছে কিনা, সে সব কিছুই জানবার চেষ্টা না করে এক-তরফা ডিগ্রী দিয়েছেন। "শিখা"র লেখাগুলো এবং আমার "নবপর্যায়"খানা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে এমন বেপরোয়াভাবে রায় দেবার আগে হয়ত সেখানকার তর্ক খণ্ডন করে অগ্রসর হতেন। সেখানে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা, বুদ্ধির মুক্তি (Emancipation of the Intellect), বর্তমানে মুসলমানের শিক্ষার দোষ, ইসলামকে সম্পূর্ণ নতুন করে বোঝার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, মুসলমান, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমান, সম্মোহিত ও পৌত্তলিক। নিশ্চয়ই আলেমদের বাদ দিয়ে এসব কথা বলা হয়নি।

বাস্তবিক যত গোলমাল তো এখানেই। আপনারা ঠিক করে বসে আছেন যে ইসলাম (আপনাদের মতে ধর্মের চরম) কোরআন-হাদিসের দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিত আছে, সেখান থেকে বচনের গোলাগুলি আহরণ করে আনতে না পারলে ধর্মযুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কারোই নেই। কিন্তু আফসোস, মুসলমান- সমাজও যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সমাজ! আর সেই মানুষের সন্ধানী চিত্ত একালে শাস্ত্রবচন-রূপ গোলাগুলির range পেরিয়ে গেছে।'

'শিখা' পত্রিকার মোট ছয়টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। প্রতিটি লেখাই বিস্ফোরক। সেই সঙ্গে প্রতিটি লেখাই এখনও এমন প্রাসঙ্গিক যে 'শিখা' পড়লে মনে হবে একেবারে এই সময়ের কোনো পত্রিকা পড়ছি। কাজী আনোয়ারুল কাদির এম.এ., বি.টি., বি.এল. লিখলেন– 'সমাজ মাত্রই অতি গুরুতর বস্তু। সমাজ শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র।

মুসলমান সমাজটি অতি গৌরবের বস্তু। ইহার ইতিহাস অপূর্ব্ব। ইহার বন্ধন প্রণালী অভিনব এবং অনন্যসাধারণ। ইহার আদর্শ পবিত্র এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে যত গরীবই হোক না কেন ইহার মৃত্যু অসম্ভব। ইহা প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পারসিক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজের কবর থেকে উঠে নূতন জন্ম, নূতন দৃষ্টি ও নূতন শক্তি নিয়ে সমগ্র জগতকে মোহিত স্তম্ভিত করেছে।... বাস্তবিক ইসলামের সাম্য এত চমৎকার, ইহার প্রয়োগ (Practice) এত সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, আশা করা যায় যে, এমন একদিন আসবে যখন সকল মানুষই ইসলামকে বরণ করে নিতে বাধ্য হবে। যেমন বাধ্য হয়েছেন গুরু নানক, রাজা রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণ। ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে পথে চলতে চেয়েছেন, সে পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ইসলামের দ্বারা।... জ্ঞানের অভাবে আজকাল আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্ম্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গোঁড়ামির দরুণ আমাদের অবস্থা যা হয়েছে তা ভাবলে আতংক উপস্থিত হয়। কোনো কিছু বলার জো নেই। সমাজের প্রচলিত অর্থহীন কোনো সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে, যে বলবে তাকে তখনই কাফের, জাহেল, গোমরাহ, গাঁওয়ার ইত্যাদি বলা হবে। ...আমাদের যাঁরা ধর্ম্মগুরু হওয়ার দাবী রাখেন, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাঁদের অনেকের জীবন সুন্দর নয়। তাঁরা নিজেরা খুব সুস্থচিত্ত, জ্ঞানবান, বলবান, বুদ্ধিমান মানুষ নন। তাঁদের মুখের কথার দামও তাই খুব বেশী নয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মৌলবী মৌলানারা জনগণের উপযুক্ত আহার যোগাতে পারছেন না। ফলে ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে না।'

আবদুর রশীদ বি.এ., বি.টি. লিখেছেন ব্যাংকিং এবং সুদ নিয়ে– ' সুদ যে আমাদের জন্য নিষেধ হইয়াছিল তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই। অন্য দশ প্রকার গঞ্জনার সহিত এ গঞ্জনা সাধারণতঃ মুসলমান জাতির উপর বর্ষণ করা হয় না যে, ইহারা "শাইলকের জাতি"। কিন্তু লাভজনক পাপটি মুসলমান করেন না বটে, ক্ষতিজনক পাপটি সকল জাতির চেয়ে বেশী করেন। অর্থাৎ বঙ্গ দেশের সুদ দাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। ...তিরমিজি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবু হোরেরা বলিয়াছেন, হজরত রসুল করিম বলিয়াছেন, "তোমরা এমন এক যুগে বাস করিতেছ যে, যদি এই সময় বিধি-বিধানের এক-দশমাংশও ছাড়িয়া দাও, তবে ধ্বংস হইবে। ইহার পর এমন এক যুগ আসিবে যখন কেহ আদিষ্ট বিধি-বিধানের এক-দশমাংশ পালন করিলেও সে মুক্তি পাইবে।" সে সামাজিক বিপ্লবের যুগ আজকাল আসে নাই কি? ...কুসীদজীবীদের ন্যায় সুদের ব্যবসা করা প্রকৃতই গর্হিত কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি, কিন্তু জাতীয় ধনবৃদ্ধি ও ধন সংরক্ষণের নিমিত্ত ব্যাংক স্থাপন ও কো-অপারেটিভ প্রণালীতে ঋণদান ও ঋণ গ্রহণ করিয়া দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করা আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি না।'

একই বিষয় নিয়ে আনোয়ার হোসেনের যুক্তিও তীব্র– 'সেভিংস ব্যাংকের সুদ পর্যন্ত অনেকে গ্রহণ করিতে চান না। জীবন-বীমা আমরা সমর্থন করি না। এসব ক্ষেত্রে আমরা অতিমাত্রায় উদাসীন। কিন্তু বেশী দিন উদাসীন থাকিলে জীবন বাঁচান দায় হইবে। বর্ত্তমান জগতের উপর Banking System এর প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সুদের গন্ধ আছে বলিয়া মুসলমান সেদিকে ঘেঁষিতেছে না। আমাদের সমাজে সঞ্চিত টাকা নাই বলিলেই হয়। আর যাহাদের আছে তাহারাও টাকা ভূগর্ভে প্রোথিত বা বাক্সে ভরিয়া রাখা বা নানারূপ কুকাজে উড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কাজে টাকা খাটাইবার সুযোগ বা সুবিধা করে না। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চালাইলে দেখা যাইবে, সমাজের ভিতর সুদপ্রথা অতি সঙ্গোপনে স্বীয় স্থান দখল করিবার আয়োজন করিতেছে। সুদের কবলে পড়িয়া দুঃস্থ কৃষক নিজের বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত হিন্দু মহাজনের হাতে তুলিয়া দিতেছে। কৃষকরূপে টিকিতে হইলে মুসলমানকে ঋণ গ্রহণ করিতেই হইবে। বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া টিকিতে হইলে আজ মুসলমানকে সুদ সমস্যার সমাধান আশু করিতে হইবে।'

পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবি। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন আসবেই। সেই পরিবর্তনকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানালেন কাজী মোতাহার হোসেন– 'প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী আপন আপন ধর্ম্ম বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠতম এবং একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বাস্তবিক পক্ষে, পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, ধর্ম্ম মানুষের মনের একটা মূল বৃত্তি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই মৌলিক ধর্ম্মবৃত্তি বা প্রেরণা হইতে যে দর্শন, যে থিওরী এবং যে ধর্ম্মকাহিনী বা mythology-র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মনুষ্যরচিত এবং প্রত্যেক ধর্ম্ম বিশ্বাস সেই সেই দেশের জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। মনে রাখিতে হইবে, এই সমস্ত দর্শন, থিওরী বা কাহিনী মুখ্য বস্তু নয়– মূল ধর্ম্ম প্রেরণাকে রূপ দিবার জন্যই তাহার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। লোকে এই বহিঃপ্রকাশকেই মূল বস্তু বলিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরিয়া লইয়া অনর্থক বিবাদ করিয়া মরিতেছে। সকলেই শরবত খাইতে চাহিতেছে– সেখানে কাহারও দ্বিমত নাই। কাঁচের গেলাসে খাইবে, না রূপার গেলাসে খাইবে, এই লইয়াই যত গোলযোগ। কিম্বা গেলাসের গায়ে কি রকম নক্সা কাটা থাকিবে, এই লইয়া বৃথা আন্দোলন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ধর্ম্ম মানুষের মনের একটা আকুল আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব্ব সান্ত্বনা। সুতরাং এই সান্ত্বনা যাহাতে অনুসন্ধান ও জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে শীঘ্র নষ্ট হইতে না পারে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিতে হইলে ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত হইতে হইবে। শাস্ত্র বা ধর্ম্মবিশ্বাসকে অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিলে যে সান্ত্বনা লাভ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য, তাহাই নষ্ট হইয়া যায়। বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত সংঘর্ষে (অর্থাৎ জ্ঞান বিচার ও বুদ্ধির ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে) ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক বিশ্বাসগুলির যদি একটু পরিবর্ত্তন হয়, তবে তাহা দূষণীয় নহে, বরং সেইটিই প্রয়োজন। এরূপ পরিবর্ত্তনে প্রকৃত ধর্ম্মের গায়ে আঁচড় লাগে না। কাঁচের গেলাস ভাঙ্গিয়া গেলে রূপার গেলাসে কাজ চালাইতে দোষ কি?'

কাজী মোতাহার হোসেন 'শিখা পত্রিকার' একক সংখ্যায় লিখলেন– 'স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সংসারে এত পাপাচরণ কেন, এটি বাস্তবিকই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ লোকই মুখে বিশ্বাস করে, হৃদয়ে করে না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধনের যেমন কদর হয় না, বিশ্বাসেরও তাই। আপন চেষ্টার দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, আয়ত্ত না করলে কোন জিনিসই আমাদের নিজস্ব হয় না। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ লোকই অন্যের চোখে দেখে, অন্যের বুদ্ধিতে ভাবে, অন্যের অনুভূতির স্পন্দনকে নিজের অনুভূতি বলে ভুল করে। জাগ্রত ভাবে, নিজের জীবনের উপর প্রভু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গড্ডালিকা স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া ঢের বেশী সহজ ও নিরাপদ। সুতরাং চোখ বুঁজে না ভেবে চলাই সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। দুই একটি বুলি আউড়িয়েই তারা মনে করে, বিশ্বাস করেছি। এই আত্মবঞ্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে আত্মদৃষ্টি ও আত্মবিচার হারিয়ে ফেলে। কোন বৃহৎ ভাব বা কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে চলবার সবচেয়ে বড় উপায়, তাকে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করে নিয়ে সব পেয়েছি ভেবে তাকে মনের কোণ থেকে সরিয়ে রাখা। ঠিক এই পদ্ধতিতেই জগতের সব উচ্চ আদর্শ, নীতি বাক্য, ধর্ম্ম কথা, কাব্য কাহিনী, আর্ট, সব অভ্যস্ত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের এক মাত্র উপায় সকলের ভিতর অবিরাম চেতনা সঞ্চারিত করে রাখবার জন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তিমান পুরুষদের চেষ্টা। সজ্ঞানে পথ বুঝে বা পথ খুঁজে চলবার সময় এঁরা বারংবার ভুল করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, শোধরানোর সম্ভাবনা থাকলে এই ভুলের ভিতর দিয়েই আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শিখা গোষ্ঠী' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজের এইসব দুঃসাহসী সংস্কারমূলক চিন্তা ও রচনাবলি অনুপ্রাণিত করেছিল স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলামকেও। তিনি আনন্দের সাথে যোগ দিলেন ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে। এবং বক্তৃতায় বললেন– ' বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে।...এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম যে, মৌ আনোয়ারুল কাদীর-প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাই না।'

পঁয়ত্রিশ

সব্বোনাশ! বাপ্পী চোখ গোল গোল করে বলল– এইসব লেখা লিখেও সেই সময়ে পার পেয়ে গিয়েছিলেন 'শিখা গোষ্ঠী'র লেখকরা! কেউ তাদেরকে আহমদ শরীফের মতো মুরতাদ ঘোষণা করেনি! দাউদ হায়দার বা তসলিমা নাসরীনের মতো দেশ থেকে বের করে দেয়নি! হুমায়ুন আজাদের মতো চাপাতি দিয়ে কোপায়নি! আবুল হুসেনরা নিজেদের কল্লা কাঁধের ওপর নিয়েই ঘুরতে পেরেছিলেন!

একেবারে কিছু যে হয়নি তা নয়। ঢাকার নবাব-বাড়িতে বিচার বসেছিল আবুল হুসেনের। এক মোল্লা বিভিন্ন প্রশ্ন করে আরবিতে নাম-ধাম লিখতে দিয়েছিল আবুল হুসেনকে। তারপরে রায় দিয়েছিল যে, এদের একেবারে কাফের বলা ঠিক নয়। তবে মুসলমানদের এত প্রকাশ্য সমালোচনা তাদের বন্ধ করতে হবে।

যারা মুসলিম সাহিত্য সমাজের কাজে সাহায্য করতেন, তাদেরকে তা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে পরে আর মিলনায়তন ব্যবহার করতে দেয়নি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মুসলিম সাহিত্য সমাজের সংস্পর্শ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আবুল হুসেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

কামাল বলল– আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে 'শিখা'র তৃতীয় বার্ষিক সংখ্যায় মোখতার আহমদ সিদ্দিকীর লেখাটি। আমার মনে হয় সেই লেখাটি পুরোপুরি ছেপে সারা দেশে সব শিক্ষিত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

বাপ্পী জিজ্ঞেস করল– কী আছে সেই লেখায়?

বইটা বাপ্পীর দিকে বাড়িয়ে দিল কামাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিকাহর উদ্ভব ও পরিণতি : মোখতার আহমদ সিদ্দিকী

মোসলেম জগতে ফিকাহ বিষয়টির প্রতিপত্তির সামনে পাক আল্লাহ তাআলার পাক কালাম কোরান মজিদ ও হজরত রসুলোল্লাহর পবিত্রবাণী হাদিস শরীফ পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। মুসলমানগণ এখন আর ইহা চায় না যে, তাহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা কি আদেশ উপদেশ দিয়াছেন বা আল্লাহর রসুলে করিম তাহার দৈনন্দিন কার্য্য কলাপ বা মুখনিঃসৃত মধুর হাদিসের দ্বারা কি আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য এই যে প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে অমুক এমাম কি বলিয়াছেন, তাঁহার রায় কি ছিল, তিনি ইহা জায়েজ বলিয়াছেন কি, না-জায়েজ। সর্ব্ব সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমান তো কোরান, হাদিস বা ফিকাহ এই সমস্ত পার্থক্যের জ্ঞান রাখে না, তাহাদের কথা কি বলা যায়, স্বয়ং আলেম এবং ফকীহগণ পর্য্যন্ত কোরান ও হাদিসকে এখন আর আদর্শ ও দলিল বলিয়া গ্রহণ করেন না। কেবল কোরান ও হাদিস দিয়া কোন মসলার সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণ করিলে বা ফতোয়া দিলে তাহা তাঁহাদের কাছে গৃহীত হয় না, যতক্ষণ না ফিকাহর দলিল দিয়া মসলা প্রমাণ করা হয়। তাঁহারা দেখিবেন মসলা সম্বন্ধে এমামদের কি মত আছে, আল্লাহর ও রসুলের মত দিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না।

মোসলেম জগতে স্থাপিত সহস্রাধিক মাদ্রাসা দিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া প্রতি বৎসর লক্ষাধিক আলেম গঠন করা হয়, ঐগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৫ টিতে কোরান হাদিসের শিক্ষা মোটেই হয় না, কেবল ফিকাহর নানা রকম কেতাবের তালিম দিয়া আলেম, ফকীহ বা মৌলভী মওলানা গঠন করিয়া সমাজের কাণ্ডারীরূপে বাহির করা হয়। তাঁহারা কোরান হাদিসের শতাংশের একাংশ খবর পর্য্যন্ত রাখেন না। ফিকাহর মসলা দিয়া তাঁহারা সমাজের শাসন রজ্জু কষিয়া সমাজ চালাইয়া থাকেন। বাকী যে সমস্ত মাদ্রাসাতে কোরানের তফসীর ও হাদিসের শিক্ষা হয়, তাহাও কোরান হাদিস দিয়া মসলা ঠিক করার উদ্দেশ্যে মোটেও নয়, বরং ফিকাহ প্রসূত মসলার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া ও ফিকাহর মসলাকে মজবুত করার উদ্দেশ্যেই বটে। এবম্প্রকার মাদ্রাসা হইতে যে সমস্ত আলেম-ওলামা বাহির হন তাঁহারা ফিকাহ ব্যতীত অন্যকিছুকে (কোরান হাদিসকে) প্রমাণ বলিয়া গণনা করেন না। অতএব তফসীরের ও হাদিসের শিক্ষা তাঁহাদের পক্ষে তরকারীতে গরম মসালা দান বই কিছু নয়।

প্রকৃত বলিতে গেলে কোরানের অর্থ শিক্ষার অভাব কেরাতের মর্ম্ম ও ভাব না জানিয়া কোরানের কেবল শব্দ দিয়া নামাজ দোওয়া ইত্যাদির প্রচলন প্রভৃতি রোগের উৎস একমাত্র ফিকাহ ও তাহার ছড়াছড়ি বলিয়াই মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন এই ফিকাহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হোক– ফিকাহ শব্দটি আরবী, ইহার আভিধানিক অর্থ 'জ্ঞান'। কিন্তু শরিয়তের ব্যবহার মতে একটি বিশেষ ধরনের জ্ঞানকেই ফিকাহ বলা হয়; অর্থাৎ শরিয়ত সম্বন্ধীয় আদেশ নিষেধ ইত্যাদির জ্ঞানকেই ফিকাহ বলে এবং যাঁহারা এই জ্ঞান রাখেন তাঁহাদিগকে 'ফকীহ' বলা হয়। কিন্তু আধুনিক ব্যবহার মতে শরিয়তের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকে আবার 'ফিকাহ' বলা হয় না। কোরানের জ্ঞানকে, হাদিসের জ্ঞানকে 'ফিকাহ' নামে অভিহিত করা হয় না। কোরান, হাদিস, এজমা অর্থাৎ সর্ব্ববাদী মত এই তিনটিকে আদর্শ ধরিয়া কেয়াস করিয়া যে সমস্ত মসলা বাহির করা হইয়াছে, আজকাল তাহাই কেবল ফিকাহ। মুসলমানী অইনের নামই ফিকাহ। স্থূলভাবে এই বলিলেই যথেষ্ট হয় এবং সাধারণ কথায় ইহাকে শরিয়ত বলা হয়।

এখন দেখিতে হয় যে এই ফিকাহ এর উৎপত্তি কোথায়, কখন ও কিভাবে হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লেখ মতে মুসলমানী আইনকে যখন ফিকাহ বলা হয়, মোসলেম রাজত্ব গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে ফিকাহর প্রচলন হইয়াছিল, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। এবং এই মোসলেম রাজত্ব প্রসারের ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ফিকাহরও প্রসার ও উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু ইহার উৎপত্তি পূর্ব্বাপর এক জিনিষ ছিল না। হজরত রসুলোল্লাহ ইসলামের আলো দিয়া আরব ভূমি আলোকিত করেন এবং মোসলেম রাজত্বের সূত্রপাত হয়, তাঁহার মদিনা বাসের দশ বৎসরকাল তিনিই একমাত্র রাজা ও রাজ্য শাসনার্থ তিনিই আইনজ্ঞ ও ফকীহ ছিলেন বলিতে হয়। মহারাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার রাজ্যে আল্লাহ তাআলার আইনই একমাত্র আইন ছিল। হজরত তাঁহার উম্মতগণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সাংসারিক দুরূহ ব্যাপারাদিতে আল্লাহ তাআলার আদেশের ও আইনের অপেক্ষা করিতেন এবং ফেরেশতা প্রবীণ হজরত জিবরাইল কর্তৃক অবতীর্ণ আদেশ লইয়াই ঐ সমস্তের মীমাংসা করিতেন। অতএব তাঁহার সময় কোরানের আইনই মোসলেমদের আইন বা ফিকাহ ছিল। সাধারণ বিষয়াদিতে হজরত তথা-প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিরপেক্ষভাবে বিচার মীমাংসা করিয়া লইতেন। সাহাবীগণ তাঁহার সময়ে তাঁহার কার্য্যক্রিয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে বিশেষ তৎপর ছিলেন।

কিন্তু হজরতের পর তাঁহার সাহাবীগণের সময়ে ফিকাহর মূল উৎপত্তি অর্থাৎ মুসলমানী আইন কেবল আল্লাহর আইন বা কোরান রহিল না। কোরান ও হাদিস উভয়টি এখন ফিকাহর মূল হইয়া দাঁড়ায়। হজরতের খোলাফায়ে রাশেদিনগণ প্রত্যেক মীমাংসা উপযোগী বিষয়াদিতে প্রথমতঃ কোরানের দিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহর আইন অনুযায়ী মীমাংসা করিতেন। এবং যে ক্ষেত্রে কোরানের মীমাংসা পরিষ্কার হইবে না বুঝিতেন, হজরতের সুন্নত অর্থাৎ আদর্শ ক্রিয়া কলাপ ও তাঁহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাদিস মতে মীমাংসা করিয়া দিতেন, যাহা তাঁহারা নিজে জানিতেন বা সমসাময়িক অহরহ সঙ্গী সাহাবীগণ হইতে জানিয়া লইতে পারিতেন। এবং যে সমস্ত বিষয়াদির মীমাংসাতে কোরান ও হাদিসের ব্যাখ্যাও অসম্পূর্ণ বিবেচিত হইত, তজ্জন্য পাঁচজনের অধিক সাহাবীর পরামর্শ লইয়া মীমাংসা করার নিয়মও ছিল।

হজরতের সময় মোসলেম রাজ্য আরব্য ভূমির বাহিরে প্রসার পাইয়াছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা গাজী হজরত ওমরের সময় পর্য্যন্ত হজরতের এন্তেকালের ১২ বৎসরের মধ্যে দামাস্কাস রাজ্য সম্পূর্ণ সিরিয়া দেশ ও মেসোপটেমিয়া এবং পশ্চিমে মিশর রাজ্য মোসলেম রাজ্যে পরিণত হয়। হজরতের সাহাবীগণের মধ্যে প্রায় লোক বিভিন্ন রাজ্যের শাসন-কর্ত্তারূপে বিরাজ করিতে থাকেন। তাঁহারা হজরতের জীবদ্দশায় হজরতের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া হজরত হইতে ফিকাহ শিক্ষা পাইয়াছিলেন ও সেমতে স্ব স্ব রাজ্যের শাসন নিজ জানা আইন অনুযায়ী চালাইতেন। যে ক্ষেত্রে কোরানের আদেশ অনুযায়ী কাজ হইত তাহা কোরান মতে এবং যেখানে তাঁহার জানা সুন্নত ও হাদিস মতে কাজ হইত, ঐ বিষয়ের মীমাংসা সেমতে করিয়া দিতেন। কোরান ও হাদিসের অনুরূপ কাজ না হইলে নিজের বিবেক অনুযায়ী বিচার করিয়া দিতেন। ইহাতে সকল রাজ্যে যে সমভাবের মীমাংসা হইত না কোন সন্দেহ নাই। একজনার বিবেক মতে যে সকলের বিবেক হইবে না ইহা স্বাভাবিক। অতএব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের আইন বা ফিকাহ চলিত বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতে আজকালকার ন্যায় পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ও বীতশ্রদ্ধার কারণ হইত না। কেননা হজরতের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ যুগেও তাঁহার আদর্শ সংসর্গ প্রভাবে মুসলমানগণের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাবের স্রোত এত প্রখর ছিল যে, সহজে একের প্রতি অপরের বিদ্বেষ ভাব স্থান পাইতে পারিত না। তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাবসমূহ জাগরিত ছিল বলিয়া বিদ্বেষের বীজ তাঁহাদের অন্তর্ভূমিতে দখল পাইত না। কাজেই প্রত্যেকে যাহা সত্য সনাতন ও ইসলামের আদর্শ বলিয়া বুঝিতেন সেমতে ব্যবহার করিতেন। দ্বিতীয়তঃ সাহাবীগণ সকলেই ইহা মনে করিতেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই হজরতের শিষ্য, কেহ কাহারও উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা রাখে নাই, যিনি যাহা করেন তাঁহার জানা ফিকাহ অনুযায়ী করিয়া থাকেন, অতএব সংঘর্ষ ও বিদ্বেষ এক্ষেত্রে স্থান পাইতে পারে না। এবং তৃতীয়তঃ এক দেশে যাহা ঘটিত ও চলিত অন্য দেশে সহজে তাহা অবগত হওয়ার সুবিধাও ছিল না। কাজেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ফিকাহর প্রচলন বিনা বাধায় হইত।

ইহাও দেখা যায় যে, ফিকাহর ইত্যাকার বিভিন্ন রীতি হিজরী প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্তও ছিল। খলিফা হারুনর রশীদ যখন বাগদাদ হইতে মক্কা শরীফে হজ করিতে যান মদিনাতে ইমাম মালেকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। ইমাম মালেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন মদিনাতে তাঁহার ফিকাহ্ জারী করিতেছিলেন। ইমাম সাহেব খলিফাকে তাঁহার প্রণীত কেতাব 'আল মোয়াত্ত্বা' দেখান। খলিফা এই কেতাব দেখিয়া এত অধিক প্রীত হন যে, তিনি এই কেতাবকে কাবা শরীফের দরজায় লটকাইয়া দেওয়া ও সমস্ত মোসলেম রাজ্যে এই কেতাবের মতে শরিয়তের বিধান চলা উচিত মনে করেন, এবং খলিফা তাঁহার এই ইচ্ছা ইমাম সাহেবের কাছে প্রকাশ করেন। কিন্তু ইমাম সাহেব খলিফাকে তাহা করিতে নিষেধ করেন ও বলেন যে, হজরতের সাহাবীগণের নানা জন নানা দেশে ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তার ও প্রচার করিয়া স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব মতে ইসলাম জারী করিয়াছেন। ঐ সমস্ত স্থানে এখন পুনরায় এক রকমের শরিয়ত করিতে গেলে নানা রূপ গোলমালের সৃষ্টি হইতে পারে। অতএব খলিফা তাঁহার কথা মানিয়া তাহা করিলেন না। এই খলিফার রাজত্বকাল হিজরী ২য় শতাব্দীর শেষ ভাগেই ছিল।

ইহাও জানা যায় যে, খলিফা হজরত ওমরের সময়কাল পর্যন্ত মোসলেম রাজ্যে বা মোসলেম রাজ্য সম্পর্কে মুসলমানগণের মধ্যে কোন বিদ্বেষভাব আসিয়াছিল না। কিন্তু তৎপর তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের সময়ে খেলাফত প্রসঙ্গ লইয়া মুসলমানগণের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে হজরত মোআবিয়ার সময়ে ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়া উম্মীয় বংশীয় খলিফাগণের শেষ পর্য্যন্ত ইসলাম রাজত্বে ধর্ম্মভাবের বিশৃঙ্খলা ঘনীভূত হইতে থাকে। এই সময়টি ইসলামের জন্য একটি মহা পরীক্ষার কাল ছিল। উম্মীয় খলিফাগণ নিজেকে রাজ্যের অধিপতি বলিয়া বুঝিতেন। মোসলেম রাজ্যের খলিফা হওয়ার ভাব তাঁহাদের অন্তরে ছিল না। এই সময় ফিকাহ লইয়া বেশী কিছু বাড়াবাড়ি হয় নাই কিন্তু ফিকাহর মর্য্যাদা একরূপ নষ্ট হইয়া যায়। খলিফাগণ যাহার যেরূপ ইচ্ছা শাসন পরিচালনা করেন, কোরান হাদিসের সহিত সম্বন্ধ খুব কমই রাখেন। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা ইচ্ছামত হাদিস গড়িয়া বা গড়াইয়া লইতেও ত্রুটি করিতেন না। এইরূপে কত হাজার হাজার জাল ও মিথ্যা হাদিসের যে উৎপত্তি হয় তাহার সংখ্যা ছিল না। এই উম্মীয় বংশীয় খলিফাগণের মধ্যে একমাত্র খলিফা ওমর বিন আবদুল আজীজ ছাড়া সকলেই এই কলঙ্কে কলঙ্কিত ছিলেন। কথিত আছে এই সময়ে ইবনে আবিল আওজা নামে এক ব্যক্তি নিজে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে নিজে ৪০০০ (চারি হাজার) হাদিসের প্রচার করে যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল। আব্বাসীয় খলিফাদের সময়ে হিজরী ১৫৫ সনে এই দোষের জন্য তাহার শিরচ্ছেদ হয়। এই উম্মীয় বংশীয়দের সময়ে শিয়া, মোতাজেলা ও খারেজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয় ও এক আল্লাহ, এক কোরান, এক রসুল ও এক ইসলামের অনুসরণকারী মুসলমানগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বহ্নি জ্বলিয়া উঠে, ও ইসলামের সুরম্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঘর সাম্প্রদায়িক আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরম্ভ করে। ধর্ম্মহীনতার দ্বারা মোসলেম সমাজ আক্রান্ত দেখিয়া এই সময় হইতে সুফিয়া সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। এইরূপে নানাভাবে পবিত্র ইসলামের পরীক্ষা চলিতে থাকে।

হিজরী ৪১ সন হইতে ১৩১ সন পর্য্যন্ত উম্মীয় বংশীয় খলিফাগণ রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে ফিকাহর প্রচলন যদিও রাজকীয় সরকার হইতে ছিল না বা নামমাত্র ছিল, কিন্তু যেখানে ফিকাহর নিয়মে বিচার হইত তাহা কোরান হাদিস ও সাহাবীগণের সম্মতিসূচক নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিয়াই হইত। আইনের জন্য বিধিবন্ধন কিছু ছিল না, আইন বই রূপে কোন বই ছিল বলিয়াও মনে হয় না। তবে কোরান ও হাদিসের উক্তিগুলি তাঁহাদের আইনের কাজ করিত। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এই সময় পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিত বটে কিন্তু রাজ্য বিস্তৃতির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে নাই। রাজ্যের বিস্তৃতি, শাসনের বিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ সমস্তটি অস্বাভাবিক রূপে বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে ৭০ হিজরী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃতি যেরূপ দ্রুতভাবে চলিয়াছিল, তৎপর হইতে তাহা কমিয়া আসে।

উম্মীয় বংশীয়দের পর যখন আব্বাসীয় বংশীয়গণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের সময় রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা ও সুশাসনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। এবং ইসলামিক নিয়মে আইন প্রণয়ন, মুফতি নিয়োগ ইত্যাদি কার্য্যের সূচনা হয়। বর্ত্তমান সময়ের ফিকাহ এই সময়েই আরম্ভ হয়।

ইমাম আবু হানিফা যাহাকে বড় ইমাম (ইমাম আজম) বলিয়া স্মরণ করা হয়, হিজরী ৮০ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া হিজরী ১৫০ সনে ৭০ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। উম্মীয় খলিফাগণের সময় হইতে তিনি ধর্ম্মবিদ্যালোচনাতে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার ও অগাধ বিদ্যার তুলনা ইসলাম ধর্ম্ম জগতে ছিল না ও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া দুইবার তাঁহাকে রাজকীয় কোর্টের বিচার নিষ্পত্তির জন্য কাজীউল কোজ্জাতের পদে আহ্বান করা হয়। প্রথমবার উম্মীয় বংশীয় খলিফা মারওয়ান হেমারের নিযুক্ত কুফা রাজ্যের শাসনকর্ত্তা এজিদ বিন ওমর তাঁহাকে আহ্বান করেন, এবং দ্বিতীয়বার আব্বাসীয় খলিফা মনসুর দাওয়ানেকী কর্তৃক আহুত হন। কিন্তু তিনি উভয় বারই এই দুরূহ ব্যাপার সমাধা করা অস্বীকার করিয়া রাজকীয় আদেশ অমান্যতার দোষে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হন।

উম্মীয় রাজগণের সময় হইতে কৃত্রিম হাদিসের ছড়াছড়ি ও অনৈসলামিক ফিকাহর প্রচলন দেখিয়া ফিকাহ বিষয়টিকে যথারীতি কোরান ও সত্য হাদিসের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করার আবশ্যকতা তিনিই সর্ব্বপ্রথম অনুভব করেন, ও এই উদ্দেশ্যে তাঁহার যথা শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কোরান, হাদিস, এজমা (সর্ব্ববাদীমত), কেয়াস (মৌলিক বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া আর একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয় বাহির করা) ও রায় (ধীর বিবেকপ্রসূত মত) এই কয়েকটিকে মূল সূত্র ধরিয়া তিনি বর্ত্তমান ফিকাহর সূচনা করেন। ফিকাহর জন্য তাঁহার নিজ প্রণীত কোন কেতাব আছে বলিয়া দেখা যায় না। ফিকাহ আকবর নামে একটি কেতাব তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রকাশ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কেতাবটি তাঁহার শিষ্য আবুমতি তাঁহার খসড়াগুলি জমা করিয়া তাঁহার নামে প্রচার করেন। 'অছিয়ত' ও 'মকসুদ' নামে আরো দুইটি কেতাব তাঁহার বলিয়া প্রকাশ আছে মাত্র, বর্ত্তমান যুগে এগুলির প্রচলন লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ইমাম সাহেবের শিষ্যমণ্ডলী কর্তৃক তাঁহার ফিকাহ প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে কিন্তু, তাঁহার অতুলনীয় ধর্ম্মনিষ্ঠা ধার্ম্মিকতার গুণে তিনি অত্যন্ত অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামেই ফিকাহর পরিচয় হয়। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ কুফার কাজী ছিলেন। তিনি রাজকীয় পদমর্য্যাদার সুযোগে হানাফী ফিকাহকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুবিধা পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ইমাম আবু হানিফা তাঁহার শিষ্যগণকে ফিকাহ শিক্ষা দিতেন, এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা ফিকাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। শিষ্যগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ শয়বানী ও ইমাম জাফর প্রভৃতি বিশেষতর প্রসিদ্ধ। কোন কোন সময় শিষ্যগণ তাঁহার মতের উপরও তর্ক করিতেন।

যে সময়ে ইমাম আবু হানিফা বাগদাদের মধ্যে ফিকাহ প্রচলন করেন প্রায় ঐ সময়েই বা তাহার কিছু কাল পরে মদিনা নগরীতে ইমাম মালেক ইবনে আনস কোরান হাদিস ও এজমাকে মূল সূত্র ধরিয়া তাঁহার ফিকাহ প্রচার আরম্ভ করেন। ইমাম মালেকের ফিকাহ ও ইমাম আবু হানিফার ফিকাহর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। ইমাম আবু হানিফা সন্দেহজনক হাদিস হইতে 'রায়'কে (লুবিচাকে) প্রবলতা দিতেন ও 'রায়' মতে মসলার মীমাংসা করিতেন। কিন্তু ইমাম মালেক সাহেব 'রায়'কে অগ্রাহ্য করিতেন এবং হাদিস গ্রহণ করার, যদিও তাহা একজনমাত্র রাবী হইতেও পাওয়া যায়, পক্ষপাতী ছিলেন। তখন মদিনাবাসীগণ ইমাম মালেকের ফিকাহ মতে ও কুফীর ও বাগদাদীওগণ হানাফী মতে চলিতে থাকেন। হিজরী ১৭৯ সনে ইমাম মালেক সাহেব মদিনাতে পরলোক গমন করেন।

ইমাম হজরত আবু হানিফা ও ইমাম মালেক সাহেব যখন নিজ নিজ ফিকাহ প্রবর্ত্তনে লিপ্ত থাকেন, তখন আরো কয়েকজন এরূপ ফিকাহ প্রবর্ত্তন কাজে মনোযোগ দেন। তাঁহাদের মধ্যে আল আওজাই ও সুফিয়ান সুরী এই দুই জনের নামই প্রসিদ্ধ। আল আওজাই ১৫৭ হিজরীতে ও সুফিয়ান সুরী ১৬১ হিজরীতে প্রাণ ত্যাগ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরোক্ত ইমামগণের প্রবর্ত্তিত ফিকাহ পরস্পর যথেষ্ট পৃথক হইলেও পরস্পরের মধ্যে এতদিন বেশী কিছু সংঘর্ষ হয় নাই। কিন্তু ইমাম মালেকের এন্তেকালের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মোসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মালেকিয়া ও আওজাইয়াগণ ইমাম আবু হানিফার ফিকাহকে বেদাতী ফিকাহ ও ইমাম আবু হানিফাকে বেদাতী বলিয়া প্রচার করার কথা শুনা যায়। কেননা তিনি নিজ মতকে (রায়কে) হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার ফিকাহর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই কানাকানি এতদিন এত অধিক প্রবল হয় নাই, কিন্তু পরিশেষে যখন ইমাম আল আবদুল্লা আল শাফেয়ী প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি হানাফী, মালেকী, আওজাই প্রভৃতি ফিকাহগুলির উপর সন্তুষ্ট না হইয়া ফিকাহর জন্য নিজে মাঝামাঝি এক নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন ও সে মতে তাঁহার ফিকাহ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিয়া দেন। ইমাম আবু হানিফার মৃত্যুর বৎসর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪০ হিজরীতে ৫৪ বৎসর বয়সে তাঁহার এন্তেকাল হয়। ক্রমে তাঁহার ফিকাহও যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। তিনি ইমাম আবু হানিফার শিষ্য মোহাম্মদ হইতেও ফিকাহ শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

মোসলেম রাজ্যে এই সময় নানা রকম ফিকাহ লইয়া ঘোর বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। কিছু দিন পরে ইমাম আহমদ বিন মোহাম্মদ হাম্বল শয়বানী ফিকাহ প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হয়। তিনি খলিফা মাহদী ইবনে মনসুরের সময় বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭ বৎসর বয়সে হিজরী ২৪১ সনে খলিফা আল মোতা-ওয়াক্কেলের সময়ে বাগদাদেই এন্তেকাল করেন। ইমাম আহমদ হাম্বল শাফেয়ীর নিকট ফিকাহ শিক্ষা করিয়া প্রথমাবস্থায় শাফেয়ী ফিকাহ মতে চলিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শাফেয়ীরা ফিকাহতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজে ফিকাহ প্রবর্ত্তনে মনোযোগ দেন।

মোসলেম রাজ্যে এত রকমের ফিকাহ বাহির হওয়ায় ও একজনার ফিকাহর উপর অন্যজন সন্তুষ্ট না হইয়া পৃথক ধরনের ফিকাহ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার মুখ্য কারণ কৃত্রিম অকৃত্রিম হাদিসের ছড়াছড়িই বলিতে হয়। বনী উম্মীয়দের সময়ে যে হাজার হাজার কৃত্রিম হাদিস বাহির হইয়াছিল, এই সমস্ত হাদিস হইতে ঠিক ও সত্য হাদিস বাহির করিয়া মসলা নির্ধ্বারণ করিতে ইমামগণ একমত হইতে পারেন নাই। যে হাদিস একজনের কাছে সত্য বলিয়া বোধ হয় অন্যজন তাহাতে সন্দেহ করেন। হাদিস লইয়া এরূপ মতভেদ হওয়াও যথেষ্ট স্বাভাবিক ছিল। কেননা প্রথমতঃ হাদিসের জন্য পুস্তকাকারে কিছু ছিল না। রসুলুল্লাহর সাহাবীগণ রসুলুল্লাহ হইতে যাহা শুনিতেন ও তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিতেন, তাহা তাঁহারা যথারীতি লিপিবদ্ধ করিতেন না। কেবল মনে রাখিতেন বা কোন বিষয় খসড়াভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাগজে লিখিয়া রাখিতেন। আর যে সময় হাদিস জমা করার ও নির্ব্বাচন করার খেয়াল মোসলমানদের অন্তরে জাগে, তাহাও হজরত রসুলুল্লাহর দেহত্যাগের অন্যূন শতাধিক বৎসর পরে। সাহাবীগণের মধ্যে তখন খুব কম লোকই জীবিত থাকেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ হইতে শুনিয়া শুনিয়া বহু সহস্র হাদিস জমা করা হয়। ইমাম মালেক সাহেবের 'আল- মোওয়াত্ত্বা' হাদিসের প্রথম কেতাব। ইহাও প্রায় দেড়শত বৎসরের পরে বলিতে হয়। প্রায় লক্ষাধিক হাদিস হইতে নির্ব্বাচন করিয়া মাত্র ৩০০০ হাদিসের উপর এবং কোরানের প্রায় ৬৬০০ (ছয় হাজার ছয় শত) আয়াত হইতে মাত্র ৫০০ পাঁচ শত আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া ইমামগণ ফিকাহ বা মোসলমানী আইন গঠন করেন। এরূপ ক্ষেত্রে মতভেদ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সত্য ও জাল হাদিসের নির্ব্বাচনের নিমিত্ত কত যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এস্‌নাদ ও আসমায়ে রেজাল অর্থাৎ হাদিস যাঁহারা বলিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও তাঁহাদের পরম্পরার ক্রমিক পরিচয় ইত্যাদি লইয়া কত খাটুনী যে খাটিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারই বটে। কিন্তু এ সমস্ত লইয়া অধিকতর পরিশ্রম ইমামগণের ফিকাহ প্রবর্ত্তনের অনেক পরেই হইয়াছিল।

উপরোক্ত ইমাম সাহেবগণ যদিও এত কিছু করিয়া ফিকাহ গড়িয়াছিলেন তাঁহাদের ফিকাহ অনুযায়ী চলা কোন মুসলমানের পক্ষে তখন বাধ্যতামূলক ছিল না। যাহার যেরূপ ইচ্ছা কোরান হাদিসের অধীন হইয়া সেমতে চলিতেন। হিজরী ৪ঠা শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্দিষ্ট কোন মজহাবেরও সৃষ্টি হয় নাই এবং নির্দিষ্ট মজহাবের কোন কথাও ইতিপূর্ব্বে মুসলমানের মনে আসে নাই।

হিজরী ৪ঠা শতাব্দীর পর যখন চেঙ্গিজখানী অত্যাচারে মোসলেম রাজ্য ছাড়খাড় হইয়া পড়ে, ধর্ম্ম ও শাসন ব্যাপারে যথেচ্ছরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তখন যাহার যেমত ইচ্ছা ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া চলিতে আরম্ভ করে সেই সময়েই নির্দিষ্ট মজহাবের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ইমামগণের ফিকাহগুলির মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চারি রকমের ফিকাহকে অধিকতর মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেবল এই চারি মজহাবকে নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়।

প্রথম হইতেই নির্দ্দিষ্ট কোন মজহাব মতে চলা যদিও অনাবশ্যক ও অনেকে বেদাত বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ইহার কারণে অনেক সুফল ফলিয়াছে বলিতে হয়। যদি এই চারিটি মজহাবকে নির্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইত, আজ পর্য্যন্ত দশটি মোসলমান একমত হইয়া এক জামাতে নামাজ পড়িতেন কিনা বলা যায় না। ধর্ম্মের মধ্যে স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া গেলে তাহার কুফল সুনিশ্চিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এই প্রবন্ধ ইতিহাস নয়। ফিকাহ সম্বন্ধে আলোচনাকালে ঐতিহাসিক ধারা রাখা হইয়াছে মাত্র। প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হয় ভয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম না।

এখন এই ফিকাহর প্রভাব ও ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ লইয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

উপরোক্ত বিষয়াদি হইতে এই দেখা গেল যে, ফিকাহকে প্রথম অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ও তাঁহার রসুলের নিরূপিত আইনমতে চলার উদ্দেশ্যে আল্লাহর বান্দাগণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। পরে পরে মোসলেম রাজ্যের শাসন উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আইনগুলির উপর ভিত্তি করিয়া কেয়াস ও রায় দিয়া তাহার পুনর্গঠন করা হয় এবং প্রায় বিষয়াদিতে অর্থাৎ এবাদতে ও মোআমলাতে ফিকাহ প্রতিষ্ঠাতাগণ একমত হইতে না পারিয়া ভিন্নমত পোষণ করিতে বাধ্য হল। এমতাবস্থায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মত যে ধ্রুব সত্য ও অভ্রান্ত ইহা কেহ বলিতে পারে না। বিশেষতঃ স্বয়ং ইমাম সাহেবগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়, তাঁহারাও ভুল করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ রাজার আইন রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। তাহা বাহ্যিক ক্রিয়া ও কথার উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত করা হয়। অন্তরের সঙ্গে রাজার আইনের সংস্রব থাকে না। বাহ্যিক যাহা দেখা হয় ও যাহা মুখে প্রকাশ করা হয়, তাহার উপরই দোষগুণের বিচার মীমাংসা করিয়া দেওয়া রাজকীয় আইনের কর্ত্তব্য। রাজকীয় আইনের বিচার অন্তরের সঙ্গে কখনো হয় না। অন্তরের ও অন্তরের ভাব কেবল সে জানে ও তাহার অন্তর্য্যামী আল্লাহ তাআলা জানেন।

এহেন অবস্থায় বর্ত্তমানকালীন ফিকাহ বা মোসলমানী আইন কেবল মোআমলতে অর্থাৎ সাংসারিক ব্যাপারেই খাটে ও শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দীনিয়াত অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ফিকাহর হুকুম পুরাভাবে খাটিতে ও শুদ্ধ হইতে পারে না। কেননা দীনিয়াতের বিচারক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে না। তিনি অন্তর্য্যামী, অন্তরের খবর তিনি রাখেন ও অন্তরের অবস্থা লইয়াই তিনি দীনিয়াতের বিচার করেন। বান্দা যাহা মুখে বলে বা কাজে করে, তাহা অন্তর হইতে বলে বা করে কিনা ইহাই আল্লাহর লক্ষ্য। কাজেই আলেমগণ আমার নামাজ দোওয়া শুদ্ধ হইয়াছে ফতোয়া দিলেও আল্লাহর কাছে তাহা শুদ্ধ ও গৃহীত হইবে বলিয়া ঠিক বলা যায় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিজে না বুঝিয়াছি যে, আমি যাহা করিয়াছি, আমার অন্তর হইতে আল্লাহর জন্যই করিয়াছি। যদি আমি আল্লাহর জন্য নামাজ না পড়িয়া বান্দাগণকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ি, নামাজকে হাজার শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করিলেও আল্লাহর কাছে তাহার পুরস্কার তো পাইব না বরং তিরস্কার পাওয়ার আশঙ্কাও আছে, অথচ আলেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেব আমার নামাজ দেখিয়া নামাজ শুদ্ধ ও সুন্দর হইয়াছে বলিয়া ফতোয়া দিবেন, এই ফতোয়া কি কখনো শুদ্ধ হইতে পারে? আরও দেখুন, মুসলমান রাজার দেশে বা মুসলমান সমাজে থাকিয়া নামাজ না পড়িলে রাজার বা আইনের হতে শাস্তি হইবে। যদি কেহ কেবল এই ভয়ে রাজাকে বা সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজ পড়ে, আল্লাহর ওয়াস্তে যদি সে নামাজ না পড়ে, রাজার মুফতি ও সমাজের আলেম তাহার নামাজ শুদ্ধ ঠিক হইয়াছে বলিয়া তো ফতোয়া দিবেন, কিন্তু আল্লাহর কাছে কি এরূপ নামাজের কোন মূল্য আছে?

অতএব নামাজ দোওয়া ইত্যাদি যত সমস্ত এবাদত বান্দা করিবেন তাহার প্রকৃত বিচারক আল্লাহকে জানিয়া অন্তর হইতে ঐ সমস্ত করা সঙ্গত বরং আবশ্যক। এবাদত বিষয়ে আলেমের ফতোয়ার ও হুকুমের উপর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, নিজেও অন্তরের মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করা কর্ত্তব্য। অন্যথায় নিস্তারের আশা কম। কিন্তু ইহাও দেখিতে হয় যে, ফিকাহ ছাড়া আমাদের এখন গত্যন্তর নাই। খায়রুল কুরুন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ইসলামিক যুগ হইতে আমরা এখন এত দূরে পড়িয়া গিয়াছি যে ফিকাহ ছাড়া কেবল কোরান ও হাদিস দিয়া আমাদের লাখের মধ্যে একটি জনও যে ঠিক মোসলমানী মতে চলিতে পারিবে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। তবে অন্ততঃপক্ষে ফিকাহর একবার পুনর্বিবেচনা আবশ্যক যাহাতে অনৈসলামিক গোঁড়ামী বিষয়গুলির সংশোধন হয়।

AMARBOI.COM

ছত্রিশ

সাদী ওস্তাদ বলল– খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন 'শিখা গোষ্ঠী'র লেখকরা। আমাদের সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। কাজ করতে হবে একই ভাবে।

ঠিক!

বাপ্পী আর কামাল সায় দিলেও ইউসুফ বলল– আমাদের কাজটা একটু অন্য রকম হওয়াই উচিত।

কেন? অন্য রকম করতে যাওয়ার দরকারটা কী? সামনে একটা মডেল আছে, মডিউলও আছে। সেটাকে গ্রহণ করলে অনেক কাজ যেমন কমে যায়, তেমনই সময়ও কম লাগে। তোমার খালি সব কিছুতেই দ্বিধা।

ইউসুফ হেসে বলল– আমি কোনো দ্বিধা করছি না। কাজটা আমরা করতে শুরু করব অবশ্যই। কিন্তু একটু ভেবে দেখা যাক না কেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ কাজটা চালিয়ে যেতে পারল না কেন?

কেন আবার? কিছুদিন পরেই পাকিস্তান হয়ে গেল না! আর পাকিস্তানকে আমাদের দেশের মানুষ, বিশেষত বাংলার মুসলমানরা মনে করেছিল পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদিনের আমল। তখন সেই আবেগের জোয়াড়ে ভেসে গিয়েছিল অন্য সব চিন্তাই।

এই কারণটি আংশিক সঠিক। কিন্তু আরও কারণ আছে।

একটা কারণ একেবারেই অন্তর্নিহিত। লেখা থেকে, বক্তৃতা থেকে, অনুষ্ঠান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মীরা ছিলেন উন্নাসিক, সাধারণ মুসলমান সমাজ থেকে দূরে। সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা নিজেরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলমান সমাজের সমালোচনায় এগিয়ে এসেছিলেন, সেই দৃষ্টিটা ছিল ইউরোপের রেনেসাঁর শিক্ষা নিয়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ। তাঁরা ঠিক মুসলমান সমাজের একজন হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করতে বোধহয় রাজি ছিলেন না। ফলে মোল্লারা তো বটেই, সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান সমাজও তাদের কথা ও সমালোচনাকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া বলেই মনে করেছে। তাদের সমালোচনাকে নিজেদের লোকের সহৃদয় আত্মসমালোচনা বলে মনে করতে পারেনি। এবং এটাও তো ঠিক যে শিখা গোষ্ঠীর লেখকরা তদানীন্তন বাংলার মুসলমান সমাজের যে সমালোচনা করেছেন, তা করেছেন ইউরোপের যুক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। ফলে তাঁদের কথনভঙ্গিটা অচেনা ঠেকেছে বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের কাছে।

দ্বিতীয় যে কাজটি আমরা এখনই করতে চাই না, তা হচ্ছে তাঁদের মতো এখনই পত্রিকা বের করে জ্বলন্ত ভাষায় সমালোচনা শুরু করা। আমরা জানি যে মুসলমানদের বিশ্বজুড়ে পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে যেমন নিজেদের ভেতরের সমস্যা আছে, তেমনই আছে বাইরের শক্তির অব্যাহত ষড়যন্ত্র। এখন মুসলমান সমাজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং ভুলগুলি চিহ্নিত করে শোধরানোর ক্ষমতা অশিক্ষিত মোল্লাদের যেমন নেই, তেমনই শুধুমাত্র আধুনিক শিক্ষার মধ্যেও নেই। দরকার দুইটির সমন্বয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারি শিক্ষিত লোকেরাই এখন ইসলামি শাস্ত্র পাঠ করবে, ইসলামি জ্ঞান অর্জন করবে, হয়ে উঠবে সত্যিকারের আধুনিক যুগের উপযোগী ফাকিহ। আমাদের প্রত্যেক জেলা শহরে অন্তত কয়েকজন করে এমন লোক তৈরি করা দরকার যারা নিজ নিজ এলাকায় মুসলমান সমাজের তাত্ত্বিক নেতৃত্ব অর্জন করতে পারবে। তাদের মাধ্যমে উপজেলা বা তৃণমূলে যাওয়ার ধাপ তৈরি করা যাবে। মানে আলো দিয়ে আলো জ্বালা। নির্দিষ্ট পরিমাণ শিক্ষিত ফাকিহ গড়ে না ওঠা পর্যন্ত আমাদের মুসলমান সমাজের প্রকাশ্য সমালোচনায় নামা উচিত হবে না।

বাপ্পী রেগে উঠল– তাহলে কত বছর লাগবে সে খেয়াল আছে?

ইউসুফ শান্তস্বরে বলল– আছে। আমি মনে করছি আমাদের পঁচিশ বছরের মতো সময় লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হা হয়ে গেল বাপ্পী– পঁচিশ বছর ধরে এই বেলনা বেলতে হবে আমাদের! আর ইউ সিরিয়াস?

ইয়েস আই অ্যাম সিরিয়াস।

এত সময় নিচ্ছি কেন আমরা?

যাতে কোনো মোল্লা বা মুফতি বা শায়খুল হাদিস এক ফতোয়া দিয়ে আমাদের থামিয়ে দিতে না পারে।

দূর ঐসব ফতোয়াবাজদের কে পাত্তা দিচ্ছে!

এখন পর্যন্ত ঐ ফতোয়াবাজরা যা বলে সেটাই মেনে নেয় এই দেশের মুসলমানরা। ব্রিটিশরা এই ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝেছিল। সেই কারণে এক মোল্লার ফতোয়ার জবাবে তারা আরেক মোল্লার ফতোয়া জোগার করে আনত। অযথা জোর করে কোনো মোল্লার বিরোধিতা করতে চাইত না।

কেমন?

ওহাবিরা এই দেশ বা পুরো ভারতবর্ষকে দারুল হারব বা শত্রুদেশ ঘোষণা করেছিল। তাদের ইমামরা ফতোয়া দিয়েছিল এই দেশে আর জুম্মা বা ঈদের নামাজ পড়া চলবে না। যদি কেউ নিজেকে মুসলমান মনে করে, তাহলে এই দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য জিহাদ করতে হবে, নতুবা এখান থেকে হিজরত করে অন্য কোনো দারুল ইসলামে চলে যেতে হবে। তারা এই ফতোয়া দিয়েছিল 'ফতোয়া-এ-আলমগীরী' বই থেকে। সেখানে বলা হয়েছে তিনটি শর্তের কারণে কোনো দেশ দারুল হারব হয়ে যায়। সেগুলি হচ্ছে–

১. যখন বিধর্মীদের শাসন নির্বিচারে জারি করা হয় এবং ইসলামের অনুশাসন পালন করা যায় না।

২. যদি দারুল হারবভুক্ত কোনো দেশের সীমান্তে দেশটির অবস্থান হয়ে থাকে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশটি ও দারুল হারবভুক্ত দেশের মধ্যেকার কোনো বিষয়ে দারুল ইসলামের কোনো শহর থেকে হস্তক্ষেপ করা না যায়।

৩. কোনো মুসলমান যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না; এবং কোনো জিম্মি (মুসলমান শাসনের শর্তাবলি স্থায়ীভাবে মেনে চলার শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ বিধর্মী) যখন ইসলামি শাসনে যেসব শর্ত মেনে চলেছে তা আর মানতে পারছে না।

ব্রিটিশরা বেশ বিপাকে পড়ে গিয়েছিল এই বিষয়টি নিয়ে। কেননা এই ফতোয়া অনুযায়ী ভারতের সকল মুসলমানের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায়। তাহলে ইংরেজকে শুধু বিদ্রোহ দমন নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। আবার যদি কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভবও হয়, তাহলেও সকল মুসলমান দারুল হারব ছেড়ে হিজরত করে চলে যাবে অন্য কোনো মুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে। সব মুসলমান দেশ ছেড়ে চলে গেলে কৃষিকাজ করবে কে? ইংরেজরা রাজস্ব পাবে কার কাছ থেকে? যদি প্রজাই না থাকে, তাহলে রাজত্ব করা হবে কার ওপর? শেষমেষ ইংরেজরা এই ইস্যুটাকে থামিয়ে দিতে পেরেছিল ভারতবর্ষের বড় বড় মুসলমান ধর্মনেতা এবং মক্কার মুফতিদের কাছ থেকে ফতোয়া এনে। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' বইতে এইসব ফতোয়া হুবহু তুলে দেওয়া আছে।

মক্কার আইনশাস্ত্রবিশারদগণের সিদ্ধান্ত

(মুসলমানদের তিনটি প্রধান শাখার ধর্মীয় প্রধানগণ)

প্রশ্ন

'নিম্নোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার (আপনার মহত্ত্ব চিরঞ্জীব হোক) মতামত কী: খ্রিস্টানশাসিত ভারত, যেখানে শাসকশক্তি নিয়মিত পঞ্চদিন নামাজ, দুই ঈদের নামাজ প্রভৃতিসহ ইসলামের যাবতীয় বিধিসমূহ প্রতিপালনে বাধা দেয় না; অথচ ইসলামের কতিপয় বিধান লংঘন করার অনুমতি দেয়, যেমন, মুসলমান পিতার ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের পরেও মুসলমান পিতৃপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অনুমতি দেয়, এটা ভারত দারুল ইসলাম কি না? উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিন এবং তাহলে আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।'

AMARBOI.COM

জওয়াব-১

'সকল প্রশংসা শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টজগতের প্রভু। হে আল্লাহ, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন!

যতদিন ইসলামের নিজস্ব বিধি-বিধানের কিছুটা চালু থাকবে ততদিন এটা দারুল ইসলাম থাকবে।

আল্লাহ স্বয়ম্ভু, পবিত্র ও মহান:

এটা এমন এক ব্যক্তির 'নির্দেশ' যিনি সর্বশক্তিমানের গোপন মদদ আশা করেন, যিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন, এবং যিনি পয়গম্বরের শান্তি ও আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেন।

(স্বাক্ষর)

জামাল ইবনে আবদুল্লাহ শেখ ওমারুল হানাফি

মক্কার বর্তমান মুফতি(সম্মানীত)। আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর পিতাকে রহম করুন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জওয়াব–২

'সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি অদ্বিতীয়; এবং আমাদের ধর্মগুরু মুহাম্মদ(সাঃ) এর উপর, তাঁর আওলাদদের উপর, সাহাবিদের উপর এবং তাঁহার উম্মতগণের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!

হে আল্লাহ! সঠিক পথে চলার জন্য আমি আপনার মদদ-প্রার্থী।

হ্যাঁ, ইসলামের কিছু পরিমাণ বিধি-বিধান যতদিন প্রচলিত থাকবে ততদিন এটা দারুল ইসলাম।

আল্লাহ স্বয়ম্ভু, পবিত্র ও মহান। এমন এক ব্যক্তি এই জওয়াব লিখেছেন যনি করুণাময় আল্লাহর অনুগ্রহপ্রার্থী। আল্লাহ তাঁকে, তাঁর পিতা-মাতাকে, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও ভ্রাতাগণকে, বন্ধু-বান্ধবদেরকে, এবং সকল মুসলমানদের ক্ষমা করুন!

(স্বাক্ষর)

আহমদ ইবনে জৈনি দাহলান

মক্কার শাফেয়ী মজহাবের মুফতি (পরহেজগার)

জওয়াব–৩

'সকল প্রশংসা শুধু অদ্বিতীয় আল্লাহরই প্রাপ্য। হে সর্বশক্তিমান! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন!

দাসুকীর মতামতে উল্লেখ আছে যে, কোনো ইসলামি দেশ কাফেরদের করতলগত হওয়ামাত্রই দারুল হারব হয়ে যায় না; কেবলমাত্র ইসলামের সকল বা অধিকাংশ বিধি-বিধান নাকচ হলেই দেশটি দারুল হারব-এ পর্যবসিত হবে।

আল্লাহ স্বয়ম্ভু! আমাদের ধর্মগুরু হজরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর উপর, তাঁর আওলাদবৃন্দ ও সাহাবিদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!

(স্বাক্ষর)

হোসেন-বিন-ইব্রাহিম

মক্কার মালেকি মজহাবের মুফতি (মশহুর)

উত্তর ভারতের মুসলিম আইনশাস্ত্রবিশারদগণের সিদ্ধান্ত

ভাগলপুরের কমিশনারের ব্যক্তিগত সচিব সাঈদ আমীর হুসেন কর্তৃক প্রশ্নটি ভাষান্তরিত হয়েছে।

নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে আপনারা যাঁরা বিজ্ঞ ও ইসলামি বিধি-বিধানের অনুসারী তাঁরা মতামত দিন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ভারত আগে মুসলমান শাসকের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু বর্তমানে খ্রিস্টান সরকারের শাসনাধীনে রয়েছে; এবং যেখানে খ্রিস্টান শাসক মুসলমান প্রজাগণকে তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রতিপালনে, যেমন, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, শুক্রবারের নামাজ ও জামাত আদায় করতে কোনোভাবেই বাধা দেয় না, এবং উপরোক্ত বিষয়সমূহ চর্চা করতে সমান রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করেছে; এবং যেখানে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো শক্তি ও উপায়-উপকরণ মুসলমান প্রজাদের নেই, এবং যেখানে যুদ্ধ বাধলে মুসলমানদের পরাজয়বরণ ও ইসলামের অবমাননার আশংকা রয়েছে– সেই ভারতে জিহাদ আইনসঙ্গত কি না?

অনুগ্রহপূর্বক প্রামাণ্য দলিল উল্লেখ করে জওয়াব দিবেন।

ফতোয়া তাং ১৭ই রবিউস সানী, ১২৮৭ হিজরি মোতাবেক ১৭ই জুলাই, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ:

এখানে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা নিয়েছে, এবং যেখানে মুসলমানদের রক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে জিহাদ চলতে পারে না। কারণ মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে রক্ষাকবচ ও স্বাধীনতা না থাকলেই শুধু ধর্মযুদ্ধের উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু অনুরূপ অবস্থা এখানে বিদ্যমান নেই। এতদ্ব্যতীত এখানে মুসলমানদের বিজয় ও গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। এ কারণে এখানে জিহাদ আইনসিদ্ধ নয়।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মৌলবীগণ এখানে 'মানহাজ উল গাফফার' ও 'ফতোয়া-এ-আলমগীরী' থেকে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি পেশ করেন।

(স্বাক্ষর)
মৌলবী আলী মুহাম্মদ (লক্ষ্ণৌ)
মৌলবী আব্দুল হাই (লক্ষ্ণৌ)
মৌলবী ফজলুল্লাহ (লক্ষ্ণৌ)
মৌলবী মুহাম্মদ নাইম (লক্ষ্ণৌ)
সিলমোহর
মৌলবী রহমতউল্লাহ (লক্ষ্ণৌ)
মৌলবী কুতুব-উদ্দীন (দিল্লী)
মৌলবী লুতফুল্লাহ (রামপুর) এবং অন্যান্য।

ভারতবর্ষ 'দারুল ইসলাম' এই ঘোষণা প্রচার করে মৌলবী কারামত আলীর মন্তব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশে জিহাদ করা আইনসঙ্গত কি না? প্রথম প্রশ্নটির সাথে সাথে দ্বিতীয় প্রশ্নটিরও সমাধান হয়ে গেছে। কারণ, দারুল ইসলামে কখনও জিহাদ আইনসঙ্গত হতে পারে না। এটা এত স্পষ্ট যে এর সমর্থনে কোনো যুক্তি প্রমাণ বা প্রামাণ্য দলিল পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না। এখন কোনো বিভ্রান্ত ব্যক্তি যদি হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ-ভারতের শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে সেই যুদ্ধকে 'বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করাই সঙ্গত হবে; এবং মুসলমানি আইনে বিদ্রোহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং একই কারণে অনুরূপ যুদ্ধ বেআইনি হবে। এবং কেউ যদি অনুরূপ যুদ্ধ শুরু করে তবে মুসলমান প্রজারা তাদের শাসককে সাহায্য করতে এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 'ফতোয়া-এ-আলমগীরী'- তে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।'

লক্ষণীয়, একই বই থেকে দুই দল মুসলমান ফতোয়াবাজ দুই ধরনের ফতোয়া দিচ্ছেন।

কাজেই যে কোনো বিষয়ে নিজের পক্ষে ফতোয়া চাইলে তা পাওয়া অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়।

AMARBOI.COM

সাঁইত্রিশ

আচ্ছা ইউসুফ, আমরা সত্যিসত্যি মুসলমান তো?

বাপ্পীর প্রশ্নে থমকে গেল ইউসুফ। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল– এই প্রশ্নের উত্তর দলগতভাবে বসে যুক্তি দিয়ে খুঁজে বের করা মুশকিল। শুধুমাত্র একাকি সৎভাবে নিজের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব।

আটত্রিশ

: আমি কি আল্লাহতে বিশ্বাস করি?

: হ্যাঁ করি!

: হজরত মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসুল হিসাবে স্বীকার করি? বিশ্বাস করি কোরআনে? অন্যসব আসমানি কিতাবকে? ফেরেস্তায়? পূর্ববর্তী নবীদেরকে?

: বিশ্বাস করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: আমি কি বিশ্বাস করি, মানুষকে তার কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে?

: করি।

: আমাদের দেশের মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে আমার কি খারাপ লাগে?

: খুবই খারাপ লাগে।

: মুসলমানদের মধ্যে ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কালোবাজারি, অনৈতিক কার্যকলাপ দেখে আমি কি ক্ষুব্ধ হই?

: হ্যাঁ।

: সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার ঘটনা কি আমাকে কষ্ট দেয়?

: খুবই কষ্ট দেয়।

: দুর্নীতিতে মুসলমান দেশগুলির শীর্ষস্থানে থাকার জন্য আমি কি অপমান বোধ করি?

: করি।

: ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে দেখলেই কি তাকে আমার মৌলবাদী মনে হয়?

: না। কখনোই না।

: ইসরায়েল যে প্যালেস্টাইনকে দখল করে রেখেছে তাতে কি আমি কষ্ট পাই?

: পাই।

: আমেরিকা যখন আফগানিস্তানকে দখল করে নেয়, ইরাককে দখল করে নেয়, তখন কি আমি ক্ষুব্ধ হই?

: খুব।

: সে কি এই কারণে যে আমি আমেরিকাকে ঘৃণা করি? না কি এই কারণে যে আমি মুসলমানদের অসহায়ত্ব এবং কষ্ট দেখে নিজেও কষ্ট পাই?

: দুই কারণেই।

: আমি কি বিশ্বাস করি যে কোনো ব্যক্তি যদি চায় তবে পরিপূর্ণভাবে ইসলামি নিয়মে জীবনযাপন করার স্বাধীনতা তার রয়েছে?

: অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সে অন্যের ওপর জোর করে তা চাপিয়ে দিতে পারবে না।

: অন্য কোনো অমুসলিম দেশে গেলে নিজেকে কি আমার বেশি করে মুসলমান মনে হয় না?

: হয়।

: নিজের মুসলমান পরিচয় নিয়ে আমি কি লজ্জিত হই?

: কখনও কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: তার জন্য কি আমার ইসলাম ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে?

: কখনোই না।

: ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে এমন কোনো ভুল কাজ কি আমি করি?

: মাঝে মাঝে করি।

: তার জন্য কি আমার মধ্যে অনুশোচনা জাগে না?

: মাঝে মাঝে খুবই অনুতপ্ত বোধ করি। তবে পরে আবার অনেক সময় সেই একই ভুল আবার করে ফেলি। তার জন্য নিজের ওপর খুব রাগ হয়।

: আমি কি কোনো হারাম অর্থ বা সম্পদ উপার্জন করেছি?

: না!

: আমি কি অন্য মুসলমানকে কখনও কাফের বলে গালি দিয়েছি?

: না।

: আমি কি মনে করি যে ইসলাম এই পরিবর্তিত পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবে?

: পারবে। তবে তার অনেক যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।

: আমি কি অন্য ধর্মের লোকদের নীচু চোখে দেখি?

: না।

: আমি কি মনে করি না যে মিথ্যে কথা বলা খারাপ?

: মনে করি।

: ভিক্ষাবৃত্তিকে কি খারাপ মনে করি?

: খুব খারাপ মনে করি।

: কোন পাপকে বড় মনে করি?

: একজন ব্যক্তি যদি এমন পাপ করে যা তার নিজের ছাড়া আর কারও কোনো ক্ষতির কারণ হয় না, তাহলে সেটাকে আমি গুরুত্ব দিতে চাই না। কিন্তু যখন দেশের নেতারা দেশের মানুষের স্বার্থ বিক্রি করে দেয় নিজের লাভের বিনিময়ে, যখন দেশের তেল-গ্যাস-কয়লা তুলে দেয় বহুজাতিক কোম্পানির হাতে, যখন বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর কাছে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, যখন সামরিক-বেসামরিক আমলারা ঘুষ খেয়ে দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তি করে, কোর্টে মানুষকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে, যখন ব্যবসায়ীরা যোগসাজস করে জিনিসের দাম মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যায়, তখন সেইসব লোকের মুখে ইসলামের কথা শুনতে আমার ঘৃণা হয়। মনে হয়, এই লোকেরা যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তাহলে অমুসলিমরা সত্যিসত্যিই ভালো মানুষ। আমাদের দেশের কোনো মন্ত্রী-আমলা-পুলিশ অফিসার-বড় ব্যবসায়ী মরে গেলে তার জন্য আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোয়া করতে ইচ্ছা হয় না। বরং মনে হয়, এইসব খারাপ লোকেরা যদি পরকালেও সাজা না পায়, তাহলে আল্লাহর ধর্ম মিথ্যে হয়ে যাবে।

: আমার কি মনে হয় যে মুসলমান ছাড়া আর কোনো ভালো লোক থাকতে পারে না?

: তা কখনোই মনে হয় না। কারণ আমি মুসলমান ছাড়াও অনেক ভালো মানুষ দেখেছি। আবার মুসলমানদের মধ্যেও অনেক খারাপ মানুষ দেখেছি।

: তার জন্য কি আমি ইসলাম বা ইসলামের শিক্ষাকে দায়ী মনে করি?

: না।

: কেউ যদি আমাকে কোটি কোটি টাকা অথবা ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ইসলাম ত্যাগ করার কথা বলে, আমি কি তাতে রাজি হবো?

: না না না!

নিজের কাছে একান্ত সৎভাবে উত্তর দিয়ে মনের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করে ইউসুফ। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে– আমি মুসলমান! আমি নিশ্চিতই মুসলমান। এ ব্যাপারে কারও ফতোয়ার কোনো দরকার নেই আমার!

রাতে অপূর্ব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখল ইউসুফ।

নির্জন বনপথে জীর্ণ একটা মসজিদ। তার ছাদ বেয়ে নেমেছে বট-পাকুরের ঝুড়ি, দেয়ালজুড়ে শ্যাওলা, বোঝাই যায় ছাদ এবং কড়ি-বরগার অবস্থা খুবই খারাপ। তবে দরজাটা খুবই মজবুত। কিন্তু দরজার দিকে এগুতেই তার পথ আগলে দাঁড়াল কয়েকজন মানুষ। তারা জানাল– এই মসজিদে ঢোকা নিষেধ!

কেন?

তা জানি না। কিন্তু রাসুলের জামানার পর থেকে এই মসজিদের দরজা বন্ধ। কেউ ঢুকতে পারে না এই মসজিদে।

কিন্তু আমি ঢুকবই।

না, ঢুকতে পারবেন না।

তাদের আপত্তিতে পাত্তা দিল না ইউসুফ। এগিয়ে গেল মসজিদের দরজার দিকে। লোকগুলোও কেন কে জানে, আর বাধা দিল না ইউসুফকে। এই মসজিদে কতদিন সূর্যের আলো ঢোকেনি! ভাবতে ভাবতে শক্ত কাঠের পাল্লায় ঠ্যালা দিল ইউসুফ। মসৃণভাবে খুলে গেল মসজিদের দরজা। আর কী আশ্চর্য! বাইরের সূর্যের আলো দরকারই হলো না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের ভেতর থেকেই এক অপার্থিব আলো ছিট্‌কে এসে উজ্জ্বল করে তুলল পুরো বনভূমি এবং পরিত্যক্ত জনপদটিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোকাবিলাপর্ব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাউন ট্রেনটি ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে চলে যাওয়ার পরে রেললাইনের ওপারে আগুন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিমুল গাছগুলি দৃশ্যমান হয়। তাদের পাশ দিয়ে শহরের বর্জ্য নিয়ে বয়ে যাওয়া খালটি শিমুল গাছগুলির দিকে ছোটে পরিশুদ্ধ হতে। ট্রেনের পেছনে লোহার হাতল ধরে ঝুলে থাকা দু'টি প্রাক-তরুণ তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিল। হাত নাড়ানো দুই তরুণ, ট্রেনটিসহ, ছোট হতে হতে উত্তর দিকে মিলিয়ে যাওয়ার সময় শব্দ ওঠে– কুউউ...। শব্দটি ট্রেনের হুইসেলের নাকি শিমুল গাছগুলিতে বসে থাকা কোকিলের ঠোঁট চিরে বেরুনো, তা আলাদা করে বোঝা যায় না। আবিষ্ট কণ্ঠে ইউসুফের জিজ্ঞাসা– কী সুন্দর নাহ...! শুনেও উপমার ঘোর তো কাটেই না, বরং ভালোলাগার বোধ আরও বেড়ে যায়। তার বুক ঢিব ঢিব করে। ইউসুফ, যে তার চোখে প্রায় কখনোই সরাসরি তাকায় না, উপমা খেয়াল করেছে, কোনো মেয়ের দিকেই কখনও সরাসরি তাকায় না, অভ্যাসবশত এখনও সে তাকিয়ে নেই উপমার দিকে। তার চোখ এখনও দিগন্তের দিকেই। কিন্তু দিগন্তও তো কোনো কোনো সময় আয়না হয়ে যেতে পারে। হয়েছেও তাই। উপমাও বোঝে।

ফাল্গুনের বাতাস দেড়ফুটি ধানচারাগুলিকে মাটিতে নুইয়ে ফেলে ছুটে আসে তাদের দিকে কিছু শুকনো ঝরাপাতা সমেত। উপমা নৈঃশব্দ ভাঙে। ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বলে– মাথার চুলে পাতা!

ইউসুফ নিজের চুলে হাত বোলায়। একটা উড়ে আসা শুকনো পাতা চুলের ফাঁদ থেকে খসিয়ে তাকায় উপমার চুলের দিকে। তারপরে চোখের দিকে। উপমার চোখে আমন্ত্রণের স্মিত হাসি।

অবশেষে ইউসুফের হাত অগ্রসর হতে পারে। অধীর অপেক্ষায় নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে উপমা। মনে হয় অশেষ প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ পেরিয়ে ইউসুফের কাঁপা কাঁপা হাত অবশেষে স্থিত হয় উপমার চুলে। আর উপমার সমস্ত অন্তর ভূমিকম্পের মতো কেঁপে কেঁপে প্রচণ্ড খুশিতে বান-ডাকা নদীর মতো কেঁপে ওঠে কলকলিয়ে। ইউসুফের হাত তার মাথা থেকে সরে যাওয়ার আগেই উপমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুইহাতে ধরে নেয় সেটিকে। মাথা থেকে নামিয়ে এনে চেপে ধরে নিজের দুই চোখের ওপর। ফুঁপিয়ে উঠে বলে– তুমি আমাকে এত জন্ম অপেক্ষা করালে কেন?

এই মুহূর্তে চোখ খুলতে ইচ্ছা হয় না ইউসুফের। ঘুম ভেঙ্গে গেছে। জানে সে স্বপ্নই দেখছিল। কিন্তু তবু মনে হয়, হোক না স্বপ্ন, যেমনটা চলছে চলুক আরও কিছুক্ষণ; আরও অনেকক্ষণ। এই স্বপ্নটা যতবার দেখে ততবারই তার একই অবস্থা হয়। মনে হয় পাশে দাঁড়িয়ে আছে উপমা। এখনই তার কপালে বা গালে রাখবে শীতল আরামের স্পর্শমাখা হাত। বলবে– চোখ খোলো, আর কত ঘুমাবে! এদিকে আমি কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে... তোমার ঘুমভাঙ্গার অপেক্ষা করতে করতে আমি যে...

উপমা এখন বোধহয় কোলকাতায়। কিংবা হয়তো নদীয়ায়, কিংবা শিলিগুড়িতে, কিংবা কৃষ্ণনগরে, কিংবা বিশাল ভারতবর্ষের কোনো এক কোণে। তবে কোলকাতায় থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কোলকাতা আর কত দূর! সকাল সাতটায় এই শহর থেকে রওনা দিলে দুপুরে শেয়ালদার আমজাদিয়া হোটেলে ভাত খাওয়া যায়। কিন্তু সেই কাছের পথ এখন এতই দূরে! পাসপোর্টের দূরত্ব, ভিসার দূরত্ব, ভিন্নরাষ্ট্রের সীমানার দূরত্ব। এইসব যে কোনো একটা দূরত্বই হাজার হাজার কিলোমিটারের চাইতে বেশি ব্যবধান তৈরি করে দিতে পারে। তা জানে বলেই তো উপমার বাবা-মা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। ইউসুফের বাড়ানো হৃদয় সেখানে আঁচ যোগাতে পারবে না উপমার মনে। সেখানে কি উপমার সংসার আছে? সেখানে কি কেউ তাকে ইউসুফের চাইতেও বেশি ভালোবাসা দেয়? সেখানে কি উপমা কাউকে সেই রকম ভালোবেসে কষ্ট পায় যেমনটি ইউসুফকে নিয়ে? সেখানে কি উপমা কোনো নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে না? সেখানে কি এমন কিছু আছে, এমন কেউ আছে, যা বা যে ইউসুফের ভালোবাসার চাইতেও বেশি নির্ভরযোগ্য?

কেন যাবে?

প্রশ্ন করতেও সাহস পায়নি ইউসুফ।

যদি উত্তর আসে– তোমার কী অধিকার আছে আমাকে এখানে থাকতে বলার? তুমি কি সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী ঠেকাতে পেরেছ? পেরেছ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বানানো ঠেকাতে? অন্য ধর্মের মানুষদের যে অপ্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে ফেলা হলো, তা কি ঠেকাতে পেরেছ? পেরেছ বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় এখানকার হিন্দু বাড়িগুলিতে আগুন দেওয়া ঠেকাতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব প্রশ্ন যদি উপমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তখন নিজের মুখ কোথায় লুকাবে ইউসুফ! সে তাই শুধু জিজ্ঞেস করে– আমি যদি তোমার সাথে, মানে তোমাদের পরিবারের সাথে ইন্ডিয়াতে চলে যাই?

না!

উপমার মুখে একেবারে পাথুরে কাঠিণ্য। ইউসুফ জানে এই না-কে হ্যাঁ করা যাবে না, তবু জিজ্ঞেস করে– কেন?

কারণ আমি চাই না সংখ্যালঘু হওয়ার কষ্ট, সংখ্যালঘু হওয়ার অপমান, তোমাকে সইতে হোক।

সেই কষ্টের চাইতে কি ভালোবাসা ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট বেশি নয়?

বিরহে একসময় মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। অপমানে অভ্যস্ত হতে পারে না।

এত নির্মম মনে হচ্ছিল উপমাকে তখন! কিন্তু ইউসুফ বোঝে উপমার এই নির্মমতা আসলে তার নিজের ওপরেই। নিজের সমস্ত সর্বনাশের প্রতি আর ভ্রূক্ষেপমাত্র করার ইচ্ছাও তখন আর উপমার অবশিষ্ট নেই। সে যে ভেতরে-বাহিরে, মনে-মননে, জীবনযাপনের অতীতে-ভবিষ্যতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তাতেও তার যেন কিছু আসে-যায় না। ইউসুফ বোঝে, এরপর উপমা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে সুখ কিংবা ভালোবাসার কথা আর মনেও আনবে না। কেউ নিঃস্বার্থভাবে তাকে নতুন জীবন দিতে চাইলেও সে নেবে না। বেঁচে থাকার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা উপমা এখন যতদিন জীবনধারণ করবে, বেঁচে থাকবে শুধুমাত্র জৈবিক অর্থেই। কত মানুষ যে এইভাবে হৃদয়ে-মনে মরে গিয়ে শুধুমাত্র জৈবিকতার গ্লানি বয়ে চলেছে!

নিউ ইয়র্কের বাংলা রেস্তোরায় সারাদিন কাজ করেন হরিপদ দত্ত। রাতে তার শোবার জায়গা মালিকের ছেলের ঘরেই। ছেলেটা বিছানায় ঘুমায়, আর মেঝেতে হরিপদ দত্ত। আদিতে নোয়াখালির ছেলে। বাপ ছিল চট্টগ্রামে সাম্পানের মাঝি। নিউ ইয়র্কে পাড়ি দিয়ে এখন পুরো একটা বাঙালি কারি রেস্টুরেন্টের গর্বিত মালিক। রাতে ঘুমানোর আগে ছেলেটা টুকটাক কথা বলে হরিপদ দত্ত-র সাথে। অশিক্ষিত ছেলেটা এটুকু অন্তত বোঝে, যে সমস্ত লোক ভাগ্যের সন্ধানে স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় পাড়ি জমায়, হরিপদ দত্ত ঠিক তাদের মতো নন। ছেলেটা জিজ্ঞেস করে– কাকা আন্নে কি ম্যাট্রিক হাশ কচ্ছেন?

হ্যাঁ। আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি।

আঁর এক বোনাই আছে। হেইতেও ম্যাট্রিক হাশ কচ্ছে। আঁরগে মইদ্যে হেইতে খুব শিকখিত। আঁর সেই বইনের কপালডা কত ভালা। হেইতে একখান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্‌খিত্‌ হোয়ামি পাইছে। তা কাহা, আন্নে আর কিছু পচ্ছেন নাহি? আন্নে কি আইএ পাশ হচ্ছেন?

সংক্ষেপ উত্তর আসে হরিপদ দত্ত-র কাছ থেকে– হ্যাঁ। আমি আইএ-ও পাশ করেছি।

হরিপদ দত্ত একাই এতটা বিদ্বান তা মেনে নিতে একটু যেন সংকোচ হয় ছেলেটার। সে অন্তত নিজের এলাকার মান রাখতে চায়– আঁরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ব্যাডা আছে, হেইতে আইএ পাশ। উসরে, ব্যাডা একখান!

কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে দুই কলি সাম্পানের গান ভাঁজে ছেলেটা। তারপর হঠাৎ করেই যেন কথার কথা বলছে এমনভাবে জিজ্ঞেস করে– ও কাহা, আন্নে কি বিএ পাশ কচ্ছেন নি?

হ্যাঁ। আমি বিএ-ও পাশ করেছি।

এবার শোয়া থেকে বিছানায় সটান উঠে পড়ে ছেলেটা। অবাক চোখ মেলে দেখতে থাকে হরিপদ দত্তকে। তার ভাবান্তর খেয়াল করে হরিপদ দত্ত তাকান সেদিকে। ছেলেটা বিছানায় বসে আছে দেখে জিজ্ঞেস করেন– কী হলো তোমার?

না কিছু হয় নাই। ছেলেটা মাথা নাড়ে। তারপর জিজ্ঞেস করে– কাহা, আর কুনো পড়া আছে নি? বিএ-র পরে আর কুনো আছে নি?

আছে। এরপরে অনেক ডিগ্রি মানে অনেক পাশ আছে। এমএ আছে, এমফিল আছে, পিএইচডি আছে।

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ছেলেটা। বলল– আন্নে...

ক্লান্তকণ্ঠে বললেন হরিপদ দত্ত– হ্যাঁ আমি এমএ-ও পাশ করেছি।

ছেলেটার প্রতিক্রিয়া হলো বিস্ময়কর। তীব্র ভর্ৎসনার সুরে সে বলল– এমএ হাশ দিয়া আন্নে এইহানে আইছেন কিল্লাই? আন্নেরে কি ভূতে হোন্দাইছিল!

ভূত নয়, দাঙ্গা।

রাষ্ট্রের পোষকতায় গড়ে তোলা দাঙ্গা। চোখ বন্ধ করলেই স্ত্রী-র তীব্র কণ্ঠ কানের পর্দায় বেজে ওঠে– উনিশ দিন! উনিশটা দিন আর রাত আমাকে এই ছোট্ট ছেলে আর মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়েছে। দরজায় কখনও ধাক্কা পড়ছে, কখনও ছাদে এসে পড়ছে আস্ত থান ইট। মহল্লার কয়েকটা হিন্দু বাড়িতে আগুন জ্বলছে। যে দেশে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার শেষ চেষ্টা হিসাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় সেই মাটিতে আমি আর কোনোদিন পা রাখতে চাই না। তুমি থাকলে থেকে যাও। তোমার দেশপ্রেম নিয়ে থাকো, তোমার অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটানোর জন্য থাকো! আমি সামান্য নারী। আমি শুধু আমার ছেলে-মেয়ের কথাই ভাবতে চাই। তাদের দিতে চাই শঙ্কাহীন দিন-রাত্রি, নিরাপত্তার জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী ছেলে-মেয়ে দু'টোকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে; আর হরিপদ দত্ত স্কুলের চাকরি ছেড়ে, স্কুলের কচিমুখগুলিকে দূরে রেখে এখন আমেরিকায়। বাংলাদেশের প্রধান কথাসাহিত্যিক হওয়ার পথে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া হরিপদ দত্ত এখন দেশ ছেড়ে আমেরিকার রেস্তোরায় কাপ-ডিশ ধুয়ে, রেস্তোরার মেঝে ঝাঁট দিয়ে, রাস্তায় রাস্তায় পর্ণো পত্রিকা ফেরি করে, ছুটির দিনে মানুষের বাড়িতে কামলা দিয়ে ডলার জমাচ্ছেন যাতে পশ্চিবঙ্গের কোনো এক কোণে তার পরিবারের থাকার জন্য একটু জায়গা করে দেওয়া যায়। এই টাকাটা যোগার হলেই হরিপদ দত্ত ফিরে যাবেন ঢাকায়। হ্যাঁ ঢাকাতেই। আর কোথাও নয়।

অন্যদিকে হিন্দু হয়ে জন্ম নেওয়াটাই যতীন সরকারের কাছে মনে হয়েছে 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ!' না। হিন্দু হিসাবে অত্যাচারিত হওয়ার কারণে তিনি এই কথা বলেন না। যদিও সেই অত্যাচার তাঁর ও তার পরিবারের ওপর যথেষ্টই হয়েছে ১৯৭১ সালে। স্ত্রী কানন সরকারকে মুসলমান হতে হয়েছে, রোজা রাখতে হয়েছে রোজার মাসে। কিন্তু তা নিয়ে যতীন সরকারের কোনো আক্ষেপ নেই। দেশের স্বাধীনতার জন্য সব বাঙালিকেই কিছু না কিছু মূল্য দিতে হয়েছে। কানন সরকার এবং যতীন সরকার একাত্তরে তাঁদের অত্যাচারিত হওয়াটাকে এইভাবেই গ্রহণ করেছেন। গ্রহণ করতে পেরেছেন বলেই যতীন সরকারের মতো কথায় কথায় প্রাণখোলা অট্টহাসি হেসে উঠতে পারার মতো বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে একজনও নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মে জন্ম নেওয়ার কারণে মুসলমানদের সংস্কার বা ভুল ধরিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার তাঁর এই দেশে নেই। ইসলাম ধর্মের মূল প্রবণতা যে মানবিকতা, সেই গুণটিকে যতীন সরকারের মতো আর কেউ শনাক্ত করতে পারেনি। কিন্তু ইসলাম নিয়ে কোনো মন্তব্য করার অধিকার তাঁর নেই। অন্তত এই দেশে নেই। কারণ তিনি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছেন।

এমন তালিকা তৈরি করতে গেলে তা শেষ হবে না। দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অনিঃশেষ বাড়তে থাকবে। নিজেকে কি একটি সাম্প্রদায়িক দেশের অধিবাসী হিসাবে ভাববে ইউসুফ? ভারত-ভাগের পাশাপাশি যে বাংলাকেও ভাগ করা হলো, তার জন্য তো একচেটিয়াভাবে দায়ী করা হয় পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের। তাদের একচেটিয়া ভোটেই নাকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। কথাটা অবশ্যই সত্য। পাকিস্তানকে ঘিরে কত স্বপ্নই না দেখেছিল পূর্ববঙ্গের গরীব মুসলমান কৃষক। এমনকি তেভাগার আন্দোলন করতে গেলেও বামপন্থীরা সাড়া পায়নি তখন। কৃষকদের সার কথা– পাকিস্তান হলে তেভাগার দরকারই পড়বে না। পাকিস্তান হবে পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ। তখন তেভাগা কেন, কৃষক চৌভাগা পর্যন্ত পেয়ে যাবে।

পূর্ববঙ্গের কৃষকের এই স্বপ্ন কি সাম্প্রদায়িকতা ছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস যিনি জানেন, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এটা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ছিল নিজের মতো করে বাঁচতে চাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পাওয়া আশ্বাসের প্রেক্ষিতে নিজেকে সেই পাকিস্তান আন্দোলনে সঁপে দেওয়া। সাম্প্রদায়িকতার বিষের ছোঁয়ায় নিজের প্রেম-হারানো ইউসুফ উত্তর খোঁজে।

বাঙালি মুসলমানকে সেই পাকিস্তান আন্দোলনই বা করতে হলো কেন?

দুই

আমাদের ভূখণ্ডে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত কাদের হাতে? হিন্দু না মুসলমান?

বাপ্পী একটু ভেবে উত্তর দেয়– ঐভাবে বলা কঠিন। দিনক্ষণ দিয়ে তো আর সাম্প্রদায়িকতার কিংবা মৌলবাদের শুরু হয়নি। একটা বিষাক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এগুতে এগুতে আমরা পড়েছি এই চক্রের মাঝখানে। কিছুতেই আর উত্তরণ সম্ভব হচ্ছে না তা থেকে।

মোটাবাবু স্ট্রেটকাট বলে– কীভাবে শুরু তা খোঁজাখুজির দরকার কী? দেখতে হবে এই দেশভাগ থেকে সবচেয়ে লাভবান কারা। এ থেকে সবচেয়ে লাভবান তো এইদিকে জিন্নাহ আর ঐদিকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলরা। আমাদের নিজেদের সমালোচনা করতে গেলে আগে আনতে হবে জিন্নাহর কথাই। ব্যাটা নিজে কোনোদিন এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েনি, রোজা রাখেনি, সাম্প্রদায়িকতার ধোঁয়া তুলে হয়ে গেল মুসলমানদের পাকিস্তানের কায়েদে আজম। জাতির জনক!

জিন্নাহ নামাজ পড়েছেন কি না, বা রোজা রেখেছেন কি না, তা আমরা জানব কীভাবে? এই বিষয়ে তো কোনো বিবরণ লেখা নেই তার নিজের ডায়েরিতে। কেউ রোজা রাখছে কি না বা নামাজ পড়ছে কি না, তা তো আরেকজনের সাক্ষী নিয়ে বলা ঠিক নয়।

তা ঠিক। কিন্তু বাছা তুমি কি ভুলে গেছো যে ব্রিটিশরা সাতচল্লিশের আগস্ট মাসে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হবে ঘোষণা দেওয়ার পরে জিন্নাহ এই উপলক্ষকে সেলিব্রেট করার জন্য তার বাড়িতে দুপুরের ভোজের আয়োজন করেছিল। বেচারা জানতই না যে তখন ছিল রমজান মাস!

হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

স্বপন বলল– কিন্তু মনে রাখতে হবে দেশভাগের কারণে জিন্নাহর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বেশ খানিকটা।

সেটা কেমন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্নাহর জন্ম করাচিতে হলেও কর্মজীবন পুরোটাই কেটেছে বোম্বে। মানে এখনকার মুম্বাইতে। সেখানে বেচারা খুব সখ করে শ্বেতপাথরের বাড়ি বানিয়েছিল। বাড়ি বানিয়েছিল দিল্লীতেও। দুই বাড়িই ছিল তার খুব প্রিয়। এমনকি শত ব্যস্ততার মধ্যেও বাড়ি তৈরির সময় নিজে মাঝে মাঝে কাজের তদারকি করেছে জিন্নাহ। সেই বাড়ি ছেড়ে তাকে হিজরত করতে হয়েছে পাকিস্তানে। কাজেই রিফ্যুজির বেদনা একটু হলেও ভোগ করতে হয়েছে তাকে।

আচ্ছা ইন্ডিয়ার সরকার কি জিন্নাহর বাড়িকে শত্রুসম্পত্তি করেছিল?

তা তো জানি না।

ইউসুফ আবার মূল আলোচনায় ফিরে এলো– তাহলে কি আমরা ধরেই নিচ্ছি যে আমাদের উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার শুরু জিন্নাহ-নেহেরুদের সময় থেকেই?

এই প্রশ্নে একটু অস্বস্তি নেমে আসে আড্ডায়। স্বপন বলে– এইভাবে বোধহয় নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। কারণ ইতিহাস যেটুকু পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় ব্যক্তিগত জীবনে নেহেরু এবং জিন্নাহ দু'জনেই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। আর জিন্নাহর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের আচরণের প্রায় কোনো জায়গাই যে ছিল না তা তো বোঝাই যায় রোজার দিনে মানুষকে দুপুরে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়াতে।

তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত এদের হাতে নয়। বরং অনেক আগে থেকেই।

তা তো বটেই।

সেইসঙ্গে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক চিন্তা বা বিবাদের সূচনা হিন্দুর দ্বারা নয়। মুসলমানের দ্বারা তো নয়ই। দুই ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা প্রথম ঢুকিয়েছে ইংরেজরা।

আর সেটিকে প্রথম ধারণ ও লালন-পালন করেছে হিন্দুরাই।

আড্ডার হিন্দু সদস্য ধীমানের সোজাসুজি ঘোষণা।

একটু ইতস্তত করে সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ইউসুফ– আমারও তাই ধারণা।

তিন

উনিশ শতকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণীর সদস্য ছিল কারা?

সুরজিৎ দাসগুপ্ত খুব সংক্ষেপে তাদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। তারা হলো:

অর্থনৈতিক বিচারে– মধ্যবিত্ত

রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে– ইংরেজদের সহযোগী

সাংস্কৃতিক বিচারে– পাশ্চাত্য শিক্ষা, মূলত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক বিচারে– বাবু সম্প্রদায়
ভাষা বিচারে– বাঙালি
ধর্মীয় বিচারে– হিন্দু।

তাই এদের হাতে যে জাতীয়তার বিকাশ, তা আসলে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ।

আমরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে ব্রিটিশ রাজশক্তির ভূমিকার কথা জানি। কিন্তু ইংরেজ পণ্ডিতশ্রেণী যে এই ক্ষেত্রে বিশাল এক প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে, তা জানার জন্য আমরা মেকওলের বহুকথিত উক্তিটি ছাড়া অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই না। আসলে হিন্দু-ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে ইংরেজ পণ্ডিতদের 'ইন্ডিয়ানোলজি' বা 'ভারততত্ত্ব'। ১৮৬১ সালে আলেকজান্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খনন-কাজের ফলে উঠে আসতে থাকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস। সেইসাথে শুরু হয় ম্যাক্সমুলার, উইলসন ও ফার্গুসনের ভারতবিদ্যামূলক গবেষণা 'ভারততত্ত্ব'। এই পণ্ডিতরা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অতুলনীয় মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধি তুলে ধরতে থাকেন। আর সেটিকে সর্বাংশে হিন্দু ঐতিহ্য বলে দাবি করতে থাকে এদেশের হিন্দুসমাজ। যদিও সবাই জানে যে প্রাচীন ভারতে হিন্দু নামের কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল না। হিন্দু শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে গ্রীকরা, যারা সিন্ধুতীরের সকল অধিবাসীকেই হিন্দু নামে আখ্যায়িত করত। কাজেই আজকের আধুনিক হিন্দু ধর্ম যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র উত্তরাধিকারি নয়, সেকথা সকলেই বুঝলেও সেদিনকার উঠতি হিন্দু সমাজ তা মানতে রাজি হয়নি। সাত শো বছর ধরে মুসলমান-অধিকৃত এবং উনবিংশ শতকে ব্রিটিশের শিক্ষায় ও শক্তিতে অভিভূত, নিজেদের দুর্দশায় হীনম্মত্যতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হিন্দু সম্প্রদায় হঠাৎ আবিষ্কার করল যে তারা এক সুবিশাল এবং মহান সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অধিকারী। যেহেতু তারাই তখন ব্রিটিশ-তোষণসূত্রে রাষ্ট্রে ও সমাজে অগ্রগামী, তাদের পক্ষে অন্যকে সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা অনেকটাই সহজ ছিল। নিজেদের হীনম্মন্যতা দূর করার কাজে তারা যতখানি ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে পারত, সেই ভাবে না লাগিয়ে তারা এটিকে প্রবাহিত করল সাম্প্রদায়িকতার খাতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম লিখিত রচনা রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা'। তিনি লিখলেন– 'আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্মের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। ...দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে, এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্ত্তি হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপণ করিতেছি।'

এরপরে মঞ্চে এলেন সর্বযুগের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি-প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যে বঙ্কিম একসময়ে লিখেছিলেন– 'যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলন্ডকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল তবে শাহজাঁহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দি-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?' সেই বঙ্কিমই রাজনারায়ণ-কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু-ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় শরিক হলেন– 'আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামেরও তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি এইরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। তাহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।'

এই রকম উৎকট জাতীয়তাবাদই সাম্প্রদায়িকতা ডেকে আনে। যেমন জাতীয়তাবাদই হচ্ছে নাৎসিজম এবং ফ্যাসিজমের উৎস।

প্রায় একই সময়ে সূত্রপাত ঘটে আর্যসমাজ আন্দোলনের। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এই আন্দোলনের সূচনাকারী ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। ১৮৬৩ সালের মধ্যেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে দয়ানন্দ সরস্বতীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। গুজরাত, রাজপুতানা এবং যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলের রাজা-জমিদাররা তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি বারবার পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে বৈদিক হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানাতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের মতো বহিরাগত ধর্ম যে সাফল্য অর্জন করেছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এইসব ধর্মের কোনো-না-কোনো একটি সর্বজনীন, অবশ্যমান্য এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। সুতরাং হিন্দু জীবনের অবক্ষয় রোধ করার জন্য অন্যান্য ধর্মের মতো হিন্দুধর্মেরও একটি সর্বজনীন, অবশ্যমান্য ও অভ্রান্ত শাস্ত্র প্রয়োজন। তাঁর দৃষ্টিতে বেদ হচ্ছে সেই সমাধান। এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তৎকালে প্রচলিত সায়নাচার্যের ভাষ্য প্রত্যাখ্যান করে নিজেই বেদের একটি ভাষ্য রচনা করেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাইতেন। প্রকৃতপক্ষে 'স্বরাজ' শব্দটির প্রথম প্রয়োগকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশেছিল তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। তাঁর অনুসারীরা প্রকাশ্যেই বলতেন যে, মুসলমান এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে হিসাব মিটিয়ে ফেলার দিনটির জন্য তারা দিন গুণছেন।

হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় জাতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মূর্ত হয়ে ওঠে হিন্দুধর্মের শুদ্ধি আন্দোলনে। যে সমস্ত হিন্দু কোনো-না-কোনো কারণে ধর্মত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের হিন্দু ধর্মীয় উদারতার প্রচ্ছদে শুদ্ধ করে আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়াই ছিল এই শুদ্ধি আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

বৈদিক যুগে হিন্দুরা গোমাংস আহার করত বলে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর 'সত্যার্থপ্রকাশ' গ্রন্থে হিন্দুদের গরুর মাংস খাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনিই 'গো-রক্ষিণী সভা' স্থাপন করলেন স্পষ্টতই মুসলমানদের আহারের আচার ও রুচিকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে। ১৮৯৩ সালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সংঘটিত হয়, তার পেছনে ছিল এই 'গো-রক্ষিণী সভা'র উস্কানি। অর্থাৎ গো-হত্যা বন্ধের জন্য মানব-হত্যার ঘটনা দিয়েই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অশুভ সূচনা।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে একসময় মনে করা হচ্ছিল হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত। এমনকি দিল্লীর জুমা মসজিদ থেকে শুক্রবারে তাঁর বাণী প্রচার পর্যন্ত করা হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আমূল পাল্টে যাওয়া এই সন্ন্যাসী উগ্র হিন্দু মৌলবাদের প্রবক্তাতে পরিণত হলেন। তিনি বেদের টীকাভাষ্য রচনার সময় 'দুর্বৃত্ত' শব্দটির ব্যাখ্যা করলেন 'অহিন্দু' শব্দের সমার্থক হিসাবে। এবং লিখলেন যে, হিন্দুধর্ম রক্ষার স্বার্থে অহিন্দুকে হত্যা করা সঙ্গত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতীর উগ্র ব্যাখ্যাকারী এবং উৎসাহী অনুসারী। তিনি ভারতীয় জাতি বলতে শুধুমাত্র হিন্দুকেই বুঝতেন। তিনি শিবাজীর সাম্রাজ্য পুনর্গঠনে ব্রতী হন এবং সর্বজনীন গণপতি পূজার প্রবর্তন করেন। উল্লেখ্য শিবাজী যে সমাজকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়– 'আচার-বিচারগত বিভেদ-বিচ্ছেদ সেই সমাজের একেবারে মূলের জিনিস' এবং শিবাজী যে তাঁর আট পত্নীর যে কোনো একজনের গোপনে প্রদত্ত বিষমিশ্রিত খাবার খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই বিষয়টি সামনে এনে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন যে শিবাজীর মারাঠা-সমাজের পতনের কারণই ছিল 'জাতিভেদের বিষ'। বালগঙ্গাধর তিলকের কাছে সেই সমাজই ছিল আকাঙ্ক্ষিত সমাজ। আর গণপতি পূজা একান্তই পৌরাণিক হিন্দু আচারসম্মত একটি অনুষ্ঠান। কোনো অহিন্দুর পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেকে তিলকের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ছিল অসম্ভব। অসম্ভব প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু তিলক সহবাস সম্মতি বিলের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। গো-রক্ষা সমিতি ছিল তার সকল সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ তো বটেই, মহারাষ্ট্রের উদারপন্থী হিন্দু নেতারা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় নিগৃহীত হয়েছেন তিলকের উগ্র অনুগামীদের দ্বারা।

আর একটি রহস্যময় প্রতিষ্ঠান ছিল 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে তখন তাঁরা যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই বোঝাতেন এবং বুঝতেন, সেই চিন্তায় আধ্যাত্মিক সমর্থন যুগিয়েছিল এই সোসাইটি। ১৮৭৫ সালে মাদাম ব্লাভাটিস্কি এবং কর্নেল অলকট আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই সোসাইটি। অ্যানি বেসান্ত নামীয় একজন ব্রিটিশ রমণী এটিকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। তার কর্মক্ষেত্র ছিল মূলত মাদ্রাজ। অ্যানি বেসান্ত এই সমিতিকে কাজে লাগান ভারতের প্রাচীন উদ্দেশ্য ও প্রাণশক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করার মহান(!) উদ্দেশ্যে। বিধবা বিবাহের বিরোধী, অবস্থাবিশেষে পুরুষের বহুবিবাহের সমর্থক, হিন্দুধর্মের অলৌকিক রহস্যবাদের প্রচারক অ্যানি বেসান্ত বারণসিতে স্থাপন করেন হিন্দু কেন্দ্রিয় বিদ্যালয়। এটিই পরবর্তীতে পরিণত হয় বারাণসি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি একান্ত রূপে বিশ্বাস করতেন যে আধ্যাত্মিকতাই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃত অন্তঃসার, আর হিন্দুধর্ম হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত ধারক। এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে হিন্দুধর্ম। এই বিদেশিনীর বচন, রচনা, এবং কার্যক্রম থেকে উগ্র হিন্দু মৌলবাদীরা পর্যাপ্ত উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেছে।

যে জিন্নাহকে দ্বিজাতি তত্ত্বের স্রষ্টা বলে আমরা সবচাইতে বেশি ঘৃণা করি, ইতিহাসের পুনর্পঠন আমাদের জানাচ্ছে যে জিন্নাহ একাই এজন্য দায়ী নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসল ঘটনা হচ্ছে, জিন্নাহর মাথায় দ্বিজাতি তত্ত্বের চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন হিন্দু নেতারাই। জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা উচ্চারণ করার অনেক আগে থেকেই অবাঙালি হিন্দু নেতারা এই বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন, জনসভায় বক্তৃতা করেছেন এবং পত্রিকায় এ সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর অন্যতম ভাবশিষ্য লালা রাজপত রায় ছিলেন এ ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রণী। তিনি ১৯২৪ সালেই লাহোর থেকে প্রকাশিত 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধে লেখেন যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে ভারত-বিভাগই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার একমাত্র সমাধান। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, মুসলমানদের চারটি রাজ্য বা অঞ্চল দিয়ে দেওয়া হোক। একটি হচ্ছে, উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারে পাঠান অঞ্চল; দ্বিতীয়টি, পশ্চিম পাঞ্জাব; তৃতীয়টি, সিন্ধু; এবং চতুর্থটি হচ্ছে পূর্ববঙ্গ।

প্রকৃতপক্ষে মাইকেল এডওয়ার্ডস-এর এই বক্তব্যই সঠিক যে, লালা রাজপত রায় এবং বালগঙ্গাধর তিলকই প্রথম ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োগ শুরু করেন। পরবর্তীতে জিন্নাহ তা ধার করেছেন।

জিন্নাহ কিন্তু ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলনে বলেছিলেন যে আমরা হিন্দু-মুসলমান-শিখ-বৌদ্ধ সবাই এই মাটির সন্তান। আমাদের একসঙ্গেই বাস করতে হবে। তিনি জোরে-শোরে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে ভারতীয়, তারপরে মুসলমান। কিন্তু ঐ সম্মেলনেই একসঙ্গে একদেশে বসবাসের তাঁর বিরোধিতা করলেন এম.আর.জয়কার।

জিন্নাহ প্রথমে কংগ্রেসেরই নেতা ছিলেন। গোখলে তাঁকে বলতেন 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত'।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হলেও সেই প্রক্রিয়ার সাথে জিন্নাহর বিন্দুমাত্র সংযোগ ছিল না। তিনি গান্ধীর সাথে মনোমালিন্যের কারণে লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। রাজনীতির কথা মন থেকে মুছে ফেলে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন ব্যারিস্টারিতে। কিন্তু তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল মুসলীম লীগ। সেই ঘটনারও রয়েছে এক ব্যাপক পটভূমি।

অসহযোগ আন্দোলনের কারণে হিন্দু মহাসভা তখনকার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে এগুতে পারছিল না। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের উন্মাদনা থিতিয়ে আসার সাথে সাথে সক্রিয় হয়ে উঠলেন হিন্দু মহাসভার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ১৯২৩ সালে– এক বছরেই হিন্দু মহাসভার পর পর দুইটি অধিবেশন বসল গয়ায় এবং বারাণসিতে। ১৯২৪ সালে অধিবেশন বসল বেলগাঁও-তে। এই দুই বছর দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকোপ চরমে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে মুষড়ে পড়া গান্ধী তখন রাজনীতির সামনের সারিতে নেই। চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহেরু স্বরাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দল গঠন করে সম্প্রীতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুর কারণে মতিলাল নেহেরু একা হয়ে পড়লেন, এবং হিন্দু মহাসভার সকল নেতা একযোগে আক্রমণ করা শুরু করলেন মতিলালকে। ছেলে জওহরলাল তখন স্ত্রী-র চিকিৎসা করাচ্ছেন ইউরোপে। অপমানে জর্জরিত মতিলাল পুত্রের কাছে চিঠিতে লিখলেন– জনতার একমাত্র মনোভাব এখন সাম্প্রদায়িক ঘৃণা।

এই সময় দেশজুড়ে দাঙ্গায় বিপর্যস্ত মুসলিম লীগ আর কোনো উপায় না দেখে হাতে-পায়ে ধরে দেশে ফিরিয়ে আনল জিন্নাহকে। এবার শুরু হলো জিন্নাহর অসাধারণ রাজনৈতিক মেধার প্রতিফলন। সত্যিকারের দক্ষ ব্যারিস্টারের প্রজ্ঞা নিয়ে জিন্নাহ সবল সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার থেকে দুর্বল সংখ্যালঘুকে রক্ষা করার রণকৌশল খুঁজে বের করলেন। দাঙ্গার জবাবে দাঙ্গা নয়, বরং রাজনীতির কূটচাল দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মুমূর্ষু মুসলিম লীগকে পুনর্জীবিত তো করলেনই, সেই সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে তাকে একটি প্রবল পক্ষ হিসাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন ইংরেজদের এবং কংগ্রেসকে। এই প্রথম মুসলিম লীগ ভারতের রাজনীতিতে শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষ হওয়ার স্বীকৃতি লাভ করল। লন্ডনের গোলটেবিল থেকে শুরু হয়ে জিন্নাহর জয়রথ এগিয়ে চলল ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন পর্যন্ত। সেটি ছিল মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশন। ঐ অধিবেশনে জিন্নাহ ২২ মার্চ তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন, এবং ২৪ মার্চ শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক উত্থাপন করলেন পাকিস্তান প্রস্তাব। জিন্নাহ ততদিনে বুঝে গেছেন যে দেশভাগ অনিবার্য। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন মূলত এই কারণে যে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেশিদিন বজায় থাকবে না। আর গান্ধী না থাকলে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না কোনো হিন্দু নেতাই। যে যে লক্ষণ দেখে জিন্নাহ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সেগুলির একটি ছিল ১৯৩৪ সালে মাধব শ্রীহরি আনে এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগে কংগ্রেসের ভেতর থেকেই সাম্প্রদায়িকতার সমর্থকদের একত্রিত করে ও গান্ধীর বিরোধিতা করে কট্টর হিন্দুপন্থী কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। অপর কারণটি হচ্ছে, পুণা শহরে গান্ধীকে হত্যার জন্য কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বোমা হামলা। এটি ছিল কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে গান্ধীকে হত্যা করার প্রথম প্রচেষ্টা। উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্ব যে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে ও সংঘবদ্ধ হচ্ছে, এই ঘটনা জওহরলাল এবং জিন্নাহ– দু'জনকেই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল।

ঘটনা আরও এগিয়ে চলল। জওহরলাল তাঁর গুরু গান্ধীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়েও উগ্র হিন্দুত্বের বিকাশে বাধা দিতে পারছিলেন না। ১৯৩৩ সালে আজমীরে হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাসভার অধিবেশনের সভাপতি ভাই পরমানন্দ তাঁর ভাষণে পরিষ্কারভাবে হিন্দুদের মনোভাব জানিয়ে দিলেন– 'হিন্দুস্তান শুধুমাত্র হিন্দুদের একার দেশ। মুসলমান, খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মের লোকেরা এখানে হিন্দুদের অতিথির চাইতে বেশি কিছু নয়। তারা যদি নাগরিক না হয়ে অতিথির মতোই এখানে থাকতে রাজি থাকে, তবে তারা যতদিন চায় হিন্দুস্তানে থাকতে পারে।'

১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর হিন্দু-মুসলমান বিভেদের প্রশ্ন আর লুকিয়ে না রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন– 'কোনো আপসের পথে এই বিভেদ দূর করা যাবে না। এই সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র পথ রয়েছে। তা হচ্ছে এই কথা মেনে নেওয়া যে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র হিন্দুদেরই দেশ, এটি শুধুমাত্র হিন্দুদেরই পিতৃভূমি, হিন্দু ছাড়া আর কারও, বিশেষ করে মুসলমানদের এর সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে না। তাই আমাদের উচিত মুসলমানদের জন্য একটি অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেওয়া। তারা সেখানেই থাকবে। তবে তাদের ওপর কোনো ধরনের অত্যাচার করা হবে না।'

জিন্নাহকে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তানের জনক বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার যে রেওয়াজ দেশে-বিদেশে প্রায় সর্বত্রই সমান স্বীকৃতি পেয়ে বসে আছে, আসল ঘটনা যে তা নয়, প্রকৃত ইতিহাস সেটাই বলে। ভারত-ভাগের জন্য যে মায়াকান্না কাঁদা হয় হিন্দু ও খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের পক্ষ থেকে, প্রকৃত সত্য তার থেকে অবস্থান করছে অনেক দূরে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে দ্বিজাতি তত্ত্ব ও পাকিস্তানের প্রকৃত জনক হচ্ছে হিন্দু মহাসভা, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা রাজপত রায়, সাভারকর, গোলওয়াকর, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো ক্ষমতাধর হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি সময় ধরে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দুদের স্বতন্ত্র ও ভারতবর্ষের একমাত্র অধিপতি জাতি বলে ঘোষণা করতে করতে জিন্নাহকে দ্বিজাতি তত্ত্বের কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছেন।

চার

তাই বলে কি জিন্নাহ বা মুসলমানদের ধোয়া তুলসি পাতা বলা যাবে?

সাদী ওস্তাদের প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ বলে– আমি কখনোই তা বলতে চাইনি।

কিন্তু তুমি তো শুধু সাম্প্রদায়িকতার একপেশে বিবরণ দিচ্ছ! হিন্দুদের মধ্যে কত বড় বড় অসামান্য নেতা ছিলেন। তাঁরা তো শতভাগ অসাম্প্রদায়িক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই। তাঁদের মধ্যে স্বয়ং গান্ধীর নামই তো আসে এক নম্বরে। তারপরে ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, তাঁর আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আরও কতজন। অবাঙালিদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় মহামতি গোখলের নাম।

কিন্তু বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা তো দেশভাগের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁরা কেউ সাম্প্রদায়িকও ছিলেন না।

ম্লান হাসল ইউসুফ– এটা হলে তো ভালোই হতো। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা গোপন ক্যানসারের মতো মনের কোন গভীর কোণে যে লুকিয়ে বসে থাকে, তা বোঝা সত্যিই খুব শক্ত। সময় পেলেই তা বেরিয়ে আসে সাপের মতো ফনা তুলে।

যেমন এখন বেরিয়ে আসছে আমাদের মধ্য থেকে– সাদী ওস্তাদের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ।

মাথা গরম হয়ে উঠতে চাইল ইউসুফের। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতরে বেজে উঠল বিপদসংকেত। না, সাদী ওস্তাদের তো কোনো দোষ নেই। কিছুদিন আগে হলে তো সে নিজেও এইভাবেই প্রতিক্রিয়া জানাত। কেননা তারা মনে করত সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলোচনা করাই উচিত নয়। এতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে। দেশে দেশে মৌলবাদ আর ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এতই বেড়ে গেছে যে, তাদের আলোচনা থেকে যদি কোনো বাক্য বেরিয়ে আসে কোনো মৌলবাদীর সপক্ষে, সঙ্গে সঙ্গে তারা সেগুলি কাজে লাগিয়ে দেবে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের লক্ষ্যে। তাছাড়া এই বিষয়ে বেশি মনোযোগের ফলে অনেক প্রগতিশীল মানুষদেরই বিভ্রান্ত হতে দেখা গেছে। এই বিভ্রান্তি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে এই দেশের চীনপন্থী বামদের মধ্যে। তারা ডিগবাজি দিয়ে সোজা গিয়ে ভিড়েছে চরমপন্থী মৌলবাদীদের সাথে। এই দেশে এমনও বাম বুদ্ধিজীবী আছে, যাদের ডাক পড়ে জামাতে ইসলামীর সেমিনারে। তাদের লেখা ছাপা হয় মৌলবাদীদের পত্রিকায়। মৌলবাদী নেতারা বক্তৃতার সময় নিজেদের পক্ষে উদ্ধৃতি দেয় সেইসব বামপন্থী তাত্ত্বিকদের লেখা থেকে। কেউ কেউ আবার বিদেশ সফরে যায় মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক সরকার-প্রধানের সফরসঙ্গী হয়ে। তাই সবসময় সচেতন থাকতে হয় তাদের। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের আলোচনায় বিরক্ত বোধ করছে সাদী ওস্তাদ।

বাপ্পী বলল– আমাদের আলোচনা করতে দোষ কী ওস্তাদ?

দোষের কথা আমি বলছি না। আমি বলতে চাইছি যে গত সময়ের আলোচনা না করে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করা উচিত। অতীত নিয়ে বেশি খোঁচাতে গেলে নিজেদেরই রক্তাক্ত হওয়ার ভয় সবচেয়ে বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে ইতিহাসের পর্যালোচনা করা যাবে না?

সেটা কি খুবই প্রয়োজন?

আমার তো মনে হয় এখন সেই কাজটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। কারণ এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস আমাদেরকে যেটা শেখানো হয়েছে, তার সবটুকু যে বস্তুনিষ্ঠ ছিল না তা সবচেয়ে বেশি প্রমাণ করছেন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ইতিহাসবিদরা। তাঁরা এই কাজটি করছেন নিজেদের দেশে মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থান নেবার প্রয়োজনেই। আমাদের জন্যেও তো কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসলামের নামে আমরা যত রকম কাণ্ড-কারখানা এখানে ঘটতে দেখছি, তার কোনোটাই বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এগুলির সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে নিজেদের দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা, তেমনই জড়িত আছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির ঘটনার প্রতিক্রিয়া, এমনকি বিশ্বের অন্যপ্রান্তের ঘটনারও প্রতিক্রিয়া।

আমরা তো এইটুকু অন্তত জানি যে মুদ্রিত ইতিহাস মানেই সবসময় সঠিক ইতিহাস নয়। ইতিহাস কে লিখছে তার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে ইতিহাস কতটুকু সত্যি হবে।

সাদী ওস্তাদ তবুও নিজের জায়গা থেকে হটতে রাজি নয়– সাম্প্রদায়িকতায় আমরা মুসলমানরাও পিছিয়ে ছিলাম না রে ভাই। কান মে বিড়ি মুহমে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান– আওয়াজ তো এই মুসলমানরাই তুলেছিল।

আরে সে কথা কে অস্বীকার করছে! আমরা কি বলছি যে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা মহান, আর শুধু হিন্দুরাই সাম্প্রদায়িক?

এবার আলোচনা নিজের হাতে তুলে নিতে চাইল ধীমান– শোনেন ওস্তাদ, এই দেশে তো সাম্প্রদায়িকতা আছে। আছে না?

হ্যাঁ আছে।

আচ্ছা কেউ কি কল্পনা করতে পারবে যে বাংলাদেশে হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাচ্ছে?

তা কীভাবে সম্ভব? হিন্দুরা এই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবে কোন সাহসে?

কারণ তারা সংখ্যায় কম, তাদের হাতে বড় সংগঠন নেই, তাদের হাতে দাঙ্গা বাধানোর অস্ত্র নেই, তাদের শেল্টার দেওয়ার মতো বড় কোনো শক্তি নেই। ঠিক?

সাদী ওস্তাদ মেনে নেয়– ঠিক।

তাহলে হিন্দুরা যখন এই বাংলাদেশে দাঙ্গা বাঁধানোর সাহস পায় না, তেমনই ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমানরা সংখ্যায়-শক্তিতে-বিত্তে-সংগঠনে তুলনামূলকভাবে এতই দুর্বল ছিল যে তাদের পক্ষে নিজে থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত করার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণই ছিল না। একথা বুঝতে ইতিহাসবিদ হওয়া লাগে না। যার সাধারণ জ্ঞান আছে, সে-ই এই কথা বলবে। কাজেই বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক উস্কানির ব্যাপারটা যে হিন্দুর তরফ থেকেই বেশি ঘটেছে, একথা পরিষ্কার।

কিন্তু মুসলমানরাও তো কম করেনি। তারা তো দাঙ্গা এড়ানোর চেষ্টা না করে নিজেরাও দাঙ্গায় যোগ দিয়েছে। মুসলমানরা এমনিতেই একটু দাঙ্গাবাজ টাইপের হয়।

ধীমান হেসে ফেলল– এই কথার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই ওস্তাদ। কোনো তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়েই প্রমাণ করা যাবে না এই ধরনের কথার সত্যতা।

এবার সাদী ওস্তাদ একটু থমকায়। ধীমান চালিয়ে যায়– এই দেশে হিন্দুদেরকে অনেকে মালাউন বলে সামনাসামনিই। সুযোগ পেলেই বলে যে তোরা ইন্ডিয়ায় চলে যা। এদেশের মুসলমানের এক বিরাট অংশ মনে করে যে প্রত্যেক হিন্দুরই ইন্ডিয়াতে বাড়ি আছে। এই দেশে হিন্দুরা মাটির বাড়িতে থাকে আর ইন্ডিয়াতে বানায় পাকা দালান। বলে না?

হ্যাঁ বলে।

এই রকম কথা শুনলে তো হিন্দুদের খুবই খারাপ লাগে। হিন্দুর ঘরে জন্ম আমার। জানি, যারা এই সব কথা বলে তারা কত ইতর ধরনের মানুষ। তবু আমার খারাপ লাগে।

তা তো লাগবেই। এই খারাপলাগাগুলি জমা হতে হতে একসময় ক্রোধে পরিণত হয়ে ফেটে পড়বে।

হেসে উঠল ধীমান– না ওস্তাদ, তা ফেটে পড়বে না। কারণ এই দেশের হিন্দুদের পিছু হটার একটা জায়গা আছে। তা হচ্ছে ইন্ডিয়া। যদি ইন্ডিয়া না থাকত, তা হলে এদেশের হিন্দুরা অবশ্যই সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ত। যেমনটি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ আমলের মুসলমানরা। কারণ তাদের যাওয়ার জায়গা ছিল না।

কেন? ইন্ডিয়ার মুসলমানরা তো দেশ ছড়ে না! ওরা তো বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে চলে যায় না!

তার কারণ হচ্ছে ওরা মনে করে না যে পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হিজরত করলে ওরা ভালো থাকবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চেয়ে তো ভারতে তারা ভালো থাকে। এক্ষেত্রে ধর্মের চেয়ে অর্থনৈতিক দিকটাই তারা বেশি বিবেচনা করে।

সেই সঙ্গে একটি কথা যোগ দিচ্ছো না কেন? সেটই তো আসল ব্যাপার!

কোনটা?

AMARBOI.COM

ভারতের সংবিধানের ব্যাপারটা? সেখানে যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে এখনও ধারণ করে রাখা হয়েছে। কাগজে-কলমে ঐ দেশে সকল ধর্মের নাগরিককে সমান চোখে দেখতে রাষ্ট্র বাধ্য। এমনকি বিজেপি-র মতো দল এসেও সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করতে পারেনি।

ধীমান একেবারে ছাড় দিতে নারাজ। বলল– ওস্তাদ, কাগজে-কলমে তো কত কিছুই থাকে। কিন্তু বাস্তবে যখন মুসলমানদের ওপর হামলা হয় তখন দেখা যাচ্ছে হিন্দু পুলিশ এমনকি আর্মিও হিন্দু দাঙ্গাবাজদের সাথে হাত মেলায়। নিদেনপক্ষে এই হামলা নিয়ে সারা দুনিয়ায় হই-চই শুরু না হওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত মুসলমানদের রক্ষায় এগিয়ে আসে না সরকার।

সাদী ওস্তাদ মুখ গোমড়া করে বসে রইল। ধীমান হেসে বলল– আমি মালাউন হয়ে বলছি, নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি থেকে বলছি, ভারতে তলে তলে সাম্প্রদায়িকতা সব জায়গাতে ছড়িয়ে আছে। এই ধরেন সরকারি চাকরির কথা। আমাদের এখানে হিবৌখ্রি সবচেয়ে বেশি চিল্লাপাল্লা করে চাকরির ব্যাপারে। এখানে দশ শতাংশ সংখ্যালঘুর মধ্যে সরকারি চাকরিতে নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘুর সংখ্যা কমপক্ষে আট-নয় পার্সেন্ট হবেই। কিন্তু ভারতে সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা হবে টেনে-কষে দেড় থেকে দুইভাগ।

এতে আমাদের আত্মতৃপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই ধীমান। আমরা আমাদের দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারিনি। এটা তো সত্যি কথা।

অবশ্যই সত্যি কথা। আমাদের রাষ্ট্র কার নিরাপত্তাই বা নিশ্চিত করতে পেরেছে বলেন! কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটি আমাদের দেশে শিকড় ছড়াতে পারে না। কারণ এদেশের মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। কিন্তু ভারতে এক বাঙালি বাদ দিলে বিশেষ করে, হিন্দিভাষী অঞ্চলের মানুষ ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন। ১৯৪৭-এর ভারতবিভাগ দিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক তৎপরতার সমাপ্তি ঘটেনি। বিবরণ শুনতে চান?

বাপ্পী আর কামাল একসাথে বলল– আমরা শুনতে চাই।

সাদী ওস্তাদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল– মনগড়া কথা যেন না হয়!

পাগল! মনগড়া কথা বললে লালকৃষ্ণ আদভানি আমার কল্লা আস্ত রাখবে!

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো। সাম্প্রদায়িক সমস্যা তো সেদিনই মিটে যাওয়ার কথা। কিন্তু বেড়ে চলল। আবার আঘাত এলো গান্ধীর ওপর। কারণ, হিন্দু মৌলবাদীদের মতে গান্ধী যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু নন। গান্ধী থাকলে হিন্দু মহাসভা কিংবা বিশ্বহিন্দু পরিষদ তাদের মনমতো সাম্প্রদায়িক ভারত গড়তে বাধা পাবে। ১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারি দিল্লীতে গান্ধীর প্রার্থনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভায় মদনলাল নামের এক যুবক গান্ধীকে হত্যার চেষ্টা চালায়। এটি দ্বিতীয় দফা চেষ্টা। ব্যর্থ হলো। কিন্তু তৃতীয় বারে তারা ব্যর্থ হয়নি। তৃতীয় চেষ্টা হলো ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। খাকি পোশাক পরা এক যুবক গান্ধীর কাছে এসে ভঙ্গি করল তাঁকে প্রণাম করার। তারপরে বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বের করে পরপর তিনটি গুলি করল গান্ধীর বুকে। নাথুরাম গডসে ব্যর্থ হলো না। শুধু একবার 'হা রাম' বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রধান সৈনিক।

এগারো মাস পরে শুরু হলো নীল-নক্শা অনুযায়ী অযোধ্যায় রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ। ১৯৪৮ সালেরই ২২ ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে একদল রামভক্ত বাবরি মসজিদের তালা ভেঙে মসজিদের ভেতরে দু'টো পুতুল রেখে এলো। পরদিন সকাল থেকে একদল লোক রিক্সার সাথে মাইক বেঁধে অযোধ্যা এবং ফৈজাবাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা দিল যে বাবরি মসজিদের মধ্যে আপন জন্মস্থানে 'রাম লালা স্বয়ং প্রকটিত হুয়া'। হিন্দু মহাসভা দাবি তুলল, কত হাজার বছর আগে সেই ত্রেতা যুগে রাম ঠিক কোন জায়গাটিতে জন্মেছিলেন, তা তিনি নিজেই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই দিন থেকেই শুরু হয় বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ। কিন্তু জওহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিত্ব তখন তাদের এর চেয়ে বেশি মাথা তুলতে দেয়নি। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের উদ্যোগে দিল্লীতে হিন্দু সাধু-সন্তদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী তখন শিখ ধর্মগুরু ভিন্দ্রানেওয়ালের স্বর্ণ মন্দিরে হামলা নিয়ে ব্যস্ত। ভারতের দক্ষ গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বলে যে সাধু-সন্তদের ঐ সমাবেশ নির্দোষ একটি ধর্ম সম্মেলন মাত্র। ঐ সমাবেশে গঠিত হলো 'ধরম সংসদ' নামে একটি সংস্থা। এই ধরম সংসদ দাবি তুলল যে অযোধ্যা, বারাণসি এবং মথুরায় মসজিদের জায়গাতেই মন্দির নির্মাণ করতে হবে। এই দাবিকে কেউ তখন তেমন একটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং ধরম সংসদের যৌথ উদ্যোগে বিহারের সীতামারি থেকে অযোধ্যা অভিমুখি রথযাত্রা পরিচালিত হলো, সেই ঘটনাটিও সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি খুব একটা। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত যতবার ধরম সংসদের সমাবেশ হয়েছে, ততবারই তারা দাবি তুলেছে 'মন্দির ওয়হি বনায়েঙ্গে'। এই পাঁচ বছর ধরে তারা দাবিটাকে সামনে রেখে আসলে বুঝে নিতে চেয়েছে যে এই বিষয়ে বাধার পরিমাণ কতটুকু হতে পারে, কে কে বাধা দিতে পারে ইত্যাদি। হিন্দু সাধুরা ধাপে ধাপে উগ্র হয়ে উঠেছে। ১৯৯১ সালের ৪ এপ্রিল বিজয়রাজে সিন্ধিয়া ধরম সংসদের করসেবকদের মসজিদ ভাঙার জন্য প্রত্যক্ষ আহ্বান জানালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিষয়ে সরকার আদালতের শরণাপন্ন হয়, এবং আদালত মসজিদ ভাঙার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর ধরম সংসদ দিল্লীতে সমাবেশ করে ঘোষণা দেয় যে আদালতের ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করে তারা ৬ ডিসেম্বর রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করবে। ঐ তারিখেই ভাঙা হলো বাবরি মসজিদ, আর তারপরের একমাস ধরে চলল ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের ওপর হামলা এবং মুসলমানদের বাড়ি-ঘর-সম্পত্তিতে আগুন দেওয়া। হিন্দু ধর্মনেতারা চাইছিলেন যেন হিন্দুর সংখ্যা তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে। সেই কারণে, শুনতে হাস্যকর শোনালেও, এলাহাবাদে ধরম সংসদের সভা থেকে স্বামী মুক্তানন্দ সরস্বতী প্রতিটি হিন্দু পুরুষকে ২৫ জন করে স্ত্রী গ্রহণের আহ্বান জানান। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে নারীনেতৃবৃন্দ এই ঘোষণাকে সমর্থন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিতর্কিত সন্ন্যাসিনী উমা ভারতী এবং সাধ্বী ঋতাম্ভরা। আর স্বামী বামদেব আহ্বান জানালেন ভারতের সর্বস্তরে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য মেনে নিয়ে বর্ণপ্রথার পূর্ণ বাস্তবায়নের। এইভাবেই উত্থান ঘটল বিজেপি-র। মৌলবাদের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, ক্ষমতা দখলের লড়াইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে সংখ্যালঘু বা দুর্বল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা। বিজেপি তার সহযোগী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং ধরম সংসদের মাধ্যমে এই কাজটি খুবই সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পেরেছে। মৌলবাদী হিন্দুরা বারবার বলছে যে এই দেশ হিন্দুদের দেশ; হিন্দুদের জমিতে মুসলমানরা স্বত্ব দখল করেছে বলে হিন্দুরা বিপন্ন হয়েছে; মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে বা তাড়িয়ে দিতে পারলে এদেশ হবে রামরাজ্য; আর যারা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করছে একমাত্র তারাই হিন্দুদের সমর্থন লাভের যোগ্য। সেই কারণেই বিজেপি সেখানে কেন্দ্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। আর যে বাংলাদেশকে মৌলবাদী দেশ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই বাংলাদেশের সবচেয়ে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক শক্তি জামাতে ইসলামি সংসদে খুব বেশি হলে তিনটি আসন পায়। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এই দেশে টিকে থাকার ক্ষমতা জামাতের কোনো সময়েই ছিল না, এখনও নেই। জামাতকে সবসময় কারও-না-কারও ঘাড়ে উঠতেই হয়। একাত্তর সালে তারা চেপেছিল পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর ঘাড়ে। এখন চেপে আছে খালেদা জিয়ার বিএনপি-র ঘাড়ে।

দীর্ঘ বক্তৃতার পরে থামল ধীমান। চায়ের কপে চুমুক দিল জোরে শব্দ করে।

ইউসুফ বলল– এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটি সবসময়ই ক্রিটিক্যালি পর্যালোচনা করা উচিত। কেউ কেউ বলতে চায় যে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ একেবারে মনগড়া জিনিস। বলতে চায় যে ইংরেজরা আসার আগে হিন্দু-মুসলমানে কোনো বিরোধ ছিল না। আরেক পক্ষ বলতে চায় যে হিন্দু আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান সম্পূর্ণ আলাদা দুইটি জাতি। তাদের মধ্যে কোনোদিনও সুনির্দিষ্ট বোঝা-পড়া তৈরি হয়নি। অতীতে কোনোদিন তাদের মধ্যে ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং ভবিষ্যতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের হিসাবে এই দুই ধারণাই ভুল। সত্যকে পাশ কাটিয়ে গেলে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। অনেক রকম সমীকরণ ছিল আমাদের মধ্যে। কোনো একটি নির্দিষ্ট জিনিস অর্জিত হলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ভারতভাগ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়েছিল। সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ হলেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভূত মাথা থেকে নেমে যাবে মনে করা হয়েছিল। সেটাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেই তার ছত্রছায়ায় সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে এখন যে জোরে-শোরে দাবি তোলা হচ্ছে, সেটাও ভুল। বিভেদ আছে। বামপন্থীরা সকল বিভেদ শ্রেণীর কাঠামোর মধ্যে বিচার করতে চায়। কিন্তু মুসলমান কৃষক কেন হিন্দু কৃষকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? হিন্দু শ্রমিক কেন মুসলমান শ্রমিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? বিহারের মুসলমান কেন বাংলার মুসলমানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? ভারতের মাদ্রাজের তামিলভাষী কেন হিন্দিভাষীকে ঘৃণা করে? এই সবগুলির পেছনেই রয়েছে একদিকে বাস্তব কারণ, আরেকদিকে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। কারণ যেমন বহুমুখি, সমাধানও তেমনই বহুমুখিই হতে হবে। তার সমাধান সূত্র আমাদের হাতে নেই। কিন্তু সংকটের কারণগুলি তো খুঁজে বের করতেই হবে।

এবং কোনো পূর্ব অনুমান বা পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়াই তা খুঁজতে হবে। যেমন আমাদের প্রচলিত ইতিহাসগুলিতে বারবার তুলে ধরা হয়েছে যে, হিন্দু নয়– মুসলমানরাই ভারত তথা বাংলা ভাগের জন্য দায়ী। এই কথাটা কতখানি ঐতিহাসিকভাবে সত্যি? বাংলার মুসলমানরা যে দেশভাগ মেনে নিল, তা কতখানি বাধ্য হয়ে? বাংলার মুসলমানদের এই অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ইংরেজরা কতখানি দায়ী? হিন্দুরা কতখানি দায়ী? আর কতখানি দায়ী মুসলমানরা? এইটুকু বিচারে তো আমরা এগুতেই পারি।

সাদী ওস্তাদের প্রশ্ন– তাতে লাভ?

ইতিহাসের দায়মুক্তি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপমা যেদিন নতুন কোনো সাজ-পোশাক বা প্রসাধন করে আসে, কিন্তু অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেলেও ইউসুফ সেকথা মুখ ফুটে বলে না, তখন বিরক্ত হয়ে এই রকম কথা বলে। একথা শুনে উপমার দিকে পর্যবেক্ষকের চোখে তাকায় ইউসুফ। সে কি আজ বিশেষ কোনো টিপ পড়েছে? চোখে কি টেনেছে কাজলের রেখা? চুলে কি আজ অন্য ধরনের বিন্যাস? পরনের জামায় কি আজ অন্য রকম চুমকির কারুকাজ? এক পায়ে কি রূপার নুপুর?

পাশাপাশি বসে ছিল দু'জন। ইউসুফ উঠে সামনাসামনি দাঁড়াল উপমার। তন্ন তন্ন করে চুলে চিরুনি চালানোর মতো করে দেখল উপমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। তার সিরিয়াস ভঙ্গি দেখে উপমা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম। হাসির ফাঁকে ফাঁকেই বলল– দ্যাখো হাঁদারাম, ভালো করে দ্যাখো! আজ যদি খুঁজে বের করতে না পারো তাহলে তোমার শাস্তি হবে।

মুখে হাসি নিয়ে ইউসুফ বলল– শাস্তির ব্যাপারটা নিয়ে আমি আপাতত ভাবছি না। কিন্তু তুমি এই কথার মাধ্যমে আমার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছ। হার স্বীকারে আমি রাজি নই।

আরেকটু কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল ইউসুফ। হাত বোলাল উপমার কপালে-চিবুকে। নাহ এখানে তো বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না। উপমা হেসেই চলেছে। ইউসুফ বলল– পা বাড়াও তো এদিকে।

এক পা একটু উঁচু করল উপমা। নাচাল পা। যাতে নুপুর থাকলে বেজে ওঠে। নাহ। পায়ে তো নুপুর নেই। সিরিয়াস ভঙ্গিতে ইউসুফ বলল– ঐ পা দেখি!

আগের পা নামিয়ে আরেক পা উঁচু করল উপমা। নাচাল এটাও। এই পায়েও নুপুর নেই। পা নামিয়ে নিতে গেলে বাধা দিল ইউসুফ। অঞ্জলি পেতে দুই হাতে তুলে নিল উপমার পা। এই কী করো! ছাড়ো ছাড়ো!

কিন্তু ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে উপমার সামনে বসে পড়েছে ইউসুফ। উপমার বাম পা তার দুই হাতের অঞ্জলিতে ধরা। একটু ছাড়ানোর চেষ্টা করল উপমা– এই পাগল, ছাড়ো পা! লোকে দেখছে তো! কী বলবে মানুষ!

বলুক। যা খুশি বলুক লোকে। আমি এখন তোমার পায়ে আলতা পরাব।

আলতা! এখন কোথায় আলতা পাবে তুমি?

এই যে। পকেট থেকে আলতার শিশি বের করল ইউসুফ।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে উপমা। না কী খুশিতে! তুমি আলতা এনেছ! আমাকে পরানোর জন্যে!

তাছাড়া আর কাকে পরাব?

খুশিতে চোখে পানি এসে গেছে উপমার। কোনোক্রমে বলল– এভাবে না সোনা! লোকে কী বলবে! তারচেয়ে আমাকে দাও। আমি আলতা পরে এসে তোমাকে দেখাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না আমি পরাব!

পরাও! আমার কি! লোকে তোমাকে দেখে হাসবে।

নিজের লজ্জা লুকাতে চোখের ওপর ওড়না টেনে দিয়ে বসে রইল উপমা। তার শরীর কাঁপছে একটু একটু। এত ভালোলাগাও কী পাওনা ছিল তার!

তার পায়ে আলতার তুলি বোলাচ্ছে ইউসুফ। নিজে ঘুরে ঘুরে সরে বসছে আলতা লাগানোর জন্যে। মাঝে মাঝে উপমার পা অল্প এদিক-ওদিক নড়াচ্ছে। ভালোলাগায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে উপমার। ওড়নার আঁচলের নিচে তার চোখও বন্ধ। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে তার পায়ের পরিচর্যা করে চলেছে ইউসুফ।

অবশেষে কাজ থামিয়ে কথা বলল ইউসুফ– হ্যাঁ হয়েছে এবার। আর লজ্জা করতে হবে না। চোখ খুলে দ্যাখো এবার।

ওড়না সরিয়ে চোখ খুলল উপমা। সর্বনাশ! তাদের সামনে ছেলেমেয়েদের বেশ বড়সড় একটা জটলা। এতগুলি ছেলেমেয়ের সামনে এই কাজ করেছে ইউসুফ! ইউসুফের কাজ শেষ হওয়া এবং উপমার চোখ খোলা উপলক্ষে উৎফুল্ল করতালির শব্দ উঠল। আর উপমা লজ্জা ঢাকার আর কোনো উপায় না পেয়ে সামনে ঝুঁকে মুখ লুকাল ইউসুফেরই কাঁধে।

কিছুক্ষণ তাকে এইভাবে থাকতে দিল ইউসুফ। তারপর কাঁধ থেকে মাথা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। বসল এসে উপমার পাশে। সামনের জটলার দিকে তাকিয়ে বলল– আমাদের উৎসাহিত করার জন্য অনেক ধন্যবাদ বন্ধুগণ। এবার আপনারা বিদায় নিয়ে আমাদের প্রেমালাপের সুযোগ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। এখনকার পর্ব আমাদের একান্ত দু'জনার।

আরও একবার জোর তালি বেজে উঠল। কোঁকড়া চুলের স্মার্ট একটা ছেলে বলল– দারুণ ভালো লাগল ভাই। প্রেম হলে এই রকমই হওয়া চাই। গুডলাক!

চলে গেল সবাই।

উপমার চোখ ভেজা ভেজা। ইউসুফ হাত বাড়িয়ে উপমার হাত ছুঁয়ে বলল– আর কী রাগ আছে আমার ওপর? আমি ঠিকমতো মনোযোগ দেই না তোমার দিকে। এই অভিযোগ কি এখনও বহাল আছে?

তার হাতটা জোরে আঁকড়ে ধরল উপমা। ঠোঁট ছোঁয়াল হাতে। তারপর ফুঁপিয়ে উঠল।

কী হলো রে পাগলি!

না এখন কোনো কথা নয়!

তাকে চুপ থাকতে বলে ইউসুফের হাতটা গালে চেপে অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে বসে রইল উপমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ পরে আলতো করে হাত ছাড়িয়ে নিল ইউসুফ। এবার হাত রাখল উপমার মাথায়– আমি সত্যিই দুঃখিত উপমা। আমি তোমাকে ঠিকমতো সময় দিতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি ইচ্ছা করে এমনটি করি না! তুমি তো জানো আমার কত কাজ।

আমি জানি। চোখ মুছে বলল উপমা– আমি বুঝি না তা তো নয়। বুঝি। কিন্তু তারপরেও ছেলেমানুষি করে ফেলি। জেদ করি তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য।

তা তো করবেই। করাটাই তো স্বাভাবিক।

না স্বাভাবিক নয়। তুমি কি অন্য আর সবার মতো প্রেমিকার আঁচল ধরে বসে থাকার মানুষ! তা যদি হতে তাহলে তো তুমি ইউসুফ আহমেদ হতে না। তাহলে হয়তো আমিও তোমাকে ভালোবাসতাম না।

ফাঁপড়ে পড়ার ভঙ্গি করে ইউসুফ– এ আবার কেমন কথা!

এটাই সত্যি কথা। তুমি তো শুধু আমার প্রেমিক নও, তুমি আমার আইডল, আমার হিরো। এমন মানুষকে পায় কয়জন মেয়ে? বেশিরভাগ মেয়ে তো প্রেম করে প্রেম করার জন্য। কিন্তু তার প্রেমিক যে তার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, একথা বলতে পারবে না তারা। কিন্তু আমি পারি।

আমি আবার শ্রেষ্ঠ হলাম কীভাবে?

তুমি খুব সাধারণ পোশাকে খুব সাধারণভাবে যখন অজস্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে হেঁটে যাও, তখনও যে কেউ তোমাকে দেখলেই বুঝতে পারে যে তুমি এই ভিড়ের কেউ নও। তুমি সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ।

হাসল ইউসুফ– সে তুমি আমাকে ভালোবাসো তাই আমার মধ্যে অসাধারণত্ব দেখতে পাও। যে কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষেত্রেই এই কথাটা খাটে। তারা অবশ্যই পরস্পরের কাছে অসাধারণ।

না তা নয়। তুমি কয়জন মেয়েকে দেখতে পাবে যে তার প্রেমিককে দেবতার চোখে দেখে? সম্ভবত একজনকেও পাবে না। কারণ তার প্রেমিক যে দেবতা নয়, সেটা একজন মেয়ের চাইতে বেশি ভালো করে আর কেউ বুঝতে পারে না। আর তোমাকে ভালোবাসি বলে আমি তোমাকে অসাধারণ মনে করি, এই কথাটাও ঠিক নয়। বরং ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। তুমি অসাধারণ বলেই তোমাকে আমি ভালোবাসি।

ইউসুফ একটু হাসে– বোকা মেয়ে! এইভাবে ভালোবাসলে বেশি দুঃখ পেতে হয়। আমি তো খুবই সাধারণ একজন মানুষ। পড়াশুনায় ভালো তো প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই কেউ না কেউ আছে। তারা সবাই ব্রিলিয়ান্ট। আমি কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট হওয়ার জন্যে পড়ি না। আমি পড়ি, কারণ পড়তে আমার ভালো লাগে। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো বিষয়ের বই পড়তে গেলে লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নুয়ে আসে। তাঁরা কী অসাধারণ ভাণ্ডার রেখে গেছেন আমাদের জন্য, যাতে আমরা আমাদের পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে-মেয়েরা ভালো রেজাল্ট করে ভার্সিটির শিক্ষক হবে, বিসিএস দিয়ে বড় অফিসার হবে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে লাখ লাখ টাকা বেতনের পোস্ট পাবে। কিন্তু আমি তো সেসব কোনো খাতাতেই নাম লেখাব না।

তাতে অসুবিধা কী? এই কারণেই তো তুমি ইউসুফ আহমেদ। শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবার জন্য তো তুমি নও।

ব্যাপারটা যেভাবে ভাবছ, তা তো নাও হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে আমি ঐসব প্রতিযোগিতায় নামতে ভয় পাই। সবাই তো সবকিছু পারে না। একজন যুবক যা যা স্বপ্ন দেখে তার কোনোটাই আমার নেই। কেন নেই, তাও জানি না। শুধু জানি আমার কাছে এই তথাকথিত ওপরে ওঠার জন্য যে গুঁতোগুতি চলে তাকে রীতিমতো অমানবিক এবং অশালীন বলে হয়। আমি যে কীভাবে চাকরি-বাকরি করব!

তোমাকে চাকরি করতে হবে কেন? চাকরি করব আমি। তুমি তোমার মতো করে কাজ করে যাবে।

কী কাজ?

যা তুমি করছ।

কী করছি আমি?

মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছ। মানুষের ভাগ্য বদলানোর পথ খুঁজছ।

এটা আবার কোনো কাজ না কি? তাছাড়া আমার তো এমন প্রতিভা নেই যে বড় কোনো সংস্কারকের মতো বা দার্শনিকের মতো সফল হবো।

তোমাকে সফল হতে দিব্যি দিচ্ছে কে! এই আত্মস্বার্থপরায়ণ দেশে আত্মকেন্দ্রিক সমাজে কেউ নিজেকে বাদ দিয়ে সমষ্টিকে নিয়ে ভাবছে, এই ব্যাপারটাই তো মানবজাতির ওপর আস্থা একটু হলেও ফিরিয়ে দেয়। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। আর আমার কাজ হবে তোমার দেখাশোনা, সেটা আমি করে যাব।

পুরো ঘটনা এবং বাক্যালাপ হুবহু মনে আছে ইউসুফের। মনে করতে চায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ঠোঁটের কোণে তিক্ত একটু হাসিও কি ফোটে না? হয়তো ফোটে। কিন্তু সচেতন মনে ইউসুফ জানে উপমা তার পক্ষে যেটা করা স্বাভাবিক, সেটাই করেছে, ঠিক কাজটাই করেছে। কিন্তু অবচেতন মনটা কেন যে হাহাকার করে! আহ ধর্ম! তোমার তো সব মানুষের অবলম্বন হওয়ার কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষে মানুষে সেতুবন্ধন তৈরি করার কথা। তোমাকে মানুষ এখন উল্টো ভূমিকাতে নামিয়েছে কেন? কীভাবে?

ছয়

"ধর নাথ! এ রত্ন তোমারই। জগৎপতি জগজ্জীবে যে সকল বৃত্তি দান করিয়াছেন, তাহার কোনও একটি বৃত্তির সহিত বজ্র বিশেষের সংঘর্ষণে করুণ রসের উৎপত্তি হয় ও তাহাই জীবের মর্ম্মস্থল ফাটাইয়া হৃদয় চুয়াইয়া অশ্রুরূপে আবির্ভূত হয়। ইহা স্বর্গীয় হইলেও সুখের ঘরে দুর্ল্লভ-রত্ন।

ভক্ত মাত্রেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, এ রাজ্য তোমারই এবং তুমিই ইহার সর্ব্বাধিকারী। জীবের সুখ দুঃখ আদি রাজ্যের সামগ্রী মাত্রেই তোমার সম্পত্তি। রাজ্যে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়,তাহাও তোমারই। তাই আমি বলিতেছিলাম, ধর নাথ! এ রত্ন তোমারই!

কৃপানাথ! তুমি কৃপা করিয়া যাহাকে যাহা দান করিয়াছ, প্রাণের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সে তাহাই রক্ষা করিতেছে। তোমার বঙ্গীয় কৃষককে একমাত্র অশ্রুই রক্ষা করিতে দাও নাই কি? আজ ঐ এক অশ্রুই তাহার সর্ব্বস্ব ধন– বহু কাল হইতে হৃদয় ভাণ্ডারে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ঐ অশ্রু ক্রমে উথলিয়া উঠিতেছে– ভাণ্ডারটি ষ্টীমপূর্ণ বয়লারের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে; ঐ জীর্ণ বয়লারের সন্ধি স্থানের সূক্ষ্ম ছিদ্র মাত্র দ্বারা ঐ অশ্রু রাশির যে সূক্ষ্ম কণিকা সজোরে ছুটীয়া বাহির হইতেছে তাহাও তোমারই, ও স্বভাবের টানে তোমারই উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; সরল পথ দেখাও নাই, তাই সরল স্রোত প্রবাহিত হইতে না পারিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে নানা দিকে ছুটীয়া যাইতেছে; তাই বলিতে ছিলাম, ধর নাথ! এ রত্ন তোমারই!

হৃদয়ের ইষ্ট দেবতাকে– ভক্তির যথার্থ পাত্র পরম পূজনীয় জনকে– মরমের ভালবাসার ধনকে, মনের কথা– প্রাণের ব্যথা জানাইতেও উদাসীন, এমন কোনও জীব তোমার জগতে আছে কি? বোধ হয় বঙ্গীয় কৃষক ব্যতীত এমনটী আর নাই। তুমি দয়া করিয়া তোমার এই ভক্ত জনকে এমনই এক সুমন্ত্র দান করিয়াছ যে, অনন্ত যন্ত্রণায় পুড়িয়া ছারখার হইলেও, নিস্পন্দ ভাবে– স্থির নেত্রে তোমারই করুণার দিকে চাহিয়া থাকিবে– গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। কৃপানাথ! তোমার ভক্তবৃন্দের ঐ অশ্রু যথার্থই পবিত্র, তাই তোমাকে উপহার দিবার জন্য এক বিন্দু চুরি করিয়া আনিয়াছি ও ভক্তি ভাবে নিবেদন করিতেছি, ধর নাথ! এ রত্ন তোমারই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলা রাজসাহী, মহকুমা নাটোর, থানা বড়াইগ্রামের অধীন কৈডিমি গ্রাম নিবাসী চতি হাজী গোমাংস খাইয়াছিল। গোমাংস খাওয়া বঙ্গীয় মুসলমান কৃষকের অপরাধ?! তাই প্রবলের দ্বারা কয়েদ হইল, মাথায় অত্যাচারীর জুতার আঘাত পড়িল, কপালে দাগ হইল, জরিমানা দিতে বাধ্য হইল।

ভবের বিচারক মিঃ এ, সি, ম্যাকার্ট্রিস মহোদয়ের মফঃস্বল ক্যাম্পে, তেবারিয়া মোকামে ২৬/২/০৮ তারিখে দরখাস্ত করিল– কপাল দেখাইল। ম্যাকার্ট্রিস বাহাদুর হলপান এজাহার গ্রহণ করিবেন, এমন সময় চতি হাজি বলিয়া উঠিল, "ধর্ম্মাবতার! প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চালাইতে পারিব না, শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।" তাহাই হইতে চলিল। পুলিশ রিপোর্ট করিলেন যে, কয়েদ আদি ঘটনা সত্য, কিন্তু শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

মক্কার পবিত্র মসজিদে ঐ খাস তক্তে যে মাথা সেজদায় যাইতে পাইয়াছিল, ঐ পবিত্র মাথায় অত্যাচারীর জুতার আঘাত হইল, তবুও বঙ্গীয় কৃষক ভবের বিচার চাহে না! পৃথিবী দেখ! ইতিহাস সাক্ষী থাক!

কালে ঐ দাগ মিটিয়া যাইবে, কিন্তু নাথ! ঐ অশ্রু? ঐ অশ্রু কি হইবে? তাহা ত মিটিয়া যাইতে পারে না। অশ্রু অবিনশ্বর– তোমার গ্রহনীয়, তাই বলিতে চাহি ধর নাথ! এ রত্ন তোমারই!

অশ্রু পবিত্র– অবিনশ্বর ও স্বর্গীয়, সেই জন্যই এই পাপ-সংসারে অধিকক্ষণ প্রকাশ থাকে না। প্রকাশ হওয়া মাত্রই স্বর্গধামে চলিয়া যায়।

অশ্রু যাহার প্রিয় পদার্থ, তাঁহার দরবারে সমাদরে গৃহীত হয়।

ভব-সংসারে অশ্রুকে জল রূপে দেখা যায়। ইহাকে জল বলিয়া বিচার করিতে গেলেও ইহার শক্তি দেখিয়া পাপীর হৃদয় ভীত হয়। জল বাষ্প হয়, বাষ্প আকাশে যায়, স্বর্গীয় শীতল বাতাস জমিয়া শিলা হয়, ও শীলার সংঘর্ষণে বজ্রের উৎপত্তি হয়। বজ্র কি হয়?

জলে আর কি হয়? জলে পাপ রাজ্য ডুবিয়া যায়।

ভয় পাইয়া; তাই বলিতেছিলাম, ধর নাথ! এ রত্ন তোমারই!"

(মিহির ও সুধাকর, ইং ১৭ই এপ্রেল, ১৯০৮।)

শ্রীমহছেনউল্লাহ সরকার নামক এই পত্রলেখককে সাম্প্রদায়িক বলার কোনো কারণ নেই। কারণ তিনি আদপেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় কৃষক সম্মিলনীর স্থানীয় কমিটির সম্পাদক। তাই কৃষকের পক্ষে কথা বলা ছিল তাঁর পবিত্র দায়িত্ব। ঘটনাক্রমে এখানে কৃষক হচ্ছে মুসলমান সমাজের। আর ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে প্রায় শতভাগ জমিদার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু। এখানে জমিদার-বিরোধিতা অনেকটা হিন্দু বিরোধিতার মতো শোনাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমিদার ও তার নায়েব-গোমস্তা হিন্দু মহাসভার প্রভাবে উজ্জীবিত হয়ে গো-রক্ষার আন্দোলনে না নামলে বঙ্গীয় কৃষকের গোমাংস ভক্ষণকে নিশ্চয়ই অপরাধ হিসাবে গণ্য করতেন না। আর তার ফলে বাংলার সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িক বিভেদের সুরও হয়তো এত তীব্রভাবে বেজে উঠত না।

এই বাংলায় নাগরিক বলয়ের বাইরে, তৃণমূল পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো সাংস্কৃতিক বিভেদ ছিল না বলে ভাবতে ভালোবাসেন অনেক চিন্তাবিদ। কিন্তু ধারণাটি ভুল। বিভেদ ছিল বরাবরই। কিন্তু বিভেদটা যাতে বড় হয়ে না উঠতে পারে সেই জন্য সমন্বয়ের সাধনাটাও ছিল। আমরা যখন এই সমন্বয় সাধনের ইতিহাস তুলে ধরতে চাই, তখন আসলে স্বীকার করেই নিই যে বিভেদটা ছিল। এই সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে ব্রিটিশ, কংগ্রেসের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক অংশ, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং বাংলাভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান মারোয়াড়ি টাটা-বিড়লা-কানেরিয়া-বাজাজ-আম্বানি এবং উত্তর ভারতের আদমজী-বাওয়ানি-লতিফরা। বাঙালি নিম্নআয়ের গ্রামবাসী মুসলমান স্বপ্ন দেখেছে পাকিস্তানের মাধ্যমে পঞ্চম খেলাফায়ে রাশেদিনের আমলে প্রত্যাবর্তনের। কিন্তু তাকে আরেক শোষণের ফাঁদে যে ফেলা হচ্ছে, সেই সম্পর্কে সাবধান করে দেবার মতো কোনো মুসলমান মনীষা সেই সময় ছিল না। তার সবচেয়ে বড় কারণ, বাঙালি মুসলমানদের যারা নেতা ছিলেন তারা কেউ বাঙালি ছিলেন না। তারা বাংলার সাধারণ আতরাফ মুসলমান সমাজের কথা ভাবেননি। ভেবেছেন নিজেদের উচ্চবিত্ত সমাজের উন্নতির কথা। তাদের সুযোগ করে দিয়েছে বাঙালি হিন্দু চিন্তানায়কদের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, যাদের কাছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে ছিল হিন্দু-ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা জেনেছি। কিন্তু তাঁরও আগে এই হিন্দু-জাতীয়তার সূত্রপাত। সুভাষচন্দ্র বসু বিবেকানন্দকে বলেছেন 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা।' ব্যক্তিজীবনে এবং চিন্তায় বিবেকানন্দকে সাম্প্রদায়িক বলার অপরাধ করতে তাঁর চরম শত্রুও দ্বিধা করবে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে বিবেকানন্দ যে জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন, তা আসলে হিন্দু-জাতীয়তাবাদই। বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্রে বলা হচ্ছে– 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘণ্য নিষ্ঠুরতা– এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না– তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না– তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না– তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের– নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না– তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না– তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না– নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল– আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল– মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল– ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই– ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর কর, আমায় মানুষ কর!'

কিন্তু বিবেকানন্দের এই স্বদেশমন্ত্র কোনো অহিন্দুর পক্ষে আক্ষরিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না। এটি কোনো অহিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভারতের অজস্র দেবদেবীকে কোনো মুসলমানের পক্ষে নিজের ঈশ্বর বলে কল্পনা করাও অসম্ভব; গৌরীনাথ কিংবা জগদম্বার কাছে কোনো মুসলমানের পক্ষে নিজেকে মানুষ করার প্রার্থনা জানানোও সম্ভব নয়; এই স্বদেশমন্ত্রের আবহে কোনো মুসলমানের সত্যিকারের প্রবেশাধিকারের সুযোগই নেই। কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম অংশে বাংলায় যে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দলগুলি গঠিত হয়েছিল, সেগুলিতে মুসলমানদের গ্রহণ করা হতো না। বিপ্লবীরা মুসলমানদের বিশ্বাস করতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' তো বহুল আলোচিত। এই বইতে প্রত্যক্ষ মুসলমান বিদ্বেষের যে চিত্র বঙ্কিম তুলে ধরেছেন, তার জন্য বাঙালি মুসলমান কোনোদিনই মন থেকে তাঁকে গ্রহণ করতে পারবে বলে মনে হয় না। তাঁর রচনা বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাঠ করবে চিরদিন। কিন্তু তাঁর সাম্প্রদায়িক চিন্তা চিরকালই মুসলমান মৌলবাদীরা ব্যবহার করে যাবে বিচ্ছেদের হাতিয়ার হিসাবে। তবে সমকালীন মুসলমান প্রগতিশীলদের মনে যে এসব কাজ যথেষ্ট কষ্টদায়ক ছিল, তা চিন্তা করার অবকাশ হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা পাননি বললেই চলে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, আপামর প্রগতিশীলদের প্রিয় 'কাকাবাবু' মুজফ্ফর আহমদ পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হলেন যে– 'বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ থেকে বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূল মন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম গান। তাতে আছে– বাহুতে তুমি মা শক্তি/ হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি/ তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে/ তুংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেশ্বরবাদী কোনো মুসলিম ছেলে কি করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারত? এই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনোদিন বুঝতে পারেননি। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।'

ঢাকা অনুশীলন সমিতির পরিচালক ও সংগঠক বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস লিখেছেন– 'নিয়ম করিলাম সমিতিতে মুসলমান নেয়া হইবে না। কেহ কেহ আপত্তি করিল– মুসলমানগণকে গভর্ণমেন্টই উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা সদ্ভাব রাখিলে মুসলমানগণও সদ্ভাব রাখিবে– কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই এই যুক্তি মানিতে পারিল না।'

যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ বাঙালির প্রাণের স্পন্দন সবচেয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর একের পর এক রচনায়, সেই শরৎচন্দ্র যখন সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালিতে পথ হারান, তখন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন বাঙালি মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল অংশ। তিনি লিখলেন– 'বস্তুত মুসলমান যদি বলে– হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে। বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সংকোচ মানে নাই।... হিন্দু-মুসলমান মিলন একটি গালভরা শব্দ। এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মবঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। হিন্দুস্তান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই।'

এই হিন্দু জাগরণের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী বিপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই সচেতন ছিলেন। তিনি সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়কে ধিক্কার জানাতে দ্বিধা করেননি। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন যে মুসলমানকে প্রতি পদে পদে অপমান করার 'হিন্দুজ বৃত্তিটাই' আসল ব্যাধি– 'আমাদের পাপই ইংরেজদের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণমাত্র। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমতো প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার সহজ পথ নাই।'

'হিন্দু-মুসলমান পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বিদ্যালয় আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তা মানি তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না হৃদয়ে লাগে। ...বঙ্গ বিচ্ছেদের ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের শরীক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়কে কোন দিন এক হইতে দেই নাই। ...ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়া বৃথা। বঙ্গ বিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানদের আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ খননেরও চেষ্টা করি নাই।'

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত তখন ইংরেজদের আনুকূল্য পেতে শুরু করেছে। হিন্দুরা দেড় শো বছর ধরে যে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে, ইংরেজরা 'ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি' নিয়ে সেই রকম পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে শুরু করেছে মুসলমানদের। ফলে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত তখন হিন্দু মধ্যবিত্তের সাথে স্বার্থের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। হিন্দু তখন বারবার ঐক্যের আহ্বান জানালেও মুসলমান ইতস্তত করছে। কারণ তার শিক্ষিত চোখে আরও কিছু মুসলমান-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড চোখে পড়ে গেছে। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলা পাঠ্যপুস্তক। সবগুলিই হিন্দু লেখকদের লেখা। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী দুঃখ করে বললেন– মুসলমান ছাত্ররা দুর্ভাগা। কারণ তাদের এমন বিদ্যা অধ্যয়ন করতে হয় যা পরিষ্কাররূপে অবমাননাকর ও বিজাতীয়। হিন্দু লেখকরা মুসলমানদের গালাগালি না দিয়ে কিছু লিখতে পারেন না। গালাগালির একটি তালিকা তুলে দিলেন তিনি। তাতে মুসলমানদের বলা হচ্ছে– যবন পিশাচ ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য নেড়ে চাষা ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের লেখার তীব্র প্রতিক্রিয়া আসাটাই স্বাভাবিক। তবে তা এলো যেমন গোঁড়া মুসলমানদের পক্ষ থেকে তেমনই এলো প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক মুসলমানদের কাছ থেকেও। ওয়াজেদ আলীর মতো অসাম্প্রদায়িক চেতনার লেখকও লিখতে বাধ্য হলেন– 'এখন আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, হিন্দু ভ্রাতাদের সম্বন্ধে একটুও বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য হিন্দুর সঙ্কীর্ণতা পনের আনা দায়ী।'

মোতাহার হোসেন চৌধুরী, যাঁর ধর্মই ছিল অসাম্প্রদায়িকতা, তিনি লিখলেন– 'এই বিরোধের গোড়ায় রয়েছে হিন্দু জাতীয়তার স্বপ্ন। হিন্দুর স্বপ্ন শুধু ইংরেজের কবল থেকে মুক্তি দাবী করেনি, হিন্দু ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও কামনা করেছিল। কংগ্রেসের গায়ে শেষ পর্যন্ত যে রং লাগল তা হিন্দু জাতীয়তার রং, আর সেই রঙের পূজাই শেষ পর্যন্ত সার্থক ভারতীয় জাতীয়তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানরা দেখলো এখানে তাদের ঐতিহাসিক মৃত্যু, তাই ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসহারা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে এই বিভাগ মিথ্যা নয় মোটেই।'

অনেক বছর পরে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী নির্মোহ ভাবে এই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যবিত্তীয় অর্থনৈতিক চরিত্রটি উন্মোচন করেছেন এইভাবে– 'মধ্যবিত্ত যখন গড়ে উঠছিল তখন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এর সদস্যরা সবাই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত; এই হিন্দু মধ্যবিত্ত নিজেদেরকে একটি জাতি মনে করতো। মুসলিম মধ্যবিত্ত তখনো মঞ্চে এসে পৌঁছেনি; যখন তারা এলো তখন দেখলো প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারছে না, ফলে তাদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হলো, তারা মনে করা শুরু করলো যে তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি। এই বোধটা যে পুরোপুরি আদর্শিক ছিল তা অবশ্যই নয়, কেননা এর মূলে ছিল প্রতিষ্ঠিত একটি মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাকামী একটি মধ্যবিত্তের বস্তুগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আবেগের আচ্ছাদনটি সরিয়ে ফেললে ভেতরে যা চোখে পড়তো সেটা হচ্ছে এই বাস্তবতা যে, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে মধ্যবিত্তের দুই অংশের মধ্যে চাকরি ও জনপ্রতিনিধিত্বের ভাগাভাগি নিয়ে টানাটানি।'

তাহলে আপামর নিম্নবিত্ত মুসলমান কৃষক বিনাপ্রশ্নে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিল কেন? তাদের দেখানো হয়েছিল খেলাফায়ে রাশেদিনের যুগে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন। বারো শো বা চোদ্দ শো বছর আগের পৃথিবীকে যে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তা বোঝার মতো শক্তি বাঙালি মুসলমান কৃষকের তখনও ছিল না, এখনও নেই। আর শ্রীমহছেনউল্লাহ সরকারের মতো মানুষরা চেয়েছিলেন, বাঙালি মুসলমান কৃষক মুক্তি পাক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শোষণ থেকে, ব্রিটিশের অন্যায় শাসন থেকে, আবার একই সাথে মুক্তি পাক হিন্দু জমিদারদের অসহিষ্ণু অমানবিক কার্যকলাপ থেকে, হিন্দু বাবুদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য থেকে। এইসব আকাঙ্ক্ষার বিপথগামী পরিণতির নাম পাকিস্তান। জিন্নাহ যে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষচক্র প্রয়োগ করে পাকিস্তান হাসিল করেছিলেন, তা তার হাতে তুলে দিয়েছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারাই।

স্বপন জিজ্ঞেস করল– তাহলে কি আমরা সাম্প্রদায়িক দেশভাগের জন্য জিন্নাহকে দায়ী করতে পারি না?

অবাক ইউসুফ বলল– এমন কথা আমি কোথায় বললাম! আমি শুধু বলতে চেয়েছি, আমাদের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ, যারা বঙ্গদেশের মুসলমান কৃষক, দেশভাগের জন্য তারা দায়ী নয়। অতএব কোলকাতার লেখকরা যখন মর্মস্পর্শী ভাষায় নিজের ভিটে ছেড়ে চলে যাওয়ার কষ্টের কথা লেখেন, তখন তাদের একথা মনে করিয়ে দেওয়া অন্যায় নয় যে আমাদের দেশের সকল বাঙালি মুসলমান লেখকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বড় অংশই হিজরত করে ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে এসেছিলেন। ভারত যে সবসময় জোর গলায় বলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালি শরণার্থীর বোঝা তাকে বইতে হয়েছে, তখন আমাদের বলা দরকার যে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিহারি মুসলমান মুহাজিরের বোঝা আমাদের ক্ষুদ্র দেশকে এখনও বহন করে চলতে হচ্ছে। আর বিনীত ভাবে এই দাবিটুকু করতে চাই যে, বাঙালি সমাজে সাম্প্রদায়িকতা শুরুর দায়ভার আমাদের বাঙালি মুসলমানদের নয়।

সাত

ঘুমমাখা চোখে দরজা খুলে সামনে একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে তার ছোট বোনের বান্ধবী ধরে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পেছনে ফিরেছিল ইউসুফ। ভালো করে তাকানোর বদলে অসমাপ্ত ঘুমের বিছানাই তাকে টানছিল বেশি। কিন্তু চোস্ত ইংরেজিতে 'এক্সকিউজ মি' শুনে ঘুরে তাকাতে হলো তাকে। আরে এ মেয়ে তো দেখে মনে হচ্ছে বিদেশী! যদিও পরনে সালোয়ার-কামিজ দেখে প্রথমে সে খেয়াল করেনি। একনজর পরিপূর্ণভাবে দেখেই বোঝা গেল পাশ্চাত্যের কোনো দেশের শ্বেতাঙ্গিনী তার সামনে দাঁড়ানো। সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ইউসুফ জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বলল– ইয়েস?

আই লাইক টু মিট মি. ইউ... ইউজেফ আমেদ। ইজ হি হিয়ার?

এবার মেয়েটিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ইউসুফ। তারপর ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করল– প্লিজ কাম ইন!

পরনের লুঙ্গিটা ভালোমতো বেঁধে নেওয়া দরকার। কারণ কোন রকমে দরজা খুলে দেবার জন্য সে কোমরে লুঙ্গি জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে। পায়ে কোনো স্যান্ডেল নেই। গায়ের গেঞ্জিটার দশাও খুব একটা ভালো নয়। কিন্তু পরক্ষণেই মন থেকে দূর করে দিল এসব চিন্তা। বাংলাদেশের মানুষ তো এভাবেই থাকে। বিদেশিনীর সামনে ফুলবাবু সেজে থাকলেই তো আর আমাদের সম্বন্ধে ওদের ধারণা পাল্টে যাবে না। তাহলে তো ঢাকায় আমাদের গরীব দেশের অসাধারণ ধনী ব্যবসায়ী, আমলা, কিংবা মন্ত্রী-এমপিরা-ই তো ওদের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারত।

ওদের বসার ঘরটাই আসলে ইউসুফের পড়ার ঘর। সেখানেই মেয়েটিকে নিয়ে এলো ইউসুফ। সোফা দেখিয়ে বলল– প্লিজ টেক এ সিট।

থ্যাংক ইউ!

মেয়েটি বসার উপক্রম করছে। সেই সময় ইউসুফ বলল– আমিই ইউসুফ আহমেদ।

মুসলমানমঙ্গল– দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসতে গিয়েও বসল না মেয়েটি। তার দিকে হাতটা বাড়াতে গিয়েও দ্বিধা করল। সম্ভবত তার মনে পড়ে গেছে যে বাংলাদেশে মুসলমান পুরুষরা কোনো মেয়ের সাথে হ্যান্ডশেক করে না। মৃদু হাসল ইউসুফ। তারপর দ্বিধা থেকে উদ্ধার করল মেয়েটিকে। হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। হ্যান্ডশেক করল মেয়েটি খুবই আন্তরিকতার সাথে। বলল– নাইস টু মিট ইউ! আই অ্যাম লিসবেথ।

নাইস টু মিট ইউ।

মেয়েটিকে আবার সোফায় বসার ইঙ্গিত করে নিজে নিচু সিঙ্গেল খাটের কোণায় বসল ইউসুফ। মেয়েটা ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাচ্ছে। বলে উঠল– বিউটিফুল!

থতমত খেয়ে গেল ইউসুফ। চল্টা ওঠা মেঝে। দেয়ালে সাদা চুন নেই বহুদিন থেকে। টিনের একচালার ফাঁক দিয়ে বর্ষার মৌসুম কিংবা অকাল বর্ষার পানি দেয়ালে দাগ রেখে যায় প্রতিনিয়ত। সেসব দাগ দৃষ্টিকটু রকমের প্রকট। যে খাটে সে বসে আছে তার একটা পায়ার নিচে ইট গুঁজে দেওয়া। আর যে সোফাতে বসতে দেওয়া হয়েছে মেয়েটিকে, সেটি বাবার রিটায়ারমেন্টের টাকায় কেনা। প্রায় বছর আষ্টেক বছর বয়স ওটার। এতগুলি বছরে নানা কিসিমের মানুষের নিতম্ব-পেষণে তার অবস্থা ভালো নয়। তাহলে কী দেখে মেয়েটি বিউটিফুল বলছে! ঠাট্টা করছে নাকি! কিন্তু তার দিকে ভালোমতো খেয়াল করে ইউসুফ বুঝল মেয়েটি ঠাট্টা করছে না। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তিনদিকের দেয়াল জোড়া চালাছোঁয়া বইভর্তি স্টিলের র‍্যাকগুলির দিকে।

একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে হাসল ইউসুফ– দিজ আর দি অনলি প্রপার্টি অব দিস ফ্যামিলি।

তারপর বাংলায় জিজ্ঞেস করল– আমাকে কেন খুঁজছেন আপনি? আপনি কি বাংলা বোঝেন? আমি ভালো ইংরেজি বলতে পারি না।

মেয়েটি বলল– একটু একটু, মানে ওল্প।

হেসে উঠল ইউসুফ– আমিও ইংরেজি পারি ওল্প ওল্প। মনে হচ্ছে ওল্প বাংলা আর ওল্প ইংরেজি দিয়ে কাজ চালানো যাবে। তা বলুন আমার কাছে আপনার কী কাজ?

আমি আপোনার কাছে বাংলাদেশের সং... সং... মানে কালচার জানতে চাই।

একটু গম্ভীর হয়ে গেল ইউসুফ। জিজ্ঞেস করল– আপনি কি চা খাবেন?

খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি– খেতে পারি। রোং চা। দুধ ছাড়া।

রং চায়ের কথাও শিখে ফেলেছেন আপনি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরের বারান্দায় একটা বড় টেবিলকে ডাইনিং টেবিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আসলে তা নামেই। কেউই সেখানে বসে খায় না। যার যার মতো খাবার বেড়ে নিয়ে চলে যায় ঘরে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায় খাবার। টেবিলে ইউসুফের জন্য রাখা সকালের নাস্তা। তিনটি আটার রুটি আর আলু-সিম ভাজি। ফ্লাস্কে চা থাকে। মনে মনে প্রার্থনা করল ইউসুফ, অন্তত দুই কাপ যেন হয়। হয়েও গেল। হতে পারে মা এখনও চা খায়নি। মা তার ঘর থেকে জিজ্ঞেস করল– কে এলো রে?

এই একজন মা! চা দিচ্ছি। আপনার চা খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ। কিন্তু খালি চা দিবি?

আর তো কিছু নাই। বিস্কুট-টিস্কুট আছে?

নাহ।

থাক, খালি চা-ই নিয়ে যাই।

চায়ের কাপ হাতে বাইরের ঘরে ফিরল ইউসুফ। একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল– ইন আওয়ার কান্ট্রি, দিস ইজ ইন বিটুইন টাইম অফ ব্রেকফাস্ট এন্ড লাঞ্চ। ব্রেকফাস্ট ইজ কমপ্লিটেড। লাঞ্চ ইজ ইন প্রোসেস। সো আই ক্যান অফার ইউ অনলি টি নাউ। ভেরি স্যরি!

ইটস ওকে। টি উইল বি ফাইন।

হাসিমুখে চায়ের কাপ হাতে নিল মেয়েটি। চুমুক দিল চায়ে।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করল– কতদিন থেকে আছেন বাংলাদেশে? আমাদের এই শহরে কতদিন? কী কাজ করেন আপনি?

আমি কাজ করি ইউএস পিস কোর্পস-এ। বাংলাদেশে আছি চোদো মাস। ফোরটিন মান্থস। মোট চার বছর থাকব।

বাংলাদেশের কালচার জেনে কী হবে? দেশে ফিরে গিয়ে বই লিখবেন?

নট নেসেসারিলি। মানে লিখতেও পারি হয়তো। কিন্তু আমি জানতে চাই।

আমার কাছে কেন এসেছেন? আমি আপনাকে বাংলাদেশের কালচার সম্পর্কে জানাতে পারব একথা কার কাছে শুনলেন?

মেনি, মানে অনেকজন বলেছে।

বাব্বাহ আমি যে এত পরিচিত তা তো নিজেই জানতাম না!

সরি?

না আপনাকে বলিনি। তা আপনি কোন কালচার সম্পর্কে জানতে চান? বাংলাদেশের কালচার জানার জন্য চার বছর যথেষ্ট সময় হতে পারে। বিবেচনার বিষয় হচ্ছে আপনি কোন কালচার সম্পর্কে জানতে চান? এইদেশে সরকার মানে গভর্নমেন্টের একটা কালচার আছে, এস্টাবলিসমেন্টের একটা কালচার আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর জেনারেল, মানে মাস পিপলের একটা কালচার আছে। আপনি কোনটা জানতে চান?

সবগুলিই। তবে মাস পিপল কালচার...

সরকারি কালচার মানে গভর্নমেন্ট আর এস্টাবলিসমেন্টের কালচার তো অলরেডি আপনি জেনে ফেলেছেন নিশ্চয়ই! সেটি সম্পর্কে আপনার দেশেই নিশ্চয়ই ব্রিফিং করা হয়েছে। এই দেশে পা দিয়ে যাদের সঙ্গে আপনাকে প্রথমে থাকতে হয়েছে, তারা তো এটা আপনাকে বুঝিয়ে ছেড়েছে নিশ্চিত ভাবেই।

হেসে ফেলল লিসবেথ– অলমোস্ট। ইউ আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট মি ইউজেফ আমেদ!

থ্যাংক ইউ ফর দি কমপ্লিমেন্ট! কিন্তু আমরা তো বুদ্ধিতে আমেরিকানদের হাঁটুর সমানও হতে পারব না।

কে বলেছে?

আমেরিকানরা বলে। আমাদের দেশের যারা আমেরিকানদের সাথে যোগাযোগ রাখে, তারা বলে। সামনাসামনি বলে, রেডিয়ো-টিভিতে বলে, পত্রিকায় ফিচার লিখে জানায়। তারা সেই জন্যই তো বলে আমেরিকা হচ্ছে স্বর্গরাজ্য। ড্রিম কান্ট্রি।

অ্যামেরিকা ইজ নট এ ড্রিম কান্ট্রি মি আমেদ। অ্যামেরিকা ক্যান নট বি এ ড্রিম কান্ট্রি। আই অ্যাম টেলিং ইউ দি ট্রুথ। অ্যাবসোলিউট ট্রুথ।

এবার ভালো করে মেয়েটির দিকে তাকাতে বাধ্য হলো ইউসুফ। জিজ্ঞেস করল– এই কথা কেন বলছেন? আপনি কি আমাকে খুশি করার জন্য বললেন? আপনি নিশ্চয়ই অলরেডি জেনে গেছেন যে আমি আমেরিকাকে ক্রিটিক করি!

নো। আমি সত্যি কথাটা বলেছি। আমি আমার দেশকে আইডিয়াল কান্ট্রি বলতে পারি না। ইটস নট অ্যান আইডিয়াল কান্ট্রি ফর ম্যানকাইন্ড।

আই নো। কিন্তু কোনো আমেরিকান এই কথাটা স্বীকার করবে সেটা আমি ভাবিনি। ইন ফ্যাক্ট যে ক'জন আমেরিকানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তাদেরকে আমার আমেরিকান ফরেন পলিসির মতোই ব্লাইন্ড মনে হয়েছে। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে তারা বেশ ভালো মানুষ, কিন্তু তারা তাদের আমেরিকান আইডেন্টিটি দিয়ে সব জায়গাতেই প্রায়োরিটি পেতে চায়। হয়তো এটা তাদের দোষ নয়। তারা সব জায়গায় এটা পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই এটাকে আর আনইউজুয়াল মনে করে না। তবে যাই হোক, আমেরিকানদের সম্বন্ধে আমি নিজে খুব একটা ভালো ধারণা পোষণ করি না।

তার জন্য কি আপোনি আমাকে অ্যাভয়েড করবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তবে আমি ভাবছি আমি কীভাবে আপনাকে আমাদের পূর্ণাঙ্গ কালচার দেখাব! আমার তো কোনো মেথডলজি জানা নেই।

ওহ নো! নো অ্যাকাডেমিক মেথড প্লিজ!

হেসে ফেলল ইউসুফ– ঠিক আছে। কিন্তু কীভাবে আমরা কাজটা করব তা তো ভাবতে হবে!

আমি আপোনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আমার অফিসিয়াল কাজ শেষ হলে আপোনি যেখানে যেখানে যাবেন আমি যাব। আমি উইকলি হলিডেগুলিতেও যেতে পারি। ইফ ইয়োর ওয়ার্কস আর নট ডিস্টার্বড!

আমার আবার কাজ! আমার কাজ তো এসবই।

এখোন আপোনারা কী কাজ করতেছেন?

আমরা এখন ইসলামোলজি নিয়ে কাজ করতে চাইছি।

ইসলামোলজি!

হেসে বলল ইউসুফ– শুনতে অবাক লাগছে? আসলে ইসলামোলজি নামে কোনো টার্মিওনোলজি নাই। আমরা নিজেরাই এটি ব্যবহার করছি খুবই লিমিটেড লেভেলে। এ টোটাল জার্নি ইন ইসলামিক থিয়োলজি, এন্ড ইসলামিক হিস্ট্রি, এন্ড ইসলাম রিলেটেড এনি অর অল সাবজেক্টস মিলে আমাদের ইসলামোলজি।

ফ্যানটাস্টিক! প্লিজ ইনক্লুড মি দেয়ার।

ইট ইজ জাস্ট ইন দি ইনিশিয়াল স্টেজ। আমরা, মানে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে এই বিষয়ে মারাত্মকভাবে কাজ করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কদ্দুর করতে পারব তা-ও জানি না।

আমি ইসলামিক কালচারে খুবই ইন্টারেস্টেড।

কেন? আমেরিকা থেকে আসার সময় আপনাকে ইসলাম সম্পর্কে ব্রিফিং করা হয়নি?

উত্তর দিতে দ্বিধা দেখা গেল লিসবেথের মধ্যে। হাসল ইউসুফ বলল– নিশ্চয়ই আমেরিকানরা মুসলমান বলতে বোঝে জোব্বা-পাগড়ি-টুপিঅলা মানুষ, তারা আমেরিকান বা ইউরোপিয়ানদের দেখলেই তাদের ওপর হামলা করে, মেন্টালি তারা সবাই ফ্যানাটিক, সাবহিউম্যান। তাই না?

ইতস্তত করে বলল লিসবেথ– অনেকটা...

আমেরিকান সাধারণ মানুষগুলো আর যাই হোক, অপ্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলে না আমাদের বাঙালি মুসলমানদের মতো। তিক্ততার সাথে কথাটা ভাবল ইউসুফ। তারপর ম্লান হেসে লিসবেথকে জিজ্ঞেস করল– তা এখানে এসে এই চোদ্দ মাসে কী দেখলেন? আপনার কল্পনার সাথে বা আপনাকে দেওয়া ব্রিফিং-এর সাথে মেলে এই দেশের মুসলমানরা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। এই জন্যই আমি বেশি ইন্টারেস্টেড। দেয়ার ইজ হিউজ গ্যাপ। জানি না কার দোষে? কিন্তু হিউজ গ্যাপ।

আমেরিকানদের দোষ। সরাসরি বলল ইউসুফ।

হাসল লিসবেথ– ও কে! আমেরিকানরাই গিল্টি। কিন্তু আমরা কি ইন্টার-পারসোনাল ডায়ালগ শুরু করতে পারি না?

হাসল ইউসুফও– অবশ্যই পারি।

মা ঢুকল ঘরে। ইউসুফ বলল– মাই মাদার!

তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল লিসবেথ। বিনয়ের সাথে বলল– আস সালামো আলায়কোম!

একেবারে গলে গেল মা। শ্বেতাঙ্গিনী একটি মেয়ে, কোন বিদেশ-বিভুই থেকে এসেছে, নিশ্চয়ই অন্য ধর্মের, সেই মেয়ে এত আদবের সাথে মুরুব্বিকে সালাম দিচ্ছে, বিশেষ করে যখন মায়েরা মনে করে আদব-লেহাজ উঠে গেছে আমাদের দেশ থেকে! মাকে গলিয়ে ফেলতে আর কী লাগে! স্নেহের হাসিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল মায়ের পুরো মুখমণ্ডল– বসো মা বসো! তোমার দেশ কোথায়?

আলাস্কা। আমেরিকায়।

এই জাগাত কী কাম করো?

কাজের প্রতিস্থাপনে কাম শব্দটি বুঝতে পারে না লিসবেথ। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় ইউসুফের দিকে। ইউসুফ বলে– ইয়োর জব হেয়ার।

ওহ। আমি যুব উন্নয়ন আছে না! সেখানে কম্পিউটার টিচ করি। আর ইংলিশ ল্যাঙ্গয়েজ টিচ করি।

মা আরও মুগ্ধ– সেই সাত সমুদ্দুর পার হয়ে তুমি আসিছো আমার দেশের মানুষের জন্যে কাম করতে। তোমরাই আল্লার সত্যিকারের বান্দা। তুমি কি মুসলমান?

এবার বিব্রত দেখায় লিসবেথকে। অন্য ধর্মের মেয়েকে একটি পরিবারের প্রাচীন মহিলা কোন দৃষ্টিতে দেখবে তা নিয়ে বোধহয় একটু চিন্তিতও। তবু বলে– না, আমি ক্রিশ্চিয়ান। রোমান ক্যাথলিক।

মা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় তার দ্বিধা– তা হোক, খিস্টান হও আর যাই হও, তুমি তো আসিছো ভালো কামের জন্যে। আল্লার কাছে যে ভালো কামে নামে তার মর্যাদা বেশি। সে যে ধর্মেরই মানুষ হোক।

ইউসুফ বলল– আমি একটু বেরোবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পষ্টতই বোঝা গেল লিসবেথও ইউসুফের সঙ্গে বেরোতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার এই ইচ্ছাকে পাত্তাই দিল না মা– তাই কি হয়? আজ তুমি পয়লা দিন এই বাড়িত পা রাখিছো। দুপুরে ভাত না খেয়ে তো যাওয়া যায় না মা। ইউসুফ তো বাইরে যায়া বসবি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে। তুমি আমার সাথে থাকো আজ সারাদিন।

লিসবেথ বুঝতে পারে না কী করবে। ইউসুফ বলে– ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। ইউ উইল বি অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ইনারমোস্ট কালচারাল হ্যাবিটস অফ এ লোয়ার-মিডলক্লাস মুসলিম ফ্যামিলি।

মায়ের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়ে গেল লিসবেথ। ইউসুফ বের হওয়ার সময় মা বলল– বাড়িত মেহমান আছে সেই কথা য্যান মনে থাকে। আজ য্যান সাঁঝ করে ফিরিস না! আর মেহমানের পাতে দেওয়ার মতোন দুই-একটা মিষ্টি নিয়া আসিস।

আট

যতীন সরকার প্রয়োজনের চাইতেও জোর দিয়ে বলছিলেন– আরে ধর্মীয় মৌলবাদী হওয়া তো খুব ভালো জিনিস!

ইউসুফের পাশাপাশি গোলাম ফারুক খান, কবি নূরুল হক, কবি মাহবুব-উল-করিম, বিজ্ঞানচিন্তা পরিষদের ডা. মনিরুল ইসলামও একথা শুনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই যতীন সরকারের এ ব্যাপারে নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই কথা না বলে চুপ করে বসে রইল সবাই। যতীন সরকারই আবার নিজের কথার খেই ধরলেন– মৌলবাদ এসেছে মৌল বা মৌলিক শব্দ থেকে। যারা ধর্মের মৌলিক জিনিসগুলির ওপর বিশ্বাস রাখে, এবং সেইগুলিকে ভিত্তি করে কাজ করে তারাই না ধর্মীয় মৌলবাদী! ঠিক তো?

হ্যাঁ ঠিক।

তাহলে ধর্মের মৌলিক জিনিস কী কী? ইহকালীন এবং পরকালীন মঙ্গলের জন্য কাজ করা; বিশ্ব মানব সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা; আল্লাহর সম্পদ থেকে কাউকে বঞ্চিত না করা; মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি না করা; পৃথিবীর একপ্রান্তের মানুষ বিপদে পড়লে আরেক প্রান্তের মানুষের সাহায্য নিয়ে ছুটে যাওয়া; মিথ্যা না বলা; চুরি-ডাকাতি না করা; অন্যের সম্পদ বা এককথায় জানমালের জন্য হুমকি সৃষ্টি না করা– এই সবই তো ধর্মের মৌলিক জিনিস। এই সব মৌলিক জিনিস মেনে যদি কেউ মৌলবাদী হয় তো খুবই ভালো কথা! এই রকম ধর্মীয় মৌলবাদী পৃথিবীতে যত বেশি হবে, পৃথিবী তত বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে। পৃথিবীতে সত্যিকারের ধর্মরাজ্য স্থাপিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরে আবার সেই নির্মল প্রাণখোলা হাসি।

যতীন সরকারের ব্যাখ্যা যদি ধর্মীয় মৌলবাদীরা গ্রহণ করে নিজেদের সেভাবে তৈরি করত, তাহলে পৃথিবী তো সত্যিই সব ধরনের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকত। কিন্তু কেউই এখন আর নিজের নামের সঙ্গে মৌলবাদী শব্দটি যুক্ত হওয়া পছন্দ করে না। সম্ভবত ওসামা বিন লাদেনও করে না, তালেবানরাও করে না, জর্জ বুশও করে না, ইহুদি মেনাহিম বেগিনও করে না, বাংলা ভাই বা শায়খ আবদুর রহমানও করত না। কেননা মৌলবাদ শব্দটি আজ পৃথিবীর সকল মুক্তবুদ্ধির ও স্বাভাবিক চিন্তার মানুষের কাছে একটি ঘৃণিত শব্দ।

বাপ্পী বলে– ঠিকই তো। যতীন সরকার তো ঠিক ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

ইউসুফ হাসে– কখনও কখনও একটা শব্দ তার মূল অর্থ হারিয়ে অন্য তাৎপর্য নিয়ে ব্যবহৃত হয়। তখন সেই শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ কেউ খুঁজতে যায় না। ধরো মীর জাফর নামটি তো খারাপ নয়। কিন্তু এই উপমহাদেশের যে কোনো ভাষার যে কোনো ধর্মের মানুষের কাছে মীর জাফর শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক। রাজাকার কি খারাপ শব্দ? তার অর্থ তো সাহায্যকারী। কিন্তু তোমাকে কেউ রাজাকার বললে তোমার গায়ে-মাথায় আগুন ধরে যায় কেন? কারণ রাজাকার শব্দটা আমাদের দেশে এখন খুবই খারাপ একটা গালি। আল-বদর তো ইসলামের বদর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা মহান শব্দ। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার কাছে আল-বদর হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথার খুনি, পাকিস্তানি বাহিনীর সবচেয়ে ঘৃণিত দোসর, যারা এই দেশের বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যা করেছিল, যাতে স্বাধীন হয়েও বাঙালি মুসলমানরা মেধাশূন্যতায় ভোগে। সেই রকম মৌলবাদী শব্দটিও এখন গালি। কেউ কাউকে মৌলবাদী বললে সে এই কারণেই রেগে যায়।

সাদী ওস্তাদ যোগ করে– রাগবেই তো। নিজেকে কে গোঁড়া, অন্ধ, অবিবেচক, যুক্তিহীন, অশিক্ষিত, সমাজের প্রগতি রুদ্ধকারী হিসাবে স্বীকার করতে চায়?

বাপ্পী ফিক করে হাসে– সত্যিকারের মৌলবাদী পর্যন্ত নিজেকে মৌলবাদী বলে স্বীকার করতে নারাজ। এমনকি নিজের কাছে কনফেশনের সময় পর্যন্ত না।

হেসে উঠল সবাই। বোঝো তবে মৌলবাদী শব্দটি এখন কত বড় গালি!

সাদী ওস্তাদ যোগ করে– তবে মৌলবাদ কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। যে কোনো মতবাদের ক্ষেত্রেই মৌলবাদী তৈরি হয়ে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই পারে। এবং হয়েছেও তাই। ধর্মীয় মৌলবাদের বাইরে মতবাদের মৌলবাদীও অনেক তৈরি হয়েছে। তারাও তো দুনিয়া জুড়ে রক্তারক্তি কম করেনি।

স্বপন বিড়বিড় করে বলল– যত দোষ নন্দ ঘোষ! অথচ দ্যাখো, এখন সবাই বোঝাতে চায় যে মৌলবাদ মানেই হচ্ছে ইসলামি মৌলবাদ!

তিক্ত হাসল ইউসুফ– অথচ মৌলবাদ 'শব্দ' বা 'ধারণা' কোনোটিই মুসলমানদের তৈরি করা নয়।

বোঝো অবস্থা! আর কত একতরফা মিথ্যা অপবাদ বইতে হবে মুসলমানদেরকে? কতদিন যে বইতে হবে সেটাই বা কে জানে?

সাদী ওস্তাদ গম্ভীরভাবে বলে– যতদিন না মুসলমানরা মানুষ হচ্ছে!

একটু অস্বস্তি নেমে আসে আড্ডায়। কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙে ইউসুফই– আপনার ক্ষোভ-কষ্ট আমরা সবাই বুঝতে পারছি ওস্তাদ। একই কষ্ট তো আমাদের সবারই। তবে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে একটা ধর্মীয় গোষ্ঠী যখন শত শত বছর ধরে অন্যের অধীন থাকে, অন্যদের দ্বারা অন্যায়ভাবে অসম্মানীত হতে থাকে, তখন তার বিহ্বলতা আসবেই। আর তার ফাঁক গলে ঢোকে নানা রকম বিচ্যুতি, নানা রকম ভুল প্রতিক্রিয়া। এই অবস্থা তো আর অনন্ত কাল ধরে চলতে দেওয়া যায় না। তাই একদিকে যেমন আমাদের নিজেদের ভুলগুলিও খুঁজে বের করতে হবে, আবার একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে।

সাদী ওস্তাদের কণ্ঠে শ্লেষ– আমরা কি ইসলাম ধর্মের ত্রাণকর্তা সাজতে চাইছি?

ব্যঙ্গের উত্তরে রাগল না ইউসুফ। শান্ত কণ্ঠে বলল– মোটেই তা নয়। সারা পৃথিবীতেই এখন ইসলাম নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা চলছে। ধর্ম আর এখন কোনো প্রান্তিক বিষয় নয়। মুসলমানরা এখন যেমন নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা সেরে নিতে চাইছে, তেমনই বোঝাপড়া সেরে নিতে চাইছে আমেরিকা-ইউরোপের নেতৃত্বাধীন ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মের সাথে, এবং অন্যান্য সব ধর্ম আর মতবাদের সাথেও। সেই কাজে আমাদের সবারই নিজেদের মতো করে যদি অংশগ্রহণ না থাকে, তাহলে নতুন যে বিশ্বব্যবস্থা তৈরি হবে, তা থেকে আমরা অন্ধ হয়ে থাকব। সেটা কি আমরা নিজেরা চাইব?

প্রশ্নই ওঠে না। স্বপন বলল– আমাদের আলোচনা চলতে থাকবে। আমরা সবাই হয়তো সমান পরিমাণ অ্যাক্টিভিস্ট হবো না। কিন্তু বিশ্লেষণ থেকে দূরে সরে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তুমি মৌলবাদ সম্পর্কে কী যেন বলছিলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছিলাম এই মৌলবাদ শব্দ বা কনসেপ্ট কোনোটাই মুসলমানদের তৈরি করা নয়।

কে বানাল তাহলে?

পোপ দশম পায়াস ১৯০৭ সালে প্রথম ব্যবহার করেন ফান্ডামেন্টালিস্ট শব্দটি। আমেরিকান প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা প্রথম নিজেদের ফান্ডামেন্টালিস্ট বলে পরিচয় দেয়। কাজেই শব্দটির উদ্ভাবক খ্রিস্টানরা। আর মৌলবাদ 'ধারণা' বা কনসেপ্টটি প্রথম ব্যবহার করে ইহুদিরা। ইতিহাসে প্রথম সংগঠিতভাবে মৌলবাদের চর্চাও করে ইহুদিরা। তাওরাতের ৬৩১ টি বিধিনিষেধকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে তাদের মৌলবাদ।

আরেক রাউন্ড চায়ের অর্ডার দেয় কামাল। এক ভিখিরি মেয়ে ঘ্যানঘ্যান করছিল কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে। তাকে তাড়াতাড়ি দুই টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করতে চাইল কামাল। কিন্তু উল্টো হলো ফলাফল। গ্রুপের সবাইকে দয়াবান ধরে নিয়ে সবার সামনে পালাক্রমে হাত বাড়াতে শুরু করল মেয়েটা। একটু দূর থেকে এই ভিখিরিকে টাকা দিতে দেখেছে আরও কয়েকজন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে ছেঁকে ধরল গ্রুপটাকে। বিসমিল্লা আল্লা লা ইলাহা ছাড়া আর কিছু মুখে নেই। হাত বাড়ানো ওদের মুখের কাছে। বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল ইউসুফের। একবার নিজেকে কল্পনা করল ঐ ভিক্ষুকদের সারিতে। কোনো সন্দেহ নেই, সাদা চামড়ার মানুষদের সামনে এই রকম হাত পেতে না দাঁড়ালেও আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রীদের চোখের দৃষ্টিতে এই রকমই অনুনয় লেপ্‌টে থাকে। মনের ভেতর ভর করে আসে হতাশা। কোটি কোটি এই রকম মানুষের একটি জাতিকে নিয়ে কতদূর আর এগুনো সম্ভব! ভিখিরিগুলোকে মনে হয় মাছের ডালার চারপাশে ভন ভন করা মাছির মতো। হাজার চেষ্টা করেও মনের মধ্যে এই রকম মানুষের জন্য একটু শ্রদ্ধাবোধও খুঁজে বের করতে পারে না ইউসুফ। কোনো রকমে লোকগুলিকে বিদায় করে ইউসুফ বলে সাদীকে– আমরা যেভাবে ঐ ভিখিরিগুলোকে দেখে বিরক্ত হই, সেই রকমই পাশ্চাত্যের ধনীরা আমাদেরকে দেখে উত্যক্ত বোধ করে তাই না ওস্তাদ?

সাদী বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়– কী রকম বোধ করে তা বুঝতে পারবে ইউরোপের কোনো এয়ারপোর্টে বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট বের করে দেখাও যদি।

আসল বিষয় থেকে দূরে সরে যেতে রাজি নয় কামাল। বলে– আমাদের আলোচনায় আসি।

হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে বটে, কিন্তু আসলে খেই হারিয়ে ফেলেছে ইউসুফ। বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে মনটা। তাই আলোচনাতে আবার মন বসাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়।

পৃথিবীতে তিনটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্ম হচ্ছে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম। এই তিন ধর্মের মধ্যে মিল রয়েছে অনেক। কিন্তু পরস্পরের সহায়ক না হয়ে তিন ধর্ম শত শত বছর ধরে পরস্পরকে ঘায়েল করতে ব্যস্ত। কোন ধর্ম সঠিক তা নিয়ে বিতর্কের কোনো শেষ নেই। তা কোনোদিন মীমাংসা হবে বলে মনে হয় না। এই বিতর্ক নিয়ে চমৎকার একটি গল্প আছে।

একবার এক মুসলমান বাদশাহ এক ইহুদি পণ্ডিতকে ডেকে বললেন– বন্ধুবর, আমি বিভিন্ন মানুষের মুখে শুনতে পাই যে আপনি অসাধারণ প্রজ্ঞাবান একজন মানুষ। আমি একটি সমস্যার সর্বজনমান্য একটি সমাধান চাই। আচ্ছা বলুন তো, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম– এই তিন ধর্মের মধ্যে কোনটিকে আপনি সবচেয়ে সঠিক মনে করেন?

ইহুদি পণ্ডিত চালাক। সরাসরি যদি বলেন যে তার নিজের ধর্ম সঠিক, তাহলে মুসলমান বাদশাহ তার ওপর নাখোশ হবেন। আবার তিনি যদি বাদশাহকে খুশি করার জন্য বলেন যে ইসলাম ধর্মই সঠিক, তাহলে বাদশাহ বলে ফেলতে পারেন যে আপনি ইসলাম ধর্মকে যদি সঠিকই মনে করে থাকেন তাহলে এখনই সেই ধর্ম গ্রহণ করুন। ইহুদি পণ্ডিত তখন এক গল্পের মাধ্যমে বাদশাহর প্রশ্নের উত্তর দিলেন–

একসময় খুবই বিত্তবান একজন মানুষ ছিলেন। তার ধনসম্পদ ছিল অনিঃশেষ। কিন্তু সব ধনসম্পদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিল একটি মহামূল্যবান আংটি। সেই বিত্তবান ব্যক্তি ঠিক করলেন যে এই আংটিই হবে তার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারির প্রাপ্য। তিনি উইল করলেন যে, তার মৃত্যুর পরে তার ছেলেদের মধ্যে যার কাছে এই আংটিটি পাওয়া যাবে, সেই ছেলেই তার উত্তরাধিকারি মনোনীত হবে। সবাই সেই ছেলেকেই তার উত্তরাধিকারি হিসাবে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেবে। যে ছেলেকে তিনি মৃত্যুর সময় আংটি দিয়ে গেলেন, সেই ছেলেও নিজের মৃত্যুর সময় বাবার পথই অনুসরণ করল। এইভাবে আংটিটি বংশানুক্রমিকভাবে হাতবদল হয়ে চলল। অবশেষে এই আংটি এমন এক ব্যক্তির হাতে এলো, যিনি তার তিন ছেলেকেই সমান ভালোবাসতেন, একই সমান স্নেহ করতেন। আংটিটি কাকে দিয়ে যাবেন সে ব্যাপারে মনস্থির করতে না পেরে তিনি তিন ছেলেকেই গোপনে গোপনে ডেকে বললেন যে তিনি তাকেই আংটিটি দিয়ে যাবেন। কিন্তু এখানেও তো সমস্যা। কারণ আংটি তো মাত্র একটি। একটি আংটি তিনি তিনজনকে দেবেন কেমন করে! অনেক ভাবনা-চিন্তা করে তিনি সেই রাজ্যের সবচেয়ে ভালো সোনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারিগরকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন যে যত টাকা সে মজুরি চায় তিনি তা দিতে রাজি আছেন, কারিগরকে এই আংটির মতো আরও দুইটি আংটি হুবহু বানিয়ে দিতে হবে। ওস্তাদ জহুরি এমন সুন্দরভাবে আরও দুইটি আংটি বানিয়ে আনল যে স্বয়ং মালিকের পক্ষেই আর সনাক্ত করা সম্ভব হলো না যে কোন আংটিটি আসল। তিনি মৃত্যুশয্যায় তিন পুত্রের প্রত্যেককেই একটি করে আংটি দিয়ে গেলেন। ফলে প্রত্যেকেই বাবার মৃত্যুর পরে নিজের উত্তরাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আংটি উপস্থিত করল। কিন্তু কোন আংটি যে আদি তা তখন আর কারও পক্ষে শনাক্ত করা সম্ভব হলো না। এমনকি যে জহুরিকে দিয়ে পরে দুইটি আংটি বানানো হয়েছিল, সে পর্যন্ত পারল না সঠিক বা আদি আংটিটিকে আলাদা করতে। তাই আদালতে আজ অবধি সেই মামলা চলছে। জাঁহাপনা, আমাদের তিন জাতিকে ঈশ্বর যে তিনটি ধর্ম দিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। তারা প্রত্যেকেই মনে করে যে তার নিজের ধর্মই সঠিক। কিন্তু কার কাছে যে সঠিক আংটির মতো সঠিক ধর্মটি রয়েছে, তা কেউই নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবে না। সেই প্রশ্ন আজও ঐ আংটির মতোই অমীমাংসিত। একমাত্র পরকালই তা নির্ধারণ করতে পারবে।

আড্ডার সবাই গল্পটি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মোটাবাবু আস্তে আস্তে বলল– সবাই যদি পরকালে আল্লাহর বিচার নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা করে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে যেত, তাহলে তো পৃথিবীতে কোনো ঝগড়া-ফ্যাসাদই থাকত না।

AMARBOI.COM

নয়

বাড়িতে ততক্ষণে লিসবেথের সব তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে ফেলেছে মা। যত রকম স্নেহের অত্যাচার আছে, সব সহ্য করতে করতে বেচারা লিসবেথের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

লিসবেথকে যে মায়ের খুবই পছন্দ হয়েছে তা বোঝা গেল ইউসুফের সাথে মায়ের নরম ব্যবহার দেখে। মা ইউসুফকে এক ফাঁকে বলল– মেয়েডা খুব ভালো! খুব লক্ষ্মী। আর নরম-সরম। বিদেশী অন্য মেয়েদের মতোন না।

হেসে ফেলল ইউসুফ। মা আবার কবে কয়টা বিদেশী মেয়ে দেখল!

মা পাত্তাই দিল না ইউসুফের কথায়– বেশি দেখা লাগে না। এমনিই বুঝা যায়। শুনছি না কত বিদেশী মেয়ের গল্প!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতে বসে দেখা গেল টেবিলে মাছ-মাংসের চিহ্ন নাই। ভাজি-ভর্তা-সবজিতে টেবিল ভর্তি। কী ব্যাপার? মা জানাল, লিসবেথ নাকি মাছ-মাংস খায় না। তাই এই ব্যবস্থা।

লিসবেথ জানাল এই চোদ্দ মাসে সে খেয়াল করেছে বাঙালিরা খুব মাছ-মাংস খায়।

তিক্তস্বরে বলল ইউসুফ– আপনি কি জানেন যে আমাদের দেশের কত পার্সেন্ট মানুষ বছরে মাত্র একবার, মানে কোরবানির ঈদে, মাংস খেতে পায়?

না তো। আমি জানি না।

থাক আর ডেটা নিয়ে কাজ নেই। এই দেশের গরীব মানুষদের কথা আপনি কিছুই তেমন জানেন না। আপনি যাদের মাছ-মাংস খেতে দেখেছেন, তাদের নিশ্চয়ই দেখেছেন ঢাকার বড় বড় হোটেলে বা পার্টিতে?

পারহ্যাপস! মে বি ইউ আর রাইট।

বাদ দিন। আপনি কি ছোট থেকেই ভেজিটেবিল খান?

না। এইই পাঁচ বচ্ছর থেকে।

মাছ-মাংস খাওয়া বাদ দিলেন কেন? কোনো অসুখ করেছিল?

না। শুনেছি ফিস-মিট এইসব শরীরের জন্য ভালো না। ভেজিটেবিল মানুষকে মেন্টালি পিস দেয়। মানে হেল্পফুল। মানে ন্যাচারাল।

মাংস খাওয়া কি মানুষের জন্য ন্যাচারাল নয়?

আই ডোন্ট নো। বাট ভেজিটেবিল ইজ মোর ন্যাচারাল।

তাহলে মানুষের ক্যানাইন টিথ আছে কেন লিসবেথ?

ক্যানাইন টিথ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল লিসবেথ।

ওপরের ঠোঁট উল্টে তাকে নিজের ছেদন-দন্ত দেখাল ইউসুফ– দিস ইজ ক্যানাইন টিথ। এই দাঁত থাকা প্রমাণ করে যে মানুষ মাংসাশি প্রাণী। বিবর্তন মানেন?

স্যরি!

ইভোলিউশন। ডারউইনিজম।

ওহ। আমি আসলে খুব ভালো ডারউইন জানি না।

আমিও যে ডারউইনের তত্ত্বের মাস্টার তা নয়। তবে এটুকু জানি যে মানুষের ক্যানাইন টিথ থাকায় মানুষের পক্ষে এই পৃথিবীতে টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কোনো কোনো প্রাণী শুধু ভেজিটেবিল খায়। কোনো কোনো প্রাণী শুধুই মাংস খায়। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে দু'টোই খায়। তার শরীরের ভেতর যে এনজাইমগুলি অছে, সেগুলি প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ্জ দুই ধরনের খাদ্যই হজম করতে পারে। এই কারণেই মানুষ সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ করেই বেঁচে থাকতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে যাকে ব্যালান্সড ফুড বলে, তাকে হতে হবে দুই ধরনের খাবারেরই কম্বিনেশন। বাট রাইট নাউ ইউ ক্যান টেক ইয়োর ফুড অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর লাইকিং।

খাওয়ার পরে ইউসুফের মোবাইল নম্বর নিল লিসবেথ। নিজেরটা জানাল। তারপর জানতে চাইল– আবার কবে দেখা হবে?

যেদিন আপনি চাইবেন।

আপোনার অফিস নাই?

এখন কোনো অফিস নাই।

কেন?

উত্তরটা দিল মা– উনি মাসে মাসে চাকরি পাল্টান। মানুষে চাকরি পায় না। আর উনি যে চাকরিতেই ঢুকেন, সেটাই তার পছন্দ হয় না। এই ছেলেডাক নিয়া যে আমি কী করব! তা তুমি মা রোজ আসবে। কোনো অসুবিধা নাই। আমি সারাদিন বাড়িত একা একা থাকি। তুমি যখন খুশি চলে আসবে।

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল লিসবেথ। তারপর আবার ইউসুফের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল– আমার লেসন কখন শুরু হবে?

হাসল ইউসুফ– অলরেডি শুরু হয়ে গেছে।

থতমত খেয়ে গেল লিসবেথ। তারপর বুঝতে পারল কথাটার তাৎপর্য। স্বীকার করল– আমি বুঝতে পারি নাই।

লিসবেথকে রিকশায় তুলে দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এলো ইউসুফ। লিসবেথ বলল– দরকার নেই। আই ক্যান ম্যানেজ।

ইউসুফ শুধু বলল– ইট ইজ আওয়ার আদব।

আদব?

ওয়েল, ইউ ক্যান সে ইট এটিকেট। বাঙালি এটিকেট।

ওহ। দ্যাটস ফাইন।

রিকশায় উঠতে গিয়েও একটু দ্বিধা করল লিসবেথ। শেষ পর্যন্ত করেই ফেলল প্রশ্নটা– আপোনি বললেন অ্যামেরিকান পছন্দ করেন না। আপনার কি মনে হয় অ্যামেরিকার কিছুই ভালো নাই?

তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল ইউসুফ– যখন কোনো জাতি অনেক বছর ধরে অন্যের ওপর নেতৃত্ব দিতে পারে, তখন বুঝতে হবে যে সে শুধু তার আর্মড ফোর্স দিয়ে বা টেকনোলজি দিয়ে বা বস্তুগত রিসোর্স দিয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই তার সোসাইটির ভিতর এমন কিছু পজিটিভ ভ্যালুজ আছে, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে সবসময়ই নৈতিক শক্তি যোগাতে পারে। হতে পারে সেগুলি সম্পর্কে আমরা জানি না। সেগুলি আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব।

খুব নির্ভার দেখাল লিসবেথকে– থ্যাংক ইউ মি ইউজেফ। মেনি থ্যাংকস! আবার দেখা হবে। কথা হবে সেলফোনে।

দশ

ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রতি কেমন ছিল হজরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর মনোভাব?

"তোমরা কিতাবিদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করবে তাদের সাথে নয়। আর বলো, 'আমাদের ওপর ও তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই আর তাঁরই কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।" (আল কোরআন– ২৯:৪৬)

"তোমরা বলোঃ আমরা আল্লাহয় বিশ্বাস করি
আর যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল
ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে
এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ঈসা, মুসা ও
অন্যান্য নবীকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না
এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।" (আল কোরআন– ২:১২৯-৩২)

রাসুল হজরত মুহাম্মদ(সাঃ) তো বটেই, কোনো মুসলমান কখনোই ইহুদি বা খ্রিস্টানদের নবী সম্পর্কে কোনো অশালীন বা কুৎসামূলক শব্দ উচ্চারণ করেননি। কারণ হজরত মুসা(আঃ), ইহুদিদের নবী, ইহুদিরা যাকে মোজেস বলে ডাকেন, তিনি মুসলমানদেরও সম্মানীত নবী। একইভাবে যীশুখ্রিস্ট, খ্রিস্টানদের ত্রাণকর্তা ও নবী, মুসলমানদের কাছেও সম্মানীত হজরত ঈসা(আঃ) হিসাবে। পূর্ববর্তী কোনো নবী বা রাসুল সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে মুসলমানদের সুস্পষ্টরূপে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আরবদের কোনো নতুন বাণী শিক্ষা দেননি হজরত মুহাম্মদ(সাঃ)। ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা যেমন মনে করত, আরবের কুরাইশদেরও অধিকাংশই তখন বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনিই শেষ বিচারের দিনে সব মানুষের বিচার করবেন। কাজেই মুহাম্মদ(সাঃ) কখনোই ভাবেননি যে তিনি নতুন একটি ধর্ম নিয়ে এসেছেন। বরং তিনি আরবদের কাছে একমাত্র ঈশ্বরের প্রাচীন বিশ্বাসই আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, যাদের কাছে এর আগে কোনো পয়গম্বর আসেননি। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ব্যক্তিগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা ঠিক নয় বরং সম্পদ বণ্টন করাই মঙ্গল; আর এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা উচিত যেখানে অসহায় এবং দুর্বলরা সমান সম্মান লাভ করতে পারবে।

মুহাম্মদ(সাঃ)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তাঁর পূর্বে অন্তত দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এসেছেন। অসীমতা বোঝানোর জন্য এই সংখ্যাটি একটি প্রতীকি সংখ্যা। এই সংখ্যার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে মানব জাতির যেভাবে চলা উচিত, কীভাবে সেই পথে চলতে হবে, সেই সম্পর্কে আল্লাহ মানবজাতির কোনো গোষ্ঠীকেই অজ্ঞ রাখেননি। প্রত্যেক পয়গম্বরই তাঁর নিজ নিজ জাতি-গোষ্ঠীর কাছে আল্লাহর প্রত্যাদেশ পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু অবশ্যই মূলবাণী একই ছিল। অবশেষে আল্লাহ মুহাম্মদ(সাঃ)-এর মাধ্যমে আরব বা কুরাইশদের কাছে একজন পয়গম্বর এবং একটি ঐশীগ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। কোরআন বারবার উল্লেখ করেছে যে, মুহাম্মদ(সাঃ) পুরনো ধর্মগুলিকে রদ করার জন্য আসেননি। তাদের পুরাতন পয়গম্বরদের বিরোধিতা করতে বা নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতেও আসেননি। তাঁর কাছে প্রেরিত বাণী আব্রাহাম বা ইব্রাহিম(আঃ), মোজেস বা মুসা(আঃ), ডেভিড বা দাউদ(আঃ), সলোমন বা সোলায়মান(আঃ), যীশু বা ঈসা(আঃ) এর কাছে প্রেরিত বাণীরই অনুরূপ। কারণ সঠিক পথে পরিচালিত সকল ধর্মবিশ্বাস যা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পিত, যা মানবসৃষ্ট দেবতাকে উপাসনা করতে অস্বীকৃতি জানায়, এবং ন্যায়বিচার ও সাম্যের কথা বলে, সেগুলি সবই একই স্বর্গীয় উৎস থেকে আগত। এই কারণে মুহাম্মদ(সাঃ) কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টানকে সরাসরি কখনও ইসলাম গ্রহণের আহ্বানও জানাননি। কেননা তারাও তাদের নবীদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বৈধ নিজস্ব প্রত্যাদেশ লাভ করেছিল। তবে কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান নিজের ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তিনি বাধা দেননি। কোনো কোনো বন্ধুভাবাপন্ন ইহুদির কাছ থেকে তিনি কিছুটা তাওরাত জেনেছিলেন। বুক অব জেনেসিসের একটি অধ্যায় শুনে মুহাম্মদ(সাঃ) খুবই খুশি হয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে আব্রাহামের দুই পুত্র ইসহাক এবং ইশমায়েল। আরবিতে ইশমায়েলের নাম হয়েছে ইসমাইল। আব্রাহাম তাঁর উপপত্নী হ্যাগার (হাজেরা) ও পুত্র ইসমাইলকে বিরান প্রান্তরে নির্বাসন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করেন, এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে ইসমাইলও এক মহান আরবজাতির পিতা হবেন। মুহাম্মদ(সাঃ)-এর কাছে এই কাহিনী খুবই অনুপ্রেরণার মনে হয়েছে। কারণ এই অংশ থেকেই বোঝা যায় যে আরবরা আল্লাহর স্বর্গীয় পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়া জাতি নয়। এর আগে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা কুরাইশ ও আরবদের এই বলে হেয় প্রতিপন্ন করত যে তাদের নিজেদের কোনো নবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই; এবং ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় পরিকল্পনা থেকে বর্বর আরবদের বাদ দিয়ে রেখেছেন। এটি ছিল আরবদের সীমাহীন মনঃকষ্টের কারণ।

মদিনাবাসীদের সাথে প্রথম বৈঠক এবং শপথের (আকাবা) পর মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কয়েকটি ইহুদি রেওয়াজের প্রচলন করেন। নিঃসন্দেহে এসবের মাধ্যমে ইহুদিদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি। আবার একই সাথে এই ঘটনা ইহুদি ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধেরও পরিচয় দেয়। সাহাবি মু'সাবকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতি শুক্রবার দুপুরে মুসলমানদের জন্য একটি জমায়েতের ব্যবস্থা করার জন্য। এই সময় ইহুদিরা তাদের শনিবারের সাবাথের প্রস্তুতি নেয়। এই ব্যবস্থার ফলে কৌশলে একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও এই নতুন প্রার্থনাকে ইহুদিদের সাপ্তাহিক উৎসবের সঙ্গে মেলানো গিয়েছিল। এরপর তিনি ইহুদিদের ইয়োম কিপ্পুর (প্রায়শ্চিত্ত দিবস) উপলক্ষে মুসলমানদেরকেও রোজা পালনের নির্দেশ দিলেন। ইহুদি মাস 'তিশরি'র দশ তারিখে পালিত হতো এই দিবসটি। মুসলমানরাও যথারীতি এটিকে 'আশুরা' নামে আখ্যায়িত করেন, আরবি এই শব্দের অর্থও হচ্ছে দশম। এর আগে মুসলমানরা শুধু সকাল আর রাতে নামাজ পড়তেন। ইহুদিদের দেখাদেখি এখন থেকে তাঁরা দিনের মধ্যভাগেও নামাজ পড়তে শুরু করলেন। মুসলমানদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে তাঁরা ইহুদি নারীদের বিবাহ করতে পারবেন। এবং ইহুদি খাদ্য গ্রহণ করতেও তাদের কোনো বাধা নেই। ইহুদিদের অনুসরণে মুসলমান বালকদের খৎনা করার প্রথা চালু করা হলো। সর্বোপরি, মুসলমানদেরকে জেরুজালেমকে কেবলা হিসাবে ধরে নামাজ পড়ার কথা বলা হলো। পরবর্তী বারো বৎসর মুসলমানরা নামাজ আদায় করেছেন জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে। তারপরে সুস্পষ্ট ওহি নাজিল হওয়ার প্রেক্ষিতে কেবলা পরিবর্তন করা হয় কাবার দিকে। তা সত্ত্বেও কোরআনে ইয়াসরেব নগরীর নামকরণে ইহুদিদের দেওয়া নাম 'মেদিনাত'কেই গ্রহণ করা হয়েছে। মেদিনাত শব্দের অর্থ শহর। এই মেদিনাত থেকেই আল-মাদিনাত; তা থেকে আমরা পেয়েছি মদিনা। মদিনায় হিজরত করার পরে মুহাম্মদ(সাঃ) প্রথমেই সেখানকার ইহুদিদের সাথে শান্তি ও মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ইহুদিরা বারবার এই চুক্তি লঙ্ঘন করায়, বারবার মুসলমানদের বিপক্ষের সাথে গোপনে হাত মেলানোয়, মুহাম্মদ(সাঃ) ও মুসলমানদের নামে অবিরাম কুৎসা রটনা করায়, ইসলামকে ধ্বংসের জন্য একের পর এক ষড়যন্ত্র করায় রাসুল বাধ্য হন ইহুদিদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করতে।

খ্রিস্টানদের প্রতিও মুহাম্মদ(সাঃ) অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মদিনায় এলে মুহাম্মদ(সাঃ) তাদের নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলকে মসজিদে নববীতে

মুসলমানমঙ্গল– ১ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসলমানরা যখন কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছিল, তখন খ্রিস্টানরা বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করছিল। এতে কেউ তাদের কোনো বাধা দেয়নি।

ঐ একই সালে নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে এক সন্ধিচুক্তিতে মুহাম্মদ(সাঃ) তাদের এই মর্মে নিশ্চয়তা দান করেন যে, খ্রিস্টানদের তিনি আশ্রয় দেবেন, তাদের ওপর কোনো অত্যাচার করা হবে না। তাদের জীবনের, ধর্মপালনের ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দেওয়া হবে; কোনো খ্রিস্টানকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য জবরদস্তি করা হবে না; কোনো খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীর তীর্থযাত্রায় বা চলাফেরায় বাধা দেওয়া হবে না; খ্রিস্টানদের ওপর কোনো বাড়তি কর ধার্য করা হবে না; মুসলমানরা যুদ্ধযাত্রাকালে কোনো খ্রিস্টানকে বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে না; খ্রিস্টান মহিলা কোনো মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করলে সে তার নিজের ধর্ম পালন করতে পারবে; কোনো গির্জা ভেঙে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হবে না; গির্জা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বায়তুল মাল থেকে সাহায্য দেওয়া হবে; কোনো বিশপকে গির্জা থেকে, কোনো সাধুকে মনস্টারি থেকে, কোনো পুরোহিতকে তার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না; কোনো মূর্তি বা ক্রস ধ্বংস করা হবে না; খ্রিস্টানরা প্রার্থনার সময় কাঠের মন্দিরা বাজালে কোনো মুসলমান বাধা দিতে পারবে না; উৎসবের সময় খ্রিস্টানরা ক্রস বহন করতে পারবে। এইসব বিষয়ে মুহাম্মদ(সাঃ) নিজে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, কোনো মুসলমান এই শর্তগুলির কোনো একটিও যদি ভঙ্গ করে তবে সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী হিসাবে বিবেচিত হবে।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মদ(সাঃ) কাবা ঘর থেকে সব মূর্তি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। তিনি কাবার দেয়ালে আঁকা বিভিন্ন চিত্রও মুছে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম এবং ইসমাইলের মূর্তিও ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু কথিত আছে যে তিনি মাতা মেরি ও যীশুর ছবি মুছতে দেননি। ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাবা ঘরের সংস্কারের সময় বাকুম নামক একজন চিত্রশিল্পী মাতা মেরির কোলে যীশুর এই ছবিটি এঁকেছিলেন।

এসবের বিনিময়ে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা কেমন ব্যবহার করেছে মুসলমানদের সঙ্গে?

এক শো বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসে বলেছিলেন– 'খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বিগণ মুসলমান ধর্মকে যত বেশী ঘৃণা করে এরূপ আর কোনও ধর্মকে করে না।'

আর কোনো ব্যাখ্যা বা উদাহরণের প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো

দিস ইজ ইয়োর স্টাডি সার্কেল!

লিসবেথের কণ্ঠের অকৃত্রিম বিস্ময় উপভোগ করছে ইউসুফ।

অবাক হওয়ারই কথা লিসবেথের। একটা পাঠচক্রে ন্যূনতম কিছু জিনিস থাকবে বলেই ধরে নেবে সবাই। অন্তত একটা ছোট-খাট ঘর, বসার ব্যবস্থা, কিছু বই-পুস্তক। কিন্তু খোলা আকাশের নিচে চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চি পেতে বসে যে পাঠচক্র চালানো যায়, তা অন্তত লিসবেথের মতো প্রথম বিশ্বের মানুষের কল্পনাতেই আসবে না।

মদনের দোকান আসলে নামেই দোকান। সিএন্ডবি-র জায়গায় রাস্তার ধারে চারটে বাঁশের খুঁটির ওপর চাটাই এবং তার ওপরে পলিথিন বিছিয়ে দোকানের কাঠামো। একটা কাঠের টেবিলের ওপর কাপ-ডিশ রাখার টিনের পাত। পাশে কাঠকয়লার চুলোতে চাপানো কেতলি। আর সামনে বিভিন্ন ভঙ্গিতে পেতে রাখা কয়েকটা সস্তা নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চি। পাশের দোকানগুলোর মধ্যে আছে চালের আড়ৎ, কাপড় ধোয়ার লন্ড্রি, ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকান, পোল্ট্রি ফিডের দোকান। দোকানগুলো খোলা থাকলে বেঞ্চি টেনে নিয়ে বসতে হয় একটু দূরে, যাতে দোকানগুলোর মুখ বন্ধ না হয়ে যায়। রাত আটটার পরে দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেলে তখন দোকানগুলোর কাঠামোর সাথে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসা যায়।

এইখানে আপোনারা সিরিয়াস টপিক নিয়ে কথা বলতে পারেন?

কেন নয়!

সবার সাথে এইমাত্র পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে। বেঞ্চিতে বসতে বসতে আবার সবাইকে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করল লিসবেথ। আশ্বস্ত হওয়ার মতো একটা ব্যাপারই শুধু চোখে পড়ল তার। সবার হাতেই বই। কারও হাতে ম্যাগাজিন।

এই জায়গাতে কীভাবে পড়েন আপেনারা?

এই জায়গায় বসে আর কতটুকু পড়া যায়! এটা তো ডিসকাসনের জায়গা।

এত ওপেন!

হ্যাঁ। এখানে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে অন্যান্য কাজও করা যায়। আরও কেউ কেউ আমাদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে। মজা পেলে অনেকক্ষণ থাকে। না পেলে সৌজন্য বিনিময় করে কেটে পড়ে। তারপরে এখানে বসলে শহরের বাকি সব খবরই পাওয়া যায়। এমনকি টেলিভিশনে কোনো বিশেষ খবর দিলে কেউ না কেউ এসে চা খেতে এসে সেটাও জানিয়ে যায়। আবার ক্রিকেট

AMARBOI.COM

খেলা চলার সময় কত রান হলো বা কয়টা উইকেট পড়ল, সেটাও এখানে বসে বসেই জানা যায়।

ডিস্টার্ব হয় না?

তেমন একটা না। এইভাবেই তো চলছে আমাদের তাই না বাবু?

বাবু হেসে বলল–মাঝে মাঝে বেশি খদ্দেরের ভিড় হলে অসুবিধা হয়। মদন তখন আমাদের উঠিয়ে দেয় বেঞ্চি থেকে। খদ্দের চলে গেলে আমরা আবার এসে বসি।

সভয়ে বলল লিসবেথ– আমাদের চলে যেতে হবে তখন?

অভয় দিল ইউসুফ– আরে মদন অত ক্রুয়েল হয় না। আজ কি আমাদের তুলে দেবে মদন?

মদনের সবগুলো দাঁত বের করা– কী যে বলেন বাবু!

আজ অবশ্য মদন একটু বেশি হাসছে। তার চায়ের দোকানে একেবারে খাঁটি ইংরেজ সাদা চামড়ার একটা বিদেশী যুবতী মেয়ে। কত বড় বড় দোকানই তো আছে শহরে। কই কোথাও তো এমন সব মানুষ গিয়ে বসে না! ইউসুফ-বাপ্পী-কামাল-বাবু-সাদী ভাইদের নিয়ে রীতিমতো গর্ব মদনের। তার কাছে এরা সব সোনার টুকরা মানুষ। ওরা বলতে নিষেধ করেছে যে এই দোকান মদনকে বানিয়ে দিয়েছে ওরাই। ওরা না থাকলে সিআইডি-পুলিশের লোক আর দলের মাস্তানরা কবে উঠিয়ে দিত মদনকে! সে ঝকঝকে দাঁতের হাসিতে আশ্বস্ত করে লিসবেথকে– আপনারা বসেন মেমসাহেব। কেউ ডিস্টার্ব করবি না। কী চা খাবেন? রং না কি দুধ?

চায়ের কাপগুলোর দিকে তাকাল লিসবেথ। তারপর আস্তে আস্তে বলল– রং চা।

মদন তাকে প্রথমে দুধ চা দিতে চায়– খাঁটি গরুর দুধ আছে মেমসাহেব। আগে এককাপ দুধ চা খান। পরে রং চা খাবেন।

বাধ্য মেয়ের মতো মাথা দোলায় লিসবেথ– আচ্ছা।

এবার সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাকায় বাবুর দিকে। জিজ্ঞেস করে– আপনার নাম মোটা বাবু কেন?

হো হো করে হেসে উঠল সাদী ওস্তাদসহ বাকিরাও। এই রকম সম্মিলিত হাসি অপ্রস্তুত করে ফেলল লিসবেথকে– আমি কি সামথিং রং বলে ফেলেছি? সামথিং ফানি?

ইউসুফ তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করল– না না। আসলে ফানি হচ্ছে আমাদের নাম রাখার প্রসেস। আমাদের দেশে বাবু নামটা খুব কমন। আমাদের গ্রুপেই আছে তিন-চারজন বাবু। যাতে স্পেসিফিক হয়, একজনকে ডাকলে অন্যজন যাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভ্রান্ত না হয়, তাই তার বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা হয়। যেমন এর নাম মোটা বাবু। কারণ সে একটু ফ্যাটি। আরেকজন আছে লম্বু বাবু। কারণ তার হাইট একটু বেশি। আমার নামের সাথেও বাবু আছে। আমাকে বলা হয় খোকা বাবু। তবে আমার ইউসুফ নামটাই বেশি পরিচিত।

আপোনার নাম খোকা বাবু কেন? আপোনিও তো বেশি হাইটের।

তবু লম্বু বাবুর সমান নয়। তাই তার জন্যই নামটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর আমি একটু বোকা টাইপের বলে আমাকে ডাকা হয় খোকা বাবু নামে। বাংলায় বোকা আর খোকা অনেক সময়ই সিনোনিমাস।

আপোনি বোকা কেন?

সাদী ওস্তাদ এবার কথার মধ্যে মাথা ঢোকায়– ও বোকা নয়। ও অন্য সবাইকে বোকা বানায়।

ওহ। দ্যাটস রাইট।

তার মানে?

লিসবেথ হাসে– আপোনি আসলে বুদ... বুদ... ইন্টেলিজেন্ট।

ঠিক। ঠিক। হাসে সবাই।

চায়ে চুমুক দিয়ে লিসবেথ কাজের প্রশ্ন তোলে– স্টাডি সার্কেলের আজকের সাবজেক্ট কী?

ইউসুফ বলে– লিসবেথ ডার্লিং, ইট ইজ নট স্টাডি সার্কেল। এটি পিওর আড্ডা।

আড্ডা?

রদেভুঁ।

ওহ দ্যাটস নাইস! আমি প্যারিসের রদেভুঁর কথা শুনেছি। যাইনি। আই অ্যাম লাকি। এখানে রদেভুঁ পেলাম। তা রদেভুঁ তে কী নিয়ে কথা হবে?

আড্ডায় কখনও ঠিক করা থাকে না কী নিয়ে কথা হবে। কোনো নির্ধারিত বিষয় নিয়ে বসলে সেটা আর আড্ডা থাকে না। শুরু হয় যে কোনো বিষয় নিয়ে। যুত মতো লেগে গেলে তা নিয়েই চলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভালো না লাগলে সাবজেক্ট বদল হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি।

দ্যাটস গ্রেট। আমি আগে কখনও রদেভুঁতে...

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল কামাল– বলুন আড্ডায়

ইয়েস, আড্ডায়, আর ভুল হবে না, আমি আগে কোনোদিন আড্ডায় যাইনি।

কেন আপনি যে ভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন সেখানে আড্ডা হতো না?

না তো।

সে কী! আড্ডা ছাড়াও ভার্সিটি ক্যাম্পাস হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে প্রোগ্রাম হলে আমরা অ্যাটেন্ড করি। তাছাড়া লেসনের সময় ছাড়া কেউ থাকে না। সবাইকেই তো অন্য কাজ করতে হয়। আর পড়তেও হয় খুব। কারণ সেমিস্টারের কস্ট অনেক বেশি। অনেক পে করতে হয়। একটা সেমিস্টার থেকে রিগ্রেটেড হলে অনেক ডলার লস হয়ে যায়।

নাক দিয়ে বিরক্তির শব্দ তোলে বাপ্পী– শালার আমেরিকা! সব জায়গায় মালকড়ি চাই।

লিসবেথ তার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে দেখে অপ্রতিভ হয়ে বলল– স্যরি, মুখ খারাপ করে ফেললাম। আসলে আড্ডা ছাড়া কোনো ভার্সিটি ক্যাম্পাস হতে পারে তা আমাদের কল্পনাতেই আসে না।

ইটস ওকে। কিন্তু মুখ খারাপ বললেন কেন? মুখ খারাপ করা মানে কী?

ইউসুফ বলল– আমাদের এখানে স্ল্যাং বলাকে মুখ খারাপ করা বলে। মানে হলো মুখ দিয়ে খারাপ কথা বের করা।

আপোনারা স্ল্যাং বলেন?

একটু ইতস্তত সত্ত্বেও স্বীকার করল ইউসুফ– হ্যাঁ বলি। কারণ কখনও কখনও মনে হয় নির্দিষ্ট স্ল্যাং ছাড়া পারফেক্টলি মনের ভাবটা প্রকাশ করা যাচ্ছে না। স্ল্যাং কে কী আমরা আমাদের কালচারের পার্ট বলা যাবে ওস্তাদ?

তা যেতে পারে।

লিসবেথ উৎসাহের সঙ্গে বলল– তাহলে বলবেন উইদআউট এনি হেজিটেশন। আমিও শিখে নেব।

সাদী ওস্তাদ বলল– হয়েছে! নাও এবার খিস্তি শিখাও!

ইউসুফ হাসতে হাসতে বরল– এই ব্যাপারে তো যোগ্যতম শিক্ষক ওস্তাদ আপনিই। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করেন এখন থেকেই।

হ্যাঁ এই লোকজনের মধ্যে একটা বিদেশী মেয়েকে খারাপ কথা শিখাই, আর পাবলিক আমাকে ধরে ধোলাই দিক।

লিসবেথ ধরে বসল– এখানে তো পাবলিকলি অনেক কথা বলা যায় না তাই না? ফ্রি থিংকিং, মানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা তো মুসলমান সমাজে নেই।

গম্ভীর হয়ে গেল প্রত্যেকেই। ইউসুফ অন্যদের বলল– ওর তো কোনো দোষ নেই। ওকে ওর দেশ থেকে এইভাবেই শিখিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া ওদের দেশে এবং ইউরোপে সব মানুষই আমাদের সম্পর্কে এই রকমই ভাবে।

তারপর লিসবেথের দিকে ফিরে বলল– খ্রিস্টান ধর্মে কি মত প্রকাশের পুরো লিবার্টি আছে?

সরাসরি উত্তর দিতে গিয়ে একটু ভাবল লিসবেথ– মনে হয়।

কতদিন থেকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতদিন থেকে মানে! সব সময়ই।

আপনি জন্ম থেকেই দেখে আসছেন। তাই ভাবছেন সব সময়ই বোধহয় খ্রিস্টান ধর্ম মানুষের মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে।

হতে পারে। স্বীকার করল লিসবেথ।

শুনুন, যদি আপনি ভালো ভাবে ইউরোপ-আমেরিকার চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে পারেন, তাহলে বুঝবেন যে অল্পদিন আগেও পশ্চিমের মানুষ কী অমানবিক পরিস্থিতিতে বাস করেছে। তার তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থাকে আপনার কাছে মনে হবে স্বর্গ। এই দেশে মত প্রকাশে অনেক বাধা আছে স্বীকার করি, কিন্তু পশ্চিমে এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অসংখ্য মানুষকে যে মূল্য দিতে হয়েছে, সেই রকম বর্বরতার শিকার আমাদের দেশে কাউকে হতে হয় না।

জোর গলায় কথাটা বললেও ইউসুফ জানে তার দাবি সর্বাংশে সত্য নয়। কিন্তু ইউরোপের চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাসকেও কম নৃশংসতা পেরুতে হয়নি।

বারো

ইউরোপ বা পশ্চিমে মুক্তচিন্তার বিকাশের ইতিহাসের সাথে গায়ে গায়ে লেগে আছে খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাসও। খ্রিস্ট ধর্ম যতদিন ইউরোপে রাজা বা রাজতন্ত্রের আনুকূল্য পায়নি, ততদিন এই ধর্মের নেতারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহনশীলতা দাবি করে আসছিল। কিন্তু এই একই ধর্ম রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাওয়ার পরে এবং এক পর্যায়ে রাষ্ট্রের ওপর সার্বিক প্রভাব বিস্তার করার পরে নিজেকে পরিণত করল অসহনশীলতা ও মুক্তচিন্তা দমনের একটি প্রতিষ্ঠানে।

সক্রেটিসকে হেমলক পানে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘটনাটি ছাড়া সার্বিকভাবে খ্রিস্টপূর্ব গ্রীকরা ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট সহনশীল ছিলেন। রোমানরাও একই ভাবে কোনো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। রোমান সম্রাট তিবেসিয়াস পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছিলেন– 'যদি কেউ দেবতাদের অসম্মান করেই থাকে, তবে দেবতারা নিজেরাই তার ব্যবস্থা দেখুন।'

রোমান সম্রাটদের পূজা করার বিধি ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা মানত না। তার জন্য এক পর্যায়ে সম্রাট ট্রাজান ঘোষণা করেন যে, খ্রিস্টান হওয়া একটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। রাষ্ট্রীয়ভাবে খ্রিস্ট ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে ঐ আইনকে আদৌ প্রয়োগ করা হয়নি। ট্রাজান নিয়ম করেছিলেন যে খ্রিস্টানদের খুঁজে বের করা হবে না, অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির অভিযোগ বিবেচনায় নেওয়া হবে না, এবং যে ব্যক্তি তার অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবে, তাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অপরাধে শাস্তি পেতে হবে। খ্রিস্টানরা নিজেরাই স্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে যে এই অনুশাসন কার্যত তাদের রক্ষাই করেছে। কোনো খ্রিস্টানকে গ্রেপ্তার করার পরে সে পালিয়ে গেলে দেখেও না দেখার ভান করা হতো। কোনো লোক খ্রিস্টান বলে ধৃত হলে তাকে দেবতার মূর্তির সামনে ধূপ-ধুনো দিতে আদেশ করা হতো। এটা করলেই সে মুক্ত।

আর ৩১১ ও ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের পক্ষ থেকে দুইটি ফরমান জারি করা হয় ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়ে। চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রথম ফরমানটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই ফরমানটিকে বলা হয় ইডিক্টস আব টলারেশন। এই ফরমানে বলা হয়েছে– 'আমরা বিভ্রান্ত খ্রিস্টানদেরকে যুক্তি ও প্রাকৃতিক সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলাম। খ্রিস্টানরা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পরিত্যাগ করেছিল, ধৃষ্টতার সঙ্গে প্রাচীন রীতি-নীতির প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে নিজেরা খামখেয়ালিভাবে নানা বাড়াবাড়িপূর্ণ আইন ও মতামত উদ্ভাবন করেছিল। এবং আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের লোক নিয়ে একটি বিচিত্র সমাজ গড়ে তুলেছিল। দেবতাদের পূজা-অর্চনা বাধ্যতামূলক করে আমরা যেসব ফরমান ইতোপূর্বে জারি করেছি, তার ফলে খ্রিস্টানদের অনেকেই বিপদ ও দুর্দশার মুখে পড়েছে; অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে; এবং আরও অনেকে যারা এখনও তাদের ঐ ধর্মহীন নির্বুদ্ধিতা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা প্রকাশ্যে ধর্ম পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আমরা আমাদের চিরায়ত ক্ষমাশীলতার সুফল ঐ অসুখি মানুষগুলির কাছে পৌঁছে দিতে ইচ্ছুক হয়েছি। সুতরাং আমরা তাদের নিজস্ব মতামত স্বাধীনভাবে ও প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার, তথা নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে তাদের সভা-সমিতিতে যোগদানের অনুমতি দিলাম। তবে তা সর্বদাই এই শর্তে যে তারা প্রতিষ্ঠিত আইন ও সরকারের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা বজায় রাখবে।'

দ্বিতীয় ফরমানটি জারি করেছিলেন সম্রাট কনস্তানতিন। এটি পরিচিত ছিল 'ইডিক্ট অফ মিলান' নামে। এই ফরমানেও প্রজাদের সুখশান্তির ব্যাপারে সম্রাটের যত্ন এবং স্বর্গের দেবতার সন্তুষ্টিকেই সহনশীলতার কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল।

এর বছর দশেক পরে সম্রাট কনস্তানতিন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টে যায় পরিস্থিতি। এই সময় থেকেই শুরু হলো খ্রিস্ট ধর্মের আধিপত্য। আর একই সঙ্গে শুরু হলো হাজার বছর ব্যাপী এমন একটি অন্ধকার যুগের যে সময় যুক্তি ছিল শৃঙ্খলিত, চিন্তা ছিল দাসত্বের কাছে বন্দি, এবং এই এক হাজার বছর ইউরোপে বা পশ্চিমে জ্ঞানের সকল অগ্রগতি ছিল রুদ্ধ।

যে দুইশো বছর খ্রিস্টানরা ছিল নিষিদ্ধ সম্প্রদায়, সেই দুইশো বছর তারা রাষ্ট্রের কাছে সহনশীলতা দাবি করত এই যুক্তিতে যে ধর্মে বিশ্বাস একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছামূলক ব্যাপার, এবং কারও ওপর কোনো ধর্মবিশ্বাস জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এটি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অতএব অন্যায়। কিন্তু তাদের ধর্ম শক্তিশালী সম্রাটের সাহায্য লাভ করামাত্র খ্রিস্টানরা সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করল। তারা মানুষের চিন্তার ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য দূর করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল। অন্য কোনো ধর্ম পালন করা চলবে না বলে রায় ঘোষণা করল। তারা এই কথা সবাইকে মেনে নিতে বাধ্য করতে চাইল যে খ্রিস্টান গির্জার মাধ্যমেই একমাত্র মানুষের আত্মার মুক্তিলাভ সম্ভব। খ্রিস্ট ধর্ম যারা বিশ্বাস করে না তারা অনন্তকালের জন্য নরকে যাবে। এমনকি যেসব শিশু খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা নেবার আগেই মারা যায়, তারাও অনন্তকাল নরকের মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে কাটাবে।

মাঝখানে একবার সম্রাট ভালেন্স খ্রিস্ট ধর্মের বিরোধী হয়ে পড়েন। তখন আবার থেমিস্তিয়াস সম্রাটকে সহনশীলতা প্রদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে বলেন– 'ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সরকারের কর্তৃত্ব কার্যকর হতে পারে না। হুকুম মেনে চলতে বাধ্য হলে তা কেবল কপট চর্চাতেই পর্যবসিত হয়। প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসকেই অনুমোদন দেওয়া উচিত। অযাজকীয় সরকারের উচিত নৈষ্ঠিক খ্রিস্টান ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বি খ্রিস্টানদেরকে উভয়ের সাধারণ মঙ্গলের লক্ষ্যে শাসন করা। ঈশ্বর নিজেই স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি নানা ধরনের উপাসনা পেতে আগ্রহী; তাঁর কাছে পৌঁছানোর অনেক রাস্তা রয়েছে।'

কিন্তু পরবর্তীতে অনুকূল অবস্থা ফিরে পাওয়ামাত্র আবির্ভাব ঘটল সেন্ট অগাস্তিনের। তিনি যীশুখ্রিস্টের কথিত একটি রূপক কাহিনীর মধ্যে খুঁজে পেলেন একটি বাক্য– "বাধ্য করো তাদের ভেতরে আসতে।" এই বাক্যকে অবলম্বন করে সেন্ট অগাস্তিন খ্রিস্টান-গির্জার সকল ভিন্নমতাবলম্বিদের নির্মূল করার কর্মসূচি নিলেন। এই প্রক্রিয়া চলল শত শত বৎসর ধরে। দ্বাদশ শতাব্দীতে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের সময় গির্জা ইউরোপের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করে। যাজকবিরোধী যে কোনো কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করা হচ্ছিল। এই সময় দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে লঁগুদোক নামক একটি জায়গায় আলবিজোয়া নামে একটি গোষ্ঠী ছিল। এদের মতামত গির্জার কাছে বিশেষভাবে বিরক্তিকর মনে হয়েছিল। তাছাড়া তারা গির্জাকে যে অর্থ প্রদান করছিল তার পরিমাণ নিয়েও গির্জা সন্তুষ্ট ছিল না। এই জনগোষ্ঠী ছিল তুলুজের কাউন্টের প্রজা। পোপের দরবার থেকে তুলুজের কাউন্টের কাছে আহ্বান জানানো হলো তার জমিদারি থেকে ভিন্নমতাবলম্বি এই জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার। তুলুজের কাউন্ট গির্জার আহবান অমান্য করায় পোপ এই কাউন্ট ও আলবিজোয়ারদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করলেন। ফলে অনুষ্ঠিত হলো একের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যাতে ইংরেজ সাইমন ডি মন্টফোর্ডও অংশ নিয়েছিলেন। জনতার প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। পুরুষ, নারী ও শিশুদের পাইকারিভাবে আগুনে পুড়িয়ে ও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হলো। তুলুজের কাউন্টের চূড়ান্ত অবমাননার মধ্য দিয়ে সফল সমাপ্তি ঘটল ক্রুসেডের। এই ঘটনার সবচেয়ে ভয়াবহ তাৎপর্য এই যে, এর ফলে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো– ইউরোপের সরকারি আইনের মধ্যে গির্জা এই নীতির প্রবর্তন করল যে, শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন এই শর্তে যে তিনি গির্জা-বিরুদ্ধ যে কোনো মতামত উচ্ছেদ করবেন। যদি তিনি পোপের নির্দেশে নিপীড়ন পরিচালনা করতে দ্বিধা করেন, তবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই রকম জমিদার বা শাসকের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো।

১২৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে পোপ নবম গ্রেগোরি বিরুদ্ধ মতাবলম্বিদের খুঁজে বের করার জন্য কুখ্যাত 'ইনকুইজিশন' গঠন করেন। ইনকুইজিশন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায় পোপ চতুর্থ ইনোসেন্টের আমলে এক 'বুল'এর (পোপের অধ্যাদেশ) বলে। নাৎসিদের গেস্টাপো বা আমেরিকার এফবিআই-এর চেয়েও বেশি নৃশংসতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ইনকুইজিশন। তাদের কার্যকলাপ আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক-এর একটি ফরমান জারি হওয়ার পরে। ফরমানে বলা হয়– 'সকল বিরুদ্ধধর্মীকে আইন বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে। যারা তাদের ধর্মমত প্রত্যাহার না করবে তাদেরকে পুড়িয়ে মারতে হবে, যারা প্রত্যাহার করেছে তাদেরকে জেলখানায় বন্দি করে রাখতে হবে, কিন্তু যদি তারা আবার পূর্ব মতে ফিরে যায় তাহলে তাদের প্রাণনাশ করতে হবে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করতে হবে এবং দুই প্রজন্ম পর্যন্ত তাদের সন্তানরা বেতনভাতাযুক্ত পদের অযোগ্য থাকবে, যদি না তারা তাদের পিতা বা অন্য কোনো বিরুদ্ধধর্মীকে ধরিয়ে দিয়ে থাকে।'

বিরুদ্ধধর্মীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতে থাকে। অষ্টম হেনরী কয়েকজনকে ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন। ইনকুইজিশনের নীতি ছিল– একজন অপরাধীর পার পেয়ে যাওয়ার চেয়ে একশত নিরীহ লোকের দণ্ডভোগ বরং ভালো। বিরুদ্ধধর্মীয়কে পুড়িয়ে মারার চিতায় কেউ কাঠ সরবরাহ করলে তাকে ইনডালজেন্স (ধর্মীয় কাজে অপরাধ করার অধিকার) দেওয়া হতো। কিন্তু ইনকুইজিশনের বিচারকরা কখনোই কাউকে পুড়িয়ে মারার ঘোষণা দিত না। কারণ "গির্জা কখনও রক্তপাতের অপরাধে অপরাধী হতে পারে না।" তাই ইনকুইজিশনের বিচারক এই মর্মে রায় দিতেন যে আটক ব্যক্তি একজন বিরুদ্ধধর্মী যার সত্য ধর্মে ফিরে আসার আর কোনো আশাই নেই। তাই তিনি তাকে 'আলগা' করে দিতেন। অর্থাৎ জাগতিক কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করতেন। সেই সঙ্গে "অপরাধীর প্রতি সদয় ও ক্ষমাশীল" [illegible]র করার আহ্বান জানাতেন। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমার জন্য এই আনুষ্ঠানিক আবেদনে সাড়া দেবার কোনো অধিকার জাগতিক কর্তৃপক্ষের ছিল না। কারণ অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলে সেই ম্যাজিস্ট্রেটই আবার বিরুদ্ধধর্মীদের প্রশ্রয়দাতা হিসাবে গির্জার শাস্তি পেতেন।

বিজ্ঞানচর্চা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। বাইবেল যা বলে বিজ্ঞানকে সেভাবেই সাজানো ছিল বিজ্ঞানীদের একমাত্র কাজ। কয়েক শত বছর পরেও খ্রিস্টান-জগতে এই ধর্মান্ধতার রেশ কাটেনি। জিয়ারদানো ব্রুনোর পরিণাম আমাদের এই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে– কোপার্নিকাসের এই আবিষ্কার খ্রিস্টানরা গ্রহণ করেনি। ব্রুনো এই কোপার্নিকাস-তত্ত্বের সাথে আরও যোগ করলেন যে, স্থির তারকাগুলি প্রত্যেকেই এক-একটি গ্রহমণ্ডলি পরিবেষ্টিত সূর্য। ব্রুনো মনে করতেন যে বাইবেল অশিক্ষিত মানুষদের জন্য রচিত বলে এই গ্রন্থকে বিভিন্ন কুসংস্কারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। এই বিবেচনা থেকেই ব্রুনো গির্জার সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছুতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গির্জা তাকে ছাড়েনি। আত্মরক্ষার জন্য ইতালি ছেড়ে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে অনেকদিন কাটানোর পরে ১৫৯২ সালে এক কপট বন্ধুর প্ররোচনায় ভেনিসে ফিরে আসেন ব্রুনো। ইনকুইজিশন তাকে সেখানে গ্রেপ্তার করে। তার বিচার হয় রোমে। 'কাম্পো দ্য ফিওরি' নামক জায়গায় ১৬০০ সালে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়।

১৬১৯ সালে লুসিলিও ভানিনি নামের এক ইতালিয় বিদ্বানকে তার জিহ্বা ছিঁড়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। কবি মার্লোও নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বিচার শেষ হওয়ার আগেই শুঁড়িখানায় এক কলহে তিনি নিহত হলেন। নাট্যকার টমাস কিডকে জেলখানায় আটক করে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল। ধর্মে তুলনামূলক কম অনুরাগ– এই অজুহাতে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। তিনি অবশ্য খালাস পেয়েছিলেন।

১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে গির্জা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, কোপার্নিকাসের সৌরতন্ত্র একটি অসম্ভব বস্তু এবং বাইবেলের বক্তব্যের তুলনায় তা সত্যি সত্যি ধর্মবিরোধী। গ্যালিলিওকে ডেকে নিষেধ করা হলো যে তিনি যেন তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রচার না করেন। নিষেধ অমান্য করায় গ্যালিলিও-কে কী পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল সেই ইতিহাস সকলেরই জানা।

চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি খ্রিস্ট ধর্মের অসহিষ্ণুতা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল সমান তীব্রতা নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর উইচ-হান্টিং এর কথা তো বলারই অবকাশ নেই। ডাইনি আখ্যা দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নারীকে যে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। ভাবতে পারেন, জোয়ান-অব-আর্ক পর্যন্ত রেহাই পাননি।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল ইউসুফ। লিসবেথ ভাড়ায় থাকে খোকন কন্ট্রাকটরের দোতলার ফ্লাটে। সেই পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে ইউসুফ। লিসবেথ বলেছিল– আপনাকে কষ্ট করতে হবে না ইউজেফ। আমি একাই যেতে পারব।

তার কথায় দ্বিমত পোষণ করেনি ইউসুফ– আপনি যে একাই যেতে পারবেন এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি বাঙালি কার্টসি যে একজন মেয়েকে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করতে হবে। তাছাড়া হাঁটতে হাঁটতে গেলে আমাদের আলোচনাটুকুও শেষ করা যাবে।

লিসবেথের বাসস্থানের সামনে এসে কথায় ছেদ টানল ইউসুফ।

বিস্ময়ের সঙ্গে বলল লিসবেথ– আপনার এত স্মরণ থাকে কীভাবে!

সংকোচ বোধ করল ইউসুফ। বলল– আসলে এই ব্যাপারগুলি নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে ভাবছি তো! ভাবছি আর পড়ছি। নতুন ইনফরমেশন সার্চ করছি। মানে আমি মেন্টালি এই বিষয় নিয়েই আছি বলে মনে হচ্ছে অনেক কিছু টাটকা মনে আছে। এর মধ্যে খুব একটা মেধার ব্যাপার নেই।

আমি আশা করছি...

কী?

লিসবেথ বলল– আমি আশা করছি... আপনার মাধ্যমে আমার আশা পূর্ণ হবে। বাংলাদেশের কালচার আর মডার্ন বেঙ্গলি থিংকিং আমি জানতে পারব। থ্যাংক ইউ মি ইউজেফ!

হাসল ইউসুফ– আমি জানি, ইংরেজ আর ল্যাটিনভাষীর পক্ষে আমার নাম উচ্চারণ করা কঠিন। বাইবেলেও পারা যায়নি। ইউসুফকে সেখানে জোসেফ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আপনার অত কষ্ট করার দরকার নেই। আপনি আমাকে ইউ বলে ডাকলেই হবে।

খুশি ফুটে উঠল লিসবেথের চোখে– তাহলে আমিও শুধু লিস।

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল ইউসুফ। হাত বাড়িয়ে দিল– হ্যালো লিস!

আগ্রহের সঙ্গে তার হাত গ্রহণ করল লিসবেথ। আন্তরিকতার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলল– হ্যালো ইউ!

হাত ছাড়িয়ে নিয়েই পেছনে ফিরতে ফিরতে ইউসুফ বলল– গুড নাইট!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরো

বনু কোরাইযার ঘটনাটিকে তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ঐ ঘটনা তো হজরত মুহাম্মদ(সাঃ)-কে রক্তপিপাসু এবং প্রতিশোধপরায়ণ বলে প্রচার করার সুযোগ করে দিয়েছে ইসলামবিরোধীদের। আর আসলেও তো কোনো মানবিক দৃষ্টিতেই এই ধরনের গণহত্যা বা ম্যাসাকার মেনে নেওয়া যায় না। এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলে আমাদের তো লজ্জিত হতেই হয়।

কামালের কথায় যুক্তি আছে। বাপ্পী বলে– আসলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়ার জন্যই এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে হয়েছে। ধর্মের সাথে এই কারণেই রাজনীতিকে মেশানো উচিত নয়।

ইউসুফ সরাসরি অস্বীকার করে না কথাগুলি। বলে– তবে আমাদের সেই সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রায় বর্বর একটি সমাজ, যা কেবল গোত্রীয় সীমাবদ্ধতার উপরে উঠে একটি উম্মাহ তৈরি করতে যাচ্ছে, সেখানে কিছু কিছু ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হয়তো পুরাতন আমলের আইনকেই মেনে নিতে হয়েছে। বনু কোরাইযার ঘটনাটিও এই রকমই একটি ঘটনা।

কিন্তু ভাবো একবার! কী নৃশংসতাই সেখানে ঘটেছিল! দয়াল নবীর ভাবমূর্তির সাথে একেবারেই খাপ খায় না বনু কোরাইযার ঘটনা।

কিন্তু অন্য ধর্মের নেতারা তো এরচেয়ে অনেক বেশি নৃশংসতা ঘটিয়েছে, ঘটিয়ে চলেছে নিরন্তর।

মোটাবাবু গম্ভীর গলায় বলল– এটা কোনো যুক্তি হলো ইউসুফ? একটা অন্যায়কে আরেকটা অন্যায় দিয়ে জাস্টিফাই তো করতে চায় কেবল বর্বররাই। আমাদেরও কি বর্বর হতে হবে?

না না আমি সেভাবে কথাটা বলিনি। আমি বলতে চেয়েছি, শুধু সেই পরিস্থিতির কথা একবার ভাবতে। বনু কোরাইযা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তা সফল হলে পৃথিবী থেকে শিশু ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যেত। তাই তাদের ওপর ক্রোধ জাগাটা তো মুসলমানদের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল।

তাই বলে এমন গণহত্যা!

বেঞ্জামিন ওয়াকারের বইতে এমন মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঘটনাটি, যা পাঠ করলেই মুসলমানদের সম্পর্কে, রাসুল সম্পর্কে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠবে মানুষের মন।

'মদিনা শহরের বাজারের কাছে খাল কাটা হয়েছিল এবং মুহাম্মদের সম্মুখেই আট শোর অধিক বন্দির পেছনে হাত বেঁধে রেখে সেই খালের ধারে পাঁচজনের গ্রুপ করে একে একে মাথা কাটা হয়, পরে দেহগুলি ধাক্কা দিয়ে খালে ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া হয়। এই নিষ্ঠুর অমানবিক ম্যাসাকার নাৎসিদের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানায়। এমন কথা বলেছেন কারেন আর্মস্ট্রং-এর মতো ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবীও।

একজন নাম-না-জানা ইহুদি মহিলা, যার স্বামী ঐ কতলের অন্তর্ভুক্ত, চিৎকার করে দাবি জানায় যে সে তার তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে চায়। তার দাবি পূরণ করা হয়। সেই মহিলা হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

মুহাম্মদের প্রিয় পত্নী আয়েশা, যিনি এই ম্যাসাকার দেখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে ঐ মহিলাটির নির্ভীক মৃত্যুবরণের দৃশ্য তাঁকে সারা জীবন তাড়া করে ফিরেছে।

জাবির নামে একজন বৃদ্ধ ইহুদি ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময় মুসলমানদের উপকার করেছিলেন। তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু জাবির বললেন যে তার রক্ত সম্পর্কের সবাই চলে গেছে, তার একা বেঁচে থেকে লাভ কী? সে-ও তার গোত্রের পুরুষদের সাথী হতে চায়। মুহাম্মদকে একথা জানালে তিনি নাকি বলেছিলেন, সকলের সাথে তাকেও জাহান্নামে যেতে দাও। তারপর জাবিরকেও হত্যা করা হয়।

বনু কোরাইযার জমি-জমা, জিনিসপত্র, গবাদি পশু, অস্ত্রশস্ত্র– সবকিছু মালে গণিমত হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কয়েকজন নারীকে উপপত্নী এবং দাসী হিসাবে ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। রায়হানা নামের একজন সুন্দরী তরুণীকে মুহাম্মদ নিজে গ্রহণ করেন। তাকে তিনি বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের ধর্ম পরিত্যাগে রাজি না হওয়ায় তাকে বাঁদি হিসাবে রাখা হয়। বাকি প্রায় তের শত জন নারী ও শিশুকে দাস-দাসি হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়।'

পুরো বিবরণ মনোযোগ দিয়ে শুনল ইউসুফ। তারপর বলল– আমি পরিপ্রেক্ষিতসহ সম্পূর্ণ ঘটনাটি আরেকবার পর্যালোচনা করতে চাই। তার ফলে অন্তত এটা জিনিস পরিষ্কার হবে যে রাসুল নিজের রক্তপিপাসার কারণে এটি ঘটিয়েছিলেন নাকি সার্বিক পরিস্থিতি এবং ইহুদিরাই তাঁকে বাধ্য করেছিল এই রকম একটা ঘটনার সাক্ষী হতে।

এই ঘটনার সূত্রপাত খন্দকের যুদ্ধের সময়। এর আগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা যত যুদ্ধ করেছে তার কোনোটিই এত ব্যাপক যুদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয়ত, আগের যুদ্ধগুলিতে মদিনা আক্রান্ত হয়নি। মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর সাহাবিদের নিয়ে মদিনা থেকে এগিয়ে গিয়ে অন্যত্র শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু এবার মদিনায় অবস্থান করেই শত্রু বাহিনীকে মুকাবিলা করতে হয়েছে। হজরত সালমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারসি নামক একজন সাহাবির পরামর্শে এই যুদ্ধে মদিনার প্রতিরক্ষার জন্য পরিখা বা খন্দক তৈরি করা হয়।

মদিনার একদিকে ছিল ছোট ছোট পাহাড়। আরেকদিকে ঘন বসতি। গায়ে গায়ে লাগোয়া বাড়ি। এগুলির ফাঁকে ফাঁকে সরু কয়েকটি গলি ছাড়া আর কোনো পথে শত্রু প্রবেশ করতে পারবে না। আর একদিকে ছিল কিছু বাড়ি-ঘর, ফলের বাগান এবং বনু কোরাইযা নামক ইহুদিদের দুর্গ। এই গোত্রটি মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এই কারণে মুসলমানরা যুদ্ধে তাদের সহযোগী হিসাবে না পেলেও তারা যে বিপক্ষে যাবে না, এই বিশ্বাস মুহাম্মদ(সাঃ) বজায় রেখেছিলেন। ফলে মনে করা হয়েছিল যে মদিনার এই দিকটিও সুরক্ষিত। বাকি যে দিকটিতে ছিল দিগন্তবিস্তৃত খোলা ময়দান, শত্রুর হামলা সেইদিক থেকেই আসবে বলে ধরে নিয়ে এই জায়গাতে পরিখা খুঁড়ল মুসলমানরা। মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর সাহাবিদের নিয়ে এই খন্দকের পাশে দাঁড়িয়েই সম্মিলিত কুরাইশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। কুরাইশরা যখন খন্দকের দিক দিয়ে সুবিধা করতে পারল না, তখন তারা মদিনায় প্রবেশ করার বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করল। তখন একমাত্র যে দিকে বনু কোরাইযার দুর্গ রয়েছে, সেই দিকটাকেই তাদের কাছে মদিনায় প্রবেশের সবচেয়ে উপযুক্ত দিক বলে মনে হলো। কিন্তু তার জন্য তো বনু কোরাইযাকে নিজেদের দলে টানতে হবে। এই কাজে কুরাইশরা নিয়োগ করল মদিনা থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বিতাড়িত আরেক ইহুদি গোত্র বনু নাজির গোত্রের নেতা হাই ইবনে আখতারকে। সে বনু কোরাইযার নেতাদেরকে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘণ করে কুরাইশদের সাথে হাত মেলানোর জন্য রাজি করাল। বনু কোরাইযার নেতারা রাজি হলো পেছন থেকে মুসলমান নারী ও শিশুদের ওপর আক্রমণ চালাতে। কুরাইশরা সামনে থেকে আক্রমণ চালানোর সময় যদি বনু কোরাইযা পেছন থেকে অরক্ষিত নারী ও শিশুদের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে মুহাম্মদ(সাঃ) বাধ্য হবেন তাঁর স্বল্পসংখ্যক যোদ্ধাদের মধ্য থেকে একটি অংশকে বনু কোরাইযার বিরুদ্ধে পাঠাতে। তাহলে কুরাইশ বাহিনী সহজেই পরাস্ত করতে পারবে মুসলমানদের। ফলে এইভাবে মুসলমানদের পুরো সামরিক শক্তি ধ্বংস করার পাশাপাশি তদের নারী ও শিশুদেরও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হবে। সেই মতো একদিন যুদ্ধ চলার সময় বনু কোরাইযা একজন গুপ্তচর পাঠাল শহরের মধ্যে এটি দেখার জন্য যে নারী ও শিশু ছাড়া সেখানে অন্য কোনো যোদ্ধা আছে কি না। সেই গুপ্তচর মদিনায় ঢুকে যখন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, সেই সময় সে হঠাৎ মুহাম্মদ(সাঃ)-এর ফুপু হজরত সাফিয়ার নজরে পড়ে যায়। ঘটনাক্রমে তখন পুরো মদিনা শহরে একজনমাত্র অসুস্থ পুরুষ মানুষ ছিল। হজরত সাফিয়া তাকে ঐ গুপ্তচরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে বললেও অসুস্থ সাহাবি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তখন হজরত সাফিয়া আর কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে লাঠি হাতে ঐ গুপ্তচরকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন। এই ঘটনায় মুসলমানরা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে গোৎফান গোত্রের গোপনে মুসলমান হওয়া এক ব্যক্তি, যার নাম ছিল নাঈম, তাঁর তৎপরতায় কুরাইশ এবং বনু কোরাইযার মধ্যে সমঝোতা ভেস্তে গেল। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে মদিনা রক্ষা করতে সক্ষম হলেন।

বিশ দিন যুদ্ধ চলার পরে কুরাইশরা মদিনা-বিজয়ের আশা ত্যাগ করে নিজেদের বাহিনী গুটিয়ে চলে গেল। দীর্ঘদিন পরে স্বস্তি ফিরে এলো মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু রাসুল বললেন– 'ঘরে বসে আরাম করা যাবে না। বরং সন্ধ্যার আগেই বনু কোরাইযার দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে।'

রাসুল তাঁর প্রিয়তম সাহাবি হজরত আলীকে আগে আগে পাঠিয়ে দিলেন বনু কোরাইযার সাথে কথা বলার জন্য। তিনি গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন কেন বনু কোরাইযার এই বিশ্বাসঘাতকতা।

হজরত আলী বনু কোরাইযার নেতাদের এই ঘটনার জন্য অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন। কিন্তু বনু কোরাইযার নেতারা কোনো অনুশোচনায় রাজি নয়, এমনকি তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত পর্যন্ত নয়। উল্টো তারা রাসুল এবং তাঁর পরিবারের নামে অকথ্য গালিগালাজ বর্ষণ করতে শুরু করল।

রাসুল তাঁর বাহিনীসহ এসে পৌঁছালে এইসব গাল-মন্দ যাতে তাঁর কানে না যায় সেই জন্য আলী তাঁকে অনুরোধ করলেন মদিনায় ফিরে যেতে। বললেন যে রাসুলের অনুপস্থিতিতে আলী এবং তাঁর অন্য সাহাবিরাই বনু কোরাইয়ার উপযুক্ত শাস্তিবিধানে সক্ষম। রাসুলুল্লাহ বললেন– আমি বুঝতে পারছি। ওরা আমার নাম ধরে গালাগালি করছে। তুমি চাও না যে সেইসব গালি আমার কানে প্রবেশ করুক!

আলী উত্তর দিলেন– ঠিক তাই।

রাসুল বললেন– ওরা আমাকে গালাগালি করছে তো কী হয়েছে। ওরা তো ওদের নিজেদের নবী হজরত মুসা(অঃ) কে এর চাইতে অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছে।

এরপর রাসুল বাহিনী নিয়ে দূর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। ইহুদিরা ভেতর থেকে দূর্গের ফটক বন্ধ করে দিল। মুসলমান বাহিনী দূর্গ অবরোধ করে রইল। একের পর এক কেটে গেল কয়েকটি দিন। এবার ইহুদিরা উপলব্ধি করল যে তারা তাদের দূর্গ আর নিজেদের দখলে রাখতে পারবে না। বাইরে থেকে রসদ না এলে তাদের পক্ষে আর টিকে থাকা অসম্ভব। কিন্তু বাইরে থেকে কোনো সাহায্য আসার সমস্ত পথই বন্ধ। তখন তারা মুহাম্মদ(সাঃ) এর কাছে প্রস্তাব পাঠাল তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি আবু লাবাবা আনসারীকে তাদের কাছে পাঠান তাহলে বনু কোরাইযা তার সাথে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে আলোচনা করতে রাজি আছে। আবু লাবাবা ছিলেন বনু আউস গোত্রের একজন নেতা। তাঁর সঙ্গে বনু কোরাইয়ার ইহুদিদের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল। ইহুদিদের প্রস্তাবমতো রাসুল পাঠিয়ে দিলেন আবু লাবাব আনসারীকে। ইহুদিরা আবু লাবাবের কাছে জানতে চাইল তাদের আত্মসমর্পণ করা সঙ্গত হবে কি না। আর আত্মসমর্পণ করলে মুহাম্মদ(সাঃ) তাদেরকে কী শাস্তি দেবেন বলে আবু লাবাবার মনে হয়। তখনও এই ব্যাপারে রাসুল কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি। বনু কোরাইযার দুর্ভাগ্য যে তারা বেশি চালাকি করতে গিয়েছিল। যদি তারা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করত তাহলে মুহাম্মদ(সাঃ) হয়তো তাদের অন্য বিদ্রোহী গোত্রগুলির মতোই শাস্তি হিসাবে মদিনা থেকে বহিষ্কার করতেন। আবু লাবাবা ইঙ্গিত দিলেন যে ইহুদিদের হত্যা করা হতে পারে। তখন ইহুদিরা জেদ ধরল যে তারা মুহাম্মদ(সাঃ)-কে বিচারক হিসাবে মেনে নিতে রাজি নয়। যদি তাঁর বদলে ইহুদিদের পছন্দসই অন্য কেউ বিচারকের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছে। রাসুল তাদের এই প্রস্তাবও মেনে নিলেন। জানতে চাইলেন, ইহুদিরা বিচারক হিসাবে কার নাম প্রস্তাব করতে চায়। ইহুদিরা বলল, তারা তাদের পুরনো বন্ধু বনু আউসের নেতা ও রাসুলের সাহাবি সাদ আনসারীর ফয়সালা মেনে নিতে রাজি আছে। রাসুল অবশেষে ইহুদিদের এই দাবিও মেনে নিলেন। সাদ যুদ্ধে সদ্য আহত হয়েছিলেন। তাকে ডেকে পাঠানো হলো। বনু আউস গোত্রের অনেক লোক এসে সাদকে অনুরোধ জানাল তিনি যেন বনু কোরাইযার শাস্তি মওকুফের ব্যবস্থা করেন। তারা এই কথা মনে করিয়ে দিল যে বনু খাজরাজ গোত্র সবসময়ই তাদের মিত্র ইহুদি গোত্রগুলিকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সাদের উচিত তাদের বন্ধুগোত্র বনু কোরাইযাকে রক্ষা করা। ও তাদের জন্য সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান দেওয়া। যেহেতু তার ফয়সালাকেই মুহাম্মদ(সাঃ) মেনে নেবেন, তাই সবকিছু নির্ভর করছে সাদের উপরই।

সাদকে যখন উটের পিঠে তুলে বনু কোরাইযার দূর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তার পাশে পাশে তার গোত্রের লোকেরা দৌড়াতে দৌড়াতে বলছিল তিনি যেন অবশ্যই তাদের বন্ধুগোত্র বনু কোরাইযার পক্ষে রায় দেন।

সাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইহুদিদের কাছে জানতে চাইলেন তারা তাঁর ফয়সালা মেনে নিতে রাজি আছে কি না। বনু কোরাইযার নেতারা সমস্বরে বলল যে তারা সাদের রায় মেনে নিতে রাজি আছে। এবার সাদ মুসলমান বাহিনী ও রাসুলকে জিজ্ঞেস করলেন তারা তার ফয়সালা মেনে নেবেন কি না। রাসুল তাঁকে আশ্বাস

মুসলমানমঙ্গল- দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে বললেন যে সাদ নিজের বিবেচনামতো যে রায় দেবেন, মুসলমানরা বিনাপ্রশ্নে তা মেনে নেবে।

সাদ তখন তাওরাতের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর রায় প্রদান করলেন। তিনি পড়ে শোনালেন তাওরাতের সেই অংশ, যেখানে বলা হয়েছে– 'যখন তুমি কোনো নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তার নিকটে উপস্থিত হবে, তখন তার কাছে সন্ধির কথা ঘোষণা করবে। তাতে যদি সে সন্ধি করতে সম্মত হয়ে তোমার জন্য দ্বার খুলে দেয়, তাহলে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যাবে, তারা তোমাকে কর প্রদান করবে এবং তোমার দাসত্ব বরণ করবে। কিন্তু সে সন্ধি না করে যদি তোমার সাথে যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তা তোমার হস্তগত করলে তুমি তার সমস্ত পুরুষকে খড়্গ ধার দিয়ে আঘাত করবে, কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুপাল প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুঠের মাল, নিজের জন্য লুঠরূপে গ্রহণ করবে, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু প্রদত্ত শত্রুদের মাল ভোগ করবে। এই নিকটবর্তী জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমার কাছ থেকে দূরে আছে তাদেরই প্রতি এইরূপ করবে। কিন্তু সেই সব জাতির যে সকল নগর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, সে সকলের মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাউকেও রাখবে না। তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাদেরকে যথা, হিত্তীয়, ইমোরীয় কানামীয়, পরিষীয়, হিব্বীয়, বিবুষীয়দেরকে নিঃশেষে ধ্বংস করবে; পাছে তারা আপন আপন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে সকল ঘৃণার্হ কাজ করে, তদ্রূপ করতে তোমাদেরকে শিখায় আর পাছে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ কর।" (দ্বিতীয় বিবরণ– ২০: ১০-১৮)।

তাওরাতের এই বিধান মেনে সাদ তার রায় দিয়েছিলেন। আর তখন ইহুদিরাও যেমন তা মেনে নিতে বাধ্য ছিল, তেমনই মুহাম্মদ(সাঃ)-এর পক্ষেও এই রায় যথাযথ কারণেই উল্টে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাহলে পরবর্তীতে মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর কোনো সাহাবিকে কোনো বিষয়ে নেতৃত্ব দান করতে চাইলে বা দায়িত্ব দান করলে তিনি তাঁর স্বাধীন মত প্রয়োগে দ্বিধা করতেন। ফলে মুসলমান জগতে বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়ে যেত।

প্রশ্ন করল ইউসুফ– সবটুকু শোনার পরে কি ঘটনাটিকে মুহাম্মদ(সাঃ)-এর রক্তপিপাসু স্বভাবের পরিচয় বলে মনে হচ্ছে?

বাপ্পী বিড়বিড় করে অনুচ্চকণ্ঠে কিন্তু সবাই যেন শুনতে পায় এমনভাবে বলল– শালা ইউসুফ দেখছি আমাদের খাঁটি মুসলমান না বানিয়ে ছাড়বে না!

হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ

পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি মুসলমানদের ক্ষোভের অনেক যৌক্তিক কারণও রয়েছে। সেই কারণে পাশ্চাত্যের প্রতি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন রকম। তার মধ্যে সবচেয়ে গোঁড়া মৌলবাদী অংশটি পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কোনো ইতিবাচক জিনিস খুঁজতে নারাজ। এদের মধ্যে একটা দল মনে করে পাশ্চাত্য সভ্যতা আসলে ইহুদি-খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদী জগৎ, এবং সেটাই হচ্ছে কেয়ামত-পূর্ব দাজ্জাল।

দাজ্জালের ক্ষতিকর আবির্ভাব সম্পর্কে রাসুল যে তাঁর সাহাবিদের সতর্ক করে গেছেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চাইতে বড় আর কোনো শত্রু কোনোদিন দেখা দেয়নি, তার পরেও আর কেউ মানব জাতির অতটা ক্ষতি করতে পারবে না। দাজ্জাল সম্পর্কে এই চরম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন রাসুল।

বোখারি, তিরমিজি, মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে দাজ্জাল সম্পর্কে মুহাম্মদ(সাঃ)-এর বিভিন্ন উক্তি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন– "আদমের সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো বিষয় বা ঘটনা হবে না, যা দাজ্জালের চেয়ে গুরুতর ও সংকটজনক।"

কিংবা– "নুহ (আঃ) থেকে নিয়ে কোনো নবীই বাদ যাননি যিনি তাঁর উম্মাহকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি।"

এবং আল্লাহর নবী নিজেও দাজ্জালের ফেৎনা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে শেষ জমানায় দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। সেই বিশাল ঘোড়ায় উপবিষ্ট একচক্ষু শয়তান মানুষের ঈমান-আমান নষ্ট করবে, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গড়ে ওঠা মানব জাতির সমস্ত মূল্যবোধ ও সুকৃতিসমূহ ধ্বংস করবে, সে পৃথিবীতে নির্বিচার ধ্বংস ও হত্যালীলা পরিচালনা করবে ইত্যাদি। সে নিজেকে দাবি করবে মানুষের রব বা প্রতিপালক বলে।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রথম দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছিলেন মুহাম্মদ আসাদ। তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়ার এক ইহুদি পুরোহিত পরিবারের সন্তান। তাঁর পূর্ব নাম ছিল লিওপোল্ড ওয়েইস। তিনি ইসলাম গ্রহণের পরে 'রোড টু মেক্কা' নামে একটি বই লিখেছিলেন। তিনিই দাজ্জালের নতুন ব্যাখ্যা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশেও একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ মুহাম্মদ আসাদের দাজ্জাল-সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। তাদের ব্যাখ্যা অবশ্য বেশ আকর্ষণীয়। তারা রাসুলের হাদিস থেকে দাজ্জালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে তার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষণগুলি মিলিয়ে নিয়েছে।

যেমন–

১. "দাজ্জাল ইহুদি জাতির মধ্য থেকে উত্থিত হবে এবং ইহুদি ও মুনাফিকরা তার অনুসারী হবে।" (মুসলিম)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার জন্ম ইহুদিদের হাতে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক ছিলেন ইহুদি। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এই সভ্যতার প্রধান ধারক। আর মুনাফিক বলতে তারা বোঝায় মুসলমানদের সেই অংশটিকে, যারা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাতসহ ইসলামের অনেক অনুশাসন মেনে চলে, কিন্তু পাশ্চাত্যের ইহজাগতিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়।

১. "দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব, প্রভু বলে ঘোষণা করবে এবং মানবজাতিকে বলবে তাকে রব বলে স্বীকার করে নিতে।" (বোখারি)

আসাদপন্থীরা মনে করে, দাজ্জাল পৃথিবীর মানুষকে বলবে যে, আমি মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতি নির্মাণ করেছি, যে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষাব্যবস্থা দিয়েছি তা তোমরা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করো ও প্রয়োগ করো। তোমাদের যে পুরাতন জীবনপদ্ধতি ছিল, যেগুলি ছিল বেদ-বাইবেল-কোরআন ভিত্তিক, সেগুলি এখন অচল, মৌলবাদী এবং বর্বর যুগের মতো মানবতার বিকাশের পরিপন্থী হয়ে গেছে। ওসব ত্যাগ করে আমি যে বিধান দিয়েছি, তা গ্রহণ করলে তোমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারবে, তোমরা ধনসম্পদ অর্জন করতে পারবে, ইহলৌকিক জীবনে সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছুতে পারবে।

দাজ্জাল মানুষের প্রভু বা রব হওয়ার দাবি করছে, কিন্তু স্রষ্টা হওয়ার দাবি করছে না। সে বলছে যে ব্যক্তিগত জীবনে তোমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি, জৈন যা খুশি হতে পারো; যত ইচ্ছা তোমাদের আল্লাহ-গড-এলাহি-ঈশ্বরকে ডাকো; যত রাকাত ইচ্ছা নামাজ পড়ো, রোজা করো, হজ করো, জাকাত দাও তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সমষ্টিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমার প্রভুত্ব বা আমার রবুবিয়ত মেনে নাও। ব্যক্তিজীবনে তোমরা যে কোনো আল্লাহ বা স্রষ্টাকে মেনে নিতে পারো, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে একমাত্র আমার ইহজাগতিক নিয়মই মেনে নিতে হবে।

২. "দাজ্জালের বাহনের দুই কানের মধ্যে দূরত্ব হবে সত্তর হাত।" (বায়হাকি)

আরবি ভাষায় সত্তর বলতে যে শুধু সাতের পিঠে শূন্য বসানো সংখ্যাটি বোঝানো হয় তা নয়। এর অন্য আরেকটি ব্যবহারও রয়েছে। কোনো জিনিসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু বা অসংখ্য বোঝাতেও সত্তর শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটা শুধু সত্তর দিয়েই হয়। পঞ্চাশ বা ষাট বা আশি দিয়ে হয় না। অর্থাৎ সত্তর এখানে অসংখ্য হিসাবে প্রযোজ্য। এই কথা বলার মাধ্যমে রাসুল এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে দাজ্জাল বিশাল বা বিরাটকায়। তার বাহন বা ঘোড়ার দুই কানের মধ্যকার দূরত্ব বহুদূরবিস্তৃত হলে বাহনটি কত বড়! এর সওয়ার দাজ্জালও তাহলে কত বড়! কেউ কেউ আরেকটা রূপক প্রয়োগ করে বলেন যে দাজ্জালের বাহনের এক পা থাকবে পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তে, আরেক পা থাকবে পূর্বপ্রান্তে।

এই মতবাদের অনুসারীদের মতে আরোহী দাজ্জাল হচ্ছে ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা, যা এখন পশ্চিম থেকে পূর্ব পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। আর তার বাহন হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, যার সাথে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির নেই।

৩. "দাজ্জালের গতি হবে অতি দ্রুত। সে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো আকাশ দিয়ে উড়ে চলবে।" (তিরমিজি ও মুসলিম)

এই হাদিসের তাৎপর্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে বিমান, রকেট, ইন্টারনেট– এই সব উচ্চ প্রযুক্তির যোগাযোগ মাধ্যমকে।

৪. "দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি হবে।" (তিরমিজি ও মুসলিম)

বর্তমানে পাশ্চাত্য শক্তির হাতে এমন প্রযুক্তি রয়েছে যার সাহায্যে তারা আকাশ থেকে কৃত্রিম ভাবে বৃষ্টিপাত ঘটাতে সক্ষম। ব্যাপক হারে এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু না হলেও পরীক্ষামূলভাবে সফলতা পাওয়া গেছে। আশির দশকে চীনের আকাশে এই প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানো হয়েছে।

৫. "দাজ্জালের গরু-গার্ভি, মহিষ, বকরি, ভেড়া, মেষ ইত্যাদি বড় বড় আকারের হবে এবং সেগুলির স্তনের বোঁটা বড় বড় হবে (যা থেকে প্রচুর পরিমাণে দুধ হবে)।" (তিরমিজি ও মুসলিম)

হাইব্রিড প্রযুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্যে সকল গবাদি পশুর আকার, দুধের পরিমাণ, মাংসের পরিমাণ অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এক প্রজাতির প্রাণীর ভালো গুণ আরেক প্রজাতির প্রাণীর শরীরে সঞ্চারিত করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে উন্নত দেশগুলিতে গবাদি পশুসম্পদে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

৬. "দাজ্জাল মাটির নিচের সম্পদকে আদেশ করবে উপরে উঠে আসার জন্য এবং সম্পদগুলি উপরে উঠে আসবে এবং দাজ্জালের অনুসরণ করবে।" (তিরমিজি ও মুসলিম)

বর্তমান পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা আবিষ্কারের আগে মাটির নিচের সম্পদ অর্থাৎ খনি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুব কম ছিল। মানুষ মাটির নিচ থেকে খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমিত পরিমাণ সম্পদই আহরণ করতে পারত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবেই জানেন যে পৃথিবীর কোন অংশে ভূগর্ভে কোন কোন মূল্যবান সম্পদ রয়েছে। খনি থেকে কয়লা, লোহা, তেল, গ্যাস, সোনা, রূপা, হীরক, ইউরেনিয়াম, তামা সহ সব ধরনের সম্পদ এখন প্রযুক্তির সাহায্যে তুলে আনা হচ্ছে। এই প্রযুক্তি মূলত পশ্চিমা দেশগুলির হাতেই। নিজেদের দেশ তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খনিজ সম্পদগুলিও তারা নিজেদের করায়ত্ত করে ফেলছে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি দিয়ে।

৭. দাজ্জালের কাছে রেজেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। সেখান থেকে সে যাকে ইচ্ছা দেবে। যারা তার বিরোধিতা করবে, তাদের সে ঐ ভাণ্ডার থেকে রেজেক দেবে না। এইভাবে সে মুসলমানদের অত্যন্ত কষ্ট দেবে। যারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে তারা আরামে থাকবে, আর যারা তা করবে না তারা কষ্টে থাকবে।" (বোখারি ও মুসলিম)

মুহাম্মদ আসাদের অনুসারীরা বলতে চায় যে, রেজেকের অর্থ শুধু খাদ্যদ্রব্য নয়। রেজেক বলতে খাদ্যদ্রব্য, বাড়িঘর, টাকাপয়সা সবকিছুই বোঝায়। এক কথায় পার্থিব সম্পদ বলতে যা কিছু বোঝানো হয় তার সবকিছু মিলেই রেজেক। বর্তমানে দাজ্জালের, অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতার হাতেই পৃথিবীর মোট সম্পদের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি করায়ত্ত। এই সম্পদ থেকে দাজ্জাল কাদের দান করে? শুধু তাদেরকেই দেয়, যারা তার দেওয়া সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েছে। যারা পাশ্চাত্য আধিপত্যকে পুরোপুরি মেনে নিতে অস্বীকার করে তাদেরকে দাজ্জাল সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। সুদান, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও নীরব দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত। কিন্তু যেহেতু ঐসব দেশ পুরোপুরি পাশ্চাত্য প্রভাব বলয়ে থাকতে রাজি নয় তাই তাদের জন্য মানবিক সাহায্য দিতেও দাজ্জালের আপত্তি। আজ বাকি পৃথিবীর মানুষ ও দেশগুলি দাজ্জালের মুখাপেক্ষি। দাজ্জালের কাছেই তারা ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে যারা দাজ্জালের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের সে ভিক্ষা, সাহায্য ও ঋণ দিয়ে কৃতার্থ করে। দাজ্জাল সাহায্য না দিলে তারা না খেয়ে থাকে, দাজ্জাল ঋণ না দিলে তাদের সরকার ও রাষ্ট্র অচল হয়ে যায়, সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর কোনো দেশ বা জাতি দাজ্জালের অবাধ্য হলেই তাকে সব রকম সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হয়, তার ওপর অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক অবরোধ বা এমবার্গো আরোপ করা হয়। জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সহ সবগুলি সংস্থাই দাজ্জালের একক কতৃত্বের অধীন বলে তারা দাজ্জালের ইশারা ছাড়া কিছুই করতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. "দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে।" (বোখারি ও মুসলিম)

দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ। সে যা কিছু দেখবে সবই বাম চোখ দিয়ে। এই হাদিসের তাৎপর্য আসাদপন্থীদের মতে অন্য রকম। আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার সবকিছুরই দুইটি পরস্পর বিপরীত দিক রয়েছে। তাঁর মহাসৃষ্টি দৃশ্য-অদৃশ্য, কঠিন-বায়বীয়, জমাট-তরল, আলো-অন্ধকার, আগুন-পানি, দিন-রাত্রি ইত্যাদি বিপরীত জিনিসের ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ। এই পৃথিবীতে তিনি যে নিজের খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে মানুষকে পাঠালেন, সেই মানুষের জন্যও তিনি নির্ধারণ করে দিলেন অনেক বিপরীতমুখি বিষয়। মানুষের জন্য তিনি নির্দিষ্ট করে দিলেন দেহ-আত্মা, জড়বাদ-আধ্যাত্মিকতা, ভালো-মন্দ, গুনাহ-সওয়াব, ইহকাল-পরকালের ভারসাম্যপূর্ণ বৈপরীত্য। এই দুই-য়ের ভারসাম্যই হচ্ছে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। মানুষের জন্য যে দ্বীন তিনি নির্বাচিত করে দিয়েছেন, সেই দ্বীনের আরেক নাম হচ্ছে 'দ্বীনুল ফিতরাহ' বা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ধর্মব্যবস্থা। এই দ্বীন যারা মেনে চলবে, আল্লাহ তাদের নাম দিয়েছেন 'মিল্লাতান ওয়াসাতা' বা ভারসাম্যপূর্ণ জাতি। এই দুই বিপরীত দিকের যে কোনো একটি সম্পর্কে অসচেতন হলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

আরব-ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে ডানদিককে ধরে নেওয়া হয় উত্তম এবং বামদিককে গণ্য করা হয় নিকৃষ্ট হিসাবে। যেমন, কেয়ামতের দিন জান্নাতিদের আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে, জাহান্নামিদের বাম হাতে। দেহ ও আত্মার মধ্যে দেহ বাম ও আত্মা ডান। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সত্য ডান ও মিথ্যা বাম। ইহকাল ও পরকালের মধ্যে পরকাল ডান ও ইহকাল বাম। দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হওয়ার তাৎপর্য এই যে তার দৃষ্টি ভারসাম্যপূর্ণ নয়। দাজ্জাল জীবনের ভারসাম্যের দিক, আত্মার দিক, মনের দিক, পরকালের দিক, সত্যের দিক দেখতে পায় না। দাজ্জাল বা পাশ্চাত্য ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা দূরবিন দিয়ে মহাবিশ্ব দেখতে পায়, কিন্তু ডান চোখ বন্ধ বলে সে মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর মহত্ব দেখতে পায় না।

৯. "দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মতো দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে, আসলে সেটা হবে জাহান্নাম; আর যেটাকে জাহান্নাম বলবে, সেটা আসলে হবে জান্নাত। তোমরা যদি তার (দাজ্জালের) সময় পাও তবে দাজ্জাল যেটাকে জাহান্নাম বলবে তাতে পতিত হয়ো, সেটা তোমাদের জন্য জান্নাত হবে।" (বোখারি ও মুসলিম)

দাজ্জাল ও তার অনুসারীরা বলে যে আমরা মানুষের জন্য যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি, সেটাই আসলে মানুষের ভালো জীবন যাপনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। সেটাই পৃথিবীর স্বর্গ। ধর্মীয় জীবনকে পাশ কাটিয়ে ঐ জীবনে প্রবেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে। তাই দাজ্জালের স্বর্গ আসলে বিশ্বাসীদের নরক। আর দাজ্জালের নরক আসলে বিশ্বাসীদের জান্নাত।

১০. "দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মোমেন বিশ্বাসীরাই তা দেখতে ও পড়তে পারবে; যারা মোমেন নয়, তারা পড়তে পারবে না।" (বোখারি ও মুসলিম)

মোমেন হলে লেখাপড়া না জানলেও কোনো ব্যক্তি পড়তে পারবেন দাজ্জালের কপালে লেখা তার পরিচিতি। অথচ মোমেন না হলে লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তিও দাজ্জালের কপালে লেখা পড়তে পারবেন না। এই ইঙ্গিত থেকেই পরিষ্কার যে দাজ্জালের কপালের ঐ লেখা কাফ্, ফে, রে, এইসব অক্ষর দিয়ে লেখা নয়। এখানে মোমেন বলতে আসাদপন্থীরা বোঝান তাদের, যারা আল্লাহর সর্বব্যাপী সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে, জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্বীকার করে না। দাজ্জালকে রব বা প্রতিপালক বলে স্বীকার করে নিয়ে অনেক জ্ঞানী লোকই কার্যত মোমেনের খাতা থেকে নিজের নাম কেটে নিয়েছেন। সেই কারণে দাজ্জাল যে সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারী কাফের এটা তারা দেখতেও পান না, সুতরাং পড়তেও পারেন না। মুসলমানদের একটি সামান্য অংশ ছাড়া বাকি পৃথিবীর মানুষ দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণে আছেন, এটিও বুঝতে পারছেন না।

১১. "আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ করবে।" (শারহে সুন্নাহ)

এখানেও সত্তর বলতে বহু বা অসংখ্য বোঝানো হয়েছে। ইহুদি-খ্রিস্টানরা সবাই যেমন নিজেদের সৃষ্ট সভ্যতাকেই রব বলে মেনে নিয়েছে, তেমনই মুসলমানদের মধ্যেও অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দাজ্জালের অনুসারী হয়ে গেছে।

১২. "দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (সমস্ত ভূভাগ) আচ্ছন্ন করবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মতো তার করায়ত্ত হবে।" (মুসনাদে আহমদ, হাকিম ও দারউন নশুরা)

অতীতে কখনোই কোনো শক্তি বা মহাশক্তি একক ভাবে সারা পৃথিবী করায়ত্ত করতে পারেনি। সারা পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল ও সকল জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এমন বিশ্বজয়ীর আবির্ভাব কোনোদিন ঘটেনি। তার কারণও ছিল। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহন কখনও এত উন্নত ছিল না। এখন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছানো যায় অকল্পনীয় কম সময়ের মধ্যে। সৈন্যবাহিনী পৌঁছাতে দেরি হলেও নিক্ষেপিত মিসাইল পৌঁছে যায় কয়েক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনিটের মধ্যেই। ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতার প্রযুক্তি এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। তাই সারা পৃথিবীই এখন তাদের করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন।

সব লক্ষণ বিশ্লেষণ করে মুহাম্মদ আসাদের অনুসারীরা বলতে চান যে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাই হচ্ছে দাজ্জাল। মুসলমানদেরকে অবশ্যই এই সভ্যতা থেকে দূরে থাকতে হবে। এর সকল উপাদান থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

পনের

এ যে একেবারে মনে হচ্ছে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরের মতো অবস্থা। ইংরেজদের কাছে যুদ্ধে হেরে মুসলমান নেতারা ফতোয়া দিল যে ইংরেজি শিক্ষা হারাম। ফলে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ল পুরো দুইশো বছর। এই মুহাম্মদ আসাদের বিশ্লেষণ শুনে মনে হচ্ছে যে ইউরোপের-আমেরিকার সবকিছুই খারাপ। তাই তাদের সভ্যতা থেকে কোনো কিছুই গ্রহণ করা চলবে না। বিশেষ করে সেক্যুলারিজম একেবারেই না।

বাপ্পী বলে– আরে মোল্লারা বলে যে সবার আগে সেক্যুলারিজমই বর্জন করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা না কি ইসলামের এখন সবচেয়ে বড় শত্রু!

ইউসুফের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। সে কী বলে শুনতে চায়।

হেসে বলল ইউসুফ– আমাকে কি এই ব্যাপারে পুরোপুরি বিশেষজ্ঞ মনে করো তোমরা? ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যদি হয় যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ধর্মের সরে আসা, তাহলে বলতে হবে এটা এখন একটা মোটামুটি প্রয়োজনীয় জিনিস।

সাদী ওস্তাদ ঠেস মারল– তোমার মার্কিন-বিদ্বেষ মনে হচ্ছে কিছুটা কমাতে পেরেছে লিসবেথ!

কেন? একথা কেন?

সেক্যুলারিজম একটা ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট। কাজেই ইসলাম তাকে সন্দেহের চোখে দেখতেই পারে। আমাদের মোল্লারা তো বলে যে ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মহীনতাই। ভোটের সময় বেশি বেশি করে বলে। ফলে বেকায়দায় পড়ে আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনা বারবার হজ করে এসে হাতে সবসময় তসবি নিয়ে ঘুরেও, মাথায় ডবল হেজাব বেঁধেও যথেষ্ট মুসলমান হতে পারেন না। ইসলামের কথা বলে নেপোয় দই মেরে নিয়ে যায়। শেখ হাসিনা আছেন উভয় সংকটে। না পারেন ছাড়তে ইসলাম, না পারেন ছাড়তে ধর্মনিরপেক্ষতা।

ইউসুফ বলল– যে কোনো একটাকে ছাড়তে হবে কেন? দু'টো তো একসাথেই চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে?

আমি আগেই বলেছি, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে রাষ্ট্র থেকে ধর্মের দূরে সরে আসা। পশ্চিম এই কাজটা করেছে মাত্র দুইশো বছর আগে। আর মুসলমানরা এই কাজটা করেছে প্রায় চোদ্দশো বছর আগেই।

তাজ্জব হয়ে গেল সবাই– এ আবার কী কথা!

মৃদু হাসল ইউসুফ– হজরত আলীর মৃত্যুর পর থেকে শুরু হলো উমাইয়া শাসন। তখন থেকেই দেশ শাসনে ধর্ম চলে গেছে সাইড লাইনে। খলিফা নাম নিয়ে রাষ্ট্র চালিয়েছে উমাইয়া-আব্বাসীয়রা, আর আলেম-উলেমারা ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে সরে গেছে এক পাশে। কাজেই পশ্চিমের অনেক আগেই মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে।

তাই তো!

আরে সারা দুনিয়ার মুসলমান ধর্মনেতা আর ধর্মভক্তিকরা ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি!

করেছে। সবচেয়ে স্পষ্টভাবে খেয়াল করেছিলেন মওদুদী সাহেব। সেই কারণেই তিনি জেদ ধরেছিলেন ইজতিহাদের দরজা আবার খুলে দেওয়ার জন্য।

কামাল জিজ্ঞেস করল– কেন ইজতিহাদের দরকার পড়ল কেন মওদুদীর?

ইজতিহাদ না করতে পারলে আগের চার সুন্নি ইমাম যে নিয়ম বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা মেনে নিয়ে বিধান তৈরি করে রেখে গেছেন, সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার তো প্রতিবাদ করা যাচ্ছে না।

মওদুদী সাহেব ইজতিহাদ করেছিলেন?

না তো কী। উনি তো সরাসরি অ্যাড্রেস করেছিলেন কোরআনকে। কোরআনের নতুন তফসির এবং নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তো তাকলিদ-পন্থীরা জামায়াতের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। আর সেই কারণেই অন্তত বাংলাদেশে, জামায়াতে ইসলামির এককভাবে ভোটে জিতে ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তাই তো দেখা যায় মুসলমান ধর্মনেতাদের একটা বিরাট গোষ্ঠী জামায়াত আর মওদুদীর বিরোধী।

এই ব্যাপারটা মওদুদীও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ভোটের কথা মনেই আনেননি। তিনি বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথা বলেছিলেন। মানে একটা বড় সংখ্যায় অনুগামী তৈরি করতে পারলে তাদের নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটানো। একেবারে বামপন্থীরা যেভাবে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে চাইত গরীব ও শোষিত মানুষদের নিয়ে। জামায়াত এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর স্ট্রাকচার একেবারে হুবহু কমিউনিস্ট পার্টিগুলির স্ট্রাকচারের সাথে মিলিয়ে তৈরি। এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনিস্টরা যেমন যৌথ ব্যবস্থা বা কমিউনের প্র্যাকটিস করে, মওদুদী তার অনুসারীদের একবার সেই রকম ইসলামি-কমিউনও প্র্যাকটিস করিয়েছিলেন। তাকলিদ-পন্থী আলেমরা সবসময়ই ইসলামকে রাষ্ট্র থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। মানে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চেয়েছেন। তা বজায় থাকলে তো আর মওদুদীর ক্ষমতায় যাওয়া হয় না! তাই তাকে প্রচার করতে হয়েছে যে রাজনীতি বাদ দিয়ে ইসলামকে ভাবাই ঠিক নয়। এবং এটাও প্রচার করতে হয়েছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামবিরোধী জিনিস। মওদুদী বা জামায়াত বা তার মতো দলগুলি প্রচার করে যে যেদিন থেকে ইসলাম রাষ্ট্র থেকে দূরে সরে গেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের পতন শুরু হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাস তো তা বলে না। পৃথিবীজুড়ে মুসলমানরা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পের চর্চায় পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। এগুলো সবই তো উমাইয়া–আব্বাসীয় থেকে শুরু করে মোগল-অটোমান তুর্কি আমল পর্যন্ত।

তাহলে মওদুদীর যুক্তি তো ধোপে টেকে না।

না টিকলেও রাজনীতি করতে হলে তাদের তো একটা পুঁজি লাগবেই। সেই পুঁজি হচ্ছে রাজনৈতিক ইসলাম।

প্রতারণার রাজনীতির যুগে এই রকম একটা পুঁজি না থাকলে রাজনীতিতে টিকে থাকা যায় না। দল হিসাবে টিকে থাকতে হলে বা বিকশিত হতে হলে একটা না একটা ফিক্সড ডিপোজিট থাকতে হয়। যেমন আওয়ামী লীগের ফিক্সড ডিপোজিট হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

বিএনপি-র সেই রকম জিয়াউর রহমান।

না। দ্বিমত পোষণ করল ইউসুফ– জিয়াউর রহমানের মার্কেট ভ্যালু অত বেশি নয়। শেখ মুজিবের ভাবমূর্তির পাশাপাশি স্থাপন করলে জিয়াউর রহমান হবেন গালিভারের পাশাপাশি লিলিপুট। বিএনপি-র মূল শক্তি হচ্ছে যে এটা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্লাটফর্ম। আওয়ামী লীগের যারা বিরোধী, তারা যে পন্থীই হোক, বিএনপি-ই তাদের দাঁড়ানোর প্রধান জায়গা।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, বিএনপি মুখে যতই ইসলামি চেতনার কথা বলুক, ক্ষমতায় থাকার সময় কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাই মেনে চলে। আর অন্যরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, যাক বাবা অন্তত ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় আসেনি!

হো হো করে আরেক দফা হাসি।

আরেক রাউন্ড চা।

চায়ে চুমুক দিয়ে ইউসুফ বলে– আসলে ইসলামি রাজনীতির লোকেরা আধুনিকায়নের সাথে ভুলক্রমে সেক্যুলারিজিমকে এক করে দিয়েছে। কিছু কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান দেশের নেতা পশ্চিমের উন্নতি দেখে নিজেদের দেশে হুবহু সেই আধুনিকতা আমদানি করতে গিয়েছিলেন। তারা আসলে ইসলামও বোঝেননি, আধুনিকতাও বোঝেননি।

যেমন?

তুরস্কের অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ১৮৬২ সালে জেনিসারিদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে আধুনিক কিছু প্রযুক্তি যোগ করেন। আর প্রায় কাছাকাছি সময়ে মিশরের মুহাম্মদ আলী পাশা তার দেশকে তড়িঘড়ি আধুনিকায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এটি করতে গিয়ে উল্টো ফল ফলেছিল। মিশরের সেচ আর নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে তিনি কৃষকদের জোর করে ধরে এনেছিলেন বাধ্যতামূলক শ্রম দেওয়ার জন্য। সেচ ব্যবস্থা উন্নত হলো বটে, কিন্তু এই সময় সরকারি অত্যাচারে প্রাণ হারাল তেইশ হাজার কৃষক। মুহাম্মদ পাশা সব সক্ষম পুরুষের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছিলেন। কৃষকরা সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে এতই ভীত ছিল যে তারা নিজেরাই নিজেদের দেহকে বিকৃত করেছে। কেউ হাতের আঙুল কেটে ফেলেছে, কেউ নিজের পায়ে আঘাত করে খোঁড়া হয়ে গেছে, এমনকি কেউ কেউ মরিয়া হয়ে নিজের একটা চোখ পর্যন্ত অন্ধ করে ফেলেছে। মুহাম্মদ পাশা এরপরে হাত দিলেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে। মসজিদ এবং মাদ্রাসার নামে যেসব নিষ্কর জমি বরাদ্দ করা ছিল, সরকার সেগুলি বাজেয়াপ্ত করল। উলেমাদের কাছ থেকে সব ধরনের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলো। ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষকদের ভাতা দেওয়া বন্ধ করা হলো। মুহাম্মদ পাশার পৌত্র ইসমাইল পাশা উন্নয়নের গতি আরও বাড়িয়েছিলেন। তিনি মিশরের নিজ ব্যয়ে সুয়েজ খাল পুনঃখনন করলেন, নয়শো মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করলেন, নতুন ১৩,৭৩,০০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করলেন, ছেলে এবং মেয়েদের জন্য অনেকগুলি আধুনিক স্কুল স্থাপন করলেন। কিন্তু এইসব কাজের ব্যয় মিশরের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দিয়েছিল। প্রচুর ঋণ করতে হয় মিশরকে। এই ঋণের কারণেই ইউরোপীয়ান শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে মিশরে সামরিক হস্তক্ষেপ করার সুযোগ গ্রহণ করে ইংরেজরা। আধুনিক রাষ্ট্র বানাতে গিয়ে মুহাম্মদ পাশা এবং ইসমাইল পাশা মিশরকে ব্রিটেনের উপনিবেশ বানিয়ে ফেললেন।

তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি সুফি মতবাদকে কঠোর হাতে দমন করেছেন, নারী ও পুরুষদের বাধ্য করেছেন আধুনিক ইউরোপীয় পোশাক পরার জন্য। প্রথম থেকেই ইসলামি বিশ্বের মানুষ কামাল পাশাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে, কারণ তিনি সুন্নি মুসলমানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খলিফাতন্ত্রকে উৎখাত করেছিলেন। সেই সাথে এইসব কার্যকলাপ যোগ হওয়ায় মুসলমান মৌলবাদীরা তাকে ও আধুনিকায়নকে সমানভাবে নিন্দা জানানোর সুযোগ পেয়ে গেছে।

এইসব ঘটনাগুলিই পশ্চিমা সেক্যুলারিজমকে অপছন্দ করার প্রধান কারণ। আবার এখান থেকেই মৌলবাদীদের শক্তি সঞ্চয়ের ঘটনা ঘটেছে। সুন্নি মুসলমান সমাজে মৌলবাদের প্রথম জন্মদাতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় মিশরের সায়ীদ কুতুবকে। তিনি কিন্তু প্রথমে মৌলবাদী ছিলেন না। বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সেক্যুলার রাজনীতির প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল তাঁর। এমনকি ১৯৫৩ সালে মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগ দেওয়ার পরেও একই ধরনের চিন্তার লালন করতেন তিনি। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের একটি ইসলামি রূপ প্রদানে নিজের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। চেষ্টা করেছিলেন সেক্যুলারিজমের বস্তুবাদী উপাদানগুলিকে বাদ দিয়ে তাকে ইসলামি সমাজের জন্য উপযুক্ত একটি উপাদান হিসাবে তৈরি করে নিতে। কিন্তু ব্রাদারহুডের সদস্য হওয়ার অপরাধে ১৯৫৬ সালে জামাল আব্দুল নাসেরের সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। সায়ীদ কুতুব নাসেরের নির্যাতন-শিবিরে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন যে ধার্মিক মুসলমান আর সেক্যুলারিস্টের পক্ষে একই সমাজে বসবাস সম্ভব নয়। তিনি মওদুদীর মতো নিজেও তখন ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসাবে জিহাদকে গ্রহণ করলেন। সে জিহাদ বাস্তব দৃষ্টিতে সঠিক হোক বা না হোক।

AMARBOI.COM

মোটাবাবু সবিস্ময়ে বলল– আরে ওটা কে! চিটার শামসুল না!

সবাই সেদিকে তাকাল। হ্যাঁ। সে-ই বটে। কিন্তু চিনতে পারা মুশকিল। কারণ শামসুলের পরনে এখন একেবারে মোল্লা-জোব্বা, মাথায় গাগড়ি, গালভর্তি দাড়ি, আর গোঁফ কামানো। সে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। বাবু নিচুস্বরে বলল– ইসলামি ড্রেস পরলে মানুষের চেহারায় নূরানি ভাব আসার কথা। অথচ দ্যাখো শালাকে দেখতে একেবারে খান্নাসের মতো লাগছে। পরেছে ইসলামি ড্রেস, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে শয়তান হেঁটে আসছে এদিকে।

কাছে এসে আগের মতোই হ্যা হ্যা করে হেসে বলল শামসুল– কী খবর দোস্তোরা কেমন আছ?

কেউ সরাসরি উত্তর দিল না তার প্রশ্নের। বুঝিয়ে দিল যে শামসুল এখানে অনাহুত। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না তার। গায়েই মাখল না সে এই উপেক্ষা। বেঞ্চিতে বসতে বসতে বলল– কে খাওয়াচ্ছে চা? আমার জন্যে এক কাপের অর্ডার দাও ভাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটাবাবু বলল– চা বন্ধ হয়ে গেছে।

আবারও হ্যা হ্যা করে হাসল শামসুল। যেন দারুণ এক রসিকতা করেছে মোটাবাবু। হাসতে হাসতেই মদনকে বলল শামসুল– যার অর্ডারে চা দিয়েছ, তার অর্ডারেই আমার জন্যে এককাপ চা।

মদন অভ্যাসবশে বলল– দিচ্ছি বাবু।

অ্যাঁ! হেঁড়ে গলায় বলে উঠল শামসুল– বাবু কীরে? বাবু কী? আমরা কি হিন্দু যে আমাদের বাবু বলতে হবে! পোশাক-আসাক দেখেও তো মানুষ বুঝতে পারে। আসলে শালা হিন্দুরা...

বিরক্ত কণ্ঠে সাদী ওস্তাদ বলল– তুমি আবার এই ভেক ধরলে কবে থেকে?

ভেক মানে! মুসলমানের ছাওয়াল ইসলামি ড্রেস পড়লে সেটা ভেক ধরা হয়? এটা কী রকম কথা বললেন ভাই?

তুমি যে ড্রেসই পরো না কেন, সেটাই তোমার ভেক ধরা। যখন লুঙ্গি পরো তখনও তুমি কোনো না কোনো ধান্ধায় লুঙ্গি পরো। যখন প্যান্ট পরো তখন তার পেছনেও তোমার ধান্ধা থাকে। এখন জোব্বা পরেছ, নিশ্চয়ই এর পেছনেও বড় কোনো ধান্ধা আছে।

একটুও মলিন হলো না শামসুলের হাসি– না ভাই। সব ধান্ধা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি পুরোপুরি দ্বীনের পথে। আমার জন্যে দোয়া করো সবাই। আমি যেন আমার জান-মাল সব দ্বীনের পথে উৎসর্গ করতে পারি।

বাবু মোটেও ছাড় দেয় না শামসুলকে– তোমার মাল মানে তোমার টাকা-পয়সা তো! সেগুলো সব তো চিটারি করে কামাই করা। ঐ টাকা দ্বীনের কাজে খরচ করলেই কী আর না করলেই কী। বরং বেশি পাপ হবে।

না রে ভাই। টাকা-পয়সা ধন-সম্পদে কোনো পাপ নাই। পাপ হয় তার, যে টাকা কামায়। পাপের টাকা পুণ্যের টাকা বলে কিছু নাই।

কামাল রেগে বলল– তোমার কাছ থেকে পাপ-পুণ্য শুনতে চাই না। চা খাচ্ছ, খাও।

আরে তা তো খাবই। বন্ধুদের সাথে অনেকদিন পরে দেখা, এক কাপ চা না খেলে কি চলে? তা তোমরা আর কদ্দিন এইভাবে থাকবে?

এইভাবে মানে?

এইভাবে মানে এই যে ধরো এখনও তোমরা এই রকম রাস্তার ধারে বসে আড্ডা দাও। এখন তো আর আমরা কেউ আর ছাত্র নাই। আমার, তারপরে ধরো তোমাদের সবারই, সমাজে একটা সম্মান আছে। এই রকম জায়গায় বসে আড্ডা দেওয়া বোধহয় ঠিক হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদী ওস্তাদ গম্ভীরকণ্ঠে বলে– তোমাকে এখানে কি ডেকেছি আমরা? তোমাকে তো কেউ ডাকেনি এই জায়গায়। চা খেতে এসেছ, খেয়ে চলে যাও। বিদায় হও!

আরে আমি তো শুধু এখনকার কথা বলছি না। বলছি সারা সময়ের কথা। নিজেদের একটা প্রেস্টিজ আছে না! ধরো যে, কোনো নতুন অফিসার এলো আমাদের শহরে। তার খুব ইচ্ছা তোমাদের সাথে আলাপ করার। কিন্তু সে কি এসে বসতে পারবে এই রকম জায়গায়?

আমাদের সাথে কেউ আলাপ করতে চাইলে এখানে এসেই আলাপ করতে হবে। এখানে বসলে যে মনে করবে যে তার প্যান্টের পাছায় ময়লা লেগে যাবে, তার আমাদের সাথে আলাপ করার দরকার নাই।

না না ওস্তাদ, এইডা চলা ঠিক না। আপনাদের আড্ডার জায়গা চেঞ্জ করা দরকার। একটা স্ট্যান্ডার্ড জায়গা খুঁজে বের করেন। যদি আর কোথাও না পান, আমার চেম্বারে বসবেন। আমি খুব ওয়েল ফার্নিশড চেম্বার করেছি। এয়ার কন্ডিশনও লাগিয়েছি। কোনো অসুবিধা নাই।

হ্যাঁ তোমার চেম্বারে বসি আর পুলিশ এসে চিটিং কেসে কোমরে দড়িবেঁধে আমাদের ধরে নিয়ে যাক! তা তোমার সেই এনজিও-র কী খবর? সেই যে হায় হায় কোম্পানি করেছিলে? সেই মামলা তোমার মিটেছে? পাবলিক তোমাকে টাকা মারার জন্যে প্যাঁদানি দেয়নি তো?

আরে কে বলল আমার এনজিও হায় হায় কোম্পানি? ওটা কয়েকদিন কিছু লোক অপপ্রচার চালিয়েছিল।

তা তুমি পালিয়ে ছিলে কেন?

তা একটু সরে থাকতে হয়েছিল। এই ধরো পুলিশ, তারপরে ডিসি সাহেবই পরামর্শ দিয়েছিল সরে থাকার। হিট অফ দি মোমেন্টে যদি কিছু ঘটে যায়! তাই একটু সরে থাকা আরকি। এখন আবার সব ঠিক।

আবার হায় হায় কোম্পানি চালু করেছ?

আরে কী যে কয়! আমার প্রতিষ্ঠান এখন পুরোদস্তুর ইসলামি প্রতিষ্ঠান। এই দেশে এখন যে কয়টা এনজিও দ্বীনের খেদমত করছে, তাদের মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠান একটা। আসেন ওস্তাদ, একদিন আসেন, দেখাব আপনাদের কী কী কাজ হচ্ছে। তোমরা সবাই আসো।

কেউ আমন্ত্রণ গ্রহণ করার গরজ দেখায় না। চায়ে চুমুক দিয়ে শামসুল বলে– সেদিন নামাজ পড়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তোমাদের সঙ্গে একটা বিদেশী মেয়ে বসে আছে। কে মেয়েটা? আজ আসেনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে একটা ক্লু পাওয়া গেল। চিটার শামসুলের এখানে আসার কারণ আসলে লিসবেথ।

ষোল

তোমাদের সার্কেলে কোনো মেয়ে নেই কেন ইউ?

ইউসুফ জানত লিসবেথ এই প্রশ্নটি কোনো-না-কোনো সময় অবশ্যই করবে। বরং প্রশ্নটা অনেক আগেই আশা করেছিল ইউসুফ। কিন্তু প্রায় মাসখানেক হলো তাদের ওঠা-বসার মধ্যে লিসবেথকে এই প্রশ্নটা না করতে শুনে একটু অবাকই হয়েছে ইউসুফ। পশ্চিমা চোখে অবশ্যই অসঙ্গত ঠেকবে এই দৃশ্য যে দিনের পর দিন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আড্ডা চলছে যেখানে, সেখানে কোনো নারীর অংশগ্রহণ নেই।

ইউসুফ বলল– আমাদের আড্ডায় কোনো মেয়ে আসে না। তবে ইউনিভার্সিটি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা সাংস্কৃতিক সংগঠনে যেসব আড্ডা বা স্টাডিসার্কেল হয়, সেগুলিতে মেয়েদের পার্টিসিপেশন যথেষ্ট ভালো।

তাহলে এখানে আসে না কেন?

এর কারণ একটা নয়। অনেকগুলি।

লিসবেথ একটু জেদের সুরে বলল– আমি সবগুলো কারণই শুনতে চাই!

ওয়েল। ধরো এখানে বয়স একটা ফ্যাক্টর। আমাদের যা বয়স, আমরা স্টুডেন্ট লাইফ পেরিয়ে এসেছি। খেয়াল করলে দেখবে এখানে আমরা যারা আড্ডায় বসি, তারা কাছাকাছি বয়সের। আড্ডার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানে কাছাকাছি বয়সের আড্ডাবাজরাই থাকে।

কী বললে শব্দটা? আড্ডা...

আড্ডাবাজ। দোজ হু পার্টিসিপেট ইন দি আড্ডা ইগারলি এন্ড রেগুলারলি।

খুব সুন্দর শব্দ তো! বাংলা আসলে খুব রিচ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ।

আড্ডাবাজের সিনোনিমাস আরও শব্দ আছে। যেমন আড্ডারু। তো যা বলছিলাম। আমাদের সমবয়সী মেয়েরা যারা আমাদের বান্ধবী, তারা এখন স্টাডি শেষ করে বেশিরভাগই ঘরণী। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা তাদের স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে দেশের অন্য কোনো পার্টে। আর যারা বিয়ের পরেও এই শহরে আছে, তারা আসলে আড্ডায় যোগ দেওয়ার সময় করে উঠতে পারে না। তারা প্রায় সবাই কোনো না কোনো চাকরিতে আছে। প্রফেশনের পরে বাড়ি ফিরে তাদের নিজেদের ঘরের কাজ করতে হয়। যার বাচ্চা আছে, মানে চাইল্ড, তার যত্ন নিতে হয়। তারপরে ডেইলি হাউজহোল্ড কাজগুলি। তুমি তো জানো এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্না একটা হিউজ টাইম-কনজিউমিং এবং জটিল প্রসেস। এখানে রেডিফুডের বা প্যাকেট ফুডের চল নেই তেমন। সবকিছুই হাতে হাতে প্রসেস করতে হয়। এইসব করার পরে মেয়েদের আর সময় থাকে না। এনার্জিও থাকে না।

পুরুষরা হউজহোল্ডের কাজে হাত দেয় না?

সত্যি উত্তরটাই বলি। তেমন একটা না।

কেন?

এটি একটি খারাপ ট্রাডিশন। আগে নিয়ম ছিল পুরুষ উপার্জন করবে, নারী সংসারের কাজ দেখাশোনা করবে, সন্তান পালন করবে। এখন নারীদের উপার্জনও করতে হচ্ছে। কিন্তু উপার্জনের কাজ শেষে ঘরে ফিরে এসে সাংসারিক বাকি কাজও নারীদেরই করতে হচ্ছে। এখানে দায়িত্বের নতুন বণ্টন চালু হয়নি সমাজে। ফলে কর্মজীবী নারীদের অবসর-বিনোদন বলে কিছু থাকছে না।

খুব খারাপ। আর কী কারণ আছে?

আরেকটা কারণ হচ্ছে আমরা সন্ধ্যার পরে আড্ডা দেই। রাতে মেয়েদের বাইরে থাকাটাকে সচরাচর পারিবারিক দৃষ্টিতে অ্যাপ্রুভ করা হয় না। সামাজিক দৃষ্টিতেও না। এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে নিরাপত্তার চিন্তা। রাতে বাহিরে লোক সমাগম কম থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুষ্কর্মের জন্য রাতের অন্ধকারকেই বেছে নেয় খারাপ লোকেরা। তা থেকে শারীরিক-মানসিকভাবে মেয়েদের নিরাপদ থাকার পথ হিসাবে মনে করা হয় যে তারা সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকবে না। অন্তত একাকি তো অবশ্যই থাকবে না।

কিন্তু দিনের বেলায় আড্ডায় আসে না কেন? উইক এন্ডে তো অন্তত আসতে পারে।

আমরা যেভাবে খোলা জায়গাতে আড্ডা দেই, সেইভাবে আড্ডায় অংশ নেওয়াকে মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব একটা শালীন মনে করা হয় না। মেয়েরা নিজেরাও খুব একটা স্বস্তিবোধ করে না।

আর?

আর একটা কারণ আছে। বিশেষ করে আমাদের আড্ডার ক্ষেত্রে। আমরা আড্ডার সদস্য নির্বাচনে একটু খুঁতখুঁতে, সিনিক। মেধা বা চিন্তার দিক থেকে খুব গতানুগতিক কাউকে আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে গ্রহণ করতে চাই না। বাস্তব কারণেই, আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলাপ করি, আমাদের দেশের মেয়েরা চিন্তার ঐ স্তরে খুব কমই পৌঁছায়। আমি বলছি, বাস্তব কারণে। কারণ মেয়েরা পড়াশোনার সুযোগই পাচ্ছে না। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে তাদের আছে টেলিভিশন দেখা। তুমি জানো, টেলিভিশন মানুষকে চিন্তাশীল হতে কোনো

মুসলমানমঙ্গল- স্কুলনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্য করে না। বরং তার চিন্তাশক্তিকে ভোঁতা করে দেয়। আমাদের দেশের টোটাল মিডলক্লাস– নারী এবং পুরুষ, এই অবস্থার শিকার।

হাসল লিসবেথ– তোমার মধ্যেও পুরুষতন্ত্র কাজ করে।

স্বীকার করল ইউসুফ– কিছুটা।

এবং অ্যারিস্টোক্র্যাসিও।

ইউসুফ কৈফিয়তের ভঙ্গিতে হাসল– আমি শুধু জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র মানি। চিন্তার লেভেল খুব কম-বেশি বা উঁচু-নীচু হলে তুমি কারও সঙ্গে আলাপচারিতা নিশ্চয়ই দীর্ঘ করতে পারবে না!

ঠিক। কিন্তু মানুষকে তো তোমার থিংকিং প্রসেসের মধ্যে আসার সুযোগ দিতে হবে।

কথাটা তাত্ত্বিকভাবে সত্যি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অগ্রসর চিন্তার দায়িত্ব সবসময় এবং সবদেশে অল্প কিছু মানুষকেই নিতে হয়েছে। আমাদের দেশে সব মানুষ চিন্তাশীল হবে, সবাই সবকিছু ক্রিটিক্যালি এবং ডায়ালেকটিক্যালি দেখতে শিখবে, এটা আশা করা খুব ভালো; কিন্তু অবাস্তব।

আমি জানতে চাইছি ইসলাম ধর্ম নারীদের উপর কোনো ব্যারিয়ার দিয়েছে কি না।

এইবার আসল কথায় এসেছে, মনে মনে হাসল ইউসুফ– এই পয়েন্টে আসার জন্যই লিসবেথ এত ভূমিকা করছিল।

ইউসুফ একটু চিন্তা করে বলল– এই ব্যাপারে বিশেষ করে নারী-স্বাধীনতা এবং নারীদের অধিকারের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে পুরোপুরি ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমি গোঁড়া মৌলবাদীদের হিসাবে ধরছি না। ওরা মুসলমান সমাজের একেবারেই বিচ্ছিন্ন একটা অংশ। এই রকম বিচ্ছিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠী সব ধর্মেই আছে। আমি বাকি বৃহত্তর মুসলমান সমাজের কথা বলছি। এখানে কিছু কিছু ভিন্নমত রয়েছে। যদি শারিয়ার কথা বলো, সেখানেও এই ভিন্নমত দেখা দিয়েছে। তাতে অবশ্য ইসলামের কোনো অঙ্গহানি হয় না। কারণ এর দু'টো অংশ। একটি হলো ইবাদত বা প্রার্থনা। এখানে কেউ কোনো ভিন্নমত পোষণ করে না। আরেকটি অংশ হচ্ছে মুয়ামালাত। সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ। নারীর অধিকার বিষয়টি এর অন্তর্গত। এখানে ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ এবং নতুন ব্যাখ্যারও অবকাশ রয়েছে।

যদি রাসুল মুহাম্মদ(সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ ধরো, তাহলে তিনি নারীদের সকল কাজে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছেন। এমনকি যুদ্ধে যাওয়ার সময়ও তিনি কোনো একজন স্ত্রীকে অবশ্যই সঙ্গে নিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা শুধু যে আহতদের পরিচর্যা করেছেন তাই-ই নয়, তারা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কাজেও অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছেন। কেউ কেউ তীর কুড়িয়ে এনে তীরন্দাজদের দিয়েছেন, কেউ কেউ প্রতিরক্ষা বর্ম তৈরিতে সাহায্য করেছেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় মুসলমানরা মদিনায় যখন পরিখা খুঁড়ছিলেন, সেখানে নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। কাজেই নারী হলেই তাকে ঘরে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে, রাসুল নিজে সম্ভবত এমনটি চাইতেন না। তবে নারীদের জন্য অবশ্যই তিনি কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেগুলিকে এখনকার নারীবাদীরা ক্রিটিক করতেই পারে।

তবে পরবর্তী সময়েও মুসলমান সমাজে নারীরা অনেক বড় বড় কাজ করেছেন। এমনকি তারা এমন বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যা কিনা কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান সমাজে কল্পনাও করা যায় না। আমি তোমাকে পূর্ণ তালিকা দিতে পারব না। তবে কয়েক জনের কথা বলতে পারি। যেমন ইতিহাসের একমাত্র অবিবাহিতা নারী যিনি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁর নাম সুলতানা রাজিয়া। তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন ১২৩৬ সালে।

১২৫৭ থেকে ১২৮২ সাল পর্যন্ত একটানা ইরানের তুরকান অঞ্চলের রানী ছিলেন তুরকান খাতুন। মসজিদে খোৎবা পাঠ হতো তাঁর নামেই।

একই রাজ্যের পরবর্তী রানী ছিলেন ধাদেশা খাতুন। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

ইরানেরই সিরাজ অঞ্চলে ১২৮৩ থেকে ১২৮৭ সাল, অর্থাৎ একটানা ২৫ বৎসর রাজত্ব করেছেন আব্‌শ খাতুন। তাঁর নামেই মসজিদে খোৎবা পাঠ হতো। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

মালদ্বীপে ছিলেন পর পর তিনজন সুলতানা। খাদিজা, মরিয়ম এবং ফাতিমা। ১৩৪৭ থেকে ১৩৮৮ সাল। একটানা ৪১ বৎসর। সেই সময় ইবনে বতুতা মালদ্বীপের কাজী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইয়ামেনের সুলাইহি বংশের দুই রানী একটানা প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেছেন। আসমা এবং আরোয়া। রানী আসমার নামে জুম্মার নামাজে খোৎবা পাঠ হতো।

১২৫০ সালে মিশরের রানী ছিলেন সাজারাত আ'ল দু'র। তিনি মামলুক খেলাফতের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা ছিল। মসজিদে খতিবরা খোৎবা পাঠ করতেন তাঁর নামে।

ইন্দোনেশিয়াতে ১৬৪১ থেকে ১৬৯৯ সাল। একটানা শাসন করেছেন সুলতানা শাফিয়া, সুলতানা নূর নাকিয়া, সুলতানা জাকিয়া এবং সুলতানা কামালাত শাহ।

মধ্য এশিয়ার কাসেমী খেলাফতের সর্বশেষ সার্বভৌম সুলতানা ফাতিমা। ১৬৭৯ থেকে ১৬৮১ সাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল লিসবেথ– আর দরকার নেই। অত বড় তালিকা আমি মনে রাখতে পারব না। তবে ইতিহাস তো যা আছে আছেই, বর্তমানের কথা আমি জানতে চাই। বর্তমানে মুসলমান নারীরা তো খুবই দুরবস্থার শিকার।

সায় দিল ইউসুফ– এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আফগানিস্তান থেকে আলজিরিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলমান-প্রধান দেশে নারীদের অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু তার জন্য যে শুধু ইসলামের অনুশাসনই দায়ী এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। মুসলমানদের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা খুবই খারাপ। একই অনুপাতে খারাপ আমাদের নারীদের অবস্থাও। এর জন্য দারিদ্র্য, স্থানীয় প্রথা, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব– এই সবগুলিই দায়ী। তবে তুমি যদি এই অবস্থাকে শুধুমাত্র পশ্চিমা নারীবাদী অবস্থান থেকে বিচার করতে চাও, তাহলে ভুল হবে। ইসলামের মধ্যেও নারীবাদ নিয়ে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে। একটি ইসলামি নারীবাদও গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

ইসলামি নারীবাদ! বিস্মিত দেখাল লিসবেথকে। এই বিষয়ে আগে তো শুনিনি!

ইসলামেও নারীবাদের অস্তিত্ব আছে। তবে অস্পষ্ট। নারীবাদ তো পশ্চিমেও অস্বচ্ছ একটি প্রপঞ্চ। কিন্তু ইসলামে যে নারীবাদ থাকতে পারে, তা তোমার পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ হয়তো কল্পনাই করতে পারবে না। কোনো নারী তোমাদের পোপ হচ্ছে এমন আশা কি তোমরা কোনোদিনই করতে পারো? তোমাদের গির্জায় কোনো নারী পুরোহিত প্রার্থনা পরিচালনা করছে, এমনটি তোমরা ভাবতে পারো?

এইভাবে আক্রান্ত হয়ে হকচকিয়ে গেল লিসবেথ। আসলে নারী সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় সবসময়ই আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় মুসলমানদের। সেখানে যে চিন্তা সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হয়, তা হচ্ছে ইসলাম। কিন্তু নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যের ধর্মীয় জগতকেও যে আক্রমণ করা যায়, তা লিসবেথের চিন্তাতেই আসেনি।

আমিনা ওয়াদুদ মুসলমান নারী ও পুরুষদের সমন্বয়ে জুম্মার নামাজে ইমামতি করেছেন।

হ্যাঁ। এই রকম একটি খবর আমি ভাসভাসা ভাবে শুনেছিলাম।

মুসলমানদের সম্পর্কে তোমাদের সবকিছুই, সব ধারণাই শুধু ভাসাভাসা। ইয়োর হাইনেস লিস, আমি তোমার জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে ইসলামে নারীবাদ কোনো নতুন ঘটনা নয়। পৃথিবীর মুসলমান নারীবাদীরা যার সম্পর্কে সম্যকভাবে জানতে পারলে যে মহিলাকে আধুনিক মুসলিম নারীবাদের প্রধান হিসাবে বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতেন, তিনি আমাদের এই বাংলাদেশের বাঙালি একজন নারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। আমি তোমাকে তাঁর বই পড়তে দেব। ইংরেজি বইগুলো। আর বাংলা বইগুলো ব্যাখ্যা করে শোনাব। আজকের ইন্টারনেটের যুগে জন্মালে তিনি হতেন বিশ্বের সবচাইতে ভারসাম্যপূর্ণ নারীবাদী নেত্রী। ইরানের তাহিরা কুরাত-উল-আইন, তুরস্কের ফাতিমা আলিয়া হানিম, মিশরের জয়নাব আল ফাউয়াজ উনিশ শতকের শেষের দিকেই তাঁদের নারীবাদী চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন। বিশ শতকে ছিলেন অনেকেই। সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিলেন জয়নাব আল গাজালি আল জুবেলি। তিনিই ইতিহাসের একমাত্র নারী পণ্ডিত যিনি কোরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ তফসির লিখেছিলেন। বর্তমানে অনেক মুসলিম নারীবাদী দাবি করেন যে, তাঁরা সনাতনি পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপক্ষে অবস্থান নিতে চান না। কিন্তু তাঁরা 'ইজ্জৎ' 'সম্মান' ইত্যাদি ধারণার পিতৃতান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কারণ, তাদের মতে, এই ব্যাখ্যাগুলির সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তাঁরা জোর করে বিয়ে দেওয়া, শিক্ষা এবং চাকুরি ব্যাপারে বিধিনিষেধ, পশ্চাৎপদ কিছু দেশে মেয়েশিশুদের খৎনা– এইসব ব্যাপারের বিরোধিতা করেন। পর্দা বা বোরখার ব্যাপারেও তারা প্রশ্ন তুলেছেন। পর্দার বাহুল্য তো ইসলামি বাধ্যবাধকতা নয়, এটি পরবর্তীতে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে অগ্নিউপাসক ইরানি সম্প্রদায়ের অভিজাত মহলের মধ্য থেকে। কোনো কোনো নারীবাদী এটাও দাবি করেন যে পর্দা আসলে নারীকে রক্ষা করার কোনো উপায় নয়; এটি বরং পুরুষদের দৃষ্টিতে যৌন উত্তেজনা উদ্রেক করে।

আমি ইসলামি নারীবাদের এই সময়ের তাত্ত্বিক ধারণা হিসাবে তোমাকে একটি লেখা দিচ্ছি। এটি পড়লে তুমি মোটামুটি কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে। এটি মূলত একটি চিঠি। ইন্টারনেটে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরের ওয়েবসাইট আছে অনেকগুলি। সেগুলির একটিতে এই চিঠিটা ছাপা হয়েছিল। এটি একটি প্রশ্নের ইত্তর। লিখেছিলেন ইয়াসমিন মোজাহেদ নামের একজন সাংবাদিক। তিনি মিশরীয়-আমেরিকান। অর্থাৎ জন্ম মিশরে, কিন্তু এখন মার্কিন নাগরিক। তোমাকে আমি ইংরেজি কপিটাই দিচ্ছি। আড্ডায় পড়ার জন্য আমি বাংলা অনুবাদও সংগ্রহ করেছি।

জনৈকা সারাহ-র প্রশ্নের উত্তরে লিখছেন ইয়াসমিন মোজাহেদ...

'আমরা যেটা প্রায়শই ভুলে যাই তা হচ্ছে ঈশ্বর নারীকে সম্মানে ভূষিত করেছেন ঈশ্বর-সাপেক্ষে মূল্য দান করে– পুরুষ-সাপেক্ষে মূল্য দান করে নয়। কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদ সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট থেকে ঈশ্বরকে বাদ রাখে। সেই কারণে তাদের সামনে পুরুষ ছাড়া আর কোনো মানদণ্ড থাকে না। এর ফলে, একজন পশ্চিমা নারীবাদী পুরুষ-সাপেক্ষে নিজের মূল্য অনুসন্ধানে বাধ্য হন। সেটি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে তিনি একটি ভুল পূর্বানুমান বেছে নেন। তিনি গ্রহণ করেন যে পুরুষ হচ্ছে মানদণ্ড। সুতরাং পূর্ণ মানুষ বিবেচিত হতে হলে তাকে পুরুষ হতে হবে।

যখন একজন পুরুষ ছোট করে চুল ছাঁটে, তিনিও চুল ছোট করতে চান। যখন পুরুষ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, তিনিও সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান, এবং ইত্যাদি। তিনি এগুলো চান কারণ তার "মানদণ্ড"(পুরুষ)-এর এসব আছে; আর অন্য কোনো কারণে নয়।

তিনি যেটি বুঝতে পারেন না তা হচ্ছে ঈশ্বর পুরুষ ও নারী, উভয়কেই তাদের নিজ নিজ বিশেষত্বের ভিত্তিতে মর্যাদা দান করেছেন, তাদের সমরূপীতার কারণে নয়। এবং এই ১৮ মার্চে (২০০৫সালের), মুসলমান নারীও একই ভুল করেন।

১৪০০ বছর ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে সহমত বিরাজ করছে যে নামাজে ইমামতি করবেন পুরুষরা। মুসলমান নারীর কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ হবে কেন? যিনি নামাজে নেতৃত্ব দেন, তিনি কোনোমতেই আধ্যাত্মিকভাবে উৎকৃষ্ট নন। পুরুষ করছে বলেই এই কাজটি আরও ভালো-কিছু, তা কিন্তু নয়। এবং নামাজে ইমামতি করা মানেই এই নয় যে এটা আরও-ভালো-কিছু। যদি এটি নারীর কাজই হতো কিংবা যদি এটি আরও-ঐশ্বরিক-কিছু হতো, তাহলে হজরত মুহাম্মদ আয়েশা কিংবা খাদিজাকে– সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী– কি ইমামতি করতে বলতেন না? এই নারীদের স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কই তারা তো কখনও নামাজে ইমামতি করেননি।

কিন্তু এখন, ১৪০০ বছর পরে এই প্রথম বারের মতো, আমরা পুরুষের ইমামতি করার দিকে তাকাই এবং ভাবি "এটা অন্যায়"। আমরা ভাবি। যদিও নামাজে কে ইমামতি করছেন সে ব্যাপারে ঈশ্বর কোনো বিশেষ সুবিধা দান করেননি। ঈশ্বরের চোখে, যিনি ইমাম তিনি তার পেছনে যারা নামাজ পড়ছেন, তাদের চাইতে উচ্চতর নন। অপর পক্ষে কেবল নারীই মা হতে পারেন। এবং সৃষ্টিকর্তা মাকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন। হজরত মুহাম্মদ আমাদের শিখিয়েছেন, মায়ের পায়ের তলে বেহেস্ত। কিন্তু পুরুষ যা-ই করুক না কেন, সে কখনও মা হতে পারবে না। তাহলে সেটা অন্যায় নয় কেন?

যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কার প্রতি সবচেয়ে সদয় আচরণ করা উচিত, উত্তরে মুহাম্মদ তিনবারই বলেছিলেন "নিজের মায়ের প্রতি"। তারপর শুধু একবার বললেন "নিজের বাবার প্রতি"। এটি কি লিঙ্গবৈষম্য বা যৌনবাদ (sexist) নয়? একজন পুরুষ যাই করুক না কেন, সে কখনোই একজন মায়ের মর্যাদা পাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর যখন আমাদের মর্যাদা দেন বিশেষভাবে নারীসুলভ কিছু-দ্বারা, তখনও আমরা পুরুষ-সাপেক্ষে নিজের মূল্য খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি, সেটাকে মূল্য দেই না, কিংবা খেয়ালও করি না। আমরাও পুরুষকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। সেই কারণে কোনো কিছু যদি বিশেষভাবে নারীসুলভ হয়, সেই জিনিসমাত্রেই নিকৃষ্ট। স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল হওয়া অপমানজনক, মা হওয়া অবমাননাকর। আত্মসংযমী যুক্তিশীলতা (পুরুষোচিত হিসাবে বিবেচিত) এবং আত্মোৎসর্গকারী অনুকম্পার (নারীসুলভ বলে বিবেচিত) মধ্যে লড়াইয়ে, (আমাদের কাছেও) যুক্তিশীলতা সর্বোৎকৃষ্ট।

আমরা যখনই এই চিন্তা গ্রহণ করি যে পুরুষের যা-কিছু আছে, পুরুষ যা-কিছু করে, তা সবই আরও-ভালো, বাদ-বাকি সবই যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার মতো: তখনই দাবি করি যে পুরুষদেরও আছে, তাই আমাদেরও চাই। যদি পুরুষরা প্রথম সারিতে নামাজ পড়েন, তাহলে আমরা ধরে নেই সেটা আরও- ভালো। সেই কারণে আমরাও প্রথম সারিতে নামাজ পড়তে চাই। যদি পুরুষরা নামাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, আমরা ধরে নেই ইমাম ঈশ্বরের আরও কাছের, সে কারণে আমরাও নামাজে ইমামতি করতে চাই। কোথাও না কোথাও আমরা গ্রহণ করেছি যে বিশ্ব-সংসারে নেতৃত্ব দানের অর্থ ঈশ্বরের সাথে নিজ অবস্থান ইঙ্গিত করে।

একজন মুসলমান নারীর নিজেকে এইভাবে অবমাননা করার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরই তার মানদণ্ড। ঈশ্বর তাকে মূল্য প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে তার পুরুষের প্রয়োজন নেই।

বাস্তবে, পুরুষকে অনুসরণ করার যুদ্ধাভিযানে, নারী হিসাবে আমরা, কখনও এটা বিচার করতে বসিনি যে আমাদের যা-আছে সেটাই আমাদের জন্য আরও-ভালো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও-ভালো জিনিস আমরা হাতছাড়া করি পুরুষদের মতো হওয়ার জন্য।

পঞ্চাশ বছর আগে ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য পুরুষদের বাড়ি ছাড়তে দেখি আমরা। আমরা ছিলাম মা। তা সত্ত্বেও, পুরুষদের করতে দেখে, আমরাও সেটা করতে চাই। কোনোক্রমে আমাদের মনে হয়, মনুষ্য-প্রাণীকে লালন-পালন করার চাইতে মেশিনে কাজ করা নারীমুক্তির নিশ্চয়তা দেবে। ফ্যাক্টরিতে কাজ করা, সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী কাজের চাইতে উৎকৃষ্ট! শুধু পুরুষ করে বলেই!

তারপর কাজ করার পর, আশা করা হয় যে আমরা হবো অতি-মানব। নিখুঁত মা, নিখুঁত স্ত্রী, নিখুঁত ঘরণী, আবার থাকবে ত্রুটিমুক্ত ক্যারিয়ার। আর নারীর ক্যারিয়ার থাকামাত্রই যদিও দোষের কিছু নয়, ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারি পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করে আমরা কী হারাতে বসেছি। নিজ সন্তানকে অচেনা হয়ে উঠতে দেখে, আমরা বুঝতে পারি, কোন সুযোগ-সুবিধাগুলো হারিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সে কারণে এখন– যদি চয়েস থাকে– তাহলে পশ্চিমা নারী বাড়িতে থেকে নিজ সন্তান লালন-পালন করার পক্ষে রায় দেন। ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার-এর মতে, শিশুসন্তানসহ মায়েদের মাত্র ৩১ শতাংশ, আর যাদের দুই বা তারচেয়ে বেশি সন্তান তাদের ১৮ শতাংশ, ফুলটাইম কাজ করেন। 'প্যারেন্টিং' ম্যাগাজিনের ২০০০ সালের একটি সমীক্ষা মোতাবেক, এই কর্মরত নারীদের ৯৩ শতাংশ বলেন, পারলে তারা বাচ্চাদের সাথে ঘরেই থাকতেন; কিন্তু "আর্থিক দায়-দায়িত্বের কারণে" তারা কাজ করতে বাধ্য। আধুনিক পশ্চিমে নারীর ওপর "আর্থিক দায়-দায়িত্ব" জেন্ডার সমরূপতার মাধ্যমে আরোপিত। ইসলামের জেন্ডার বিশেষত্ব নারীকে এর থেকে মুক্ত রাখে।

পশ্চিমের নারীদের প্রায় এক-শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরিক্ষার প্রয়োজন পড়ে এটি বুঝতে যে, মুসলমান নারীদের এই সুযোগ-সুবিধা ১৪০০ বছর আগে দেওয়া হয়েছিল। নারী হিসাবে আমি বোনাফাইড বা সুযোগপ্রাপ্ত আমি যা-নই তা হওয়ার চেষ্টা করে নিজেকে অবমূল্যায়ন করি, সত্যি কথা বলতে কী, আমি পুরুষ হতে চাই না। নারী হিসাবে, আমরা কখনোই সত্যিকার মুক্তি অর্জন করব না যদি না পুরুষকে অনুকরণ করা বাদ দেই, আর ঈশ্বর-প্রদত্ত বিশেষত্বে নারীর সৌন্দর্যকে মূল্য দেই।

নির্বিকার ন্যায্যতা এবং অনুকম্পা– এই দুইয়ের মধ্যে আমাকে যদি বাছাই করতে হয় তাহলে আমি অনুকম্পা বাছাই করব। আর যদি বিশ্ব-সংসারে নেতৃত্বদান এবং পায়ের তলে বেহেস্তের মধ্যে বাছাই করতে হয়, আমি বেহেস্ত বাছাই করব।'

সতের

লিসবেথ শাড়ি পরেছে আজ। ময়ূরকণ্ঠি শাড়িতে অপূর্ব লাগছে দেখতে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার মতো সুন্দর। একটু পরেই চোখ ফিরিয়ে নিল ইউসুফ। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই নিশ্চয়ই তার চোখের ভাষা পড়ে ফেলেছে লিসবেথ। তাকে খুশি হয়ে উঠতে দেখে সেই রকমই মনে হলো।

লিসবেথ হঠাৎ তাকে দুপুরে ফোন করে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। একটু অবাক হয়েছিল ইউসুফ। কোনো উপলক্ষ আছে কি? উপলক্ষ একটা আছে বলে স্বীকার করেছে লিসবেথ। কিন্তু সেটা কী তা জানাতে চায়নি। ইউসুফও জোড়াজুড়ি করেনি। কিন্তু যখন শুনল ডিনারের দাওয়াত তার একার, তখন একটু দ্বিধা হয়েছিল। আড্ডার অন্যেরা জানতে পারলে মন খারাপ করবে। আদুরে গলায় লিসবেথ আব্দার জুড়েছিল– ওদের আর একদিন ট্রিট করব আমি। আজ তুমি রিফিউজ কোরো না ইউ প্লিজ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটায় চায়নিজ রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হয়েছে ইউসুফ। নিশ্চিত জানত লিস সেখানে সময়মতো উপস্থিত থাকবে। কিন্তু ভেতরে ঢুকে অল্প আলোতে দৃষ্টি সইয়ে নেওয়ার সময় পাওয়ার আগেই লিসের উৎফুল্ল কণ্ঠ ভেসে এলো– এই দিকে ইউ! আওয়ার টেবল ইজ হিয়ার।

অল্প আলোর মধ্যেও ঝলমল করছে লিস।

কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ইউসুফ– উপলক্ষ যেটাই হোক,তা যেন সফল হয় এই উইশ করছি!

বাড়ানো হাতটা উষ্ণ করমর্দনে ধরল লিসবেথ। হাসল মধুর ভঙ্গিতে– তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গে উপলক্ষ সফল হয়ে গেছে ইউ।

বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল ইউসুফ– কখন এসেছ তুমি এখানে?

অনেকক্ষণ।

তাই! তাহলে কেন অপেক্ষা করলে শুধু শুধু! আমাকে আগে আসতে বললে আমি সেই সময়েই চলে আসতাম।

আমি কাজ করছিলাম তো। টেবল সাজাচ্ছিলাম।

এবার টেবিলের দিকে নজর দিল ইউসুফ। আরে কোনো জন্মদিনের অনুষ্ঠান মনে হচ্ছে! টেবিলে জন্মদিনের কেক এবং মোমবাতি দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে রাশি রাশি ফুল। মনে মনে একটু লজ্জিত হলো ইউসুফ। নিশ্চয়ই আজ লিসের জন্মদিন। অন্তত একটা ফুল তার নিয়ে আসা উচিত ছিল! একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল– আজ কি তোমার বার্থ ডে লিস?

হ্যাঁ বার্থ ডে। হাসল লিসবেথ– তবে আমার নয়, তোমার বার্থ ডে। হ্যাপি বার্থ ডে ইউ!

মাথায় বাজ পড়লেও এত অবাক হতো না ইউসুফ। কোনোমতে বলতে পারল– মানে?

মানে আজ তোমার বার্থ ডে। আমি তোমার জন্মদিনের পার্টি দিচ্ছি।

বিষম খেল ইউসুফ। সেটা সামলে নিয়ে মনে মনে হিসাব করে দেখল লিসের কথা সত্যি। আজ তার জন্মদিনই বটে।

কিন্তু তুমি জানলে কীভাবে?

মাদারের, আই মিন তোমার মায়ের কাছ থেকে শুনে নিয়েছিলাম।

তাই!

বিস্ময় কাটছেই না ইউসুফের।

তোমার বার্থ ডে সেলিব্রেট করো না কেন ইউ?

তাচ্ছিল্যে কাঁধ ঝাঁকাল ইউসুফ– আমার আবার বার্থ ডে! সেটা আবার সেলিব্রেট করবে কে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আমরা স্মল স্কেলে করছি। আমি শিওর, ইন ফিউচার তোমার দেশের মানুষ তোমার বার্থ ডে সেলিব্রেট করবে।

যেন খুব মজার কৌতুক শুনেছে এমনভাবে হেসে উঠল ইউসুফ।

ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ এ ফান। আই অ্যাম ড্যাম শিওর অ্যাবাউট মাই ওপিনিয়ন।

বাদ দাওতো। আজ তুমি আয়োজন করেছ, এটাকেই এনজয় করা যাক। কই শ্যাম্পেন-ট্যাম্পেন কই!

একটু ম্লান হলো লিসবেথের চেহারা– এখানে কি শ্যাম্পেন পাওয়া যায়?

হেসে উঠল ইউসুফ– আরে এমনি বললাম। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে তো!

সত্যিই?

সত্যিই লিস। মেনি মেনি থ্যাংকস টু ইউ।

সত্যিকারের খুশিতে ঝলমল করে উঠল লিসবেথের চেহারা। তার দিকে প্রশংসার চোখে তাকাল ইউসুফ– শাড়িতে তোমাকে অপূর্ব লাগছে। তুমি শাড়ি পরা শিখলে কার কাছে?

আমার ল্যান্ডলেডির কাছে।

এই শাড়ি কবে কিনেছ তুমি?

লাস্ট উইকে। যে সময় তোমার বার্থ ডে সেলিব্রেট করার প্ল্যান করেছি তখনই কিনেছি।

বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট সাজগোজ করেছে লিসবেথ। কিন্তু এইভাবে এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে বাঙালি মেয়ের মতো সাজল কীভাবে সে?

ইউসুফের দৃষ্টির সামনে বাঙালি তরুণীর মতোই লালচে হয়ে উঠল লিসের গাল। মৃদু হাসল ইউসুফ– তোমাকে সাজিয়ে দিয়েছে কে?

লজ্জিত হাসি লিসের ঠোঁটে– পার্লারে গিয়েছিলাম।

ওরেব্বাস! তুমি যে দেখছি আমার জন্মদিনে সব এলাহি কাণ্ড করে বসে আছ।

এলাহি কাণ্ড কী জিনিস বোঝে না লিস। কিন্তু সেটা যে প্রশংসনীয় কিছু তা ইউসুফের কথার ভঙ্গি থেকে বুঝে নিল। বলল– তুমি রাগ করোনি তো? আমি আসলে তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চাইছিলাম না। আমি চাইছিলাম আজকের ইভনিংটা যেন খুব সুন্দরভাবে কাটে।

আই অ্যাম গ্রেটফুল লিস। কেউ কোনোদিন এত মনোযোগ দিয়ে আমার কথা ভাবেনি। আমি নিজেও না। ইন ফ্যাক্ট ভাবার মতো কিছু আছে বলেও আমার মনে হয়নি। আর আমাদের মতো দেশে আবার জন্মদিন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লিজ! আজ কিন্তু অন্য কোনো আলোচনা চলবে না। শুধু তোমার নিজের কথা বলবে। আমিও আমার পারসোন্যাল কথাই অনলি বলব। শুধু ভালো আর পজিটিভ কথা।

আমার নিজের তো তেমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। উইথ ইয়োর পারমিশন। তবে আগে কেকটা কাটো। তার আগে ওয়াশ রুমে যাও।

একটা প্যাকেট বাড়িয়ে দিল লিসবেথ– এই টি শার্টটা পরে এসো!

প্যাকেট হাতে ওয়াশ রুমে ঢুকল ইউসুফ। গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বড় আয়নাতে দেখল। আসলে বেশ পছন্দ করেই কিনেছে লিসবেথ।

তাকে ফিরে আসতে দেখে প্রশংসার চোখে তাকাল লিসবেথ– ইউ নো ইউ, টি শার্টে তোমাকে রিয়েলি খুব মাচো লাগে!

বসতে বসতে ইউসুফ আবার ধন্যবাদ জানাল লিসবেথকে।

লিসবেথ ততক্ষণে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ছুরি তুলে দিল ইউসুফের হাতে– কেক কাটো প্লিজ!

ইউসুফ ছুরি হাতে নিয়ে মোমবাতিতে ফুঁ দিতে গেলে ক্যামেরা নিয়ে সাটার টিপতে শুরু করল লিসবেথ। কেক কাটা হলে হাততালিও দিল। তারপর একজন ওয়েটারকে ডাকল– কাইন্ডলি আমাদের কয়েকটা ফোটো তুলে দিন!

এবার একটু লজ্জা পেল ইউসুফ। এত ছোট্ট একটা শহরে এমন দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত নয় মানুষজন। কিন্তু লিসবেথ আজ কোনো বাধাই মানবে বলে মনে হচ্ছে না। তাকে নিরস্ত করতে ইচ্ছাও করল না ইউসুফের। এমনকি ক্যামেরার সামনে লিস যখন তার মুখে কেকের টুকরা গুঁজে দিল, তখনও নিষেধ করল না সে। কিন্তু তাতেও মাফ নেই। শেষ হয়েছে ভেবে বসতে গেলেও লিসবেথ কৃত্রিম রাগে গাল ফুলিয়ে ফেলল– ইউ সেলফিস! আমাকে কেক খাওয়াবে না!

সেটাও করতে হলো।

এবার মুখোমুখি বসল দু'জন। লিসবেথ জিজ্ঞেস করল– আজ রাতে তোমার অন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই তো?

না।

তাহলে তোমার সেলফোন বন্ধ করো। তার আগে মাকে ফোন করে জানিয়ে দাও যে আজ রাতে তুমি বাড়িতে খাচ্ছ না।

সেটা জানিয়েই এসেছি।

গুড। তাহলে সেলফোন বন্ধ করো! এখানে যতক্ষণ থাকব আমরা নিজেদের নিয়ে কনফাইন্ড থাকব। কোনো ইন্টারাপশন অ্যালাউ করা হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ইন্টারাপশন তখনই এলো। টেবিলে ছায়া পড়ল। সঙ্গে হ্যা হ্যা হাসি। শামসুল! বিরক্তির সঙ্গে তার দিকে তাকাল ইউসুফ। গোঁফচাঁছা দাড়িঢাকা মুখের বিরাট হা থেকে বেরিয়ে আসছে হ্যা হ্যা হাসি– জন্মদিনের অনুষ্ঠান মনে হচ্ছে। আরে আমাদেরও দাওয়াত দিতে! একসাথে জন্মদিনের আনন্দ করা যেত।

একেবারে তাদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল শামসুল। হাত বাড়িয়ে দিল ইউসুফের দিকে– কার জন্মদিন তা তো জানি না। হ্যাপি বার্থ ডে।

কথা বলছে ইউসুফকে উদ্দেশ্য করে, কিন্তু শামসুল তাকিয়ে আছে লিসবেথের দিকে।

দায়সাড়া গোছের হাত মেলাল ইউসুফ। বোঝাই যাচ্ছে শামসুলের খুব ইচ্ছা লিসবেথের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। কিন্তু ব্যাপারটি পুরো উপেক্ষা করল ইউসুফ। চেয়ারের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে শামসুল। তাকে নিরুৎসাহিত করল ইউসুফ সরাসরি– তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে শামসুল। আমরা নিজেদের মধ্যে একটা জিনিস আলোচনা করছি। একটু কনফিডেনশিয়াল।

আরে করো করো। আমি কি তোমাদের ডিস্টার্ব করলাম? স্যরি ম্যাডাম!

লিসবেথের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ছাড়বেই না শামসুল। এই প্রথম তার দিকে সরাসরি তাকাল লিসবেথ। তার চোখে শীতল দৃষ্টি। বুদ্ধিমতী মেয়ে। এটুকু বুঝেছে যে লোকটাকে পছন্দ করে না ইউসুফ। অন্তত এই মুহূর্তে তাকে স্বাগত জানানোর ইচ্ছা ইউসুফের একেবারেই নেই। সে-ও তাই শীতল ব্যবহার করল। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করার মতো ভদ্রতাবোধ তো শামসুলের নেই। সে হ্যা হ্যা করে হেসে চলল লিসবেথের দিকে তাকিয়ে। বলল– আমি আর ইউসুফ ছোটবেলা থেকেই একসাথে স্কুলে লেখাপড়া করেছি।

লিসবেথ খুব শীতল ভদ্রতা দেখাল– নাইস টু মিট ইউ।

ইউসুফ সরাসরি বলল– এবার আমাদের মাফ করতে হবে শামসুল। তোমাকে আমাদের সাথে বসার জন্য বলতে পারছি না বলে দুঃখিত। তুমি এবার যেতে পারো।

আরে ঠিক আছে। অত লজ্জা পেতে হবে না। মানুষের পারসোনাল ব্যাপার থাকেই। এনজয় ফ্রেন্ড। চলি। খোদা হাফেজ।

হ্যা হ্যা হাসির সাথেই বেরিয়ে গেল শামসুল।

লিসবেথ বলল– আমি কিন্তু লোকটাকে দেখে ডিস্টার্বড হইনি ইউ। তুমি ওকে থাকতে দিতে চাও না মনে করেই আমিও অ্যাভয়েড করলাম। মনে হলো লোকটা প্র্যাকটিসিং মুসলিম। আমার কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্যে কোনো অ্যালার্জি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু উত্তপ্ত কণ্ঠেই বলল ইউসুফ– তুমি যদি প্র্যাকটিসিং মুসলিমকে দেখতে চাও, আমার আব্বাকে ফলো কোরো। এই লোকটি আদতে একটা চিট। এনজিও-র নাম করে শত শত দরিদ্র মহিলার সঞ্চয়ের টাকা মেরে দিয়েছে। ওর গায়ে যে পোশাক তা মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য। তাছাড়া আর একটা কথা বলি। মুসলমানদের জন্য কোনো অর্থোডক্স পোশাক নেই। মুসলিম পোশাক মানে হচ্ছে শালীন পোশাক। যেগুলোকে আমরা ইসলামি পোশাক বলি, সেগুলি আসলে অ্যারাবিয়ান ড্রেস। আরব কালচারকে ইসলামি কালচারের সাথে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের মধ্যে আরবের সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ। বাদ-বাকি ৮৫ শতাংশ মুসলমানই অনারব। কাজেই ইসলামি শালীনতার যেমন মাল্টিকালচার ধারণা আছে, সেই রকম মাল্টিকালচার পোশাকও আছে। শালীনতাকে ধরে রাখতে পারলে কোনো পোশাককেই অনৈসলামিক পোশাক বলা হয় না। আর ঐ শামসুল হচ্ছে আপাদমস্তক একটা ভণ্ড। ওকে নিয়ে চিন্তা করা মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা। লেটস ফরগেট দ্যাট ইনসেক্ট।

আবার হাসি ফিরে এলো লিসবেথের মুখে– আমি তোমাকে একটা খুব পারসোনাল একটা কোশ্চেন করতে চাই। পারমিট করবে?

সিওর! গো অ্যাহেড।

ডু ইউ হ্যাভ এনি গার্লফ্রেন্ড।

স্যুপের চামচটা ঠোঁটের কাছ থেকে নামিলে আনল ইউসুফ। কিছুক্ষণ নাড়ল চামচটা স্যুপের বাটিতে। আস্তার বলল– উত্তরটা একটু জটিল। আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। এখনও বাসি। মেয়েটা হিন্দু। সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে।

ওহ দ্যাটস ভেরি স্যাড! তা তুমি তারপরে আর কোনো মেয়েকে চয়েস করোনি?

না।

কেন? ও বুঝেছি। তুমি তাকে মন থেকে কিছুতেই সরাতে চাও না। সত্যি তোমাদের এই মনোগ্যামিক অ্যাফেয়ার আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তোমরা এই দেশের মানুষরা যত গভীর ভালোবাসার সাথে একজন সঙ্গীকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে পারো, এই মেন্টাল ডেডিকেশনটা অ্যামেরিকানরা কল্পনাই করতে পারে না। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়োর ফিলিংস ইউ!

ম্লান হাসল ইউসুফ– ব্যাপারটা ঠিক তা-ও নয়। উপমা যাওয়ার সময় আমাকে তো বলে যায়নি যে সে আর ফিরবে না। বা একথাও বলেনি যে সে আমাকে আর চায় না। তাই আমাকে ওয়েট করতেই হচ্ছে।

কতদিন হলো সে চলে গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় পাঁচ বছর।

লং ফাইভ ইয়ারস! এর মধ্যে সে তোমার সাথে, মানে তোমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে?

না।

লিসবেথ এমন ভাবে তাকাল ইউসুফের দিকে যেন সে অন্য কোনো গ্রহের প্রাণী দেখছে। অভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– তোমাদের দেশের সব যুবক কি তোমার মতো ইউ?

কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না ইউসুফ। বলল– তা তো জানি না। কিন্তু এটা মনে হয় প্রেম সব সময় এই রকমই হয়।

আমার কথা শুনতে চাইবে না?

বলো।

না থাক।

কেন? থাকবে কেন?

তোমার ভ্যালুজের সাথে হয়তো মিলবে না। আমাকে তোমার মনে হবে পাপী।

মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করার আমি কে! তাছাড়া আমাকে কি তোমার খুব কনজারভেটিভ মনে হয়?

না। একেবারেই না। ইন ফ্যাক্ট, তোমার মতো লিবারেল মানুষ, এনলাইটেড মানুষ আমি আর একজনও দেখিনি। বাংলাদেশে তো বটেই, আমার দেশ অ্যামেরিকা, কিংবা ইংল্যান্ডে, ইতালিতে, জার্মানিতে– কোথাও দেখিনি। সেই কারণেই আমার হিসাব মেলে না। যে দেশ তোমার মতো যুবকের জন্ম দিতে পারে, সেই দেশের অবস্থা এমন ভালনারেবল থাকে কীভাবে!

আর বলো না। লজ্জা পাচ্ছি। আমার মতো আনইউজেবল পারসনকে যদি তুমি দেশের অ্যাসেট বলে মনে করো তাহলে বুঝতে হবে সেই দেশের ফিউচার আরও বেশি খারাপ।

না। আই অ্যাম শিওর, বাংলাদেশের ফিউচার ভালো হবেই!

আমেন! তবে তোমার কথা বলো।

আমি এই দেশে এসেছি বলতে পারো টু এস্কেপ। আমি খুব অশান্তিতে ছিলাম মেন্টালি। একটার পর একটা মানুষকে আমি বিশ্বাস করেছি, আর ঠকেছি।

কেন আমেরিকার মানুষের তো পারসোনাল লাইফে অসৎ হওয়ার দরকার পড়ে না!

মনিটারি অনেস্টিই কি একমাত্র অনেস্টি ইউ! ইমোশনাল ডিজঅনেস্টি কি পাপ নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই পাপ।

সেই পাপের ভিক্টিম আমি। আমি তাই শান্তির জন্য এই দেশে এসেছি। পুওর পিপলের জন্য কাজে লাগব ভেবে এসেছি। যাতে মেন্টাল হ্যাপিনেস ফেরৎ পাই। আমার বয়ফ্রেন্ডদের, মানে এক্স, তাদের কথা আর আমার মেন্টাল সাফারিংস-এর কথা আমার কি খুলে বলতে হবে তোমাকে ইউ?

না। যে আলোচনায় তুমি কষ্ট পাও, সেই আলোচনা করারই দরকার নেই। শুধু এই ব্যাপার নয়, কোনো ব্যাপারেই আলোচনার দরকার নেই। আর আমি, মানে যতদিন তুমি বাংলাদেশে থাকবে, আমার সাথে যতদিন যোগাযোগ থাকবে, আমি তোমাকে মোরালি এবং মেন্টালি ভালো রাখার জন্য যতটা পারি চেষ্টা করব।

আমি শিওর ইউ, তুমি তা করবে। আরে স্যুপটা যে কোল্ড হয়ে যাচ্ছে। লেটস ফিনিশ ইট।

কিছুক্ষণ খাওয়ায় মন দিল দু'জন।

কিন্তু লিসকে আজ কথায় পেয়েছে। জিজ্ঞেস করল– তোমার জীবনের সবচেয়ে টাচি, সবচেয়ে সেনসিটিভ ঘটনার কথা আমাকে বলবে ইউ!

ঠিক কী ধরনের বিষয় জানতে চাইছ তুমি?

সবচেয়ে টাচি। যা তুমি কখনও ভুলবে না। মে বি সেটা কোনো প্লেজার বা যাই হোক। মানে তুমি চোখ বন্ধ করলে তোমার মনে সবচেয়ে বেশি ভেসে ওঠে যে মেমোরিটা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করল ইউসুফ। আস্তে আস্তে বলল– আমাদের জীবনে আনন্দের ঘটনা খুব কমই ঘটে লিস। যা ঘটে, তা কোনো পারমানেন্ট এফেক্ট রেখে যেতে কমই পারে। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে টাচি ঘটনাটা আমার নিজের নয়। আজগর আলির।

আজগর আলি! হু ইজ হি?

আজগর আলি একজন প্রৌঢ়। বৃদ্ধই বলতে পারো। ক্ষেতমজুর। মানে এগ্রিকালচার সেক্টরের ডে লেবার।

তার কী ঘটনা?

তার ঘটনা!

বলতে শুরু করার আগে ইউসুফ আবার আত্মসমাহিত হয়ে যায়। লিসের মনে হয় ইউসুফ এখন তার সামনে বসে নেই। চলে গেছে অনেক দূরে কোথাও। ইউসুফ এখন আর যেন ইউসুফ নেই। সে এখন আজগর আলি...

দলটা ডোমারে এসে শুনতে পায় সামনের তিন দিন হরতাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা দুইভাগ হয়েছিল ডোমারে এসেই। কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না ভাগ হবার। যেমন তাদের দলবদ্ধ হবার জন্যও কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন পড়েনি। দুই-চারজনের ছোট ছোট দল পথের বিভিন্ন পর্যায়ে একত্রিত হতে হতে আপনা-আপনিই বড় হয়ে যায়। একে অপরকে চিনেও নেয় সহজে। তীর্থযাত্রা কিংবা ওরসে যারা যায়,তাদের যেমন চিহ্ন থাকে,সেই রকম এদেরও চিহ্ন সর্বাঙ্গে। এদেরটা আরও প্রকট। কেননা এদের সবার ছামান প্রায় একই। কাঁথা একখানা ভাঁজ করতে করতে যতদূর ছোট করা যায়,তার সঙ্গে লুঙ্গি-গেঞ্জি মিলে একটা বান্ডিল। জামা কিংবা ফতুয়া সাধারণত একটাই। সেটা তাদের পরনে থাকে। আর থাকে একটা চটের ব্যাগ। ব্যাগ ঝোলানোর ফাঁসের পাশ দিয়ে উঁকি মারে পাটের মোটা ফেঁসোতে মোড়া কাস্তের ডগা। কারো একটা,কারো একাধিক। এই রকম সময়ে, প্রতিবছর যখন ধানকাটার মরশুম আসে, আকাশ থাকে কখনো রাগী, কখনও সজল, কখনও রোদ থাকে পিঠের চামড়ায় ফোসকা তোলার মতো যথেষ্ঠ উষ্ণ, বাতাসে থাকে ঝাঁওয়াল, ওরা গ্রাম ছেড়ে দলে দলে বেড়িয়ে পড়ে। তাদের গ্রামগুলো তখন পুরুষশূন্য। পনেরো থেকে পঞ্চাশ বছরের কেউই পুরো একমাস গাঁয়ে থাকে না। থাকে শুধু দুই-তিন ঘর বড় মানুষেরা। আর তাদের বাঁধা মুনিষেরা। আর থাকে তাদের ফসল পাহারা দেওয়ার নিজস্ব ভাড়াটে মানুষেরা।

বাকি সবাই, যারা বেরিয়ে পড়ে গাঁ ছেড়ে, তাদের হিসাব দিন কিংবা মাসে নেই। তাদের সংকেত দেয় ধানের ছড়া। নিজেদের এলাকায় ধানের ছড়া ফুটতে দেখলেই ওরা বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়। তাদের সবারই মুখস্ত খনার সেই বচন– "শীষ দেখে বিশ দিনে কাটতে মারতে দশদিন।" ধানের শীষ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ার তোড়জোর। ধানকাটার কাজে কত পুরুষ ধরে যে অন্য এলাকায় যাচ্ছে তারা, সে হিসাব কেউ রাখে না। তাদের এলাকায় যতটুকু ধানের জোত, সেই জোতের ধানকাটার মতো মুনিষ জোতদারদের নিজেদেরই আছে। বাকিদের কোনো কাজের সংস্থান এই এলাকায় নেই। তাই তারা বেরিয়ে পড়ে দলে দলে। সমস্ত গ্রামকে পুরুষশূন্য করে।

এবার দলটা ডোমারে এসে থমকে যায়। গাড়ি চলাচল বন্ধ। কী কারণ? না,তিন দিনের হরতাল। হরতাল ওরা এখন বোঝে। তবে নিজেদের এলাকায় হরতাল-টরতালে ওদের কিছু আসে-যায় না। অন্যদিনের মতো একই তালে তাদের জীবন চলে হরতালের দিনেও। গ্রামগুলোতে তো দূরের কথা– জলঢাকা, চিলমারি, উলিপুর থানা সদরগুলোতেও হরতালে অন্যরকম কিছু ঘটে বলে তাদের জানা নেই। তারা মিছিল বলতে বোঝে ইউনিয়ন পরিষদের ভোটের মিছিল আর নৌকা-ধানের শীষ-লাঙলের ভোটের মিছিল। তবে মিছিলের মতো মিছিল হয় চেয়ারম্যান-মেম্বার ভোটে। একজনের মিছিলে যদি থাকে তিন হাজার মানুষ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশটা ঘোড়া, একশ ভ্যান, আর তিন হাজার পতাকা– তো আরেকজনের মিছিলে থাকে নিদেনপক্ষে মাহুতসহ একটা ভাড়া করা হাতি, এক ডজন ঘোড়া, একশ ভ্যান , পাঁচ হাজার মানুষ। ঐ সময় মিছিলে যারা যায়,তাদের ঝুলও ওঠে খুব বেশি। তারা সমানে নাচে আর গানের সুরে সুরে শ্লোগান দেয়–ও শাবানা, নেই ভাবনা, হ্যারিকেন সিল মারো না!

দেখা যায় বাপ চাকামার্কার মিছিলে তো ছাতার মিছিলে ছেলে, হ্যারিকেনের মিছিলে ভাতিজা। কাজেই মিছিল বলতে তাদের কাছে বোঝায় ভোটের মিছিল। বড়ই আনন্দের জিনিস। কিন্তু ডোমারে এসে তারা দেখল হরতালের মিছিল। পঁচিশ-তিরিশজন মোটে মানুষ। কিন্তু যুদ্ধংদেহী। প্রত্যেকের হাতে ডাং। এই এক মিছিলই বন্ধ করে রেখেছে পুরো বন্দর। কোনো গাড়ি চলছে না কোনোদিকে।

তবু তারা পথ বেছে নিতে থাকে।

তাদের মধ্যে যারা ঠিক করে রেখেছিল ট্রেনে যাবে, তারা চলে গেল স্টেশনের দিকে। অন্যরা বাসস্ট্যান্ডে। বাস কিংবা ট্রাক পেলে উঠে পড়বে।

তারা বাসস্ট্যান্ডে আর রেলস্টেশনে অপেক্ষা করে থাকে। শুনেছে, রাতে গাড়ি চললেও চলতে পারে। রেলস্টেশনে যে দলটি গিয়ে ঢোকে, তাদের মধ্যে ছিল আজগর আলি। অনেক বছর পরে আজগর আলি ধানকাটার কাজে বেরিয়েছে আবার। মাঝখানের বছর দশেক সে বের হয়নি গ্রাম থেকে। কেননা তার ছেলেটা জোয়ান হয়ে দায়িত্ব নিয়েছিল সংসারের। সে-ই যেত। গত বছর ছেলে গিয়েছিল অনেক দূরে বেশি মজুরির আশায়। পদ্মা পার হয়ে কুষ্টিয়ার ধানের অঞ্চলে। ফেরার পথে উঠেছিল বাসের ছাদে। বাড়ি ফিরতে পারেনি। বাস উল্টে রাস্তার সাথে পিষ্ট হয়ে থেঁতলে মরেছে। লাশ বাড়িতে যায়নি। তার মজুরির টাকাও না। কাঁথা কিংবা কাস্তেও না। তাদের গ্রামের আর যারা গিয়েছিল এবং বেঁচে ফিরেছিল, তারা খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল আজগর আলির ভিটায়।

ছেলে বড় হওয়ার পর মোটামুটি সুখের সময় গেছে আজগর আলির। খুব অভাবের সংসারে সচরাচর যা ঘটে, ছেলে বড় হয়ে বিয়ে-থা করলে বাপ-মাকে কলা দেখিয়ে দেয়, তার ছেলেটা তেমনটি করেনি। নিজে যা খেয়েছে-পরেছে, বাপ-মাকেও তা-ই দিয়েছে। ছেলে বউ ঘরে আনার আগেই মারা গিয়েছিল তার মা। কাজেই আজগর আলির কাজ বলতে ছিল লুডো খেলা। খুব একটা মিশুক মানুষ সে নয়। লুডো খেলতে চারজন লাগে, নিদেনপক্ষে দুইজন। কিন্তু বউ মরার পর আজগর আলি সবসময় একা একাই লুডো খেলে। সাপলুডো খেললেও একা, গুটি ঘরে ওঠা খেললেও একা। নিজের আর নিজের কাল্পনিক প্রতিপক্ষ-দুজনের চাল আজগর আলি একাই চালে। চাল দেয় দুই পক্ষেরই খুব মনোযোগের সাথে। নিজের জন্য নিজের কাল্পনিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কখনো পক্ষপাতিত্ব করে না

মুসলমানমঙ্গল– দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাল দিতে গিয়ে। তার খেলার সময় আবার বাঁধা। রাতের খাবারের পর সে নাতি-নাতনির সাথে একটু-আধটু খুনসুটি-আদরের পর লুডো বিছিয়ে খেলতে বসে। কুপি-হ্যারিকেন চায় না। অতএব তেল খরচের জন্য ছেলের বউয়ের মুখ ঝামটাও তাকে সইতে হয় না। সে লুডো খেলে মোমবাতির আলোয়। মন্তাজের দোকান থেকে সে দুই দিন পর পর একটা করে মোমবাতি কেনে। অর্ধেক কেটে দোকানেই রেখে দেয়, বাকি অর্ধেক নিয়ে লুডো খেলতে বসে। মোমবাতিও শেষ,তার লুডোখেলাও শেষ। সটান শুয়ে পড়ে আজগর আলি। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। পরের রাতে বাকি অর্ধেক মোমবাতিতে লুডো খেলা।

তার এই বিচিত্র বিনোদন পদ্ধতিতে ছেলে বেঁচে থাকতে হাসত। মোমের খরচের জন্য তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কেননা, যৎসামান্য হলেও আজগর আলির নিজস্ব ইনকাম ছিল। চারুদাসের তামাকগুদামে তামাকপাতা সিজিল-মিছিলের কাজ করত আজগর আলি। নিজের পান-গুয়া-বিড়ি, নাতি-নাতনির ছোট-খাট হাউসের আব্দার মেটানো, আর লুডো খেলার মোমবাতির খরচ দিব্যি চলে যেত সেই উপার্জন দিয়ে। ধানকাটার মরশুমে বাপকে ঘরে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বিভুঁয়ে চলে যেতে পারত ছেলে। নিশ্চিন্তে। কেননা ঘর আর ঘরের মানুষকে দেখার জন্য মানুষ রইল। ওদের চিরদিনের অভিজ্ঞতা, বিভুঁই থেকে ফিরে, সবাই ঘরে এসে ঘরকে হুবহু আগের মতো পায় না। কেউ কেউ ফিরে এসে আর ঘর বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই পায় না। ভিটে থাকে, ঘরের খুঁটি-চালা-দরজা-জানালা থাকে, কিন্তু ঘর থাকে না। কারণ ঘরের মানুষ নেই। প্রতিবছরই যখন এইসব গাঁয়ের পুরুষরা ধানকাটার মরশুমে অনুপস্থিত থাকে, তখন বেশ কিছু ঘরের বউ-মেয়ে অভাব সইতে না পেরে, অনাহার সইতে না পেরে, অনিশ্চিতির সাথে পাল্লা দিতে না পেরে চলে যায় অন্য কারো হাত ধরে। কেউ কেউ ভিন জেলার ফেরিঅলার হাত ধরে অন্যত্র, কেউ চলে যায় জোতদারের মুনিষ-সর্দার বা তাদের হাতা-নাতার দখলে। যদিও ব্যাপারটাকে তাদের দারিদ্র্য এবং মৃত্যুর মতোই অনিবার্য হিসাবে মেনে নিয়েছে সবাই, তবু নিজের ঘর সুরক্ষিত দেখতে চায় প্রত্যেকেই। সে কারণে আজগর আলি বাড়িতে থাকলে তার ছেলেটা খুশি হতো। নিশ্চিন্তে বিভুঁয়ে চলে যেতে পারত ধান কাটতে।

এবার ঘর ফাঁকা রেখে বেরুতে হলো আজগর আলিকে। তার বয়সে যখন সে বেরুত, ছেলে থাকত ঘরে। তারপরে, ছেলে বেরুলে সে থাকত ঘরে। কিন্তু এবার ঘর ফাঁকা রেখেই বেরুতে হচ্ছে। একটু চিন্তা যে হচ্ছে না, তা নয়। মাঝে কিছুদিন খেয়াল করেছে, নাছির মুদিঅলা ঘুর ঘুর করছে। তার মুদির দোকানের অবস্থা মোটামুটি রমরমা। তার ওপরে লোক লাগিয়ে ইন্ডিয়ার মাল এপার-ওপার করে। থানার সাথে তার চুক্তি আছে। অর্থাৎ সে এখন গ্রামের বড় মানুষ।নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে বউ আছে। বাচ্চাও। কিন্তু এই রকম পয়সাঅলা লোকের জন্য একটামাত্র বউ তাদের গাঁয়ের হিসাবে বড্ড কম হয়ে যায়। একদিন শুনতে পেয়েছে আজগর আলি, আশ্বাস দিচ্ছে নাছির তার ছেলের বউকে– অ্যালা অসুবিধা নাই বাহে, তুমার ছোল-ম্যায়াক মুই টানিবার পারিব। মোর ঘরের আরও তিনজনার সাথত এই দুইজনা যোগ দিলে ঘরোত মোর জায়গা অ্যালাও সট পড়বি না বাহে!

এই পর্যন্ত শুনেই সরে এসেছিল আজগর আলি। নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে, এরকম তাদের এখানে হরহামেশাই ঘটে। প্রত্যেক মেয়েমানুষই একটা শক্ত আশ্রয় চায়। তার ছেলের বউও চাইতে পারে।

বউ নাছিরকে কী উত্তর দিয়েছে তা শোনেনি আজগর আলি। তবে একটু অবাক হয়েই খেয়াল করেছে, নাছির আর এদিকে ঘেঁষে না। তার বদলে বউকে দেখা যায় এনজিও থেকে লোন এনে গরু কিনতে। মহা উৎসাহে গরুকে ঘাস-খড় খাওয়ায়, সাত বছরের ছেলেটার হাতে গরুর গলার দড়ি ধরিয়ে দিয়ে চরাতে পাঠায়, গোবর দিয়ে ঘুঁটে আর দৈলা বানায়। আজগর আলির ঘরের চারপাশে গরুর চোনার ঝাঁঝালো গন্ধ, বেড়া জুড়ে ঘুঁটে আর দৈলা রোদে শুকোতে দেওয়া, উঠোন জুড়ে ঘাস-বিচালির টুকরো।

পনেরো দিন অন্তর অন্তর সাইকেলে টিং টিং কণ্ডে এনজিও-র সায়েব আসে। ঘুঁটে বেচা আর কীভাবে যেন জোটানো টাকায় বউ কিস্তির টাকা তুলে দেয় এনজিও সায়েবের হাতে।

হঠাৎ কয়েকদিন আগে চাকদাসের গুদাম থেকে ফিরে আজগর আলি দেখে বউ বারান্দায় বসে ফোঁপাচ্ছে। উঠোনের যে কোণে গরুর জন্য চালা তুলে গোয়াল বানিয়েছিল, সেটা শূন্য। গরু নিয়ে গেছে এনজিও সায়েব। কেননা কিস্তি বাকি পড়েছে। তার কিছুদিন আগে পিছলে পড়ে ডান কনুইয়ের ওপরের হাড় ভেঙে গেছে নাতির। কবরেজ বাঁশ চেঁছে প্লাস্টার করে দিয়েছিল। খোলার পর দেখা গেল হাত বেঁকে থাকে বেচারার। শক্ত কোনো কাজ করতে পারে না হাত দিয়ে।

টাউনোত লিয়্যা ডাক্তার দেখাও বাহে!

উপদেশ অনেকেই দেয়। কিন্তু খরচ! এই গ্রামেরই একজনের হাত ভাঙার পরে শহরের ডাক্তার দিয়ে প্লাস্টার করে এনে হাত ভালো হয়েছে। খরচ, রাহা খরচ বাদেই ছয় শ টাকা। অর্থাৎ কমপক্ষে সাত-আট শ টাকা হলে নাতিকে শহরে নিয়ে যাওয়া চলে। তার সঙ্গে যোগ হলো এনজিও-র কিস্তি খেলাপ।

অতএব আজগর আলিকে এবার বেরুতে হয় কাস্তে শান দিয়ে।

তিলকপুরে ট্রেন পৌঁছে ভোরের আলো ফোটারও আগে। ট্রেন ছেড়েছিল রাত এগারোটার পরে। সারাদিন অনিশ্চিত অপেক্ষমান যাত্রীদের সঙ্গে রেগুলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যাসেঞ্জার যারা এই ট্রেনের– বিশেষত পেট বাঁচানোর জন্য বিশ কেজি চাল কিংবা বিশ কেজি লবণ কিংবা পাঁচ কেজি জিরা কিংবা পাঁচখানা শাড়ি ইন্ডিয়া থেকে হিলি বর্ডার দিয়ে আনা-নেওয়া করে যে নারী-পুরুষরা, সবাই মিলে ট্রেনটা ঠাসা। আজগর আলির ষাট বছরের দুর্বল বুক এমনিতেই বাতাস বেশি টানতে পারে না। এই দমবন্ধ পরিবেশে তার বুকের খাঁচা পুরোটা সময়ই বাতাসশূন্যতায় আঁকুপাকু করেছে। তবু তাকে দশ বছর আগের 'কিছু হবে না ' মার্কা সাহস নিজেকে যোগাতে হয়েছে সারাক্ষণ। তার তো ফেরার পথ নেই।

তিলকপুরে নামে একদল। আজগর আলিও। প্লাটফর্মের বাইরেই কামলার হাট। তারা সেখানে বসল জটলা করে। জটলা থেকে সবসময়ই দূরে থাকার অভ্যাস আজগর আলির। কিন্তু এখন তার নিজেকে বিক্রি করতে হবে। জটলায় না বসলে উপায় নেই। সারা ট্রেনযাত্রায় পায়নি। এখানে একটু খোলা হাওয়া। তার বুকটা নির্ভার হয়ে উঠে অনেকখানি। মুখের তালু, জিভ বিস্বাদ। তবু তিতকুটে মুখে বিড়ি ধরায় সে।

বেলা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আসতে শুরু করে জোতমালিকরা। কোনো সংকেতের প্রয়োজন হয় না। দেখা গেল কামলারা সবাই সারিবন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজেরাই। একজন-দুইজন করে জোতমালিক কিংবা তাদের লোকেরা আসে, দরদাম করে পছন্দমতো কামলা নিয়ে চলে যায়। রোদ চড়া হবার আগেই ক'জনের কাজ জুটে যায়। তারা চলে যায় জোতমালিকের সাথে। খালি পেটে ঘোলাটে হয়ে যাওয়া চোখ আর মাঝে মাঝে ঘুরে ওঠা মাথা নিয়ে রেলদালানের ধীরে ধীরে কমে আসা ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে আজগর আলি। তার সঙ্গে এখন মাত্র কয়েকজন দুর্বল, অশক্ত আর বয়সী কামলা। আজগর আলি বোঝে, একটু নড়াচড়া না করলে তার কাজ জুটবে না। বুড়ো মানুষকে কাজে নিয়ে হ্যাপা পোয়াতে চায় না কোনো জোতমালিক। একজনকে আসতে দেখে সে এগিয়ে যায়। কিন্তু তাকে অপাঙ্গে দেখে লোকটা অন্য কামলাদের দিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকায়। আজগর আলি নাছোড়। জিজ্ঞেস করে– আপনের কামলা লাগবি বাহে?

লোকটা তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ লাগবে।

মোক ন্যান। মুই ধান কাটিবার কামে আইছি।

ধুর! লোকটা তার মুখের ওপর তাচ্ছিল্য দেখায়। তার দরকার জোয়ান কামলা। বুড়ো মানুষকে নিয়ে কাজ তো হবেই না, ঝামেলা হবে গাদা গাদা।

ঝামেলা হবি না মহজন। মোক ন্যান। মুই অনেক বচ্ছর এই কাম করি।

তা তুমার আবার এই বয়সে এখনও এই কাম করা লাগে ক্যা! বুড়ো হইছ, আল্লা-বিল্লা করবা, নাতি-নাতনিরে নিয়া খেলাধুলা করবা! তা না কর‍্যা কামে আইছ ক্যা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যাট, মহাজন প্যাট! মোক ন্যান!

না রে বাবা। তোমাক দিয়া হামার কাম চলবি না।

লোকটা সরে যায় অন্য কামলার খোঁজে।

ক্রমে বেলা বাড়ে। রেলদালানের ছায়াও কমতে কমতে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসতে থাকে। আজগর আলির চাঁদি আর দাড়ি বেয়ে নেমে আসতে থাকে ঘামের ধারা। তার চোখ একটু পর পর সবকিছুকে শূন্য দেখে। আজগর আলি রেলদালানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে। মাথা মাঝেমাঝেই ঘুরে উঠছে। মুখের মধ্যে লোনা পানির ধারা। আজগর আলি কী অজ্ঞান হয়ে পড়বে! ষাট বছরের আজগর আলি তার সমস্ত জীবনীশক্তি একত্রিত করে। অজ্ঞান হয়ে পড়া মানে এই অঞ্চলে আর কাজ না পাওয়া। এমনিতেই বয়স্ক মানুষ, তার ওপর যদি সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তাহলে কেউই তাকে কাজে নেবে না। কেই-ই বা বুড়া মেরে খুনের দায়ী হতে চায়?

দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে রোদের মধ্যেই বসে থাকে আজগর আলি। কতক্ষণ পর্যন্ত খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হয় তার ওপরে একটা ছায়া পড়েছে। চোখ খুলে দেখে তার ওপর ঝুঁকে আছে ভাড়গিলে চেহারার একজন মানুষ। তাকে ডাকে লোকটা– ও চাচামিয়া, ঘুমাইছ নাকি?

ঘোরের মধ্যে থাকা আজগর আলি প্রথমে এই দৃশ্যের সাথে, এই রোদের মধ্যে তার ওপর ঝুঁকে থাকা মানুষটির সাথে নিজের অবস্থানকে মেলাতে পারে না। সে ভাষাহীন তাকায়। লোকটা আবার বলে– ঘুমাইছ নাকি?

এবার সাড়া দিতে পারে আজগর আলি। দুর্বল স্বরে বলে– না বাহে, খুব ঝালো রোদ তো, তাই মুই চোখ বুজ্যা রাখিছি।

ও! লোকটা কিছুক্ষণ তার নিজের গালে হাতের তালু ঘষে– তুমি কি কামলা খাটতে আইছ? ধান কাটার কামে?

এবার ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আজগর আলি– হ্যাঁ বাহে! লিব্যান মোক কামে?

হামি কীভাবে কামে লিবো! হামার কী আর জোত-জমি আছে! বলে লোকটা হেসে ওঠে। আর আজগর আলি আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

লোকটার চোখে আজগর আলির এই ঝিমিয়ে পড়া এড়ায় না। সে অল্প হাসে– হ্যাঁ, হামার জমি– খ্যাত নাই। তয় হামি তোমাক কামলার কাম জুটায়া দিবার পারি। মানে হামি জোতমালিকের কামলা সাপ্লাই করি। কামলার ঠিকাদারিও কবার পার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজগর আলি ফের সতেজ হবার চেষ্টা করে– তো দ্যান বাহে! হামাক কাম দ্যান!

তা কাম তোমাক হামি দিবার পারি। কিন্তু মজুরি তো তুমি অন্য জুয়ান কামলার সমান পাবা না। তুমি খুব বেশি হলে রোজ পাবা চল্লিশ ট্যাকা।

ক্যান বাহে, এখন তো কামলার দর তিন কুড়ি টাকা। মোক এত কম দিব্যান ক্যান!

কম! কম আবার হলো কই! তোমাক তো কেউ কামেই লিতে চায় না। এই বয়সের কামলা কি কেউ লিবার চায়? তুমি এক কাম করো। এই চল্লিশ ট্যাকা রোজে কামে লাগো। ছানাউল্লা মাস্টারের জমির ধান কাটো।তাঁই লোকখান ভালো। খাওয়া-দাওয়া ভলো পাবা।

দোনোমনো করে রাজি হয়ে যায় আজগর আলি। তার তো ফেরার পথ নেই। সে নিজেকে নিজেই দুই পায়ের ওপর দাঁড় করায়। বেডিং-ঝোলা তুলে নিয়ে বলে– চলেন বাহে! চল্লিশেই সই।

খাড়াও, খাড়াও! আমার কমিশনের কথা ঠিক করো।

কমিশন! সে আবার কী জিনিস!

লোকটা বলে– হামি তোমাক কাম জুটায়া দিলাম।নিয়ম হলো, তুমি হামাক কমিশন দিবা। তোমার চল্লিশ ট্যাকার তিন ট্যাকা হামার।

তার মানে তার রোজ মাত্র সাঁইত্রিশ টাকা। আজগর আলি এমন কথা কোনোদিন শোনেনি। দশ বছরে এতো বদলে গেছে দুনিয়া! তার মুখ ফুটে বেরোয়– এইডা আবার কেমন কথা বাহে! মানুষের হক মারি খাওয়া!

হাড়গিলে লোকটা চটে যায়– এর নাম হক মারা না। এর নাম কমিশন। এইডা এখন দুনিয়ার নিয়ম। তুমি যদি নিয়ম না মানো তো কাম জুটাতে পারবা না। কমিশন দিলে কাম পাবা। তাহলে তোমার লাভ, হামারও লাভ।

আজগর আলি রাজি হয়ে যায়।

কেননা আজগর আলির রাজি না হয়ে উপায় থাকে না। কেননা আজগর আলিদের জীবনে অন্যরকম কিছু ঘটে না। তারা অন্য কিছু ভাবার অবকাশও পায় না। আর আজগর আলিরা অঙ্কে ভীষণ কাঁচা। অঙ্কে তাদের ভয়ও খুব বেশি। তাই কোনো অঙ্ক না কষেই আজগর আলি কাজে যোগ দেয়। কিন্তু অঙ্ক তো তাকে ছাড়ে না।

তারপর আজগর আলি পরবর্তী সাতাশ দিন তিলকপুর নিবাসী ছানাউল্লা মাস্টারের ফসলের জমিতে কাজ করে। পুরো সাতাশ দিনই সে কাজ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। তার মাথা ঘোরা, তার বিনোদনের লুডো-মোমবাতিবিহীন জীবন– এই সবকিছুকেই যন্ত্রবৎ অস্বীকার করে আজগর আলি সাতাশ দিন কাটিয়ে দেয়।

সন্ধ্যার পরপরই এলাকায় হুঁকো ঘিরে এক-একটা আসর বসে। ফসলের অবস্থা, আকাশের শিলমেশানো বৃষ্টির ভয়, নৌকা না ধানের শীষ এই সব নিয়ে গল্প হতে হতে কেউ কেউ গলা ছেড়ে হয়তো গেয়ে উঠে চার-পাঁচ কলি ভাটিয়ালি গান। হুঁকোর আসরে সবাই খুব তাড়াতাড়ি সমান সমান হয়ে উঠতে পারে। মালিক-জোতদার-কিষাণের ঠোঁট একই হুঁকোর ফুটো থেকে নেশার খোরাক টেনে নেয়। তৃপ্তিও সবার একই রকম। তৃপ্তির প্রকাশও।

আজগর আলির জটলা-এড়ানো স্বভাব এরা কদিনেই বুঝে নিয়েছে। তাই সে যখন হুঁকোর আসর থেকে একটু দূরে বসে ঘোলা চোখে অন্ধকার মাপে, তখন কেউ নেহায়েত দরকারি কথা ছাড়া তাকে বিরক্ত করে না। ছেলের বউ তার ছেলেমেয়ে দুটো নিয়ে কীভাবে এখন দিন কাটাচ্ছে, সেই চিন্তা মাঝেমাঝেই আক্রমণ করে আজগর আলিকে। মাঝেমাঝে ভাবতে ভাবতে অনেক দূর ভেবে ফেলে আজগর আলি। এই এলাকার সবরিকলাগুলো খুব হৃষ্টপুষ্ট। স্বাদেও দারুণ। আর জিয়োল মাছ বেশ পাওয়া যায়। আজগর আলিরা যাকে কানছা বলে জানে। আর জানে, এই মাছ বড়ই রক্তবর্ধক, বলবর্ধক। তো হঠাৎ হঠাৎ আজগর আলি নিজেকে জেগে থাকা স্বপ্নে কিংবা যেমনে ভাসায়– ধরো কাইল সকালেও যদি মুই কাম ছাড়িয়া রওনা করি, কামের মজুরি, দুই ছড়ি সবরি কলা, মুখঢাকা মাটির হাড়িত পানিজিয়ানো এককুড়ি কানছা মাছ! নাতি-নাতনি দুইজনার গতরে তেজ খুব কম। কানছা মাছ বলবর্ধক আর সবরিকলা দারুণ সুস্বাদু, পুষ্টিকর। তো জিয়োল মাছ আর সবরি কলা আর মজুরির পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে যদি ভোর ভোর উঠে পড়া যায়, তিলকপুর স্টেশনে পৌঁছে চিলাহাটির ট্রেন ধরে দুপুরের মধ্যে সোজা ডোমার। সেখানে কোনো হোটেলে চারটে ডাল-ভাত খেয়ে বাসে উঠলে তিস্তাঘাট। নদী সাঁঝ সাঁঝ পেরোলে ভ্যানে ঘণ্টাখানেক। তারপর হাঁটাপথ। নিজের ভিটায় পৌঁছাতে খুব বেশি হলে রাতের নয়টা কিংবা দশটা। যদিও গাঁয়ের রাত দশটা মানে নিশুতি রাত, তবু নিজের গাঁয়ে রাতের দশটাই কী আর এগারোটাই বা কী!

এই পর্যন্ত, জেগে থাকা স্বপ্নে, খুব ফুরফুরে মেজাজে পেরিয়ে যায় আজগর আলি। কিন্তু তারপরেই তার ফুরফুরে স্বপ্নে ঢুকে পড়ে তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা আশঙ্কাটা দুঃস্বপ্ন হয়ে। তার বাড়ি ফেরার সুখ তখন আশঙ্কায় টলমল করে। ধরো, বাড়ি গিয়ে সে দেখল, কোনো ঘরে আলো নেই। সব সুনসান। তবে কি বউমা আর নাতি-নাতনি দুইজনা ঘুমে একেবারে লছপছ! ধরো, আজগর আলি ডাকে– কই বাহে বউমা, এট্টু উঠো দেখি! কিন্তু কোনো শব্দ আসে না আড়মোড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙার। অপেক্ষা করেও আলো জ্বলে না ঘরে। তখন আজগর আলি ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়। দরজা বন্ধ। তখন আজগর আলি জোর শব্দ করে দরজায়। তবু দরজার ওপাশ থেকে কারও জেগে ওঠার শব্দ ভেসে আসে না। তখন সে দেশলাই জ্বালে। দেখতে পায় দরজা ভেতর থেকে নয়, বাহির থেকে বন্ধ। তার দরজায় শিকল তোলা। দেখেই কেঁপে ওঠে আজগর আলির বুক। এদিকে তার হাঁক-ডাকে পাশের ঘর থেকে কুপি হাতে বেরিয়ে আসে আয়নালের মা– ওমা আজগর ভাই, মাস ফুরানের আগেই ফিরলে যে বাহে!

আজগর আলি মুখে না বলে এমন ভঙ্গি করে, যাতে বোঝা যায় ভিটের জন্য, বউমা-নাতি-নাতনির জন্য তার বুকটা ভীষণ মোচড়াচ্ছিল। তাই কাজের মাঝপথেই সে চলে এসেছে। কিন্তু তার বউমা আর নাতি-নাতনিরা কই! তখন আয়নালের মা খানিকটা লজ্জা, খানিকটা সহানুভূতির সাথে জানায় যে, তার ছেলের বউ এখন নাছির মুদির ঘরে। জেগে দেখা দুঃস্বপ্নের মধ্যেই এই খবর শুনে স্তব্ধতায় আক্রান্ত হয় আজগর আলি। দুঃস্বপ্নের খেয়াল আরও বাড়াতে তার ভয় করে। তবু সে এগিয়ে নিয়ে চলে দুঃস্বপ্নকে। এখন তার বুকে ভর করেছে রাজ্যের উদারতা। কল্পনার মধ্যে আজগর আলি অন্যদের গলায় বলে– এট্টু মোর হয়্যা নাসিরের ঘরোত যাব্যান ভাবি!

এই রাতোত! আয়নালের মায়ের গলায় সংশয়। একটু ঝাঁঝালো গলায় বলে– ফির তার পাছোত যাওয়ার দরকারখান বা কী! তাঁই তো নিজের রাস্তা খুঁজি নিছে।

আজগর আলিও কী তা বোঝে না! কিন্তু তার বুক যে পোড়ে! তার নাতনিটা ল্যাগবেগে পুতুলের মতো! কী দুর্বল! কী মায়াময়! তার নাতিটা হাত ভেঙে নুলো হবার উপক্রম। গরুটা কিছুদিন উঠানে ছিল। তার জন্যও দরদ। সে তাই অনুরোধ করে আবার– তাও তুমি একবার যান ভাবি! এই সবরিকলা, এই যে কানছা মাছ, ছোঁড়া-ছুঁড়ি দুইডার গতরে জোর নাই! আর এই টাকাগুলান দিব্যা বউমার হাতোত। এনজিও-র কিস্তি শোদ দিয়া গরুডা ছাড়ান করুক। ছোঁড়া-ছুঁড়ি দুইজন গাই বিয়ান দিলে দুধ খাইবার পারিবে। আর এই যে ট্যাকা, ছোঁড়াক টাউনোত ডাক্তারের কাছোত লিয়া যাবি। অরা সক্কলে সুখে থাকিলেই হামার শান্তি ভাবি! হামারই যে রক্ত অরা!

এই পর্যন্ত কল্পনা করতেই দুঃখে-কষ্টে-উদারতায়-সর্বস্ব হারানোর বেদনায় আজগর আলির চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যায়। অন্ধকারে বোঝা যায় না, তার দাড়ি থেকে ঝরে পড়া কয়েক ফোটা জল তার বুকের কাছের গেঞ্জিও ভিজিয়ে দেয়।

এই সময় ভেতর বাড়ি থেকে খবর আসে, রাতের রান্না হয়ে গেছে। কামলা-কিষাণরা খেতে বসুক। আর আজগর আলি এই কয়দিনে চিনে ফেলা পুকুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাপগুলো অন্ধকারে বেয়ে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে সঙ্গী কিষাণদের সঙ্গে খেতে বসার উদ্যোগ করে।

ঐ কল্পনাই করেছিল। মাঝেমাঝেই করে। কিন্তু তাই বলে মাঝপথে কাজ ছেড়ে আজগর আলি ঘরে ফেরে না।

সাতাশ দিন পরে ছানাউল্লা মাস্টারের ধান কাটার শেষ, মাড়াই শেষ। পোয়াল আর ধানকে আলাদা আলাদা করে গুছিয়ে পোয়ালের ঠিক্কাছড়া আর ধান গোলাবন্দি করা শেষ। এবার আজগর আলিদের মতো রোজের কামলাদের বিদায়ের পালা। ছানাউল্লা মাস্টার লোকটা ভালো। আগের রাতে বিদায়ীদের জন্য গরুর গোশত রান্না হয়। বোল্ডার গরুর লালচে ঢেলার মতো টুকরো। তার সাথে শুকনো মরিচপেষা ছড়ানো প্রচুর ঝোল আর হল্যান্ডের আলু দুই ফাঁক করে সেই ঝোলে ভাসানো। খুব ঝাল, খুব স্বাদ। ঝালের চোটে তারা যখন উস্-আস্ করে জিভের শব্দ তোলে, তখন বাড়ির ভেতর থেকে মিষ্টি পায়েশ আসে। আসলে পায়েশ নয়, মিষ্টি জাউ-ভাত। তাতে আজগর আলিদের তেমন তফাৎ মনে হয় না। তারা মাংস-ভাতের পর মিষ্টান্ন পেয়ে যথেষ্ট খুশি এবং কৃতজ্ঞও।

সকালে ছানাউল্লা মাস্টার পাই পাই করে সবার পাওনা বুঝিয়ে দেয়। এক শ টাকি, দশটাকি, পাঁচটাকি মিলিয়ে তাদের পরিশ্রমের পাওনা তাদের তাৎক্ষণিক তৃপ্তি এনে দেয়। আজগর আলি বহুদিন পরে দুহাতের আঙুলে এতগুলো নোট স্পর্শ করা এবং গোণার সুযোগ পায়।

আর তখনই তাকে জাপটে ধরে অঙ্ক।

কমিশনের টাকা বাদ দেবার পরে, আর বিড়ি-গুয়া খরচের জন্য আগাম যে কয়টা টাকা মাস্টারের কাছ থেকে নিয়েছিল, সেইগুলি বাদ দেবার পরেই তার সামনে এসে হাজির হয় এই টাকা দিয়ে অবশ্যকরণীয়গুলোর তালিকা।

তার কাঁথা, লুঙ্গি, গেঞ্জি মিলিয়ে বান্ডিল বাঁধা শেষ, তার আরও ঝকমকে হয়ে ওঠা কাস্তে দু'টোকে পাটের ফেঁসোতে পেঁচিয়ে চটের ব্যাগে ঢোকানো শেষ। এখন কাঁথা-লুঙ্গির বান্ডিল আর চটের ব্যাগের পাশে ছানাউল্লা মাস্টারের পৈঠায় বসে আজগর আলি টাকা গোণে। গোণে আর খাতওয়ারি আলাদা করে। প্রথমে বউমার গরুটা ছাড়িয়ে আনার টাকা। মোট টাকা থেকে সেই টাকাটা আলাদা করে আজগর আলি। বাম হাতে সব টাকা। অন্য হাতের আঙুল দিয়ে সেই পরিমাণটিকে আলাদা করে সে। তারপরে নাতিটার ভাঙা হাতের চিকিৎসার টাকা। কিন্তু এই পরিমাণটায় পৌঁছানোর আগেই আজগর আলি সবিস্ময়ে খেয়াল করে বাম হাতে আর টাকা নেই। অঙ্ক তখন আজগর আলিকে ধন্দে ফেলে দেয়। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিড়বিড় করে– তারপরে ধরো ঘরোত ফিরার ভাড়া, একছড়ি সবরি কলা, এক কুড়ি কানছা মাছ, তারপর ধরো ঘরের চাল-ডাল, তারপর ধরো...

এতগুলো দিন কাজ করল আজগর আলি। কাজের শেষে মোট কত টাকা পাবে, সেই অঙ্ক করা হয়নি। সেই টাকা তার প্রয়োজন কতখানি মেটাতে পারবে সেটাও ভাবা হয়নি।

কিন্তু এখন টাকা নিয়ে বিদায় নেবার সময় সে হিসাববিজ্ঞানের গোলকধাঁধায় পড়ে যায়। কিস্তি, ভাঙা হাত, চাল-ডাল, নাতি-নাতনির একটু শখ, ফেরত খরচা। এ টাকা দিয়ে কি সব হবে না? সে আবার বাম হাতে টাকা নিয়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে গুণে গুণে টাকাগুলাকে আলাদা আলাদা করতে চায়। আবার খাতগুলো শেষ হবার আগেই দেখে যে তার বাম হাত শূন্য। আজগর আলির মাথা একটু ঘুরে ওঠে। সে টাকার হিসাব বাদ দিয়ে ঘোলাটে চোখে রোদের মধ্যে শুয়ে থাকা ন্যাড়া মাঠগুলো দেখে। কিছুক্ষণ পরে আবার খাতওয়ারি হিসাব করে টাকাগুলো গুণে আলাদা করতে যায় এবং আবার খাতগুলো শেষ হবার আগেই তার টাকা শেষ হয়ে যায়। আজগর আলির মাথাঘোরা আরও একটু বাড়ে। রোদপোয়ানো ন্যাড়া মাঠগুলোর দিকে আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সে। তারপর আবার খাতওয়ারি টাকাগুলোকে হিসাব করতে যায়। তার এতদিনের পরিশ্রমের টাকা আবার খাত শেষ হবার আগেই শেষ হয়ে যায়। তার মাথাঘোরা আরও একটু বেড়ে যায়। ন্যাড়া মাঠের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সময়ও আর একটু বাড়ে।

তারপর আবার সে খাত হিসাবে টাকা আলাদা করতে শুরু করে, তার টাকা খাত শেষ হবার আগেই যথারীতি শেষ হয়, তার মাথাঘোরা আর শূন্যদৃষ্টিতে ন্যাড়া মাঠের দিকে তাকিয়ে হিসাব মেলানোর চেষ্টা করা বেড়ে চলে, বেড়েই চলে, বেড়েই চলে...

#

ইউসুফের বলা শেষ হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে না লিসবেথ।

আবছা আলোতেও দেখা যায় ইউসুফের চোখের কোণে চিকচিক করছে পানি। তার হাতের ওপর হাত রাখে লিসবেথ। চাপ দেয় সান্ত্বনার ভঙ্গিতে। ফিসফিস করে বলে– তুমি এত কষ্ট পাও ইউ! কেন পাও?

আজগর আলিদের জন্য কিছু করতে পারি না যে!

যেন আরেক দুনিয়া থেকে ভেসে আসছে ইউসুফের কণ্ঠ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠার

অ্যামেরিকাতে কিছু গ্রুপ আছে...

কুণ্ঠার সঙ্গে বলল লিসবেথ– এই গ্রুপগুলো প্রচার করে যে হলি কোরআনের মধ্যেই নাকি নির্দেশ আছে যে ইসলামে যারা নন-বিলিভার তাদের হত্যা করা উচিত। তারা বলে যে এই কারণেই মুসলমানদের মধ্য থেকে সব সময় মিলিট্যান্সি সৃষ্টি হয়। টেরোরিস্ট তৈরি হয়। কথাটা কি সত্যি?

কফি হাউজে বসে আছে ওরা। এই শহরেও কফি হাউজ তৈরি হয়েছে, আগে খেয়াল করেনি ইউসুফ। এখানে ব্যবসা চলে?

মালিক ছেলেটা তার চেনা। হেসে বলে– চলে ভাই। আপনাদের দোয়ায় ভালোই চলে।

কিন্তু বেশি খদ্দের তো দেখছি না। প্রায় সব টেবিলই তো খালি।

মালিক হাসল– এই সময়টা খালিই থাকে ভাই। ভিড় হয় দুপুরের আগে আগে আর সন্ধ্যার আগে আগে।

কারা আসে? মানে আপনার বড় খদ্দের কারা?

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।

তাই নাকি! এখানে জিনিসপত্রের তো তুলনামূলকভাবে বেশ কস্টলি। ছাত্র-ছাত্রীরা এত টাকা কোথায় পায়?

পায় ভাই।

আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা পেতাম না।

এখন পায়। আমাদের ছাত্রজীবন আর এখনকার সময়ের মধ্যে অনেক তফাৎ।

কী রকম?

কফি হাউজের মালিক হাসল– আমাদের সময় কি ছাত্ররা কোনোদিন ঠিকাদারি করেছে? এখনকার সব ছাত্রনেতাই ঠিকাদার।

সে কী কথা! ছাত্রনেতারা ঠিকাদারি করলে পড়াশোনা করবে কখন? আর ছাত্র-রাজনীতিই বা করবে কখন?

সে তারাই জানে। আমি তো দেখি ছেলে-মেয়েরা এখানে যারা আসে তারা সবাই দেদারসে পয়সা ওড়ায়। তা আমার ভাই জানার দরকার নাই কোত্থেকে টাকা পায় ওরা। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার কাছে খদ্দের মানেই হলো লক্ষ্মী।

ফাঁকা কফি হাউজে বসতে ভালোই লাগছে। কিছুদিন থেকে লিসবেথ বারবার ওকে আড্ডার বদলে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চায় বিভিন্ন অজুহাতে। আসলে ইউসুফ ঠিকই বোঝে যে লিসবেথ ওকে একা পেতে চায়। প্রেম-সম্পর্ক নয়, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গটা পছন্দ করে। ইউসুফ বুঝতে পারলেও সহজে রাজি হতে চায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে রাজি না হয়ে উপায় থাকে না।

লিসবেথের প্রশ্নের দিকে এবার মনোযোগ দেয় ইউসুফ। পাল্টা জিজ্ঞেস করে– তোমার কী মনে হয়?

আমি জানি না। সেই জন্যেই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

আমেরিকাতে তুমি এই রকম গ্রুপের প্রচার শুনেছ। উত্তরটা শুনতে পাওনি? কেউ এর বিরুদ্ধে কোনো উত্তর দেয়নি? কোনো অ্যামেরিকান-মুসলমান গ্রুপ রিঅ্যাকশন জানায়নি?

আমার চোখে পড়েনি। এদিক-ওদিক মাথা দোলাল লিসবেথ।

এটাই আসল কথা। তোমাদের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে নেগেটিভ কথা প্রচার করা হবে, কিন্তু তার উত্তরটা বলতে দেওয়া হবে না। শুধু ইসলাম সম্পর্কেই না, আমি শুনেছি যে নোয়াম চমস্কি বা এডওয়ার্ড সাঈদের মতো ইন্টেলেকচুয়াল, যারা আমেরিকার ফরেন পলিসির সাথে ভিন্নতা পোষণ করে, তাদেরকেও কখনোই মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে জায়গা দেওয়া হয় না। একতরফা ক্রুসেড।

হয়তো। যদিও লোকে বলে অ্যামেরিকা হচ্ছে ফ্রি উইল প্রকাশের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু আসলে যে তা নয়, তা আমরা কিছু কিছু বুঝতে পারি। কিন্তু আমরা তাহলে সত্যিটা জানব কীভাবে?

উদাস কণ্ঠে বলল ইউসুফ– জানি না।

তুমি অন্তত আমার কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করো।

তাতে লাভ কী? তোমাকে বললে কি আর আমেরিকানদের মনোভাব পরিবর্তন করা যাবে। শুধু তুমি একা সত্যিটা জানলে কোনো লাভ আছে?

লাভ আছে। পঁচিশ কোটি অ্যামেরিকানের মধ্যে অন্তত একজন তো সঠিক ব্যাখ্যাটা জানল! অন্তত একজন তো কমল ভুল ধারণাকারীর দল থেকে!

হেসে ফেলল ইউসুফ– তুমি আসলে এত পজিটিভ-মাইন্ডেড! পঁচিশ কোটির মধ্যে একজন। কোনো পারসেন্টেজই তো করা যায় না।

আহা শুরু তো করো! পারসেন্টেজ আস্তে আস্তে রাইজ করবে।

আচ্ছা বলছি। ইসলামে জিহাদ বলে একটি ধারণা আছে। 'জিহাদ' শব্দটি শুনেছ আগে?

হ্যাঁ হ্যাঁ জিহাদ। এটাই তো মিলিট্যান্সি আর টেরোরিজমকে ইনসিস্ট করে। এখন মন পড়ছে শব্দটা।

এখানেই তো তোমাদের বোঝার ভুল। জিহাদ মানেই যুদ্ধ নয়।

তাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর শোনো। সব ধর্মের মতো ইসলামেরও কয়েকটি বেসিক জিনিস আছে। যাকে বাংলায় বলা যায় স্তম্ভ। মানে যদি ধর্মটাকে একটা বিল্ডিং হিসাবে ধরো, তাহলে বেসিক মূলনীতিগুলি হচ্ছে তার পিলারস। পরিষ্কার?

ইয়েস।

গুড। তো ইসলামের মূল স্তম্ভ হলো পাঁচটি। কালেমা বা বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ এবং জাকাত। এর মধ্যে কিন্তু জিহাদ নেই।

ওকে।

তাহলে জিহাদ জিহাদ করে ক্ষেপে উঠল কেন মুসলমানদের একটি অংশ? আর পশ্চিমারাই বা এটা নিয়ে এত জোর দিয়ে কথা বলে কেন?

কেন?

মুসলমানদের একটা অংশ, মানে ফান্ডামেন্টালিস্ট এবং রিভাইভালিস্টরা জিহাদ নিয়ে কেন মাতামাতি করছে, সেটা আরেকদিন বলব। এখন বলছি জিহাদের মূল কনসেপ্টের কথা।

দ্যাট উইল বি ফাইন।

আরবি জিহাদ শব্দটির মূল হচ্ছে 'জহদ'। এর একটা অর্থ করা হয় সংগ্রাম বা পবিত্র যুদ্ধ।

লাইক ক্রুসেড?

হ্যাঁ। তা বলতে পারো। কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে যে আরবিতে যুদ্ধের অনেকগুলো প্রতিশব্দ রয়েছে। যেমন, হার্ব মানে যুদ্ধ। সিরা'আ মানে হাতাহাতি মারপিট। মাআরাকা মানে লড়াই। কিতাল মানে হত্যা। তবে কোরআনে কিন্তু এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছে শুধু জিহাদ শব্দটি। কারণ জিহাদ বলতে শুধুমাত্র পবিত্র যুদ্ধ বোঝানো হয় না। জিহাদ বলতে একটা সার্বিক শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসকে বোঝানো হয়ে থাকে। মুহাম্মদ(সাঃ) প্রায়ই একটি শব্দের উপর জোর দিতেন। তা হচ্ছে 'জিহাদে আকবর' বা বড় জিহাদ। বড় জিহাদ বলতে রাসুল বোঝাতেন মানুষের নিজের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ। মানুষের নিজের মধ্যে যেসব কুপ্রবৃত্তি এবং নীচ প্রবৃত্তি রয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে নিজেকে পরিশুদ্ধ বা শুদ্ধ মানুষ হিসাবে নির্মাণ করা। সেটাই আসল জিহাদ বা বড় জিহাদ। মুসলমানদের সকল ক্ষেত্রে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার-ভিত্তিক ও সুশীল সমাজ গঠনের জন্য, যেখানে দরিদ্র আর অসহায় মানুষ শোষিত হবে না, আল্লাহ যেভাবে মানুষকে জীবনযাপন করতে বলেছেন– এই সবগুলি মিলেই কিন্তু জিহাদ। তবে জিহাদ বলতে রাসুল নিজেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক সময়ই পবিত্র যুদ্ধকেও বুঝিয়েছেন। কারণ তখন ইসলামি উম্মাহর অস্তিত্বের স্বার্থেই বিপক্ষের সাথে প্রধানত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে।

আমি তোমাকে কোরআনের যে যে অংশে জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি শোনাচ্ছি–

"সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য কোরো না এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে ওদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (সুরা ফুরকান: ৫২)

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে কারও প্রতি বাড়াবাড়ি কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না।" (সুরা বাকারা: ১৯০)

"আর যেখানে পাও, তাদের হত্যা করো, এবং যেখানে থেকে তোমাদের বার করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বার করবে। ফেৎনা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। আর মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কোরো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে, ইহাই তো অবিশ্বাসীদের পরিণাম।" (সুরা বাকারা: ১৯১)

"আর তোমরা, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয়..." (সুরা বাকারা ১৯৩)

"তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তা তোমরা জানো না।" (সুরা বাকারা: ২১৬)

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বলো, 'সে সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে (আদেশ পালনে) বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করে কাবা শরীফে (উপাসনায়) বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়, এবং বিদ্রোহ হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।' তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদের (সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম থেকে তোমাদের ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এবং সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এবং (এরাই) দোজখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সুরা বাকারা: ২১৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে স্বদেশ ত্যাগ করে এবং জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর দয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।" (সুরা বাকারা: ২১৮)

"তুমি কি মুসার পরবর্তী বনি ইসরাইল-প্রধানদের দেখোনি? যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করো যাতে আমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে পারি।' সে বলল, 'বোধহয় যদি তোমাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হয় তবে তোমরা সংগ্রাম করবে না।' তারা বলল, 'আমরা যখন আপন ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বহিস্কৃত হয়েছি,তখন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করব না কেন?' অতঃপর যখন তাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হলো, তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। বস্তুত আল্লাহ অপরাধীগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" (সুরা বাকারা: ২৪৮)

"স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেস্তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি', সুতরাং বিশ্বাসীগণকে অবিচলিত রাখো, যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, সুতরাং তাদের গর্দানে আঘাত করো এবং তাদের সবকটি হাতের আঙুলের ডগা কেটে ফেল।" (সুরা আনফাল: ১২)

"এ একারণে যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে বিরোধিতা করবে– (তারা মনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" (সুরা আনফাল: ১৩)

"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সম্মুখিন হবে তখন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।" (সুরা আনফাল: ১৫)

"সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম আর সে কত নিকৃষ্ট।" (সুরা আনফাল: ১৬)

"এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না অধর্ম দূর হয় এবং আল্লাহর ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সুরা আনফাল: ৩৯)

"হে নবী! বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করো, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীর উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।" (সুরা আনফাল: ৬৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাদের আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা উচিত। বস্তুত যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে আমি শীঘ্রই মহা পুরস্কার প্রদান করব।" (সুরা নিসা: ৭৪)

"তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না? যারা বলছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ অত্যাচারী শাসকের দেশ হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় করো।" (সুরা নিসা: ৭৫)

"যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে, সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, শয়তানের কৌশল দুর্বল।" (সুরা নিসা: ৭৬)

"তারা যেরূপ অবিশ্বাস করেছে তোমরাও সেরূপ অবিশ্বাস করো এবং তোমরা তাদের সমান হও। এই তো তারা চায়। অতএব আল্লাহর পথে গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদের যেখানে পাবে গ্রেপ্তার করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেই বন্ধু ও সহায় রূপে গ্রহণ করবে না।" (সুরা নিসা: ৮৯)

"কিন্তু তাদের নয়– যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ও নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে চলে যায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।" (সুরা নিসা: ৯০)

"অবশ্য তোমরা এমন কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে, শান্তি চায়। যখনই তাদের বিপর্যয়ের দিকে ফিরানো হয়, তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়! যদি তারা তোমাদের নিকট হতে চলে না যায় (অর্থাৎ বিরোধিতা করে), তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে, তবে তাদের যেখানেই পাবে গ্রেপ্তার করবে ও হত্যা করবে এবং আমি তোমাদের এই সকলেরই বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি।" (সুরা নিসা: ৯১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং (আর) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধনপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধনপ্রাণ দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদের আল্লাহ মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (সুরা নিসা: ৯৫)

"আর শত্রুদলের সন্ধানে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতোই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা করো তারা তা করে না। বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সুরা নিসা: ১০৪)

"অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করো তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন ওদের মজবুত করে বাঁধবে; অতঃপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদের মুক্ত করে দিতে পারো অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারো। তোমরা যুদ্ধ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র সংবরণ করবে। এটিই বিধান। এটি এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওদের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের এক-কে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনোই তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেন না। (সুরা মুহাম্মদ: ৪)

"তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো যারা আক্রান্ত হয়েছে; তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।" (সুরা আল হজ: ৩৯)

"তাদের বাড়ি-ঘর হতে অন্যায় ভাবে বহিস্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে তারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্যাসীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত– যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর ধর্মকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সুরা আল হজ: ৪০)

"এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তোমাদের তিনি মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেননি, এ বিধান তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। আল্লাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ গ্রন্থেও করেছেন।" (সুরা আল হজ: ৭৮)

AMARBOI.COM

"তা এই যে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানবে।" (সুরা স্বাফ: ১১)

"যে সব মরুবাসী গৃহে থেকে গিয়েছিল তাদের বলো, তোমরা আহুত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ নির্দেশ দান করলে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন। কিন্তু তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো, তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।" (সুরা আল ফাতাহ: ১৬)

"অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোনো অপরাধ নেই যদি তারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করে এবং যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে-ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।" (সুরা আল ফাতাহ: ১৭)

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে শিরককারীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দি করবে, অবরোধ করবে ও প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে যথাযথ নামাজ পড়ে ও জাকাত দেয় তবে তাদের পথে ছেড়ে দেবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা তওবা: ৫)

"আর তারা যদি তাদের চুক্তির পরে তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে অবিশ্বাসীদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে, এরা এমন লোক যাদের প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নয়, সম্ভবত তারা নিরস্ত হতে পারে।" (সুরা তওবা: ১২)

"তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসুলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? ওরাই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? বিশ্বাসী হলে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, এটিই আল্লাহর কাছে শোভনীয়।" (সুরা তওবা: ১৩)

এই আয়াতগুলি পড়ার পরে অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই যে অনেকগুলি আয়াতে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে। এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে, যে কোনো প্রত্যাদেশের মতো কোরআনেও দুই ধরনের নির্দেশ আছে। এক ধরনের নির্দেশ শাশ্বত বা চিরকালীন। আর এক ধরনের নির্দেশ হচ্ছে পরিস্থিতি-সাপেক্ষ। তুমি এই কথাটি আরও ভালো বুঝতে পারবে যদি তুমি কোরআনের আয়াতের শানে- নুজুল সম্পর্কে ধারণা নিতে পারো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শানে-নুজুল?

শানে-নুজুল হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো আয়াতের নাজিল বা অবতীর্ণ হওয়ার নির্দিষ্ট সিচুয়েশন বা ইভেন্ট।

আই সি!

সেই কারণেই কোরআনের শুধুমাত্র আক্ষরিক ট্রান্সলেশন তোমাকে কোরআনের সঠিক উপলব্ধি দিতে পারবে না। শানে নুজুল এবং পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ কোরআন পাঠ করতে হবে। এই টোটাল প্রক্রিয়াটির নাম হচ্ছে তফসির। তফসির পড়লে তুমি বুঝবে যে কোন কোন পরিস্থিতিতে কোন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল; এবং কোন আয়াতের কোন ধরনের ব্যাখ্যা কখন গ্রহণ করতে হবে।

ওহ ভেরি টাফ মনে হচ্ছে!

একটু উষ্মা প্রকাশ পেল ইউসুফের কণ্ঠে– হ্যাঁ একটু কষ্ট তো করতেই হবে! চোদ্দ শো বছর ধরে যে কোরআন কোটি কোটি মানুষের পথ-নির্দেশনার প্রতীক, তাতে তুমি একবার চোখ বুলিয়েই সব পরিষ্কার বুঝতে পারার আশা করো কীভাবে? এত শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ইসলামি পণ্ডিত কোরআন অনুধাবন এবং বিশ্লেষণের একটি ডিসিপ্লিন তৈরি করেছেন। তাকে তুমি একবার পড়েই বুঝে ফেলতে চাও। এই লিনিয়ার সরলীকরণের জন্যই তো পশ্চিমের মানুষ যেমন কোরআনের অপব্যাখ্যা করার সুযোগ পায়, তেমনই সুযোগ পায় আমাদের ধর্মের ফান্ডামেন্টালিস্টরা।

আবার এক প্রস্থ কফির অর্ডার দিল ইউসুফ। তারপর বলল– আর একটা জিনিসও এর সাথে যোগ করতে হবে।

কী?

হাদিস খুঁজে বের করতে হবে এই রকম পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ(সাঃ) ঠিক কোন কাজটি করেছিলেন। আমি নিশ্চিত জানি যে আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ আসার পরেও রাসুল যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছেন যুদ্ধ বা সংঘাত এড়িয়ে চলতে। এই কারণে এমনকি উম্মাহর ঐক্য পর্যন্ত বিনষ্ট হওয়ার ভয়ও দেখা দিয়েছে। তুমি কি হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা শুনেছ?

না। সন্ধি কী জিনিস?

সন্ধি হচ্ছে দুই রাইভাল ফোর্সের মধ্যে সিজ ফায়ার চুক্তি।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল ইউসুফ। অনুনয়ের সুরে বলল লিসবেথ– প্লিজ ইউ, সেই ঘটনাটার কথা অন্তত বলো! মনে হচ্ছে ইসলামের ইতিহাসে খুবই সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্ট ছিল সেটা।

সত্যিই তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটি ছিল ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস। তখন হজের মৌসুম। এক রাতে রাসুল স্বপ্নে দেখলেন, তিনি এতিহ্যবাহী হজের পোশাক পরে কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হাতে কাবার চাবি নিয়ে। হজের রীতি অনুযায়ী তাঁর মাথা মুণ্ডন করা।

এই স্বপ্নদৃশ্য তাঁকে মানসিকভাবে উতলা করে তোলে। কেননা স্বপ্নে তিনি নিজেকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কার কাবাঘরের সামনে দেখেছেন। নিশ্চয়ই এই স্বপ্নের কোনো তাৎপর্য অবশ্যই আছে। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ঠিক কয়েকদিন পরেই মুহাম্মদ(সাঃ)-এর ওপর ওহি নাজিল হলো–

" আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদ-উল-হারামে
নিরাপদে প্রবেশ করবে, কেউ কেউ মুণ্ডিত মাথায়, কেউ কেউ
চুল কেটে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না।"(আল কোরআন– ৪৮:২৭)

প্রত্যাদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব দ্বিধা কেটে গেল মুহাম্মদ(সাঃ)-এর। তিনি মসজিদ নববীতে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমানরা এবার হজ করতে মক্কায় যাবে। তিনি মদিনায় অনুসারীদের তাঁর সঙ্গী হওয়ার আহ্বান জানালেন। সে এক অবিস্মরণীয় মানসিক অবস্থা মুসলমানদের। তুমি ঠিক অনুমান করতে পারবে না। মক্কা থেকে যারা দীর্ঘ কয়েক বছর আগে হিজরত করে রাসুলের সঙ্গে মদিনায় চলে এসেছিলেন, তারা নিজের জন্মভূমিকে এক নজর দেখার আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। আর যারা মদিনা এবং অন্য জায়গার মুসলমান, তারাও দীর্ঘদিন হজ করতে কাবায় যেতে না পারার জন্য মর্মযাতনায় ভুগছিলেন। কারণ কাবাগৃহ ইসলামের আবির্ভাবের আগে থেকেই আরবের সকল মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে আকর্ষণ করত। বছরে এই হজের মৌসুমেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আরব উপদ্বীপে কোনো হানাহানি থাকত না। তাই এত বছর পরে মক্কায় হজ করতে যাওয়ার আহ্বান মুসলমানদের মনে একই সাথে ভীতি, বিস্ময় এবং অনিশ্চিত আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। মুহাম্মদ(সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এই যাত্রা কোনো সামরিক অভিযান হবে না। মুসলমানরা পরবে হজযাত্রীর ঐতিহ্যবাহী সাদা পোশাক। কেউ অপ্রয়োজনীয় অস্ত্র বহন করতে পারবে না।

অনেকের কাছেই এই প্রস্তাবটি বিপজ্জনক মনে হয়েছিল। মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল যেসব বেদুইন গোত্র, তারা রাসুলের সঙ্গী হতে অস্বীকৃতি জানাল। তবে প্রায় এক হাজার মুহাজির এবং আনসার মুসলমান রাসুলের সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসুলকে পছন্দ করতেন না। তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, মুহাম্মদ(সাঃ) হিজরত করে মদিনায় আসার আগে মদিনাবাসীরা তাকেই নিজেদের রাজা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ(সাঃ) মদিনায় এসে নেতার আসন লাভ করায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আর রাজা হতে পারেননি। তাই রাসুলের প্রতি তার এই ঈর্ষা কোনোদিন দূর হয়নি। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইবনে উবাই হজযাত্রায় রাসুলের সঙ্গী হতে রাজি হয়ে গেলেন। মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমাকে সঙ্গে নেন। মদিনার আরও দুইজন নারীকে হজ কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সত্তরটি উট সংগ্রহ করা হলো। হজের রীতি অনুযায়ী মিনাতে কোরবানি করা হবে এগুলো। মুহাম্মদ(সাঃ) পরেছিলেন হজের প্রচলিত সাদা পোশাক। সেলাইবিহীন দুই টুকরা কাপড়। এক টুকরা কোমরে জড়ানো থাকে, আরেক টুকরা কাঁধে। সাহাবি হজরত ওমর যুক্তি দিয়েছিলেন যে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাবেই। তাই তাদের নিজেদের উচিত সশস্ত্র অবস্থায় অগ্রসর হওয়া। কিন্তু নিজের পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রইলেন মুহাম্মদ(সাঃ)। তিনি স্বপ্ন এবং প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নিশ্চিত ছিলেন যে আল্লাহ তাদের কাবায় হজ করাবেনই। তবে ঠিক কী রকম পরিস্থিতির মুকাবিলা তাঁকে করতে হবে, সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর ছিল না। কিন্তু এই যাত্রায় যে তিনি কিছুতেই যুদ্ধে জড়াবেন না, এই মনোভাব তাঁর ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাঁর সঙ্গীরা কেবল একটি করে শিকারের উপযোগী ছোট তরবারি বহন করার অনুমতি পেয়েছিলেন। সেটিকেও খাপে বন্ধ করে রাখতে হবে। মুহাম্মদ(সাঃ) হজযাত্রা শুরু করলেন। মুখে মুখে উচ্চারিত হলো হজের ঘোষণা-ধ্বনি– 'লাব্বায়েক! আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক!' আমি হাজির! হে প্রভু আমি হাজির!

মক্কার কুরাইশরা এর চেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে খুব কমই পড়েছিল। কারণ একদিকে মক্কার অভিভাবক এবং কাবা শরীফের হেফাজতকারী হিসাবে কোনো হজযাত্রীকে কাবার চত্বরে আসতে না দেওয়ার কোনো নৈতিক অধিকার তাদের নেই। তারা যদি মুহাম্মদ(সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের কাবাঘরে হজ করতে বাধা দেয়, তাহলে সমগ্র আরব উপদ্বীপের মানুষ তাদের ঘৃণা করবে। কিন্তু ওদিকে আবার যদি মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন, তাহলে সেটি হবে তাঁর বিশাল এক নৈতিক বিজয়। এবং ফলে তাঁর হাতে কুরাইশদের অপমান চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। মক্কার সিনেট ত্বরিৎ আলোচনায় বসল। আবু সুফিয়ান অস্বাভাবিকভাবে নীরব ছিলেন। তবে ইকরামা, সুহায়েল এবং সাফওয়ান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তাঁরা মুহাম্মদকে কিছুতেই মক্কায় পা রাখতে দেবেন না। মুহাম্মদ(সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতিহত করার জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠানো হলো দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ।

মুসলমানরা মক্কার পঁচিশ মাইল উত্তর-পুবে অবস্থিত উসফান মরুদ্যানে পৌঁছুলে মুহাম্মদ(সাঃ)-এর স্কাউট খবর নিয়ে এলো যে খালিদ তার বাহিনীসহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র আট মাইল দূরে রয়েছে। মুহাম্মদ(সাঃ) ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বললেন– 'হায় কুরাইশরা! যুদ্ধ ওদের গ্রাস করেছে। আমাকে আর বাকি আরবদের আমাদের পথে যেতে দিলে ওদের কী ক্ষতি হতো!... আল্লাহর শপথ, ঈশ্বর আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তা অর্জন কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত লড়াইতে আমি ক্ষান্তি দেব না!'

মুহাম্মদ(সাঃ) পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্রের মধ্যে এমন লোকের খোঁজ করলেন যে তাঁদেরকে খালিদ-বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে মক্কার কুড়ি মাইলের মধ্যে এমন সীমানায় পৌঁছে দিতে পারবে যেখানে সব ধরনের সহিংসতা, রক্তপাত বা যুদ্ধ নিষিদ্ধ। ইংরেজিতে যাকে বলা যায় স্যাঙ্কচুয়ারির সীমানা। বনু আসলামের এক সদস্য স্বেচ্ছায় মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি অনেক ঘুরপথে, বিপদসঙ্কুল মরুভূমির মধ্য দিয়ে, এক কষ্টকর যাত্রার মাধ্যমে মুসলমানদের পৌঁছে দিলেন খালিদ-বাহিনীর নাগালের বাইরে। যুদ্ধনিষিদ্ধ এলাকার একেবারে বহিস্থ বিন্দুতে পৌঁছে মুহাম্মদ(সাঃ) তাঁর সঙ্গীদের আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন এই অভিযানের নিখাদ ধর্মীয় চরিত্রের কথা। তারপর তিনি হুদাইবিয়ার পথে এমনভাবে উট হাঁকাতে বললেন যাতে ধুলো ওড়া দেখে খালিদ-বাহিনী বুঝতে পারে যে মুসলমানরা নিরাপদ অর্থাৎ যুদ্ধ নিষিদ্ধ এলাকায় পৌঁছে গেছে।

স্বপ্নের কারণে হয়তো মুহাম্মদ(সাঃ)-এর প্রত্যাশা ছিল যে চাপের মুখে কুরাইশরা নতি স্বীকার করবে এবং মুসলমানদের হজ করার জন্য কাবায় প্রবেশের সুযোগ দেবে। কিন্তু খালিদ-বাহিনীর উপস্থিতি তাঁকে বুঝিয়ে দিল যে কুরাইশরা প্রয়োজনে আরবীয় সকল প্রাচীন ও পবিত্র রীতি-নীতি বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। প্রয়োজনে তারা কাবায় ঢুকতে দেওয়ার চাইতে বরং নিরস্ত্র মুসলমানদের হত্যা করতেও প্রস্তুত রয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলছিলেন মুহাম্মদ(সাঃ)। এই সময় হুদাইবিয়াতে পৌঁছানোর পরে রাসুলকে বহনকারী উট কাসওয়া আচমকা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে এবং আর উঠতে চায় না। সঙ্গীরা 'হাল হাল' বলে তাড়া লাগালেও উটের মধ্যে উঠে দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছাই সঞ্চারিত হলো না। তখন মুহাম্মদ(সাঃ)-এর মনে পড়ল আবরাহার হাতির কথা। কাবাঘরের সামনে এসে আবরাহার হাতিও বসে পড়েছিল মাটিতে হাঁটু গেড়ে। তিনি উটের উপর বিরক্ত সঙ্গীদের বললেন–'সেদিন যিনি হাতিকে মক্কায় যেতে বাধা দিয়েছেন তিনিই আজ কাসওয়াকে আটকে রেখেছেন। আজ স্বজাতির প্রতি দয়া দেখাতে কুরাইশরা আমাকে যা বলবে আমি তাতেই সম্মতি দেব।' তিনি সঙ্গীদের সেখানেই তাঁবু খাটাতে বললেন। এবং অপেক্ষা করতে শুরু করলেন মক্কাবাসীদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে মুসলমানরা সেখানে এখনকার পরিভাষায় "অবস্থান ধর্মঘট' শুরু করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত আরবে বিদ্যুৎগতিতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। মক্কার খুযায়াহ গোত্রের প্রধান বুদায়েল ইবনে ওয়ারকা এলেন মুহাম্মদ(সাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করতে। তিনি এসে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য আসেনি। তারা এসেছে হজ করার উদ্দেশ্যেই। তারা প্রয়োজনে কাবায় প্রবেশের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করতে রাজি, যদিও তাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নেই। তবে তারা কুরাইশরা কী করে সেটা দেখার জন্য সময় দিতে সম্মত আছে। বুদায়েল মুহাম্মদ(সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন এবং এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হলেন যে মুসলমানরা যুদ্ধ করতে আসেনি। তিনি তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন যে যতদিন মুসলমানরা এখানে অবস্থান করবে, তার গোত্র থেকে মুসলমানদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হবে, এবং তিনি কুরাইশদের সাথে আলোচনা করে সেই খবর মুসলমানদের জানাবেন।

বুদায়েল ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে মুহাম্মদ(সাঃ)-এর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা জানালেন। কিন্তু কুরাইশরা অটল। তাদের কথা হচ্ছে– হয়তো যুদ্ধ করার জন্য আসেনি তারা, কিন্তু আল্-লাহর শপথ! আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের এখানে আসা হবে না। আরবরাও কখনও বলতে পারবে না যে আমরা দুর্বলতার কারণে তাদের কাবায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছি। মুহাম্মদকে কাবায় প্রবেশ করতে দেওয়ার বদলে আমরা বরং আমাদের শেষ ব্যক্তিটি নিহত হওয়া পর্যন্ত মুহাম্মদ ও কাবার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

তবে তারা মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর ইচ্ছায় জানিয়ে দিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার একান্ত সঙ্গীরা ইচ্ছা করলে কাবায় এসে হজ করতে পারেন। তাদেরকে কোনো বাধা দেওয়া হবে না। তাদেরকে বিস্মিত করে দিয়ে ইবনে উবাই জানিয়ে দিলেন যে মুহাম্মদ(সাঃ)-এর আগে কাবায় তাওয়াফ করার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না।

কুরাইশদের ঘনিষ্ট মিত্র তায়েফের উরওয়াহ ইবনে মাসউদ মধ্যস্থতা করতে চাইলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে মুহাম্মদ(সাঃ)-এর যৌক্তিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে হিতে-বিপরীত হতে পারে। যেখানে মুহাম্মদ(সাঃ) নিজে ছাড় দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে কুরাইশদেরও কিছুটা ছাড়ের ঘোষণা দিতেই হবে। তা না হলে আরবের সকল গোত্রের কাছে কুরাইশরা ছোট হয়ে যাবে।

কুরাইশরা তখন তাদের মিত্র গোত্র আল-হারিসের প্রধান হুলায়েস ইবনে আলকামাকে পাঠাল মুহাম্মদ(সাঃ)-এর কাছে। হুলায়েস ছিলেন ঘোর পৌত্তলিক। তাকে তাঁবুর দিকে আসতে দেখে রাসুল বললেন– 'একজন ধার্মিক ব্যক্তি আসছেন। কোরবানির উটগুলোকে তার দিকে পাঠাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুলায়েস দেখলেন, সত্তরটি উটের প্রত্যেকটাই চমৎকারভাবে সাজানো; গলায় মালা,আর কোরবানির বিশেষ চিহ্ন দেওয়া। তিনি কোনো কথা না বলে ফিরে গিয়ে কুরাইশদের বললেন– ওরা প্রকৃতই তীর্থযাত্রী। এবং পবিত্র হজের রীতি অনুযায়ী মুসলমানদের কাবায় প্রবেশের অধিকার দিতে হবে। এ কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে কুরাইশরা তাকে 'মূর্খ বর্বর বেদুইন' বলে গালি দিল। এতে আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে হুলায়েস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– কুরাইশগণ, আমরা এইজন্য আপনাদের সঙ্গে মৈত্রিচুক্তি গঠন ও সম্পাদন করিনি। আল্-লাহর ঘর দর্শনে কাউকে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার কি কারও আছে? আমার জীবন যার হাতে, তার শপথ! হয় মুহাম্মদকে তিনি যে উদ্দেশ্যে এসেছেন, সেটা পূরণ করার অধিকার দিতে হবে, অথবা আমি আমার সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে চলে যাব।

কুরাইশরা তখনই মাফ চেয়ে একটি সমাধানে না পৌঁছানো পর্যন্ত হুলায়েসকে থাকতে রাজি করাল।

এদিকে মুহাম্মদ(সাঃ) মক্কায় নিজের দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি প্রথমে মদিনার একজন আনসার সাহাবিকে পাঠালেন। কিন্তু কুরাইশরা তার উটের রগ কেটে দিল। হুলায়েস বাধা না দিলে তাকে নিশ্চিতই হত্যা করা হতো। এবার মুহাম্মদ(সাঃ) পাঠাতে চাইলেন হজরত ওমরকে। কিন্তু ওমর বললেন যে তাঁর গোত্রের কোনো প্রভাবশালী লোক নেই মক্কায়; তাই তার পরিবর্তে ওসমানকে পাঠানোই ভালো হবে। নগরীর ধনী ও অভিজাতদের সাথে যোগাযোগ ছিল হজরত ওসমানের। কিন্তু তারা ওসমানের অনুরোধ শুনল না। তবে বলল যে ওসমান ইচ্ছা করলে নিজে হজ করতে পারেন। ইবনে উবাই-এর মতো ওসমানও রাসুলকে বাদ দিয়ে হজ করতে রাজি হলেন না। এরপরে কুরাইশরা তাঁকে জিম্মি হিসাবে আটক করল। মুসলিম শিবিরে খবর পৌঁছাল যে হজরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে।

এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ(সাঃ) শপথ নিলেন যে, শত্রুর মুকাবিলা না করে তিনি হুদাইবিয়া ত্যাগ করবেন না। এটি ছিল মুহাম্মদ(সাঃ)-এর জীবনের একটি বিরাট সংকটময় মুহূর্ত। কারণ তিনি ওহি পেয়ে এখানে এসেছেন। তা এখন ভেস্তে যেতে বসেছে বলে মনে হচ্ছিল। তিনি নিজের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গভীর চিন্তায় ও ধ্যানে মগ্ন হলেন। অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গীদের আহ্বান জানালেন তাঁর হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণের জন্য। এক হাজার তীর্থযাত্রী একের পর এক এগিয়ে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে বায়াত নিলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-ও ছিলেন। এই বায়াতকে পরবর্তীতে বলা হয়েছে 'বায়াত আল-রিদওয়ান' বা 'শুভ আনন্দের অঙ্গীকার'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেক মুসলমান তাঁদের 'নবীর মনে যা আছে' তা অনুসরণ করার শপথ নিয়েছিলেন।

শপথ গ্রহণের পরেই জানা গেল যে হজরত ওসমান নিহত হননি। এবার দুইজন সঙ্গীসহ কুরাইশদের অন্যতম নেতা সুয়াহেলকে তাদের তাঁবুর দিকে আসতে দেখে রাসুল বুঝলেন যে, কুরাইশরা আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুয়াহেলের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন তিনি। আলোচনা শেষে উভয়ে একমত হয়ে যেসব সিদ্ধান্ত শোনালেন, তা শুনে মুসলমানরা পরাজয়ের অনুভূতিতে আক্রান্ত হলেন। তাদের মনে হলো তাদের নবী স্পষ্টতই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে সকল মুসলমানই মুষড়ে পড়লেন।

আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এবার মুসলমানরা হজ না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন। আগামী বছর একই সময়ে তারা হজ করতে মক্কায় আসবেন। তখন কুরাইশরা তিন দিনের জন্য মক্কা ছেড়ে চলে যাবে যাতে মুসলমানরা শান্তিতে ওমরাহ পালন করতে পারেন। মক্কা ও মদিনার মধ্যে দশ বছরব্যাপী একটি শান্তিচুক্তি করা হলো এই শর্তে যে কোনো কুরাইশ তার অভিভাবকের অমতে যদি ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় চলে যায়, তাহলে মুহাম্মদ(সাঃ) তাকে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু কোনো মুসলমান যদি পক্ষ ত্যাগ করে মক্কায় চলে যায়, তবে মক্কার অধিবাসীরা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। অন্য বেদুইন গোত্রগুলি আগে যেসব চুক্তি করেছিল, সেগুলি থেকে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হলো। এখন নতুন করে বেদুইন গোত্রগুলি যার সাথে খুশি মৈত্রিচুক্তি করতে পারবে।

সাহাবিরা এইসব অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে রাজি ছিলেন না। পরিস্থিতি এতদূর খারাপ হয়েছিল যে ওমর তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ আবু বকরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে– 'আমরা কি মুসলমান নই? আর ওরা কি পৌত্তলিক নয়? তাহলে আমাদের ধর্মের জন্য অবমাননাকর এমন চুক্তি কেন মেনে নেব আমরা?'

আবু বকর নিজেও বিচলিত ছিলেন এই চুক্তি নিয়ে। কিন্তু তিনি ওমরকে বললেন– 'দেখা যাক, আমি এখনও রাসুলের ওপর আস্থা হারাইনি।'

পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো চুক্তিপত্র লেখার সময়। সেটি লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হজরত আলীকে। তিনি লিখতে শুরু করলেন– 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম' বাক্য দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি এলো সুয়াহেলের কাছ থেকে। মুসলমানরা যেভাবে আল্লাহকে ডাকে, সেইভাবে চুক্তিপত্র লিখতে রাজি নয় কুরাইশরা। তবে তারাও যেহেতু আল্-লাহকে সবচেয়ে বড় দেবতা হিসাবে মেনে চলে, তাই 'হে আল-লাহ! তোমার নামে' লেখা চলতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীদের হতচকিত করে দিয়ে মুহাম্মদ(সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে সেকথায় রাজি হয়ে গেলেন।

আলী এর পরের অংশে লিখলেন– 'এই সেই চুক্তি যা আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ(সাঃ) , সুয়াহেল ইবনে আমরের সঙ্গে সম্পাদনে রাজি হয়েছেন।'

এবারও সুয়াহেলের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠল– আমরা যদি মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসুল বলে মেনেই নিতাম, তাহলে তো আর যুদ্ধ করার প্রশ্নই উঠত না। সেক্ষেত্রে এই চুক্তিরও কোনো প্রয়োজন পড়ত না।

তাহলে কী করতে হবে?

'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর জায়গায় লিখতে হবে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।'

হজরত আলী ইতোমধ্যেই মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ লিখে ফেলেছিলেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে ঐ অংশ কেটে দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

মুহাম্মদ(সাঃ) তখন হেসে আলীকে বললেন কাগজের নির্দিষ্ট জায়গাটা দেখিয়ে দিতে। হজরত আলী দেখিয়ে দিলে রসুল নিজেই কলম হাতে নিয়ে ঐ লেখাটুকু কেটে দিলেন। এরপর চুক্তি লেখা সম্পন্ন হলো।

কিন্তু নাটকীয়তার আরও বাকি ছিল। আচমকা সেই মুহূর্তেই সুয়াহেলের পুত্র আবু জান্দাল সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় পিতা সুয়াহেল তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। আবু জান্দাল কোনোক্রমে পালিয়ে সেই মুহূর্তে মুসলমানদের তাঁবুতে চলে আসতে পেরেছেন। কিন্তু সুয়াহেল চিৎকার করে বললেন– মুহাম্মদ, এই ছেলে এখানে উপস্থিত হওয়ার আগেই আমাদের চুক্তিপত্র লেখা হয়ে গেছে। আবু জান্দালকে চুক্তি অনুযায়ী আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

আবু জান্দাল অনুনয় করে বললেন– হে নবী আমাকে আর পৌত্তলিকদের মাঝে ফিরে যেতে দেবেন না!

কিন্তু মুসলমানরা অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে দেখল, মুহাম্মদ(সাঃ) চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে গেলেন, এবং আবু জান্দালকে তার পিতার অনুমোদন ছাড়া হিজরতের অনুমোদন দিতে অস্বীকার করলেন।

হজরত ওমর আর সহ্য করতে পারেননি। তিনি মুহাম্মদ(সাঃ)-এর সামনে গিয়ে সরাসরি আক্রমণাত্মক কণ্ঠে বললেন– 'আপনি কি আল্লাহর রাসুল নন? আমরা কি ন্যায়ের পথে আর শত্রুরা অন্যায়ের পথে নেই? তাহলে কেন এমন অসম্মানজনক চুক্তি করলেন আপনি?'

পরবর্তীতে ওমর বলেছেন, ঐ সময় একশো জন সঙ্গী পেলে নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহ ছেড়ে চলে যেতেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহাম্মদ(সাঃ) উত্তরে বলেছিলেন যে যুদ্ধবিরতি বা শান্তির সম্ভাবনা থাকলে মুসলমানদের শত্রুর প্রস্তাবিত যে কোনো শর্ত মেনে নেবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার আদেশ রয়েছে কোরআনে।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিল ইউসুফ।

উনিশ

"তবে এখানকার জাতিগুলির যে সমস্ত শহর তোমাদের ঈশ্বর ভগবান তোমাদের দিচ্ছেন তোমাদের নিজেদের শহর হিসাবে, সেই সব শহরে কিন্তু একটি প্রাণীকেও বেঁচে থাকতে দেওয়া চলবে না।"

"তোমাদের ঈশ্বর ভগবানের আদেশমতো হিত্তীয়দের, আমেরীয়দের, কানানীয়দের, পেরিজীয়দের, হিভীয়দের ও জেবুসীয়দের, অর্থাৎ ওই শহরগুলির সমস্ত অধিবাসীদের পুরোপুরিই ধ্বংস করতে হবে।"

ইহুদি ধর্মপুস্তক 'ডিউটারোনমি'র ২০ তম অধ্যায়ের ১৬ এবং ১৭ তম বাক্য এই দু'টি। এমন নৃশংস আদেশ কোরআন তো বটেই, পৃথিবীর আর কোনো ধর্মগ্রন্থেই নেই।

এগুলো ছাড়াও ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে অন্তত ২৩টি শ্লোকে ধর্মের নামে যুদ্ধকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আমাদের ঘরের পাশের হিন্দু ধর্মেও ব্যতিক্রম নেই। রামায়ন-মহাভারত তো যুদ্ধেরই বর্ণনা। সেই সঙ্গে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর শ্লোকেও বলা হচ্ছে–

"যুদ্ধে হত হলে তার ফলে স্বর্গলাভ হবে,আর যুদ্ধে জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে। অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠো।"

"অতএব সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও; যুদ্ধরূপ কর্তব্য কর্ম সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে করলে তুমি পাপভোগী হবে না।"

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে এই বিশ শতকে এসে ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মের পারস্পরিক হরিহর আত্মার সম্পর্ক। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহুদিরা খ্রিস্টানদের হাতে শত শত বছর ধরে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই। খ্রিস্টানরা একটি বিষয়ে কোনোদিন ইহুদিদের ক্ষমা করতে চায়নি। তা হচ্ছে, তাদের ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে যীশুর ক্রুসবিদ্ধ হওয়া। খ্রিস্টান ধর্ম শক্তি সঞ্চয় করার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইহুদিদের উপর। ইউরোপের ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানেই খ্রিস্টানদের হাতে ইহুদি-নিধনের ইতিহাস। এর শুরু সম্রাট গ্রেট কনস্তানতিনের সময় থেকে। সম্রাটের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে এই প্রথম খ্রিস্ট ধর্ম কোনো সরকারি ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করে। খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের রাজ্যশাসন ও আইন প্রণয়নে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা ইহুদিদের ধর্মীয় আচরণে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। কনস্তানতিন ইহুদিদের বিরুদ্ধে একটি ডিক্রি জারি করেন। সেখানে বলা হয়, কোনো ইহুদি যদি এমন কোনো কাজ করে, যার ফলে কোনো খ্রিস্টানের প্রাণের ওপর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, তাহলে ঐ ইহুদি ও তার পরিবারের সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে। আরেকটি ডিক্রি জারির মাধ্যমে সম্রাট খ্রিস্টানদের জন্য ইহুদি ধর্মে ধমান্তরকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মৃত্যুর তিন মাস আগে কনস্তানতিন আর একটি আইন চালু করেন। এত বলা হয়, কোনো ইহুদি আর কোনো খ্রিস্টান ক্রিতদাসের মালিক থাকতে পারবে না। এবং ভবিষ্যতে কোনো ইহুদি কোনো খ্রিস্টানের সেবা গ্রহণ করতে পারবে না। সম্রাটের মৃত্যুর পরে তার পুত্র কনস্তানতিয়াস আরও আইন জারি করেন যে ইহুদিরা কোনো খ্রিস্টান রমণীকে বিবাহ করতে পারবে না। সেই সঙ্গে ইহুদিদের বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। কোনো ইহুদি শহরের মধ্যে বসবাস করতে পারবে না। শহর থেকে কমপক্ষে তিন মাইল দূরে ইহুদিদের বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে।

সম্রাট জুলিয়ান ইহুদিদের ওপর অত্যাচার কিছুটা কমিয়েছিলেন। তিনি এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তাঁর ইরান অভিযান সফল হলে তিনি ইহুদিদের ওপর থেকে নিবর্তনমূলক কর প্রত্যাহার করে নেবেন। জুলিয়ানের এই ঘোষণার পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। তিনি চাইছিলেন, ইরান অভিযানের সময় ইরাকের প্রভাবশালী ইহুদিরা যাতে তাকে সাহায্য করে। কিন্তু জুলিয়ানের আশা পূর্ণ হয়নি। ইরাকের ইহুদিরা তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তবু জুলিয়ান ইহুদিদের দেওয়া সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করে নেননি। কিন্তু পরবর্তী সম্রাট জোভিয়ান আবার খ্রিস্টান বিশপদের চাপে ইহুদিদেরকে প্রদত্ত সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। বিশপদের চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। সম্রাট থিউডোসিস ইহুদিদের পুড়ে যাওয়া সিনাগগ নির্মাণে সাহায্য করতে চাইলে খ্রিস্টান ধর্মনেতারা এমন বিরোধিতা শুরু করেন যে সম্রাটকে বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হয়। ইহুদিদের ব্যবসাবুদ্ধিকে সম্রাট উপকারী মনে করতেন। কিন্তু সেগুলিকে কাজে লাগাতে হলে তাদের যতটুকু নাগরিক সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা তিনি খ্রিস্টান ধর্মনেতাদের বিরোধিতার কারণে দিতে পারতেন না। উল্টো ইহুদি ব্যবসায়ীদেরকে গির্জায় কর প্রদানে বাধ্য করা হয়। গির্জা থেকে এই বিধানও জারি করা হয় যে, কোনো ইহুদির এই সাম্রাজ্যের গভর্নর বা সিনেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদস্য হওয়ার অধিকার নেই। সেনাবাহিনীতে ইহুদিদের নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিয়মও চালু করা হয় যে, কোনো উচ্চ পদস্থ বা অভিজাত ব্যক্তি কোনো ইহুদিকে আপ্যায়ন করতে পারবেন না। সম্রাট জাস্টিনিনের সময় আইন করা হয় যে, মাতা-পিতা যদি দুই আলাদা ধর্মাবলম্বি হয়, তাহলে সন্তানের উপর তার অধিকারই বর্তাবে যার ধর্ম সত্য। পিতা যদি অখ্রিস্টান হয় তাহলে সন্তানের অধিকার বর্তাবে মায়ের উপর; কিন্তু পিতাকে সন্তানের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। মাতা-পিতা দু'জনেই যদি ইহুদি হয়, আর সন্তান যদি খ্রিস্টান হয় তাহলে সেই সন্তান মাতা-পিতার সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারি হবে। মাতা-পিতা সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু কোনো অখ্রিস্টানের সাথে তার বিয়ে দিতে পারবে না। কোনো মামলা-মোকদ্দমায় ইহুদিদের সাক্ষ্য বৈধ বলে গণ্য করা হবে না।

১৪৯২ সালের জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে গ্রানাডার পতনের মাধ্যমে উচ্ছেদ হয়ে গেল ইউরোপের সর্বশেষ মুসলিম খেলাফত। ১৪৯২ সালে মুসলমানদের বলা হলো হয় তাদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, অথবা ইউরোপ ছেড়ে চলে যেতে হবে। মুসলমানদের ইউরোপ ত্যাগে অসুবিধা হয়নি। কারণ পাশেই তুর্কী অটোমান সাম্রাজ্য তখনও জীবন্ত। একই বছর ৩১ মার্চ ইহুদিদের জন্যও একই আদেশ প্রদান করা হলো রাজা ফার্দিনান্ড ও রানী ইসাবেলার ফরমানে। ইহুদিরা মুসলমান খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'আল-আন্দালুস' খেলাফতের সর্বত্র বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত ছিল। তাদের একটি বিরাট অংশ দেশত্যাগ করলে সর্বস্ব হারাতে হবে ভেবে ব্যাপটাইজড হলো। কিন্তু তারপরেও আশি হাজার ইহুদি চলে গেল পর্তুগালে। আরও পঞ্চাশ হাজার ইহুদি আশ্রয় নিল তুরস্কের মুসলমান খলিফার রাজত্বে। তাদের ভালোভাবে গ্রহণ করেছিলেন খলিফা। দিয়েছিলেন আশ্রয়। ইহুদিরা স্পেন থেকে তাদের এই বিতাড়িত হওয়াকে তুলনা করেছে ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত হওয়ার সাথে। দু'টিই তাদের কাছে মনে হয়েছে অসহনীয় বেদনার। এর আগেই অবশ্য খ্রিস্টানরা ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ইহুদি-বিতাড়ন কর্মসূচি শুরু করেছিল। যেমন ভিয়েনা এবং লিঞ্জ থেকে ইহুদিদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় ১৪২১ সালে, কোলন থেকে ১৪২৪ সালে, অসবার্গ থেকে ১৪৩৯ সালে, বাভারিয়া থেকে ১৪৪২ সালে, মোরাভিয়া থেকে ১৪৫৪ সালে। এছাড়াও ইহুদিরা পেরুজিয়া থেকে বিতাড়িত হয় ১৪৮৫ সালে, ভিসেঞ্জা থেকে ১৪৮৬ সালে, পারমা থেকে ১৪৮৮ সালে, মিলান ও লুকা থেকে ১৪৮৯ সালে, এবং টুসকানি থেকে ১৪৯৪ সালে। এর কিছুদিন পরে তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া ইহুদিদের একটি গ্রুপ প্রবেশ করে প্যালেস্টাইনে। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে যেসব ইহুদি রয়ে গিয়েছিল, তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হতে হয়েছে খ্রিস্টানদের হাতে। যারা প্রকাশ্যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকেও বংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম্পরায় সন্দেহ করা হয়েছে যে তারা গোপনে গোপনে ইহুদি ধর্মই পালন করে। এই কারণে গুপ্তচররা খেয়াল করত যে তারা শুকরের মাংস খাচ্ছে কি না, বা শনিবারে কাজ করছে কি না। মনে রাখা দরকার যে শনিবার হচ্ছে ইহুদিদের সাবাথের দিন। এই দিন কোনো ইহুদি কোনো কাজ করে না। গোপন সন্দেহে অনেক ইহুদিকে ইনকুইজিশনের সামনে হাজির করা হয়েছে এবং পুড়িয়ে মারা হয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে যাদেরকে ইহুদি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, তাদের অনেকেই ছিল খাঁটি খ্রিস্টান। কিন্তু তার জন্য খ্রিস্টান রাজা বা ধর্মনেতারা বিন্দুমাত্র অনুশোচনায় ভোগেননি এই বিশ্বাসের কারণে যে একজন ইহুদির বেঁচে যাওয়ার চেয়ে ভুলক্রমে একশো জন খ্রিস্টানকে মেরে ফেলাও ভালো। স্পেন থেকে বহিস্কৃত ইহুদি, যারা পর্তুগাল এবং ইউরোপের অন্যান্য অংশে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। কোথাও তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক স্থানেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তাদের থাকা ও বিচরণের এলাকা। আমস্টারডাম ছাড়া আর সকল শহরেই ইহুদিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তাদের একটি নির্দিষ্ট কলোনির মধ্যে বাস করতে হতো। তাদের একটি নির্দিষ্ট জেলায় বসবাস করতে হতো চার দেয়ালের মধ্যে। এই ধরনের ইহুদি-কলোনিকে বলা হতো 'ঘেটো'। এখানে ইহুদিদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করতে হতো বলে তারা স্বভাবতই হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও সংকীর্ণমনা। ঘেটো ছিল একটা বিচ্ছিন্ন জগৎ। এইসব ঘেটোর সীমিত পরিসরের মধ্যেই থাকত ইহুদিদের স্কুল, সামাজিক সাহায্য প্রতিষ্ঠান, তাদের স্নানাগার, গোরস্থান এবং কসাইখানা। ঘেটোর মধ্যে তাদের রাব্বি বা ধর্মীয় নেতারা ইহুদি আইন অনুযায়ী তাদের পরিচালিত করতেন। এককথায় ঘেটোগুলি ছিল 'রাষ্ট্রের মধ্যে আরেক রাষ্ট্র' এবং 'দুনিয়ার মধ্যে আরেক দুনিয়া'। ইহুদিরা বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে খুব একটা জানতেও পারত না। এই রকম পরিস্থিতিতে তাদের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তেমন কোনো আগ্রহও ছিল না। সচরাচর ঘেটোগুলি অবস্থিত হতো অস্বাস্থ্যকর নোংরা জায়গাতে, উঁচু দেওয়াল তুলে আলাদা করে রাখা হতো ঘেটোগুলিকে। তাদের এলাকা সম্প্রসারণের কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে ঘেটোগুলি ছিল খুবই ঘনবসতিপূর্ণ। কোনো ঘেটোতে এক টুকরা বাগানের কথা চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল। নতুন পরিবারকে জায়গা করে দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল ছাদের উপরে আরেকটি তলা তৈরি করা। এটি করা হতো নড়বড়ে ভিতের উপর। তাই প্রায় বাড়িই ধসে পড়ত সম্পূর্ণরূপে। রোগে ভুগে, আগুন লেগে এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারাত শত শত ইহুদি। ইহুদিদেরকে বাধ্য করা হতো নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক পড়তে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কেবলমাত্র দর্জিগিরি ও ফেরিঅলার পেশা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অজুহাতে ইহুদিদের ব্যাপক গণহত্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকার হতে হয়েছে খ্রিস্টানদের হাতে। সর্বশেষ হলোকস্টের ঘটনা ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের হাতে বিশ লক্ষ ইহুদি-নিধনের মাধ্যমে।

শত শত বৎসরের এই অত্যাচার ও খ্রিস্টান-বর্বরতার কথা ইহুদিরা এখন ভুলে গেছে বলেই মনে হয়। প্যালেস্টাইনকে ইহুদিদের হাতে তুলে দিয়ে সেখানকার আরব মুসলমানদের উৎখাত করে ইহুদি ইসরায়েল রাষ্ট্র স্থাপন করে দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার খ্রিস্টানরা ইহুদিদের প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে রয়েছে তাদের যৌথভাবে বিশ্বের সকল সম্পদ কুক্ষিগত করার আকাঙ্ক্ষা।

বিশ

মুসলমানরা আমেরিকাকে ঘৃণা করে কেন?

লিসবেথ এমন একটি প্রসঙ্গকে সরাসরি সামনে নিয়ে আসবে তা ভাবতে পারেনি ইউসুফ। সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকাল লিসবেথের দিকে। লিসকে সিরিয়াসই মনে হচ্ছে। তবু ইউসুফ জিজ্ঞেস করল– তুমি কি সত্যিসত্যিই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাও?

হ্যাঁ করতে চাই।

কেন?

কারণ এই প্রশ্নের সাথে আমার খুব গভীর একটি জিনিস জড়িত আছে। খুব ডিপ একটা ফিলিংস।

কেমন সেটা?

তা আমি পরে বলব। এখন তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইউসুফ খেয়াল করেছে গত মাসখানেকের মধ্যে লিসের বাংলায় অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে। এখন প্রায় সম্পূর্ণ বাক্যই সে বাংলাতে বলতে পারে। এবং নির্ভুলভাবে বলতে পারে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অধৈর্য হয়ে ওঠে লিস– কই! বলছ না কেন?

তোমার প্রশ্নের মধ্যে দুইটি ভুল আছে। প্রথমত, মুসলমানরা আমেরিকার সবকিছুকে ঘৃণা করে না। ঘৃণা করে আমেরিকার ফরেন পলিসিকে, আমেরিকার অ্যাগ্রেসিভ মনোভাবকে, বিশ্বজুড়ে সবকিছুতে আমেরিকার অবৈধ নাক গলানোকে।

আর নাম্বার টু ভুল?

দ্বিতীয় ভুলটা হচ্ছে, আমেরিকাকে শুধু মুসলমানরা ঘৃণা করে না; বরং পশ্চিম ইউরোপ এবং ইহুদি-ইসরায়েল ছাড়া প্রায় সব ধর্ম এবং সব জাতির মানুষই ঘৃণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। তোমার ঘরের পাশ লাতিন দেশগুলির দিকে তাকাও। সেখানে তো প্রায় সবাই খ্রিস্টান। কিন্তু তারা সবাই ঘৃণা করে আমেরিকাকে।

মুখটা ম্লান হয়ে গেল লিসের। সত্যের একটা আঘাত আছে। তা সামলানোর ক্ষমতা খুব কম জনেরই থাকে। তার মুখ দেখে খারাপ লাগল ইউসুফের। সান্ত্বনার ঢং-য়ে বলল– আমি তো আগেই বলেছি, আমেরিকান মানেই তাকে ঘৃণা করতে হবে, এমনটি কেউ ভাবে না। যেমন তোমাকে তো এখানে কেউ অপছন্দ করে না। আমাদের কারও কাছে তুমি আমেরিকান নও। আমাদের কাছে তুমি লিস।

খুশি হয়ে ওঠার ভঙ্গি করে লিসবেথ– রিয়েলি?

হানড্রেড পারসেন্ট।

আচ্ছা তবুও তুমি বলো আমাকে, আমেরিকার দোষ কোথায় কোথায়?

ইউসুফ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে– থাক না লিস! লেট আস টক অ্যাবাউট সামথিং এল্‌স!

না। তুমি বলো! জেদ ধরে লিস।

মনে মনে হেসে ফেলল ইউসুফ। আমেরিকার অপরাধের কয়টা ফিরিস্তি আর সে দিতে পারবে লিসবেথকে! বরং এককথায় বলে দিলে ভালো হয় যে আমেরিকা কোন খারাপ কাজটা করে না? সেইভাবেই বলল ইউসুফ– দ্যাখো লিস, আমেরিকা সারা পৃথিবীতে যত অপকর্মের সাথে জড়িয়েছে তার তালিকা তুলে দিতে গেলে মহাভারতেও কুলাবে না।

মহাভারত কী?

মহাভারত হচ্ছে হিন্দুদের একটা পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাকাব্য।

হোমারের চাইতেও বড়?

হ্যাঁ। হোমারের চাইতেও বড়। বেশ অনেকখানিই বড়।

তার মানে তুমি বলতে চাও যে অ্যামেরিকার ক্রাইমের পরিমাণ হিউজ?

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ইউসুফ– এগজ্যাক্টলি।

এত ক্রাইম একটা দেশ কীভাবে কন্টিনিউ করে যেতে পারে? আই মিন কী প্রসেসে করে?

নিজে করে, ডাইরেক্ট ফোর্স দিয়ে করে, সিআইএ-কে দিয়ে করে, অন্য দেশের ভাড়াটে টেরোরিস্ট গ্রুপকে দিয়ে করে, জাতিসংঘের মাধ্যমে করে, বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে করে, আইএমএফ-এর মাধ্যমে করে, বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে করে, মাল্টিন্যাশনাল করপোরেট হাউজের মাধ্যমে করে।

বিশ্বাস করাই মুশকিল! বিড়বিড় করে বলে লিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসল ইউসুফ– আচ্ছা তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। নব্বই সালে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে আমেরিকার সামরিক বাজেট কমেছে না বেড়েছে?

ইউসুফের প্রশ্ন করার ঢং থেকেই উত্তরটা পেয়ে যায় লিসবেথ। বলে– সম্ভবত বেড়েছে।

হ্যাঁ বেড়েছে। তোমাদের আমেরিকানদের কারও মনে এই প্রশ্ন আসেনি কেন যে এখন তো আর কমিউনিজমের সাথে বিশ্বযুদ্ধের ভয় নেই, প্রতিদ্বন্দ্বি অন্য কোনো সুপার পাওয়ার নেই, তাহলে আমেরিকার মিলিটারি বাজেট কমছে না কেন?

একটু বোকা বোকা দেখায় লিসবেথকে। সত্যিই তো এই প্রশ্নটা মনে আসার কথা ছিল। লিসবেথ বলল– আসলে আমরা অ্যামেরিকানরা অত জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাই না। নিজেদের জীবন যাপন করি। ব্যস।

কারণ তোমাদের মাথা না ঘামালেও চলে। কারণ তোমাদের দেশে সাধারণ মানুষের জীবন চালানো কোনো কঠিন কাজ নয়।

ঠিক। লিসবেথ স্বীকার করল। তারপর একটা কথা মনে পড়তেই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল– ও হ্যাঁ! নাইন-ইলেভেনের পরে, মানে টুইন টাওয়ারে মুসলিম টেরোরিস্টদের হামলার পরে অনেক অ্যামেরিকান জিজ্ঞেস করেছিল– ওরা আমাদের ঘৃণা করে কেন? তখন টিভিতে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন যে ওরা আমাদের সচ্ছলতা আর উন্নত জীবনকে ঈর্ষা করে। তাই ওদের এত ঘৃণা।

ইউসুফ বলল– না ঘটনাটা তা নয়। মুসলমানরা তোমাদের উন্নত জীবনের জন্য হিংসা বা ঘৃণা করে না। তারা তোমাদের ঘৃণা করে, কারণ তোমাদের উন্নত জীবন নিশ্চিত করার জন্য আমেরিকান গভর্নমেন্ট সারা পৃথিবী থেকে গরীব মানুষের সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় তোমাদের জন্য।

ওহ!

আচ্ছা তুমি কি জানো যে জাতিসংঘের ১৯০টি সদস্য দেশের মধ্যে ১২০টিতেই কোনো-না- কোনো ভাবে আমেরিকান সৈন্য অবস্থান করছে? অন্য দেশে আমেরিকার সৈন্যের সংখ্যা পাঁচ লাখেরও বেশি? তুমি কি বলতে পারবে কেন আমেরিকান সোলজার পৃথিবীর সব জায়গায় মোতায়েন করা আছে?

সম্ভবত পিস কিপিং-এর জন্য।

আমেরিকার সাধারণ মানুষ সেটাই মনে করে। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে তারা পৃথিবী থেকে শান্তি প্রায় নিঃশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আফগানিস্তানে আমেরিকান সৈন্য কী করছে?

বিন লাদেনকে খুঁজছে। কারণ সে টুইন টাওয়ারে হামলা চালিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও কেউই নিশ্চিত হতে পারেনি যে টুইন টাওয়ারে বিন লাদেন এবং আল কায়েদাই হামলা চালিয়েছে। আমেরিকার কোনো এজেন্সির হাতেও সলিড কোনো প্রমাণ নেই। তবু নাহয় ধরে নিলাম বিন লাদেনই এই হামলা চালিয়েছে। তাই বলে আফগানিস্তানে এই রকম ম্যাসাকার কেন?

টেরোরিস্ট নির্মূল করার জন্য।

লিসবেথের মুখস্ত উত্তরে দুঃখের হাসি ফুটল ইউসুফের ঠোঁটে– মনে করো নিউ ইয়র্কের একটা টেরোরিস্ট গ্রুপ আমাদের বাংলাদেশে হামলা চালিয়েছে। এখন তারা লুকিয়ে আছে সেখানে। তো তাদেরকে মারার জন্য আমরা কি নির্বিচারে সমস্ত নিউ ইয়র্কের উপর বোমা ফেলতে পারি? কয়েকজন টেরোরিস্টকে নির্মূল করার জন্য পুরো নিউ ইয়র্ককে কি ধ্বংস করতে পারি?

তা কেন হবে?

তোমরা কি সেই কাজটাই করছ না আফগানিস্তানে?

তাৎপর্য বুঝতে পেরে হা হয়ে গেল লিসবেথ– তাই তো!

ইউসুফ নির্দয়ের মতো বলে চলল– আর যেসব টেরোরিস্টের কথা বলছ তোমরা। ওসামা বিন লাদেন সহ আফগানিস্তানের সমস্ত টেরোরিস্ট যে আমেরিকার টাকায় এবং আমেরিকার প্রশিক্ষণেই তৈরি তা বোধহয় তোমরা সাধারণ আমেরিকানরা জানোই না?

সত্যিই জানি না।

বেশিদিনের কথা নয়। এই ধরো ১৯৮৫ সালেও আফগানিস্তানের জঙ্গী কমান্ডার গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে হোয়াইট হাউজে আপ্যায়ন করেছিলেন তোমাদের প্রেসিডেন্ট রিগ্যান। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে এই লোকেরা, মানে হেকমতিয়াররা অত্যন্ত মহান। তারা এতই মহান যে আমেরিকার ফাউন্ডারদের সাথেই কেবল তুলনাযোগ্য। আর এখন তোমরা বোমা মেরে দেশটাকে ছাড়খাড় করে দিচ্ছ।

আফগানিস্তান একটা মাত্র উদাহরণ লিস। পৃথিবীর যে প্রান্তেই তাকাবে, দেখবে সেখানেই গেড়ে বসেছে তোমাদের ঈগলের থাবা। সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটায় আমেরিকা। নিজেদের দেশে তারা গণতন্ত্র চর্চা করে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলি আরব দেশে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকারদের গদিতে বসিয়ে রেখেছে আমেরিকা। যতদিন তারা আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করবে, ততদিন আমেরিকার কাছে তারা গণতন্ত্রের মানসপুত্র। কিন্তু যেই তারা আমেরিকার কোনো কথা অমান্য করবে, তখনই তারা একনায়ক, গণতন্ত্রের শত্রু। ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের কথা মনে আছে তো তোমার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ।

সাদ্দাম হোসেন হচ্ছে এর একটি সর্বসাম্প্রতিক উদাহরণ। আর যে দগদগে ঘা সারা পৃথিবীর মুসলমানদের বুকের ওপর বসিয়ে রেখেছে আমেরিকা, তা হচ্ছে ইসরায়েল।

কীভাবে?

ইসরায়েলের অন্যায় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে আমেরিকাই।

তাই বলে একটি রাষ্ট্রকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না। ইসরায়েলের মানুষেরও তো বাসস্থানের অধিকার আছে।

অবশ্যই আছে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই সেই দেশটা আসলে যাদের, সেই প্যালেস্টাইনি আরবদের উৎখাত করে নয়।

তা বটে। কিন্তু আরবরা তো খুবই টেরোরিস্ট হামলা চালায় ইসরায়েলের লোকদের ওপর।

তার মানে তুমি বলতে চাও যে প্যালেস্টাইনিরা সন্ত্রাসী?

তা কি বলা যায় না?

আমি তা বলতে রাজি নই। আমার কাছে ওরা মুক্তিযোদ্ধা। ফ্রিডম ফাইটার। যেহেতু ওদের ভারি অস্ত্র নেই, ট্যাংক নেই, কামান নেই, তাই ওদের গেরিলা কায়দাতেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

একটু থেমে বলল ইউসুফ—এইভাবে বিচ্ছিন্ন আলাপে কোনো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া অসম্ভব। এতে শুধু বিতর্কই হবে। তুমি যদি প্যালেস্টাইন আর বর্তমান ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার সঠিক ইতিহাস জানতে পারো, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে যে কে অত্যাচারি আর কে অত্যাচারিত। তুমি যদি না পাও, আমাকে বোলো। আমি তোমাকে বই দিতে পারব পড়ার জন্য।

ঠিক আছে ইউ, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।

কেন? আমাকে বিশ্বাস করার দরকার কী? নিজে নিজে ইনফরমেশন খুঁজে নিলেই পারবে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে।

তার দরকার নেই। তোমার সিদ্ধান্তকে আমি সঠিক বলে মেনে নিতে রাজি আছি।

কে তোমাকে বলল যে আমার সব সিদ্ধান্ত সঠিক হবে?

অবশ্যই সঠিক হবে। কারণ তুমি ওয়ান সাইডেড কোনো কিছু ভাবো না। দুই দিকের কথাই তুমি কনসিডার করো। তারপরে সিদ্ধান্ত নাও। কাজেই তোমার ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি।

এই রকম অন্ধ কনফিডেন্স ভালো নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমারও তো ভুল হতেই পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা হোক। মাইনর ভুলে কিছু ক্ষতি হবে না। তুমি আবার তা কারেকশন করতে পারবে। তাই আমি আর চিন্তা-ভাবনা করতে চাই না। ওটা তোমার ওপরই থাকুক। আমার কাছে চিন্তা-ভাবনা করা খুব খাটুনির কাজ মনে হয়।

প্রসঙ্গ থেকে সরতে পারেনি তখনও ইউসুফ– আসলে কী জানো লিস, সমস্যাটা দুই দৃষ্টিভঙ্গির। আমেরিকা বা ইউরোপ, যাকে আমরা একসাথে বলি পশ্চিম, তা শুধু একটা দেশ বা শক্তিই নয়, তা একটা দৃষ্টিভঙ্গিও। অধিপতি দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করা হয় যে পশ্চিমের সবকিছুই ভালো। পশ্চিমই একমাত্র সভ্য। তাই অন্যদেরকে সভ্য করার জন্য তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার নৈতিক ক্ষমতা ও যোগ্যতাও তার আছে। পশ্চিম বিশ্বাসই করতে পারে না যে তার বাইরেও সভ্যতা আছে। রেনেসাঁর নামে কত সমৃদ্ধ সভ্যতাকে যে ধ্বংস করেছে পশ্চিম! এখনও তার আগ্রাসী চরিত্রের পেছনে লুকিয়ে আছে সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। আগ্রাসন চালানোর জন্য সে অজুহাত খোঁজে। সেই জন্যই সে শত্রু খুঁজে বেড়ায়। অ্যাকচুয়াল শত্রু না থাকলেও সে তার দেশের মানুষদের সামনে, ভোটারদের সামনে একটা ভারচুয়াল শত্রুকে খাড়া করে, যাতে তার ভোটাররা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেই শত্রুর বিরুদ্ধে পশ্চিমের আগ্রাসনকে সঠিক মনে করে। শুধু রাষ্ট্রের কথাই বা বলি কেন, পশ্চিমের মিডিয়া, পশ্চিমের পণ্ডিতসমাজ, পশ্চিমের কবি-শিল্পী তারা সবাই মনে করে অপরকে সভ্যতায় উত্তীর্ণ করার জন্য সব জায়গায় হস্তক্ষেপ করা, সব জায়গায় আগ্রাসন চালানো জায়েজ। এই শত্রু খোঁজার প্রক্রিয়া হিসাবেই সে কমিউনিস্ট লাল পতাকার পরে এখন শত্রু হিসাবে বেছে নিয়েছে ইসলামের সবুজ পতাকাকে। যে কোনো শিশুও জানে যে পুরো ইসলামি বিশ্বের সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা নেই পশ্চিমকে চ্যালেঞ্জ করার। মুসলমানদের তেমন কোনো ইচ্ছাও ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু পশ্চিম তাকে টেনে এনেছে লড়াইয়ের ময়দানের মাঝখানে। মুসলমানদের যেহেতু মুখোমুখি লড়াই করার রসদ নেই, তাই সার্বিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিভিন্ন রকমের। তার ফলশ্রুতিই হয়তো টুইন টাওয়ারও। সারা পৃথিবীর মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাতে চালাতে, মুসলমানদের নিরাপত্তা ধ্বংস করতে করতে এখন ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়তে হয়েছে পশ্চিমকে। এখন পশ্চিমের নাগরিকরাও আর নিরাপদ নয় সন্ত্রাসের হাত থেকে। এই বিপদ নিজের ওপর নিজেই টেনে নিয়েছে পশ্চিম। কিন্তু নিজের নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপার নিয়েও জুয়া খেলছে পশ্চিম। সন্ত্রাসবাদী হামলাকে অজুহাত বানিয়ে নতুন আগ্রাসনের জন্য খুলছে নতুন নতুন যুদ্ধের ফ্রন্ট।

এর প্রতিক্রিয়া আর কী রকম হবে ইউ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ইউসুফ– মুসলমানদের তরফ থেকে অনেক রকম প্রতিক্রিয়াই আসতে পারে। মৌলবাদী গ্রুপগুলো তো জিহাদের নামে টেরোরিস্ট কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেবেই। কিন্তু তাতে মুসলমানদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তবে মুসলমানদের মধ্যে একটা লিবারেশন থিয়োলজি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। মধ্যপন্থী ইসলামি চিন্তাবিদদের সঙ্গে বাম আন্দোলন থেকে আসা বুদ্ধিজীবীদের একটা চিন্তার সমন্বয়ের মাধ্যমে এই লিবারেশন থিয়োলজি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রে। যেমনটি ঘটেছে লাতিন আমেরিকায় ধর্মযাজকদের সাথে বামপন্থীদের সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে।

তাহলে তো খুব ভালো হয়।

লিসবেথের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে তাকাল ইউসুফ– তুমি কীভাবে বুঝলে এতে ভালো হবে?

আমি বুঝিনি। কিন্তু তোমার কথার ভঙ্গিতে মনে হলো তুমি এই রকমই কিছু একটা চাও। আর তুমি যেটা চাও, সেটা তো ভালো হবেই।

তারপর একেবারে শুরুর প্রসঙ্গে চলে গেল লিসবেথ। খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল– বাংলাদেশী মুসলমান ইউ কি অ্যামেরিকান ক্রিশ্চিয়ান লিসকে ঘৃণা করে?

অবাক হয়ে গেল ইউসুফ– প্রশ্নই ওঠে না। বলেছি তো আমাদের কাছে তুমি শুধুই লিস।

তাহলে আমাকে বাসায় পৌঁছে দাও! আদুরে কণ্ঠে বলল লিসবেথ।

রিকশা থেকে নেমে লিসবেথ বলল– আজ ওপরে চলো। এককাপ কফি খেয়ে যাবে!

দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইউসুফ। তার কাছে ঘেঁষে এলো লিসবেথ। নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– যাবে না?

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল ইউসুফ– চলো যাচ্ছি।

দোতলায় উঠে তালা খোলার সময় লিসবেথের হাত একটু একটু কাঁপছে। চাবিটা ঠিকমতো তালার ফুটোয় ঢুকাতে পারছে না সে। ইউসুফ হাত বাড়িয়ে চাবি নিয়ে তালা খুলল। ভেতরে ঢুকে লিসবেথ আলো জ্বালানোর পরে ঘরে পা রাখল ইউসুফ। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লিসবেথ। সে এমনকি বসতেও বলছে না ইউসুফকে।

কী হলো লিস?

ইউসুফের প্রশ্নে নিজেকে সামান্য ফিরে পেল লিসবেথ। ফিস ফিস করে বলল– ওয়েস্টার্ন কালচারে কোনো মেয়ে যখন কোনো ছেলেকে তার ঘরে কফি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়, তখন তার সিগনিফিক্যান্সটা কি থাকে তা কি তুমি জানো ইউ?

ইউসুফ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ লিসবেথের দিকে। তারপর হাসল– আনফরচুনেটলি হ্যাঁ। জানি আমি।

থরথর করে কেঁপে উঠল লিসবেথ– তাহলে কি আমাকে মুখে বলতে হবে কথাটা? কিন্তু আমার মধ্যে যে প্রাচ্য অনেকখানি ঢুকে পড়েছে ইউ। আমার মুখে যে কথাটা আসছে না!

না। দরকার নেই লিস। তোমাকে মুখে বলতে হবে না!

লিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে এলো ইউসুফ। রিকশার খোঁজে তাকাল এদিক-ওদিক। রিকশা নেই একটাও। কিন্তু শামসুল আছে। ম্লান আলোতেও তার মুখের সেই নোংরা হাসি দেখা যায়। তার দিকে হাসতে হাসতেই এগিয়ে এলো শামসুল– কী বান্ধবীর ঘর থেকে এলে মনে হচ্ছে! ভালোই তো মৌজে আছ ব্রাদার! আমেরিকান বান্ধবী। সাদা চামড়ার মেয়ে বলে কথা। দারুণ খেল দেয় তাই না ইউসুফ?

হাত মুঠি করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল ইউসুফ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল– খবরদার! ফালতু কথা একটাও বলবে না! পরে আছো ইসলামি লেবাস, আর মুখ থেকে বের হচ্ছে বেশ্যার গন্ধ। ইসলামকে আর নীচে নামিও না।

আরে রাখো তো দোস্তো ইসলামের কথা। ওসব যখন মসজিদে যাব তখন বলব। এখন বলো দেখি দোস্তো মালটা কেমন! আমাদেরও একটু চেখে দেখার সুযোগ করে দাও না!

মারল ইউসুফ।

অনেকগুলো জমাট বাঁধা ক্রোধ এসে তার মুঠোকে শক্ত বানিয়ে ফেলল লোহার মতো।

আকলিমা নামের মেয়েটি, যে শামসুলের এনজিও নামের হায় হায় কোম্পানিতে সঞ্চয়ের টাকা খোয়ানোর কারণে তার রিকশাঅলা স্বামীর কাছ থেকে তালাক পেয়েছে; শামসুলের নামে উচ্চারণ করা আকলিমার সেই লানতের ক্রোধ–

ভারতী নামের হিন্দু বিধবা মেয়েটি তার টাকা শামসুলের এনজিও-তে হারানোর পরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল; সেই অসহায় মেয়েটির আত্মহননের আগে উচ্চারণ করা বিধাতার বিচারের আবেদনের অসহায় ক্রোধ–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীতে অসহায় মানুষের মধ্যে বিলি করার জন্য পাঠানো বিদেশী সাহায্যের কম্বল শীতার্ত মানুষকে না দিয়ে চুরি করে বিক্রি করে দেওয়ায় সেইসব মানুষের শীত-কামড়ে অসহায় কান্নার ক্রোধ–

মানুষকে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়ে সেই টাকা মেরে দেওয়ার পরে নিঃসম্বল বেকার অনেকগুলো ছেলের অসহায় কান্নার ক্রোধ–

ইসলামের নাম করে এখন ইসলামি লেবাস ধরে সরল মানুষকে বিপথে চালিত করার বিনিময়ে টাকা সংগ্রহের পাপের কারণে ক্রোধ–

লিসবেথের নামে অকথ্য অশ্রাব্য অশালীন শব্দগুলো উচ্চারণ শুনে জমে ওঠা ক্রোধ–

এত জোরে ঘুষিটা মারল ইউসুফ যে মনে হলো তার নিজেরই আঙুলের গাঁটগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে। চিটার শামসুলের চোয়ালের সাথে তার মুঠোর সংযোগ হওয়ার সাথে সাথে ইউসুফ অনুভব করল, সে পেরেছে। কুত্তার বাচ্চাটার চোপা গুড়িয়ে দিতে পেরেছে। অসহায় প্রতারিত মানুষগুলোর পক্ষ থেকে অন্তত সামান্য হলেও, প্রতীকি হলেও, প্রতিশোধের বহিঃপ্রকাশ দেখাতে পেরেছে।

রাস্তায় ড্রেনের পাশে লুটিয়ে পড়ে থাকা শরীরটার দিকে একবারের জন্যেও ফিরে তাকাল না ইউসুফ। এই কাজটা করতে পেরে নিজেকে তার অনেকটা নির্ভার মনে হচ্ছে। আজ রাতে তার ভালো ঘুম হবে।

ঘণ্টাখানেক পরে কেন্দ্রীয় মসজিদের সিড়িতে একটা নাটক দেখা গেল।

ধূলো আর রক্তমাখা শামসুল দুই হাত আসমানের দিকে তুলে উদ্বাহু হেঁড়ে গলায় চিৎকার করছে– আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! মুসলমান ভাইরা জাগো! দুনিয়ার মুসলিম জাগো! আমি ইসলামের পথে ফিরে আসার জন্য আজ আমার উপর হামলা হয়েছে। আমি আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য আজ আমার উপর হামলা হয়েছে। আমার ইসলামি লেবাসকে অপমান করা হয়েছে। আমার দাড়ি, আমার নবীজীর সুন্নতকে অপমান করা হয়েছে। অপমান করেছে এই শহরের চিহ্নিত নাস্তিক ইউসুফ। আমি মুসলমানদের কাছে এর বিচার চাই। আমি আল্লাহর কাছে এর বিচার চাই।

সারা রাত মাইকিং হলো শহরজুড়ে– মুসলমান ভাইরা জাগো! আজ আমাদের শহরে ইসলামকে অবমাননা করা হয়েছে। আজ আমাদের শহরে ইসলাম সম্পর্কে যা খুশি বলা হচ্ছে। আজ আমাদের শহরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। জাগো! মুসলিম জাগো! নিদ্রা থেকে জাগো! আওয়াজ তোলো ইসলামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমান– সইব না সইব না! ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ– বন্ধ করো করতে হবে! মুরতাদ ইউসুফের– ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই!

সকালে মিছিল শুরু হলো। একের পর এক মিছিল। হাজার হাজার মানুষ ঘেরাও করল ডিসি অফিস। মুখে একটাই শ্লোগান– মুরতাদ ইউসুফের ফাঁসি চাই!

বাইশ

তার বিচার করতে বসা মানুষগুলোর দিকে তাকাল ইউসুফ।

কেন্দ্রীয় মসজিদ চত্বরেই বসেছে বিচার সভা। তার বিচারক কারা! সামনের সারিতে বসা মানুষগুলোই আজ ফয়সালা দেবে।

আবার তাদেরকে খুঁটিয়ে দেখল ইউসুফ।

একজন রিটায়ার্ড কাস্টমস কর্মী। নন-গেজেটেড পোস্টের কর্মচারী ছিল। বেতন ছিল রিটায়ারমেন্টের সময় সর্বসাকুল্যে সাত হাজার টাকা। এই শহরের সবচেয়ে গর্জিয়াস বাড়িগুলোর একটি তার। ঢাকাতেও নাকি বাড়ি আছে। ব্যাংকে যা টাকা আছে তা তার তিনপুরুষ বসে খেয়েও শেষ করতে পারবে না। কেউ জিজ্ঞেসও করে না তার এই সম্পদের উৎস কোথায়! এই রকম একজন ঘুষখোর লোক তার বিচারক।

আরেকজন এই শহরের এক চাপকল মিস্ত্রির ছেলে। তার মা ইউসুফদের ছোটবেলায় কাঁকালে ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি পাউরুটি ফেরি করত। সে কাজ শুরু করেছিল এক ঠিকাদারের বডিগার্ড হিসাবে। স্বাধীনতার পর থেকে সব সময়েই সব সরকারি দলের ক্যাডার ছিল। এখন আন্তর্জাতিক ঠিকাদার। শহরের সবচেয়ে বড় চারটি শপিং মলের মালিক। সে-ও ইসলামের রক্ষক!

আরেকজন ছিল ছিঁচকে ছিনতাইকারী। রাতের ট্রেনে যেসব যাত্রীরা এসে নামত, সুযোগ বুঝে তাদের গলায় চাকু ধরে কেড়ে নিত টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র। সে পরে হয়ে গেল সরকারি দলের ক্যাডার। সেখান থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদার। এক কোদাল মাটি না ফেলেও অন্তত চার-পাঁচটা বাঁধ তৈরির সম্পূর্ণ টাকা তুলে নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার আর স্থানীয় মন্ত্রীকে কিছু অংশ দিয়ে। নিজের বাড়ি ছাড়াও আরেকটি প্রমোদখানা আছে তার এই শহরেই। রক্ষিতা আছে অন্তত একগণ্ডা।

আরেকজন শহরের বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী। খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনের আমলে সার নিয়ে যে তোঘলকি কাণ্ড ঘটেছিল, সারের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল আঠারো জন কৃষক, সেই সময় কয়েক মাসে কোটিপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাওয়া লোক সে। তার নাকি এতই টাকা, যে যখন খুশি টাকা ঢেলে যে কোনো অফিসারকে কিনে নিতে পারে। সবাই জানে, তার একটা নকল সারের কারখানা আছে। কিন্তু প্রশাসন বা পুলিশ তাকে ছুঁতেও পারে না।

আরেকজন ছিল শহরের ঢাকা কোচের কলার বয়। পরে হলো বাসের হেলপার। তারপরে ড্রাইভার। যে মালিকের গাড়িতে থাকত, সেই মালিকই লোকসানে লোকসানে পথে বসত। সেইসব গাড়ির মালিক এখন সে। কোন ব্যাংকে তার কত টাকা আছে সে নিজেও জানে না।

আরেকজন! ঐ লোকটাকে ছোটবেলায়, মানে একাত্তরে, ইউসুফ নিজের চোখে দেখেছে কাঁধে রাইফেল নিয়ে বিহারি আর পাকবাহিনীর সাথে সাথে ঘুরতে। ঐ সময়েই অন্তত তিনজন হিন্দু মেয়েকে জোর করে তুলে এনে বিয়ে করে ঘরে রেখেছিল। পাকিস্তানি আর্মির ক্যাম্পেও নারী সাপ্লাই করত। ষোলোই ডিসেম্বরের পর পালিয়েছিল। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের আগে আর শহরে ফিরতে পারেনি। শহরের সবচেয়ে বড় জুয়ার ঠেকগুলো সেই চালায়।

আরেকজনের নামের সাথে স্মাগলার শব্দটি জড়ানো। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মানুষই তাকে চেনাতে গেলে বলে অমুক স্মাগলার। রিকশাঅলাকে শুধু বললেই হয় অমুক স্মাগলারের বাড়ি যাব, তাহলেই শহরের যে কোনো রিকশাঅলা তাকে পৌঁছে দেবে। এতই পরিচিত সে।

আরেকজন কিছুদিন আগেও পরিচিত ছিল শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত মাতাল হিসাবে। সন্ধ্যার পরে শহরের বাইপাশ-রোডে এক পরিচিত দৃশ্য ছিল। বিশেষ করে গরমের দিনে। ভ্যানরিকশায় দেশি মদের জেরিক্যান নিয়ে বসে আছে সে। পাইপ দিয়ে মুখে টেনে নিচ্ছে মদ। রিকশাঅলা ধীরে ধীরে রিকশা চালাচ্ছে। সে মদ খাচ্ছে, আর হাওয়া খাচ্ছে।

আর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে যে শত শত মানুষগুলো, তারা কারা? এদেরই ভাড়া করা মানুষ। এরা যা বলবে ইসলামের নামে সেই কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা। সমাবেশের দিকে বিতৃষ্ণ চোখে তাকাল ইউসুফ। চিন্তাশীলতার কোনো চিহ্ন নেই কারও চেহারায়। এরা যদি শামসুলের মতো মানুষদের কথায় না নাচত, তাহলে এই দেশটা কী এতটা নীচে নেমে যেতে পারত!

চোখ বন্ধ করল ইউসুফ। নিজের কী হবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় সে। তবুও নিঃশব্দ প্রার্থনায় নড়ে উঠল তার ঠোঁট– আল্লাহ ইসলামকে তুমি বাঁচাও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য, উদ্ধৃতি ও ধারণার জন্য ঋণস্বীকার

১. পবিত্র কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর)। মূলঃ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী'। অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। খাদেমুল হারামাইনিশ-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজের পক্ষ থেকে ওয়াকফ লিল্লাহ হাদিয়া স্বরূপ প্রদত্ত।

২. কোরান শরিফঃ সরল বঙ্গানুবাদ। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ৬ষ্ঠ মুদ্রণ। জানুয়ারি ২০০৫।

৩. বোখারী শরীফ (অখণ্ড)। অনুবাদঃ মাওলানা শামছুল হক ও শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক। মীনা বুক হাউস, ঢাকা। ২০০৭।

৪. বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীঃ চিন্তা ও কর্ম। ইমরান হোসেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯৩।

৫. মুহাম্মদঃ মহানবীর(সঃ) জীবনী। ক্যারেন আর্মস্ট্রং। অনুবাদঃ শওকত হোসেন। সন্দেশ, ঢাকা। আগস্ট ২০০২।

৬. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস। ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জেনারেল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৩৮৪।

৭. ধর্ম ও দর্শন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

৮. মুসলিম দর্শন। আমিনুল ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

৯. আদর্শ ও বাস্তবতা। (নোবেল বিজয়ী) ড. আবদুস সালাম। অনুবাদঃ এ, এম, হারুণ অর রশীদ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জানুয়ারি ১৯৮৮।

১০. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (প্রথম খণ্ড)। ইমাম গাযযালী(রহঃ)। অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। মদীনা পাবলিকেশান্স। বাংলা বাজার, ঢাকা। ৫ম সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ২০০৪।

১১. দর্শন ও প্রগতি। গোবিন্দ চন্দ্র দেব দর্শন গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জুন– ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যা।

১২. ইসলামে বিভ্রান্তি ও বৃটিশ গোয়েন্দাদের স্বীকারোক্তি। শাহরিয়ার শহীদ। বুক ক্লাব, আজিজ মার্কেট, ঢাকা। বইমেলা ২০০২।

১৩. বাঙালীর জাতীয়তাবাদ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ইউ.পি.এল. ঢাকা। ২০০০।

১৪. নির্বাচিত প্রবন্ধ। আবুল হুসেন। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

১৫. শিখা সমগ্র। সংকলন ও সম্পাদনাঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ২০০৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ: আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর। সম্পাদনা: বেনজীন খান। সংবেদ, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

১৭. শাশ্বত বঙ্গ। কাজী আবদুল ওদুদ। ব্র্যাক প্রকাশনা। ২য় সংস্করণ ১৯৮৩।

১৮. ইসলাম: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ক্যারেন আর্মস্ট্রং। অনুবাদ: শওকত হোসেন। সন্দেশ, ঢাকা। মে ২০০৪।

১৯. ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম। ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী। অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। মে ১৯৯১।

২০. বিচারক হিসাবে নারীরা। নিক নুরিয়ানি নিক বাডলি শাহ। অনুবাদ: শাজাহান ফারুক। সিস্টার্স ইন ইসলাম। দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন। ঢাকা। এপ্রিল ২০০৫।

২১. নাহ্জ আল-বালাঘা। মূল: আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিব। সংকলন: আশ-শরীফ আর-রাজী। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: জেহাদুল ইসলাম। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

২২. ভারতবর্ষ ও ইসলাম। সুরজিৎ দাসগুপ্ত। কলকাতা। ১৩৮৩ বাংলা।

২৩. শিয়া মাজহাবের উৎপত্তির ইতিহাস। সৈয়দ হোসাইন মুহাম্মদ জাফরী। অনুবাদ: মনজুর আলম। মাসুম পাবলিকেশান্স। ২৩-৪/১৫, মিরপুর, ঢাকা। সেপ্টেম্বর ১৯৯২।

২৪. কোরান বনাম শরিয়ত। মোহাম্মদ জামিলুল বাশার। ইয়ং মুসলিম সোসাইটি, বাংলাদেশ-কানাডা। পরিবেশক: র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা। ২০ জানুয়ারি ২০০৭।

২৫. ওহাবী আন্দোলন। আবদুল মওদুদ। আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা। ১৯৬৯।

২৬. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ। মফিজুল্লাহ কবীর। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৮৭।

২৭. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস। উইলিয়াম ডব্লিউ হান্টার। অনুবাদ: এম. আনীসুজ্জামান। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা। ১৯৯৯।

২৮. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস। আ. ত. ম. মুসলেহউদ্দীন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। জুন ১৯৮২।

২৯. বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান। ড. আজিজুর রহমান মল্লিক। অনুবাদ: দিলওয়ার হোসেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮২।

৩০. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। অনুবাদ: আবদুশ শহীদ নাসিম। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা। নভেম্বর ১৯৯২।

৩১. ইসলামী শরিয়াতের উৎস। মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা। আগস্ট ১৯৯৪।

৩২. ইসলামের নামে একটি নতুন ধর্ম তথা মওদুদী ধর্ম ও জামায়াতে ইসলামীর সঠিক স্বরূপ। মুহাম্মদ তাহের। মদনী মিশন বুক ডিপো। কলকাতা।

৩৩. অলৌকিক মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ইতিবৃত্ত। মাওলানা আবদুর রহীম হাজারী। নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা। জুলাই ১৯৯৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৪. আবুল হাশিম– তাঁর জীবন ও সময়। সম্পাদনাঃ সৈয়দ মনসুর আহমদ। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা। অক্টোবর ২০০০।

৩৫. ইসলাম– দি অলটারনেটিভ। মুরাদ হফম্যান। অনুবাদঃ মঈন বিন নাসির। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা। অক্টোবর ২০০৪।

৩৬. পল্লী বাংলার ইতিহাস। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার। অনুবাদঃ ওসমান গণি। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৩৭. বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান। ড. মরিস বুকাইলি। রূপান্তরঃ আখ্‌তার-উল্‌-আলম। জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা। মার্চ ২০০৩।

৩৮. আমরা কি মুসলমান? মোহাম্মদ কুতুব। অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুসা। আল হেরা প্রকাশনী, ঢাকা। এপ্রিল ১৯৮৮।

৩৯. ইসলামে ভিন্নমত ও ক্ষমতার লড়াই। সা'দউল্লাহ। ঐতিহ্য, ঢাকা। নভেম্বর ২০০০।

৪০. জালাল-গীতিকা সমগ্র। জালাল উদ্দীন খাঁ। সম্পাদনাঃ যতীন সরকার। নন্দিত, আজিজ মার্কেট, ঢাকা। মার্চ ২০০৫।

৪১. মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন। ড. আমিনুল ইসলাম। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। মার্চ ২০০৫।

৪২. মৌলবাদ– এক নতুন সংজ্ঞা। সুরজিৎ দাসগুপ্ত। ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা। ডিসেম্বর ১৯৯৫।

৪৩. ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ। মতিউর রহমান নিজামী। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। মার্চ ২০০৫।

৪৪. যুদ্ধ ও যুদ্ধের রাজনীতি– প্রসঙ্গ আফগানিস্তান। সম্পাদনাঃ রবীন আহসান। শ্রাবণ, ঢাকা। ডিসেম্বর ২০০১।

৪৫. দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রস্টান 'সভ্যতা'! মোহাম্মদ বায়াজিদ খান পন্নী। তওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা। আগস্ট ২০০৮।

৪৬. কাজী আবদুল ওদুদ। আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মে ১৯৭৬।

৪৭. মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলাবী। অনুবাদঃ আবদুস শহীদ নাসিম। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা। সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

৪৮. ইসলামী পুনর্জাগরণ– সমস্যা ও সম্ভাবনা। ড. ইউসুফ আল কারজাভী। রূপান্তরঃ মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী। সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা। সেপ্টেম্বর ১৯৯০।

৪৯. চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস। জে. বি. বিউরি। অনুবাদঃ প্রীতি কুমার মিত্র। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ২০০৭।

৫০. স্মৃতিকথা। কাজী মোতাহার হোসেন। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা। এপ্রিল ২০০৪।

৫১. বুদ্ধির মুক্তি শিখা ও আবুল হুসেন। সম্পাদনাঃ বেনজীন খান। সংবেদ, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

৫২. সোল অফ রুমী। কোলম্যান বার্কস। অনুবাদঃ আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। ঐতিহ্য, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৩. সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। মাইকেল প্যারেন্টি। অনুবাদঃ ওমর তারেক চৌধুরী। শ্রাবণ, ঢাকা।

৫৪. ইসলাম ৯/১১ ও বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদ। ড. নজরুল ইসলাম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। জানুয়ারি ২০০৭।

৫৫. ইসলামী চিন্তার পুনর্পঠন। সংকলন ও অনুবাদঃ রেহনুমা আহমেদ। একুশে, ঢাকা। মে ২০০৬।

৫৬. অরিয়েন্টালিজম। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ। ভূমিকা ও ভাষান্তরঃ ফয়েজ আলম। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা। আগস্ট ২০০৭।

৫৭. কাভারিং ইসলাম। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ। ভূমিকা ও ভাষান্তরঃ ফয়েজ আলম। সংবেদ, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

৫৮. বাঙ্গালী মুসলমানের মন। আহমদ ছফা। আহমদ ছফা রচনাবলী। সন্দেশ, ঢাকা।

৫৮. জাগো! সাক্ষ্য দাও! ড. আলী শরিয়তি।

৫৯. দি স্পিরিট অফ ইসলাম। সৈয়দ আমীর আলী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৬০. GOD'S TERRORISTS. Charles Allen. ABACUS. London. 2006.

৬১. Voices of American Muslims. Linda Brandi Cateura. Hippocrene Books. New York, 2005.

৬২. Progressive Muslims. Edited by: Omid Safi. One World, Oxford. 2006.

৬৩. The Battle for God: A History of Fundamentalism. Karen Armstrong. The Random House Publishing Group, New York. February 2001.

৬৪. Culture & Emperialism. Edward W. Said. Vintage Books. New York. June 1994.

৬৫. The Clash of Fundamentalisms: Cruseds, Jihads and Modernity. Tariq Ali. Rupa & Co. New Delhi, India. 2005.

৬৬. Liberal Islam. Charles Kurzman. Oxford University Press. New York. 1998.

৬৭. কিমিয়ায়ে সা'আদাত। ইমাম গাযযালী (রঃ)। অনুবাদঃ মাওলানা নূরুর রহমান। এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা। জুলাই ২০০৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আল এছলাম' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে উচ্ছ্বসিত ভাষায় লেখা হলো– 'বাঙ্গালীর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় বুদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণ যাহা পারে নাই, নানক-কবির যাহাতে সমর্থ হয় নাই, আকবর-আওরঙ্গজেব যে বিষয়ে বিফল মনোরথ, খেলাফত আজ সেই অসাধ্য সাধন করিল। হিন্দু-মোছলমানকে এক করিয়া কর্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। ...আজ হিন্দু বুঝিয়াছে মোছলমান তাহার ভাই, আজ মোছলমানও বুঝিয়াছে হিন্দু তাহার পর নয়...। হিন্দু মোছলমান ভারতের মেরুদণ্ড। ...জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হইলে, চাই হিন্দু মোছলমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন অটুট সম্প্রীতি ও অক্ষত ভ্রাতৃভাব।'

আর এক প্রাবন্ধিক কাজী মোহাম্মদ বখ্‌শ-এর মতে– 'এক শুভক্ষণে ভারতমাতা গান্ধী, শওকত ও মোহাম্মদ আলীকে নেতারূপে পাইয়াছে।' তিনি মুসলমানদের শিয়া, সুন্নি, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী প্রভৃতি মজহাবি বিতর্ক ভুলে এক হতে উপদেশ দিয়েছেন।

কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতা ছাড়াও বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। চারুচন্দ্র মিত্র খেলাফত আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে ও এই আন্দোলনকে সমর্থন করে লিখলেন– 'শাস্ত্রানুসারে খলিফার কতগুলি অধিকার আছে। তাহার কোন একটিকে বিচ্যুত করিলে তিনি আর খলিফা পদবাচ্য হইতে পারেন না। অনভিজ্ঞ ইংরেজ আন্দোলনকারীদের জানা উচিৎ যে, এছলাম ধর্ম-জগতের খলিফা ক্যাথলিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের পোপের অনুরূপ নহে। ...আমরা ভারতবাসী হিন্দু, ভারতীয় মোছলমানগণ আমাদের "ছোট ভাই"। ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক সময় বিবাদ বিসম্বাদ হইলেও আসন্ন বিপদ কালে ভ্রাতাই ভ্রাতার আশা, ভরসা ও অবলম্বন স্থল হইয়া থাকেন। ...ভরসা করি আমাদিগের হিন্দু ভ্রাতাগণ কখনই কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিবেন না।'

এই একই প্রবন্ধ লেখক 'হেজরৎ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের দেশত্যাগ না করার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের ভাগ্য একই সুতায় গাঁথা। ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী এই সময় বৌদ্ধিক এবং প্রায়োগিক– দুই ক্ষেত্রেই খেলাফত আন্দোলনকে বেগবান করতে থাকেন। তিনি লেখালেখির পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি 'হিন্দু-মোছলমান' প্রবন্ধে খেলাফত সমস্যার সমাধানে হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রীতির ওপর জোর দেন। তাঁর মতে, হিন্দু ও মুসলমানের নিজ নিজ ধর্মীয়,

মুসলমানমঙ্গল– দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~